
ওয়াসিকা নুযহাত
বৃষ্টিমহল ৩

বৃষ্টিমহল ৩

ওয়াসিকা নুযহাত

প্রথম প্রকাশ:

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১,

ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উৎসর্গঃ

আমার বন্ধুদের।

দিশা, তুলি, শম্পা, স্বর্ণা, নীলা, মুক্তা

তোরা ছিলি, তোরা আছিস, তোরাই থাকবি।

Contents

১ ..... ৭
২ ..... ১০
৩ ..... ১৪
৪ ..... ৪২
৫ ..... ৪৬
৬ ..... ৫৯
৭ ..... ৭০
৮ ..... ৭৬
৯ ..... ৭৯
১০ ..... ৮৯
১১ ..... ৯৮
১২ ..... ১০৩
১৩ ..... ১০৮
১৪ ..... ১১৪
১৫ ..... ১২২
১৬ ..... ১২৫
১৭ ..... ১২৯
১৮ ..... ১৩৭
১৯ ..... ১৪৩
২০ ..... ১৪৭
২১ ..... ১৫৩
২২ ..... ১৫৯
২৩ ..... ১৬৬
২৪ ..... ১৭৫
২৫ ..... ১৮১

২৬..১৮৫

২৭..১৯৪

২৮..১৯৯

২৯..২০৪

৩০.. ২১১

৩১..২২১

৩২..২৩৬

৩৩ ....২৪০

৩৪..২৪৪

৩৫..২৫১

৩৬ ....২৫৩

৩৭..২৬০

৩৮..২৬৯

৩৯..২৭৫

৪০..২৯০

৪১ ....২৯১

৪২ ....২৯৪

৪৩..৩০১

৪৪ ....৩০৪

৪৫ ....৩০৯

৪৬..৩১৫

৪৭ ....৩১৭

৪৮ ....৩২১

৪৯ ....৩২৬

৫০ ....৩৩২

৫১ ....৩৩৫

৫২ .... ৩৪১

৫৩.. ৩৬৮

৫৪ .... ৩৭৫

৫৫ .... ৩৭৮

৫৬.. ৩৮২

৫৭ .... ৩৮৮

৫৮ .... ৩৯৩

৫৯.. ৩৯৮

৬০.. ৪০৭

৬১.. ৪৩৩

৬২.. ৪৩৯

৬৩ .... ৪৪২

৬৪.. ৪৪৭

৬৫.. ৪৫৪

৬৬ .... ৪৬৩

৬৭.. ৪৬৬

৬৮.. ৪৭৩

৬৯.. ৪৭৯

৭০ .... ৪৮৩

৭১ .... ৪৯২

৭২ .... ৪৯৫

৭৩.. ৫০৪

৭৪ .... ৫০৯

৭৫ .... ৫১৫

৭৬.. ৫২২

৭৭ .... ৫২৬

৭৮ ....৫৩০

৭৯ ....৫৩৯

৮০..৫৪৯

৮১ ....৫৫৭

৮২..৫৬৫

৮৩..৫৭২

৮৪..৫৮৩

৮৫..৫৮৭

৮৬..৫৮৯

৮৭..৫৯৯

৮৮..৬০৮

৮৯..৬১১

৯০..৬১৬

৯১ ....৬৩১

৯২..৬৪৯

৯৩..৬৫৫

৯৪ ....৬৬০

৯৫ ....৬৬৫

৯৬..৬৭৮

৯৭..৬৮০

৯৮ ....৬৮২

৯৯..৬৯০

১০০ ....৬৯৭

১০১..৭০৪

১০২ ....৭১৯

১

ওরা যাচ্ছে কমলাপুর রেলস্টেশন। সিএনজির ভেতরে দুজনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে আধো আলোআঁধারিতে। শীতের খরবাতাস কেটে সাঁই সাঁই শব্দে ছুটে যাচ্ছে বাহনটা। সামি হৃদির কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসেছিল। হৃদির মাথাটা আলতোভাবে ওর বুকের ওপর রাখা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এমন ঘন ঘোর বিপজ্জনক মুহূর্তেও হৃদিকে পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে সামি তার বুকের মধ্যে এক মনোরম শান্তি অনুভব করছিল। তার আর কোনো দুঃখ নেই আজ। ডুয়ার্সের সন্ধেবেলার সেই অলৌকিক মায়াবী মেয়েটাকে সে পেয়ে গেছে। চিরদিনের জন্য পেয়ে গেছে!

কিন্তু হৃদিতার মনের ভেতর এখন বাস্তবতা ঠোকর দিচ্ছে। খচখচ করছে। কেবলই নিজের বাবা মায়ের মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে। পালিয়ে যাওয়ার খবর শোনার পর ওই দুজন মানুষের মনের অবস্থা কী হবে, প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে সে বারেবারে।

– ‘মনে হচ্ছে পালায় যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। চল ফিরে যাই!’ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল হৃদি।

– ‘মাথা খারাপ! এখন ফিরে গেলেই তানিশাকে বিয়ে করতে হবে।’

– ‘বেকুবের মতো কথা বলিস না সামি। তোর কি মুখ নাই? তুই মুখ ফুটে বলবি স্পষ্টভাবে যে তানিশাকে তুই বিয়ে করতে পারবি না।’

– ‘আমি আম্মাকে ফেস করতে চাচ্ছি না হৃদি। আম্মা অনেক কষ্ট পাবে ব্যাপারটা জানার পর।’

– ‘তুই পালায় গেছিস বিয়ের আগের রাতে এটা জানার পর কি উনি খুশি হবেন?’

সামি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি আম্মার মুখের সামনে দাঁড়ায়ে এই সব বলতে পারব না। ইম্পসিবল।'

– 'তুই একটা ভীতুর ডিম!'

– 'আচ্ছা শোন, এক কাজ করা যায়।'

– 'কী কাজ?'

– 'আকাশ, রুদ্র ওদেরকে বলি যে আব্বা আম্মাকে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে।'

– 'কোন ব্যাপার?'

– 'মানে এইযে আমি তানিশাকে বিয়ে করতে পারব না।'

– 'তারপর?'

– 'তারপর… ওরা রিকোয়েস্ট করবে বিয়েটা ক্যানসেল করতে।'

– 'তোর বাপ মা জানতে চাইবেন না যে তানিশাকে তুই কেন বিয়ে করবি না?'

– 'জানতে চাইলে ওরা বলবে যে আমি তানিশাকে ভালোবাসি না, অন্য কাউকে ভালোবাসি।'

– 'অন্য কাকে ভালোবাসিস তুই?'

– 'আছে একটা পেত্নী টাইপ মেয়ে।'

– 'কী বললি?'

– 'কী আর বলবো, সুন্দরী তো জুটলো না আমার কপালে, পেত্নিই জুটলো শেষ পর্যন্ত।'

হৃদি খুব রেগে গেলো এ কথা শুনে। চকিতে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলো। ক্যাটক্যাট করে বলল, 'তোর মতো একটা কুত্তা মার্কা পোলার জন্য আমি লাইফ রিস্ক নিয়া বাপ মা ছাইড়া ভাগতেছি, মানে আমারে জুতা দিয়া পিটানো উচিত।'

সামি নির্বিকার গলায় বলল, ‘জুতা আমার পায়েই আছে। পিটানো শুরু করব?’

– ‘একটা লাখি মেরে রাস্তায় ফালায় দিব হারামজাদা!’

সামি হাসে, তির্যক গলায় বলে, ‘ছিঃ তুই এসব কী বলতেছিস? বয়ফ্রেন্ডের সাথে মানুষ এভাবে কথা বলে?’

– ‘বয়ফ্রেন্ড না ছাই!’

– ‘বয়ফ্রেন্ড না?’

– ‘নাহ, তোকে আমার মোটেও বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড মনে হচ্ছে না।’

হৃদি একটু দূরে সরে গিয়েছিল। সিএনজির খাঁচার ফাঁক গলে হুড়মুড় করে হাওয়ারা ঢুকছিল দল বেঁধে। ঝাঁপিয়ে পড়ছিল মাতালভাবে হৃদির খোলা চুলের গোছায়। সামি হৃদির কাছে সরে এসে বসলো। ওর পিঠময়

ছড়িয়ে থাকা রেশমি, সুগন্ধি খোলা চুলগুলি ডান হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়ে কণ্ঠগ্রীবায় একটি আলতো চুমু খেয়ে বলল, ‘এখন মনে হচ্ছে?’

– ‘যা ভাগ, তোর সুন্দরী তানিশার কাছে যা। পেত্নীর সাথে অত কী, হ্যাঁ?’

– ‘সুন্দরী তো ভাগ্যে জুটলো না। কপাল খারাপ।’

হৃদি এবার একটু ফিসফিস করে বলল, ‘বেশি কাছে আসিস না। ড্রাইভারটা একটু পরপর মিররের ভেতর দিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। বিরক্ত লাগতেছে।’

সামি তাকিয়ে দেখল সত্যই দাড়িওয়ালা লম্বাটে চেহারার মধ্যবয়স্ক ড্রাইভার ব্যাক মিররের কাচ ভেদ করে তাদের দিকেই চোরা চোখে তাকিয়ে আছে। সে সাতপাঁচ কিছু না ভেবেই বিরক্ত গলায় বলল, 'কী মামা বারবার পিছনে তাকাও ক্যান? গার্লফ্রেন্ডের সাথে আছি। প্রাইভেসি দরকার, বুঝো না ব্যাপারটা?' সামির কথার ধরনে ড্রাইভার হেসে দিল। হেসে উঠল হৃদিও, মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে।

বন্ধু থেকে প্রেমিকপ্রেমিকায় রূপান্তরিত হবার এই সময়টি বড়ই অদ্ভুত আর অন্যরকম। দুজনের কেউই এখন অবধি এই অন্যরকম অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি। ধবধবে সাদা জল রঙের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় লাল রং মেশালে ঠিক যেমন করে সাদা রঙের মাঝে লাল রং একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে ওদের বন্ধুত্বের সফেদ বর্ণ সম্পর্কের মাঝে ফোঁটায় ফোঁটায় প্রণয়ের অরুণ বরণ রংটা মিশছিল, খুব ধীরেধীরে। ভারি সুমধুর আর মনোরম এই সম্পর্ক বদলের রঙের খেলা!

২

নিজের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল রুদ্র। চমকে উঠলো আকাশ। অতি মনোযোগ সহকারে সে তার এন্ড্রয়েড ফোনে কার্ড খেলছিল, অনলাইনে। রুদ্রর থাপ্পড়ের শব্দ শুনে কপালে ভাঁজ ফেলে মুখ তুলে বলল, 'সমস্যা কী? নিজেরে নিজে থাপ্পড় মারতেছিস কেন?'

–' মশা!'

ওরা বসে আছে ছাদের ওপর। পুল সাইডের পাশে। একটা হলুদ ডিম ডিম আলো জ্বলছে এদিকটায়। কুয়াশা জেঁকে বসেছে সেই ডিম আলোর গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে। মাঘ মাসের শীতল আকাশে একটা গোল চাঁদ জেগে আছে। কুয়াশা এবং হলুদ আলোর উপস্থিতিতে জোছনাটা ঠিকমতো টের পাওয়া যাচ্ছে না।

– 'কোথায় মশা? আমারে তো কামড়াইতেছে না, তোরে ক্যান কামড়ায়?' পুনরায় খেলায় মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়ে বলল আকাশ।

রুদ্র উদাস ভাবে বলল, 'আমার রক্ত মিষ্টি। শরবতের মতো মিষ্টি।'

– 'কে বলছে?'

– 'আমি জানি।'

– 'ক্যামনে জানোস, তুই তোর রক্ত খাইয়া দেখছস?'

– 'হ, খাইছিলাম একবার। তুই খাবি? টেস্ট করতে পারিস, মজা আছে। মিষ্টি মিষ্টি।
'

আকাশ আগুন গরম চোখে তাকালো রুদ্রর দিকে, 'আমি কি ভ্যাম্পায়ার? রক্ত খাবো কেন?'

– 'বুদ্ধিমানরা রক্ত খায়। এই তথ্যটা কি তোর জানা ছিল?'

– 'ফালতু কথা বলিস না।'

– ‘অন্য কিছু তো করার নাই। তাই বসে বসে ফালতু কথা বলেই টাইম পাস করতে হবে। সামি তো যেই পল্টিটা মারল মামা, এখন তো মনে করো যে বসুন্ধরার ফ্ল্যাটে আমার একলা থাকা লাগব।’

– ‘ক্যান আন্টি আইতাছে না?’

– ‘আম্মা আইতাছে। তাও এতদিন একসাথে ছিলাম। অনেকটা স্বামী স্ত্রী টাইপ সম্পর্ক হয়ে গেছিল আমাদের মধ্যে। এখন তো আমি ওরে মিস করব, বুঝোস না?’

আকাশ নাক কুঁচকে বলল, ‘স্বামী স্ত্রী টাইপ সম্পর্ক ছিল নাকি তোদের মধ্যে? তলে তলে এইসব চলতেছে? ছিঃ!’

– ‘সেইটা না। মানে মানসিক দিক দিয়া একটা এটাচমেন্ট ছিল না?’

– ‘রুদ্র, তুই বাল ছাল বকতেছিস। চুপ থাক শালা!

–’ কিছু তো করার নাই।’

– ‘নিউজ শোন।’

– ‘সব নিউজ আমার জানা আছে। নতুন কিছুই নাই।’

– ‘তাহলে বলা শুরু কর ‘পাখি পাকা পেঁপে খায়’ দেখি কয়বার বলতে পারস।
’

– ‘আমি বলতে পারব একশোবার, টানা! তুই বল দেখি, শী সেলস সি শেলস বাই দ্যা সি শোর’

আকাশ টেনে টেনে বলতে থাকল, শী সেলস সি শেলস বাই দ্যা সি শোর।

তৃতীয় বার বলার সময় সে বলে ফেলল, সি শেলস শী শেলস বাই দ্যা…

রুদ্র মাঝখান থেকে বলে উঠল, ‘ব্লা ব্লা ব্লা, আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডুম’

– ‘ডিস্টার্ব করস ক্যান মামা? বলতে দে।’

– ‘কিছুই হচ্ছে না। তোর জিহ্বায় এমনিতেই প্রব্লেম আছে। নরমাল কথাই কইতে পারস না শালা এইটা ক্যামনে কইবি?’

ঠিক সেই সময় রুদ্রর ফোনের রিংটোন বেজে উঠল। হৃদি ফোন করছে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে হৃদি হড়বড় করে বলল,’ রুদ্র, দোস্ত, তোদের একটা কাজ করতে হবে।’

রুদ্র একটু ভড়কে যাওয়া গলায় বলল, ‘কী কাজ?’

– ‘সামির আব্বা আম্মারে গিয়ে বল, যে, ও তানিশারে বিয়া করবে না।’

– ‘মাথা খারাপ! আমারে কি কুত্তায় কামড়াইছে?’

– ‘প্লিজ দোস্ত, এই উপকারটা করতেই হবে। তোরা আঙ্কেল আন্টিকে বলার পর আমরা বাসায় ফিরে আসব।’

রুদ্র কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘এই কাজ আমরা কিছুতেই পারব না। অমৃতাকে বল।’

– ‘অমৃতার বাচ্চি ফোন ধরতেছে না ক্যান? আমি তো কিছুই বুঝতেছি না।

– ‘জানি না। বিভাকে ঘটনা জানাইছি। সে আর তার বর আসতেছে এখানে।’

– ‘এখানে মানে?’

– ‘মানে সামির বাসায়।’

– ‘আইসা কী করবে?’

– ‘নাচবে, ধেইধেই করে! শালি তোদের প্রব্লেম সল্ভ করার জন্য আসতেছে।’

– ‘ও আচ্ছা। তাইলে তো হয়েই গেলো। আমার বিশ্বাস অমৃতা ব্যাপারটা সামলাইতে পারবে। কিন্তু ওই ছেমড়ি গেছে কই?’

– ‘আমরা জানি না, অনেকক্ষণ ধরে ফোন করতেছি, ফোন রিসিভ করতেছে না।’

– ‘আচ্ছা ঠিক আছে দোস্ত। কাজ হয়ে গেলে আমাদেরকে জানাইস।’

– ‘তোরা কি ফেরত আসতেছিস?’

– ‘হ্যাঁ।’

– ‘গুড, এটাই ভালো হবে।’

– ‘হুম, রাখি তাহলে।’

– ‘ওকে, সি ইউ সুন।’

৩

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকেই পা দিয়ে ঠেলে কাঠের দরজাটা আটকে দিলেন হক। দুম করে একটা বিকট শব্দ হলো। তাঁর মুখে এখন লেপটে আছে এক গা ছমছমে কঠোরতা। বক্র ভ্রুর নিচের চোখদুটি জ্বলছে তেজের অঙ্গারে টেবিল সংলগ্ন চেয়ারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি অমৃতাকে। অমৃতার তখনও নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বুক কাঁপছে মুরগির দুর্বল সিনার মতো। দাঁড়ানোর পরেও পা দুটি

টলছে। তার মাথাটা এখন লোকটার সবল, দৃঢ়, প্রশস্ত বুকের খুব কাছে। দামি কোনো পারফিউম মেখেছে মানুষটা। পারফিউমের সৌরভে অমৃতার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। লোকটার বুকের ওপর এলোপাতাড়ি পড়ছে তার উষ্ণ, কম্পিত, ক্ষুরধার নিশ্বাস। কাঠের চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে দুর্বলভাবে মুখ তুলে তাকালো একবার সম্মুখে দাঁড়ানো মানুষটার চোখের দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি তখন বড়ই উগ্র, ক্রুর এবং হিংস্র। বিষধর সাপের মতো এক করাল রাগের থাবায় ফুলে ফুলে উঠেছে মানুষটার কপালের নীল রগ। সেই রাগান্বিত চেহারা দেখে অবশ্য অমৃতার তেমন কিছুই আসলো, গেলো না। সে অকপট চেয়ে রইল তার কাজল কালো মদির দৃষ্টি দুটি চোখ মেলে, অগ্নি দর্শন সেই মুখের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর তার ঠোঁট দুটো হালকা কেঁপে উঠল। চোখের তারা একটু একটু করে হয়ে উঠল ঝাপসা। গলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল কান্নার দলা। তার মুখ দেখে এখন বোঝা যাচ্ছে, নিজের কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত। হক সাহেব তীব্রভাবে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই অমৃতার অর্ধনিমীলিত ডান চোখের কার্নিশ উপচে একটি টলটলে জল বিন্দু টুপ করে গড়িয়ে পড়ল হেমরঙের গালে। কী আশ্চর্য সুন্দর যে দেখাল তখন তাকে! ওরকম শুভ্র, নৈকষ্যপূর্ণ সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে অসুরের হৃৎপিণ্ড ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, মানুষ তো কোন ছার! স্ফটিক ন্যায় জলের ফোঁটাটা প্রথমে গাল বেয়ে নেমে এলো ওর চন্দন রঙের কণ্ঠাহাড়ের কালো তিলের ওপর। তারপর গড়িয়ে পড়তে পড়তে একসময় মিশে গেলো বুকের ভাঁজের কাছে, ব্লাউজের বোতামের সাথে।

তিনি চকিতে চোখ সরিয়ে নিলেন। সরে আসলেন জায়গাটা থেকে। থমথমে মুখ নিয়ে কয়েকবার পায়চারি করলেন ঘরের ভেতর। অমৃতা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো জড়োসড়ো হয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন একরাশ কুণ্ঠা তেড়ে এসে জাপটে ধরেছে তাকে। লজ্জা শরমের বালাই তার কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু আজকে এই ব্লাউজ আর পেটিকোট পরা অবস্থায়, একলা ঘরে লোকটার সামনে বসে থাকতে তার সীমাহীন লজ্জা লাগছে! মনে হচ্ছে যেন লজ্জায় সে মরে যাবে!

আগরবাতির ঘ্রাণের সাথে অস্বস্তি মিশে গিয়ে বাতাস এখন গুমোট হয়ে আছে। হক চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখলেন। আড়ষ্টভাবে বসে আছে মেয়েটা। একটু একটু কাঁপছে। বড়ই বিব্রতকর পরিস্থিতি। এরকম অবস্থায় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও তাঁর সংকোচ বোধ হচ্ছে। ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে এখন খুব দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নিতে হবে। দৃশ্যটা যদি সুলেমান ছাড়া অন্য কারো চোখে পড়ে থাকে তাহলে একটা বড়সড় ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। বিরাট স্ক্যান্ডাল হয়ে যাবে। মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘর থেকে বিদায় করতে হবে। কিন্তু মেয়েটার পরনের শাড়ি গেছে পুড়ে। এই অবস্থায় একটা মেয়ে ঘরের বাইরে বেরোবে কী করে? দুশ্চিন্তায় তার মাথার রগ দপদপ করতে লাগল। আচ্ছা মুসিবতে পড়া গেলো তো!

তিনি কথা শুরু করার আগে হেঁটে এসে পশ্চিম দেয়ালে লাগানো বাতির সুইচটা অফ করে দিলেন। ঝুপ করে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসলো সারা ঘরে। আলোটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতার বুকের কাছে কাঁটা হয়ে জমে থাকা দমবন্ধ-করা অস্বস্তিটা নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে গেলো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। শরীর থেকে জড়োসড়ো ভাবটা কেটে গেলো। আপাতত কেউ তাকে দেখছে না। লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা না করলেই নয়!

কিন্তু স্বস্তির প্রহর বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরব, নিষ্প্রভ রাতের গুমোট আবরণ ভেদ করে তীরের বেগে ছুটে আসলো হিংস্র এক গর্জন।

– 'কী করতে যাচ্ছিলে তুমি?'

অমৃতা চমকে উঠল। এতটা চমকায়নি সে বহু বহুকাল ধরে! আজকের এই ঘটনা তার ব্যক্তিত্বের শক্ত খোলসটা কেমন যেন নড়বড়ে করে দিয়েছে। ঘা লেগেছে

আত্মবিশ্বাসে। নিজের লাজহীন কৃতকর্মে নিজেই বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং কুণ্ঠিত। তার উপর এই উঁচু গলার হিম হিম কঠিন ধমকটা একদম বুকের খাঁচায় হাতুড়ির মতো আঘাত হানল।

– 'কথা বলছ না কেন? কী করতে যাচ্ছিলে তুমি? সুইসাইড?'

অমৃতা অন্ধকারে চোখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। কিচ্ছু দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায় লম্বা মানুষটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির হয়ে। অমৃতা সেই ছায়াবৃত অবয়বের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বড় শ্বাস টেনে নিল। বিক্ষিপ্ত মনের ভেতর গুড়িয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া ভঙুর আত্মবিশ্বাস পুনরায় কুড়িয়ে নিয়ে একত্র করার চেষ্টা করল যেন সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের সাথে।

– 'সুইসাইড করতে চাইনি!'

– 'তাহলে কী ছিল এটা?'

অমৃতা একটু আমতা আমতা করে বলল, 'আমি শুধু শাড়িটা… শাড়িটা পুড়িয়ে ফেলতে চাইছিলাম।'

হক দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, 'শাড়িটা যে তোমার গায়ে জড়ানো ছিল এই বিষয়টা কি তোমার মাথায় ছিল না? কী হতো যদি গায়ে আগুন ধরে যেত? কী হতো যদি সঠিক সময়ে আমি জায়গাটাতে না পৌঁছাতাম? তোমাকে আমি বুদ্ধিমতী মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন বোকা মেয়ে! যদি

কোনো বিপদ হয়ে যেত তাহলে নিজের সাথে সাথে আমাকেও ডুবাতে তুমি। আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।'

অমৃতা একটু ত্যাড়াভাবে বলল, 'ও আচ্ছা, আপনি তাহলে নিজের মান সম্মান বাঁচাতেই ছুটে গিয়েছিলেন বারান্দায়। আমাকে বাঁচাতে নয়!'

হক টেবিলের সামনে রাখা একটি চেয়ার হাত দিয়ে টেনে নিলেন। মেঝেতে ঘর্ষণ তুলে বিচ্ছিরি আওয়াজ করল কাঠের চেয়ারটা। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। নিজের সম্মান বাঁচানোটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।'

– 'এত স্বার্থপর কেন আপনি?'

– 'উত্তরটা জানা নেই।'

– 'আমি যদি পুড়ে যেতাম? মরে যেতাম? আপনার একটুও খারাপ লাগত না আমার জন্য?' কেমন করুণ শোনাল অমৃতার কণ্ঠস্বর।

– 'না লাগত না!' কথাটা যথেষ্ট শক্তভাবেই বলার চেষ্টা করলেন তিনি।

– 'সত্যি?'

– 'কেন এমন একটা বিপদজ্জনক কাজ করতে গিয়েছিলে তুমি?'

– ‘শাড়িটার ওপর রাগ লাগছিল।’

– ‘আশ্চর্য! কেন?’

অমৃতা একটু সময় চুপ করে থাকল। তারপর ভারি গলায় বলল, ‘আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন রাশেদ?’

– ‘তুমি বাধ্য করেছিলে।’

– ‘কী দোষ ছিল আমার?’

– ‘অমার্জিত এবং অসংলগ্ন কথা বলছিলে তুমি।’

– ‘আজব তো! আপনাকে আমার সুন্দর লাগে, এই কথাটা বলা কি অন্যায়?’

– ‘হ্যাঁ অন্যায়।’

– ‘সত্যি কথা বলতে পারব না?’

– ‘সব সত্যি কথা সবসময় সবাইকে বলতে হয় না। এসব তোমাকে শিখতে হবে!’

অমৃতা স্তিমিত গলায় বলল, ‘সবাইকে বলি নাতো! আপনাকেই বলেছি! জীবনে প্রথমবার!

– ‘আমি তাড়িয়ে দিয়েছি বলে তুমি শাড়ি পুড়িয়ে ফেলবে? এটা কেমন কথা?’

– ‘সব ওই শাড়িরই দোষ!’

– ‘অমৃতা! কী বলছ তুমি এসব? পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। আর একটা কথা, তুমি স্মোক করছিলে কোন সাহসে? আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে?’

– ‘আপনার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানা যাবে না। এটা কোন আইনে বলা আছে?’

– ‘পার্লামেন্ট পাশ হওয়া আইনের বাইরেও পৃথিবীতে আরো কিছু নিয়মকানুন আছে। যাকে বলে ভদ্রতা বা চক্ষুলজ্জা। তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার সামনে স্মোক করো না।’

– ‘বাবার কথা টানছেন কেন? আপনি আমার বাবা নন। বাবার মতোও নন। আপনাকে আমি ওই চোখে দেখি না। অ্যান্ড আই অ্যাম প্রিটি মাচ শিওর যে আপনিও আমাকে মেয়ের মতো দেখেন না। তাই আর কোনো দিন বাবার প্রসঙ্গ টানবেন না।
’

মেয়েটার চটাংচটাং কথা শুনে হক একদম থ বনে গেলেন। কয়েকটা সেকেন্ড নীরবে কাটলো। একটা সময় তিনি কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'তোমার এই স্মোক করার স্বভাবটা ছাড়তে হবে।'

– 'কেন? আপনি বুঝি স্মোক করেন না?'

– 'আমার কথা আলাদা।'

– 'আলাদা কেন হবে?'

– 'অমৃতা মুখে মুখে তর্ক করবে না!'

– 'তর্ক করছি কোথায়। শুধু জানতে চাইছি আমার স্মোকিংয়ে আপনার প্রব্লেমটা কোথায়?'

– 'তুমি একটা মেয়ে। এটা তোমার মাথায় রাখা উচিত।'

– 'আপনি একদম ব্যাকডেটেড লোকদের মতো কথা বলছেন।

– 'আমি মানুষটাই ব্যাকডেটেড। এটা তোমার ভুলে গেলে চলবে না। তাছাড়া আমি শুনেছি তুমি কোর্ট এরিয়াতেও জনসম্মুখে স্মোক কর। লোকজন তোমার এসব উদ্ধত চলাফেরা নিয়ে আড়ালে বাজে কথা বলে, এটা কি তুমি জানো?'

– ‘লোকজনের কথা পাত্তা দেওয়ার মতো অত সময় নেই আমার। আর তাছাড়া আমাকে নিয়ে কেউ খারাপ কিছু বললে আপনার কী? আপনি তো মাত্রই বললেন যে আমি পুড়ে গিয়ে মরে গেলেও আপনার কিছু আসবে যাবে না।’

হক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। প্রচণ্ড বিরক্ত গলায় বললেন, ‘তুমি আর কখনো সিগারেট খাবে না। কথাটা যেন মনে থাকে। আর হ্যাঁ, শাড়ির ওপর হঠাৎ রাগ হলো কেন?’

– ‘আজকে আমি জীবনে প্রথমবারের মতো শাড়ি পরেছিলাম।’

– ‘সেটা আমার জানা আছে।’

– ‘প্রথম বারের মতো সাজগোজ করেছিলাম।’

– ‘জানলাম।’

– ‘সাজটা ছিল একজন বিশেষ মানুষের জন্য।’

হক এ কথার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না। তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। কথার ঢেউ ঠিক কোন নদীতে গিয়ে মিশতে চাইছে তা বুঝে উঠতে তাঁর খুব একটা বেগ পেতে হলো না। তিনি চুপ করে রইলেন।

অমৃতার কণ্ঠে এবার অভিমান বেজে উঠল ঝনঝন করে, 'কিন্তু সেই বিশেষ মানুষটা আমাকে একটাবার চোখ মেলে দেখলও না। উল্টো অপমান করে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। আপনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কত কষ্টের?'

হক ভেবে পেলেন না এই আবেগঘন আক্ষেপ শোনার পর তাঁর ঠিক কী বলা উচিত। একটি সমৃদ্ধ, সফল এবং ঘটনাবহুল জীবনের অনেকখানি পার করে আসার পরেও আজ তিনি জানেন না যে এ ধরনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ঠিক কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

সারা ঘরে একটা নিস্তব্ধতার বলয় তৈরি হচ্ছিল ধীরেধীরে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু দুটি হৃদপিণ্ডের টিকটিক করে ডেকে যাওয়া অনবরত। অন্ধকার! অন্ধকারেরও নিজস্ব একটা আলো আছে। সেই আলোতে অমৃতা মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছিল। গুম হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। কী ভাবছেন উনি? অমৃতার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার ভাবনার শহর থেকে একটা বার অন্তত ঘুরে আসতে।

এটা তো ভালো লাগার সময় না। তবুও কেন যে অমৃতার এত ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে ঠিক এমনিভাবে অন্ধকারে লোকটার মুখোমুখি চুপটি করে বসে থেকেই যেন সে গোটা একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। সে হঠাৎ অন্যরকম গলায় প্রশ্ন করল, 'শাড়িতে আমাকে কেমন লাগছিল, রাশেদ?'

আকস্মিক প্রশ্নটা সামনে বসে থাকা দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষটাকে একটু কেমন নার্ভাস করে তুলল। তিনি বিব্রতভাবে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সেলফোনটা হাতে তুলে নিলেন। হয়তো এড়িয়ে যেতে চাইলেন প্রশ্নটা। কিন্তু অমৃতা তো নাছোড়বান্দা!

– 'বলুন না!'

তিনি গমগম করে বললেন, 'অমৃতা! আমি কমপ্লিমেন্ট দিয়ে অভ্যস্ত নই। অমৃতা মোবাইলের ফিকে আলোতে লোকটার বিপন্ন মুখখানা দেখতে পেল। হাসি পেয়ে গেলো তার। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, –'নিজের বউকেও কমপ্লিমেন্ট দেন না নাকি আপনি?'

অস্বস্তিতে গাঁট হয়ে তিনি বললেন, 'খুবই কম।'

– 'আপনি একদমই রোমান্টিক না।'

– 'তুমি আবারও অভদ্র কথাবার্তা বলা শুরু করেছ। বকা খাবে কিন্তু আবার!'

– 'আবার তাড়িয়ে দেবেন?'

– 'প্রয়োজনে তাই করতে হবে!'

ঠিক সেই সময় হঠাৎ দরজার ওপাশ থেকে একটা পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। সেই আচমকা পায়ের আওয়াজটা ঘরের ভেতরে বসে থাকা দুজন অসমবয়সী মানবমানবীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল একদম। দুজনেরই স্নায়ু হয়ে উঠল টান টান। কড়া নাড়লো কেউ একজন। একবার নয়, পরপর তিনবার। তাঁর একলা থাকার সময়গুলোতে এই ঘরে সচরাচর কেউ আসে না। এই মুহূর্তে কে দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে? রোমেলা নয়তো? ভাবতেই তাঁর মুখটা দুশ্চিন্তায় ছোট হয়ে গেলো।

ওদিকে কাঠের দরজায় ক্রমাগত টোকা পড়ছে। তমসাচ্ছন্ন নিষ্কম্প ঘরের ভেতরে প্রবল বেগে স্পন্দিত হচ্ছে দুটি হৃৎপিণ্ড। অমৃতার শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা হিমেল স্রোত শিরশির করে বয়ে যাচ্ছিল। কয়েকটা সেকেন্ড কাটল বিমূঢ়তায়। হক উঠে দাঁড়ালেন। একটা শ্বাস টেনে নিলেন সময় নিয়ে। তারপর ধীরেধীরে এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। নব ঘুরিয়ে খুললেন দরজাটা। অমৃতা তখন নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে অন্ধকারে। যেন বাইরে দাঁড়ানো মানুষটি কোনোভাবেই তার অস্তিত্ব টের না পায়। দরজা অল্প ফাঁক হতেই আঁধার ঘরের মেঝেতে জোছনার এক টুকরো নীল আলো এসে পড়ল। হক দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন বাইরে থেকে হাজার চেষ্টা করলেও ঘরের ভেতরটা দেখা না যায়।

অমৃতা একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল ওপাশ থেকে।

– 'স্যার!'

– 'কী ব্যাপার সুলেমান?'

সুলেমান একটু কাশল। তারপর গলাটা খাদে নামিয়ে সাবধানে বলল, 'স্যার পার্টির লোক আসছে। কী একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে। আপনাকে নাকি ফোন দিছেন কয়েকবার সম্পাদক সাহেব। আর ম্যাডাম ও খুঁজতেছিলেন আপনাকে।

হক চিন্তিত গলায় বললেন, 'আমার ফোনে চার্জ নেই। তুমি এক কাজ করো। ওদেরকে বলো আমার একটু লেট হবে। আধাঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে বলো। তোমার ম্যাডামকেও বলে দিও, কেমন?'

– ‘জি হুজুর।’

সুলেমান শব্দ দুটো উচ্চারণ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে গমনোদ্যত হলো। হক পেছন থেকে বললেন, ‘শোনো, একটা কাজ করতে হবে তোমার। তবে কাজটা করতে হবে খুব সাবধানে।’

– ‘কী কাজ?’

– ‘যে কোনো উপায়ে একটা শাড়ি যোগাড় করে দাও। খুব দ্রুত। পারবে?’ কথাটা বলার সময় আত্মগ্লানিতে তাঁর ভেতরটা টনটন করে উঠল। তিনি তো কোনো পাপ করেন নি, তবুও আশ্চর্যজনকভাবে ভেতরটা এক সীমাহীন পাপবোধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর প্রতি লোকের সম্মানটা অন্যরকমের। সমাজের এমনই এক উচ্চতর স্তরে তিনি আছেন, যে স্তরে পৌঁছুলে সাধারণ লোকের ন্যায় নীতি এবং সংস্কার বোধ হয়ে পড়ে বড্ড ক্ষীণ। সব পেয়েছির রাজ্যটা ক্রমশ তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে করে তোলে উচ্ছন্ন, উদ্ধত এবং লালসাপূর্ণ। তিনি ব্যতিক্রম। প্রাচুর্য এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি তাঁর নিজস্ব নীতিবোধ কখনও বিসর্জন দেননি। আজ অবধি তাঁর চরিত্রে কোনো প্রকার দাগ লাগেনি। তাই এ মুহূর্তে সুলেমানের কাছে এরকম একটা নির্লজ্জ আবদার করতে রীতিমতো তাঁর রুচিতে বাঁধছে।

– ‘হুজুর, শাড়ি কি নতুন হতে হবে? নাকি যে কোনো একটা হলেই চলবে?’

– ‘নতুন, পুরাতন, যে কোনো একটা হলেই চলবে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো।’

কথাটা বলে তিনি পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে তিন হাজার টাকা ধরিয়ে দিলেন সুলেমানের হাতে। সুলেমান প্রস্থান করল। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তিনি অন্ধকারে বসে থাকা অমৃতার দিকে চেয়ে গমগমে স্বরে বললেন, 'তোমার বোকামির মাশুল এখন আমাকে দিতে হচ্ছে। কী ভাবলো সুলেমান আমার সম্পর্কে?

– 'কে কী ভাবলো তা নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন? আপনার এই স্বভাবটা আমার একেবারেই পছন্দ না।'

হক ধমকে উঠলেন, 'তোমার পছন্দ অপছন্দ দিয়ে আমার কিছু এসে যায় না।'

অস্থিরভাবে কথাটা বলতে বলতে তিনি উত্তর দিকের জানালার একটা পাল্লা খুলে দিলেন। খুলতেই বদ্ধ ঘরটায় এক ঝলক উতলা বাতাস ঢুকে পড়ল বিনা অনুমতিতে। এতক্ষণের দমবন্ধ করা ভাবটা মুহূর্তের মাঝে কেটে গেলো। জানালার বাইরে তখন রুপালি রঙের মায়াবী চাঁদের রাত। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ছড়িয়ে আছে নরম জোছনা। বাড়ির পেছন দিক বলে এদিকটায় কোনো বৈদ্যুতিক আলো নেই। জানালার গ্রিলের ফাঁক গেলে জোছনার নীল আলো এসে পড়েছে মানুষটার মুখে, শার্টের কলারে। অমৃতা চেয়ারে বসে থেকে ওই ধারালো মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে ভালো লাগছিল তার। একটু আগের ভয় ভীতিটা এখন আর কাজ করছে না। মন ফড়িং ফরফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে ডানা মেলে। তার চিরদিনের শক্ত, ডানপিটে, একগুঁয়ে ব্যক্তিসত্তার আড়ালে যে এমনই এক আটপৌরে রমণীয় মন লুকোনো ছিল তা সে টের পেলো এতকাল পরে, এই ছাব্বিশে এসে। আজকের এই জোছনা মাখা নীলচে রাতের হিমস্পর্শী হাওয়ায়, অন্ধকারে চুপচাপ লোকটার সামনে বসে থেকে, সে মনে মনে গভীরভাবে অনুভব করল যে, বন্ধুদের হাসি ঠাট্টা, পারিবারিক টানাপোড়েন, আইনের মারপ্যাঁচ, কোর্ট বিল্ডিং এর বুক চাপা ভিড় এবং

কর্মময় ব্যস্ত জীবনের বাইরেও আরো কিছু বাস্তবতা আছে এই পৃথিবীতে। যে বাস্তবতা সম্পর্কে এতকাল সে ছিল সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত।

– 'এত রাগ করছেন কেন? আপনার বৌ তো আসেনি, এসেছে সুলেমান।'

হক জানলার বাইরে চোখ রেখেই বললেন- 'চুপ করে বসে থাকো। এ মুহূর্তে তোমাকে আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছে।'

– 'আবারও অপমান করছেন আপনি।'

– 'বেশ করছি।'

অমৃতা হাসে, 'আমার কাছে কিন্তু এখন আর তেমন খারাপ লাগছে না।

হক জানালার পাশ থেকে সরে আসলেন। ঘরের ভেতরের জমাট বাঁধা অন্ধকারটা এখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। তবুও কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তিনি খানিক দূরে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে থাকা আবছা অমৃতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কিন্তু খুব অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছ। তোমার মতো স্ট্রং পারসোনালিটির একটা মেয়ের কাছ থেকে এসব একেবারেই আশা করিনি আমি।'

– 'হয়তো আমার পারসোনালিটি স্ট্রং বলেই কথাগুলো আমি অকপটে বলতে পারলাম। দুর্বল চিত্তের হলে বলতে পারতাম না। আপনাকে যে আমার অসম্ভব ভালো

লাগছে এই কথাটা আমি একশবার বলতে পারব। সব্বার সামনে বলতে পারব। আমার কোনো ভয় নেই।

– ‘চুপ করো!’ প্রচণ্ড এক হুংকারে কেঁপে উঠল ঘরটা।

অমৃতা হুংকারটা শুনে একটুও চমকাল না। শ্লেষের গলায় বলল, –’চুপ করব কেন? আপনার মতো অদ্ভুত পুরুষ মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। আপনার জায়গায় অন্য কোনো পুরুষ হলে…’

– ‘আর একটা কথাও বলবে না তুমি!’

– ‘রেগে যাচ্ছেন! সবাইকে ধমক দিতে দিতে আপনার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে ধমক দিয়ে লাভ নেই। আমি অন্যদের মতো ভীতু না।’

– ‘তুমি কি ভুলে গেছ যে তোমার বয়সী আমার একটি ছেলে আছে এবং সেই ছেলেটি তোমার খুব কাছের বন্ধু?’

– ‘ভুলে যাব কেন? সামি আমাকে বুঝবে!’

হক প্রচণ্ড অবাক হলেন অমৃতার বলা শেষ কথাটা শুনে। স্তম্ভিত গলায় বললেন,

– ‘কী বললে? সামি তোমাকে বুঝবে? হ্যাভ ইউ লস্ট ইওর মাইন্ড?’

– ‘বন্ধুই তো বন্ধুকে বুঝবে। আমার বন্ধুরা আমার অহংকার। ওরা কখনোই আমাকে ভুল বুঝবে না।’

– ‘তুমি বিকারগ্রস্ত! ইউ আর সিক! পাগল হয়ে গেছ তুমি।’

অমৃতা হাসে, ‘হ্যাঁ পাগল তো হয়েছিই, আপনার জন্য!’

– ‘শাট আপ!’

– ‘দেখুন অত রাখঢাক করে কথা বলা আমার ধাতে নেই। আমি স্টেরিওটাইপ ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করি না। ছেলেরা মেয়েদেরকে প্রপোজ করবে সবসময়, এমন তো কোনো কথা নেই। আমার যাকে ভালো লাগে তাকে আমি ভালো লাগার কথা বলতেই পারি, তাই না?’

– ‘আমি বিবাহিত। এবং তোমার চেয়ে বয়সে অনেক অনেক অনেক বড়! এটা তুমি ভুলে যেও না।’

– ‘বয়স কোনো ব্যাপার না। ইউ আর স্টিল ইয়াং অ্যান্ড হ্যান্ডসাম! আই ক্যান সি দ্যাট!’

– ‘আমার ক্ষমতা থাকলে তোমার গালে আমি এখন একটা কষে চড় বসাতাম। নেহাৎ মেয়েদের গায়ে আমি হাত তুলি না বলে তুমি বেঁচে গেলে।’

– ‘আমি আপনার প্রশংসা করছি আর আপনি আমাকে মারতে চাইছেন। কী আজব!’

হক এই প্রশ্নের কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। তার চোখজোড়া নিবদ্ধ রইল জানালার বাইরে। অমৃতার যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ল, ‘আমার ব্যাগটা কোথায় দেখেছেন?’ কথাটা বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারে টেবিলের ওপর হাতড়াতে লাগল। হক কাটা কাটা গলায় বললেন, ‘ব্যাগ দিয়ে এখন কী করবে তুমি?’

– ‘ফোন চেক করা দরকার। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো। আমার বন্ধুরা বোধহয় খুঁজছে আমাকে। বাতিটা একটু জ্বালাবেন?’

– ‘বাতি জ্বালানো যাবে না এখন। চুপ করে বসে থাকো।’

– ‘ফোনটা আসলে দরকার ছিল। ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছে।’

হক একটু কাষ্ঠ হেসে বললেন, ‘এক কাজ করো, ফোন করে তোমার বন্ধুদের বলে দাও যে একটু আগে ঠিক কী কাণ্ডটা ঘটিয়েছ তুমি।’

– ‘সময় মতো বলবো। সামিকেও বলবো।’

হক চমকে উঠলেন, ‘সামিকে কী বলবে?’

অমৃতা হাসল, ‘বলবো, যে আপনি আমার বন্ধু।’

– ‘মাথা খারাপ! আমি মোটেও তোমার বন্ধু নই। তুমি আমার ছেলেকে এসব উল্টাপাল্টা কথা বলবে না একদম। খবরদার!’

– ‘আপনি আমার বন্ধু নন?’

– ‘না।’

– ‘কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন আমার বন্ধু হবেন। মিথ্যা বলেছিলেন কেন?’

– ‘তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি বলে মিথ্যে বলেছিলাম। তুমি আমার উপকার করেছিলে। সেই উপকারের বিনিময়ে কিছু একটা দিতে চাইছিলাম তোমাকে। তাই বন্ধুত্বের আবদারটা যখন করে বসলে তখন না করতে পারিনি।’

অমৃতা স্তম্ভিত কণ্ঠে বলল, ‘তাহলে কেন বলেছিলেন যে যা চাইবো তাই দেবেন?’

– ‘এখনো বলছি, যা চাইবে তাই দেব। কিন্তু তোমার সাথে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।’

অমৃতা বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। কয়েকটা মিনিট পর আচ্ছনতার ঘোর থেকে জেগে উঠে সে ভারি করুণ গলায় বলল, ‘বন্ধুত্ব করতে পারবেন না, ভালোবাসতে পারবেন?’

– ‘অমৃতা! ছেলেমানুষী করো না!

– ‘ছেলেমানুষী করছি না। আমার বয়স ছাব্বিশ। ষোলো নয়।’

– ‘প্রাপ্তবয়স্কতা মানেই প্রাপ্তমনস্কতা নয়। তুমি এখনো অপ্রাপ্তমনস্ক। আজকের পর থেকে আর কোনো দিন তুমি আমার সাথে কথা বলবে না। দেখা করবে না। এমন কি ফোনও করবে না। মনে থাকে যেন।’

অমৃতা চমকে তাকালো লোকটার অস্পষ্ট মুখের দিকে। বুকের ভেতর চিলিক দিয়ে উঠল এক অবর্ণনীয় ব্যথা। ছোটবেলা থেকেই তার জিদ বড় বেশি। যা একবার করবে বলে মনস্থির করে, তা সে করেই ছাড়ে! জীবন তাকে হার মানতে শেখায়নি। বরং তার একগুঁয়েমির কাছে হার মেনেছে জীবন বারেবারে। কিন্তু আজকে বুকের মধ্যে গুমরে ওঠা চিনচিনে ব্যথাটা তাকে প্রথমবারের মতো জানান দিল যে, জিদ করে জাগতিক নানা বস্তু নিজের করে পাওয়া গেলেও, কোনো মানুষের মন পাওয়া যায় না। তার চোখ দুটি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল। কোনো দিন কান্না না করা সবল চিত্তের মেয়েটিকে আজ এই লোকটি বোধহয় কাঁদিয়েই ছাড়ল।

চাঁদনী রাতের মাঘী বাতাস জানালা গেলে উড়ে এসে শীতল করে তুলছিল ঘরটাকে। আগরবাতি নিভে গেছে তখন। কিন্তু রয়ে গেছে তার রেশ। চারপাশ ভরে আছে পবিত্র সৌরভে। হক জানালার বাইরেই চোখ রেখেছেন। কৃষ্ণচূড়ার ডালের ফাঁকে উঁকি দেওয়া গোল চাঁদটার দিকে চেয়ে থেকে তিনি ভাবছিলেন যে, ভালোবাসা জিনিসটা আদতে কীরকম সেই ব্যাখ্যা আজও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁর ভেতরটা চিরকালই বড় শুষ্ক, অনেকটা মরুভূমির মতো। শুষ্ক সেই মরুভূমি খুঁড়ে খুঁড়ে জলের সন্ধান করার মতো অঢেল সময় কিংবা ইচ্ছা, এর কোনোটাই তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে ছিল না। পুত্রকে তিনি ভালোবাসেন এ কথা সত্য। স্ত্রীর প্রতিও একধরনের টান আছে

বৈকি। কিন্তু সাতাশ বছরের পুরোনো সংসারে মোটামুটি পর্যায়ের বোঝাপড়া থাকলেও, ভালোবাসা কিংবা প্রেম ছিল কতখানি? রোমেলা বরাবরই সাধারণ গোছের মেয়ে ছিল। শাড়ি, গয়না, কসমেটিক্স আর চার দেয়ালে আবদ্ধ সংসারের বাইরে সে কিছুই ভাবতে পারত না, আজও পারে না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় যে সংসারের প্রতিও শতভাগ মনোযোগ নেই রোমেলার, শুধু বিলাসিতা ছাড়া তার জীবনে অন্য কোনো শখ নেই, হবি নেই। তার শুধু একটাই নেশা, টাকা ওড়ানো, আর লোক দেখানো। রোমেলা ছিল মায়ের খালাতো বোনের মেয়ে। মায়ের ইচ্ছাতেই বিয়ে হয়েছিল তাদের। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় তাঁর মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়লো। ক্যান্সার ধরা পড়ার তিন মাসের মাথায় তিনি বাইশ বছরের পুত্রকে একরকম তাড়াহুড়া করেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। নাতির মুখ দেখে যেন মরতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই বিয়ে করানো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাতির মুখ দেখা তার আর হয়ে উঠল না। সামির জন্ম হলো তাঁর মৃত্যুর দুমাস পর। মা মারা যাবার পর বাবা মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর কাঁধে। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে শিখলেন। ছুটতে শুরু করলেন টাকার পেছনে। জীবন কেটে গেলো এই অবিরাম ছুটোছুটিতে। কোন ফাঁকে যে কেটে গেলো এতগুলো বছর!

– ‘এত রাতে কীসের মিটিং আপনার?’

কাজের কথা শুনে তিনি একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। চুপচাপ বসে না থেকে বরং কাজ নিয়ে কথা বলাটাই শ্রেয়। এই মেয়েটার একটা গুণ হলো মেয়েটার মাথা ভালো। এর সাথে কাজের কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। তিনি বললেন, ‘এই এলাকায় ডিজেবলড চিল্ড্রেনদের জন্য একটা স্কুল খোলা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে টিম আসছে আগামীকাল বাংলাদেশের টিচারদের ট্রেইনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তো এসব বিষয়ে কিছু ডকুমেন্টস সাইন করা লাগবে। বাজেটের ব্যাপারটা দেখতে হবে।’

– ‘আপনারা হিজড়াদের নিয়ে কিছু করছেন না?

– ‘কিছু বলতে কী বোঝাতে চাইছো? কী করা উচিত?’

– ‘না মানে, আমরা তো এখন ওদের নিয়ে একটা প্রজেক্ট রান করছি। দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অনেকেই প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে। কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। কেউ ওদের চাকরি দিতে চায় না। পেট চালানোর দায়ে তাই এরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, মানুষের কাছে হাত পাতে।’

হক একটু চিন্তাযুক্ত গলায় বললেন, ‘চাকরি না দিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকে নিগৃহীত, অবহেলিত হতে হতে এদের আচার আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায় হাজার চেষ্টা করলেও আর সমাজে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না।
’

– ‘আপনাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। মাইনরিটি পপুলেশনের জন্য একটু বেশি বেশি ভাবা উচিত। এই যে দেখুন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনটাও আপনারা এখনো বাধ্যতামূলক করলেন না। দু সপ্তাহ আগে একটি হিন্দু মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আমাদের এন জি ওর অফিসে আসলো। তার বর মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি ডিভোর্স চায়। কিন্তু তার বিয়ের কোনো লিগ্যাল ডকুমেন্ট নেই। তাই ডিভোর্স দেওয়ারও উপায় নেই। এমতাবস্থায় মেয়েটির বরকে ডেকে এনে মেডিয়েশন(মধ্যস্থতা) করা হলো। বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হলো। নারী নির্যাতনের মামলা দেওয়া হবে সেই ভয়ও দেখানো হলো। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। দুদিন পরে লোকটা আবারো বৌ পেটানো শুরু করল।’

– ‘দুই হাজার বারো অথবা তেরো সালে একটা হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন পাশ হয়েছে আমাদের দেশে।’

– ‘রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়নি।’

– ‘মেয়েটির স্বামীর এগেইন্সটে মামলা করোনি তোমরা?’

– ‘হ্যাঁ আল্টিমেটলি মামলা করতেই হয়েছে। কিন্তু মেয়েটির এখন থাকার কোন জায়গা নেই। মা বাবা কেউ বেঁচে নেই। কোনো এক মাসতুতো দিদির বাসায় উঠেছে। ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। কিন্তু মাসতুতো দিদির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। মেয়েটিও বেকার। এরকম অবস্থায় খুব বেশিদিন সে ওই বাড়িতে থাকতে পারবে না।’

– ‘মেয়েটি পড়াশোনা করেছে কিছু?’

– ‘এস এস সি পর্যন্ত পড়েছে।’

– ‘হুম, তুমি মেয়েটাকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। দেখি কী করা যায়।

দরজায় টোকা পড়ছে। হক সাহেব চট করে উঠে পড়লেন বসা থেকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুললেন দরজাটা। সুলেমান একটা বড়সড় প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। অমৃতার দিকে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ‘চট করে শাড়িটা পরে নাও। হারি আপ।’

– ‘অন্ধকারে কীভাবে পরবো?’

হক জানালার পাল্লা বন্ধ করলেন। পর্দা টেনে দিলেন ভালো মত। তারপর কামরার ভেতরের বাতি জ্বালালেন। অমৃতা ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, ‘আপনি কিন্তু এদিকে তাকাবেন না।’

তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন, ‘আমি কেন তাকাবো? আশ্চর্য!’

কথাটা বলে তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চেয়ারে গিয়ে বসা এখন সম্ভব না। কারণ টেবিলের ঠিক মুখোমুখি অমৃতা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বইয়ের তাকে সাজিয়ে রাখা সারিসারি বইগুলোর মধ্যে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলেন।

অমৃতা বিপন্নভাবে প্যাকেট থেকে শাড়িটা বের করল। আকাশি রঙের একটা ছাপা সুতির শাড়ি। কাঁপা বুক নিয়ে সে শাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। এখন সে করবে কী? জীবনে কোনো দিন তো শাড়ি পরেনি। কীভাবে গায়ে জড়ায় এই কিম্ভুত কাপড়টা সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তার। ভয়, লজ্জা এবং অস্বস্তিতে একদম কাঁচুমাচু হয়ে গেলো সে। অন্ধকারে লোকটার সাথে সহজভাবে কথা বলা গেলেও বাতি জ্বালানোর সাথে সাথেই কোত্থেকে যেন একরাশ জড়তা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার মাঝে। লোকটা একটা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, ‘তাড়াতাড়ি করো। মিটিং আছে আমার। লোকজন অপেক্ষা করছে।’

অমৃতা শাড়ির ভাঁজ খুলল। নতুন শাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মুচমুচে একটা ভাব সারা কাপড়ে। শাড়ির একটা কোণ কোনো রকমে গুঁজলো সে কোমরে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সাঙ্ঘাতিক রকমের স্নায়বিক চাপ অনুভব করছে।

লোকটা সামনে না থাকলে এতটা নার্ভাস লাগত না। কোনো না কোনো উপায়ে পরে ফেলতো শাড়িটা। কিন্তু এখন মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলছে না। একদম ফাঁকা হয়ে আছে মস্তিষ্ক। হাত পা কাঁপছে। অন্ধকারই ভালো ছিল। কোন দুঃখে যে সে আলোটা জ্বালাতে বলল!

হঠাৎ মনে পড়ল বিপদের বন্ধু ইউটিউবের কথা। ইউটিউব দেখেই মুহূর্তের মাঝে শাড়ি পরা শিখে নিতে পারবে সে। হন্যে হয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুঁজতে লাগল চারপাশে চোখ বুলিয়ে। কিন্তু আজব কাণ্ড ব্যাগটা কোথাও নেই! টেবিলের ওপর নেই, চেয়ারে নেই। বইয়ের তাকগুলোর ফাক ফোঁকরেও নেই। কী করবে অমৃতা এখন? মোবাইল শুদ্ধ ব্যাগটা কোথায় গেলো? গলা শুকিয়ে কাঠ। বারো হাত মাপের শাড়িটাকে তার অথৈ সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। এর বুঝি কোনো কুল কিনারা নেই। কোর্ট রুম কাঁপানো স্পষ্টভাষী, সাহসী, বুদ্ধিমতী দারুণ স্মার্ট মেয়েটার যে কখনো এরকম নাস্তানাবুদ দশা হতে পারে তা লোকে কোনোদিন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

এমন সময় তিনি আবারও তাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, 'ডান?'

অমৃতা আর্তনাদের গলায় বলল, 'আমি তো শাড়ি পরতে পারি না!'

প্রবল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন হক। এরকম অদ্ভুত কথা এর আগে কোনো দিন শুনেছে কেউ? এত বড় একটা মেয়ে নাকি শাড়ি পরতে পারে না। এটাও কি সম্ভব? বইয়ের ওপর চোখ নিবদ্ধ রেখেই তিনি রাগে গজগজ করতে করতে বললেন, 'শাড়ি পরতে পারো না তো খুলতে বলেছিল কে?'

অমৃতা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'তখন তো মাথা ঠিক ছিল না।'

– ‘তোমার মাথা কখনোই ঠিক থাকে না। আস্ত পাগল একটা তুমি! শাড়ি পরতে হবে না। কোনো রকমে জড়িয়ে নাও গায়ে। তারপর দয়া করে বিদেয় হও।’

রাগে দুঃখে অমৃতার চোখে পানি চলে আসার যোগাড় হলো। আজকের দিনটা তার খারাপ যাচ্ছে। বড়ই খারাপ। সে করুণ গলায় একবার স্বগতোক্তি করল, ‘হায় আল্লাহ, কী করবো আমি এখন! শাড়ি আনতে বললেন কেন? প্যান্ট শার্ট আনতে বললেই তো পারতেন।’

– ‘বাজে কথা বল না। তাড়াতাড়ি কর।’

– ‘এরকম তাড়া দিলে আমি সব গুলিয়ে ফেলব। আমার টাইম লাগবে।’

– ‘আমার টাইম নেই। আমার জন্য লোকজন অপেক্ষা করছে। কেউ যদি চলে আসে এখন এখানটায়? তাহলে কী হবে তুমি বুঝতে পারছ?’

এ কথা শুনে অমৃতা আরো বেশি কুঁকড়ে গেলো। সত্যই তো। যদি সামি তাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে হঠাৎ? আর ভাবতে পারছিল না সে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল তার।

শাড়ির অর্ধেক সে কোমরে গুঁজলো কোনো মতে। গোঁজার পর দেখা গেলো আঁচল একেবারে ছোট হয়ে গেছে। এত ছোট যে গায়ে আঁচল টানাই দায়। অগত্যা আবারও পুরোটা খুলতে হলো। এবার অধৈর্যভাবে হক ঘুরে দাঁড়ালেন, আচমকা! অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে গেলো অমৃতা। থমকে গেলো, স্তব্ধ হয়ে গেলো, হাত গেলো থেমে।

– ‘আপনি এদিকে ফিরেছেন কেন? প্লিজ ঐদিকে তাকান।’

হক অমৃতার কথা গ্রাহ্য না করে কুঞ্চিত ভ্রু নিয়ে এগিয়ে আসলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ‘তোমার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না!

কথাটা বলে তিনি একটুও সময় নষ্ট না করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা শাড়ির একটা পাশ হাত দিয়ে তুলে ধরলেন। তার চোখ মেঝের দিকে নিবদ্ধ। তিনি নতমুখে ধমক দিয়ে উঠে বললেন, ‘এটা ধরো। গুঁজে ফেলো। তাড়াতাড়ি!’

অমৃতার হাত কাঁপছিল থরথর করে। শ্বাসনালিতে ঢুকে যাচ্ছিল বাষ্প। নিশ্বাস নিতে বড় কষ্ট!

কাঁপা হাতে কাপড়ের একটা অংশ সে হাতে নিল। নেবার সময় হাতে হাত লেগে গেলো হালকা। চমকে উঠল মন! লোকটা একবারও অমৃতার দিকে না তাকিয়েই শাড়ি কীভাবে পরতে হবে তা বলে দিতে লাগলেন। খুব সুন্দর করে শাড়ির কুচিও করে দিলেন। এই কাজটা তিনি আগে কখনো করেন নি, তবে দেখেছেন। দেখে দেখেই একটা ধারণা হয়ে গেছে। নারী দেহ সর্বদাই পুরুষের দুর্বলতার কারণ! যথাসাধ্য দূরত্ব বজায় রাখা সত্ত্বেও অমৃতার ওই সুন্দর খাঁজযুক্ত মোমের মত সুডৌল শরীরটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমশ তাঁর মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠছিল। নিশ্বাস হয়ে উঠছিল ঘন। অমৃতা এক প্রবল শিরশিরানি নিয়ে ওই ধারালো সৌম্যদর্শন মুখটার দিকে চেয়ে ছিল। ক্রমে ক্রমে তাকে একটা তীব্র, বাঁধছেঁড়া আকর্ষণে পেয়ে বসছিল। কে বলবে যে এই লোকটার সামির বয়সী যুবক ছেলে আছে? দেখে মনে হয় না তো!

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শাড়ি পরা হয়ে গেলো। তিনি চোখ তুলে তাকালেন অমৃতার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি এখন অনেকটাই নরম। আগের সেই ঝাঁঝালো ভাবটা নেই। চারটা চোখ বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েক সেকেন্ড লেগে রইলো পরস্পরের সাথে। তারপর অমৃতা চোখ নামিয়ে নিল কুণ্ঠিতভাবে। হক সাহেব ঘরের বাতিটা আরো একবার নিভিয়ে দিলেন। যেন ঘর থেকে বেরোবার সময় দূর থেকে কেউ অমৃতাকে দেখতে না পায়। বাতি নেভানোর পর তিনি আলতো গলায় বললেন, 'এবার যাও!'

ভূমিকম্পিত বক্ষ নিয়ে অমৃতা বলল, 'যাবো?'

– 'আরো থাকার ইচ্ছে আছে?' তেরছা গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি। অমৃতা চিবুকখানি গলার সাথে লাগিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

–' তোমাকে তো বলেছি, দেখা আর হবে না।'

– 'কোনো দিনও না?'

– 'না হওয়াটাই উত্তম।'

– 'আপনি কি এই ভেবে ভয় পাচ্ছেন যে, আমি আপনার সংসার ভেঙে দেবো?'

– 'আমার সংসার এত ঠুনকো নয় যে কেউ চাইলেই তা ভেঙে দিতে পারে।' তিনি বললেন, দৃঢ় গলায়।

বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথাটা আবারো টের পায় অমৃতা। বাষ্পময় গলায় স্তিমিতভাবে বলে, ‘আমার ভালোবাসাও এত ঠুনকো নয় যে সে তার ভালোবাসার মানুষটার সংসার ভাঙতে চাইবে।’

হক কথাটা স্পষ্টতই শুনতে পেলেন। প্রত্যুত্তর করলেন না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন অন্ধকারে। অমৃতা কাঠের দরজা হাত বাড়িয়ে খুলল। কয়েকটা মিনিট হক জায়গাটা থেকে নড়লেন না। প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা ভাবতে লাগলেন, গভীরভাবে।

অমৃতা বিচলিত পায়ে গোল বারান্দা পার হয়ে আসলো। চারপাশ তখন ভেসে যাচ্ছে নীল জোছনায়। সাদা জালের মতো কুয়াশা ঝুলে আছে সরু পথটার ওপর। শীত বাতাসে দুলছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল। বুকের ব্যথাটা বাড়ছিল ক্রমাগতভাবে। মন দুলছে এক ভয়ানক আশংকায়। সত্যি, যদি আর কোনো দিন দেখা না হয়? কথা না হয়? বেঁচে থাকবে কী করে অমৃতা?

মাঘী পূর্ণিমার সেই মোহময় হিমগন্ধী রাতে, দুটি অসমবয়সী মানব- মানবীর হৃদয় রাজ্যে যে অলঙ্ঘনীয় তোলপাড়টি হয়ে গেলো, তার প্রত্যয়ক শুধু স্বয়ং বিশ্ববিধাতা ছাড়া আর কেউ নয়।

৪

তিন বন্ধু বাগানে বসেছিল জড়ো হয়ে। রুদ্র, আকাশ আর বিভা। বিভাকে নামিয়ে দিয়ে অভিজিৎ ফিরে গেছে। অমৃতাকে বাড়ির পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে দেখল বিভা। অমৃতার হাঁটার গতি এত বেশি ছিল যে সে কাউকেই লক্ষ্য করল না।

হনহন করে হেঁটে বাগান অতিক্রম করে মূল বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বিভা ডাকল, 'অমৃতা! এই অমৃতা!'

অমৃতা চমকে ফিরে তাকালো। তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক নয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা দিশেহারা ভাব। কপালে এই শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিভা এগিয়ে এসে বলল, 'কী হয়েছে তোর?

রুদ্র আর আকাশও উঠে এসেছে। বিষয়টা সবার প্রথমে আকাশই খেয়াল করল, 'তোর শাড়ি চেঞ্জ করলি কখন? আর সেই তখন থেকে তোরে ফোন দিতেছি। ফোন ধরোস না কেন?'

অমৃতা দুটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু তার মাথায় তাৎক্ষণিকভাবে ভ্যানিটি ব্যাগের চিন্তাটা চলে এলো। কোথায় হারিয়ে গেলো তার ব্যাগটা? কী আশ্চর্য!

রুদ্র উত্তেজিতভাবে বলল, 'কিছু বলতেছিসনা কেন?কী হইছে? সব ঠিক আছে তো?'

বিভা জহুরি চোখে দেখছিল অমৃতাকে। অমৃতা বাড়ির পেছন দিকের রাস্তা ধরে এসেছে। এর মানে সে এতক্ষণ লাইব্রেরি ঘরেই ছিল। একটা কূটসন্দেহ তার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। এই মেয়ের পরনের শাড়ি পাল্টে গেছে কেন? শাড়ি পাল্টানোর মতো কী এমন ঘটনা ঘটল? আর তাকে এত বিচলিতই বা কেন দেখাচ্ছে? খারাপ কিছু ঘটেনি তো? এদিকে সামি আর হৃদি ফিরে আসছে। ওরা ফিরে আসার আগেই সামির বাবা মাকে জানাতে হবে যে, সামি কোনোভাবেই তানিশাকে বিয়ে করতে পারবে না। এতক্ষণ অমৃতার জন্যেই অপেক্ষা করছিল তারা। অমৃতা ছাড়া

অন্য কেউ এই দুঃসাহসিক কাজটা করতে পারবে না। বিভা আর দুশ্চিন্তা সইতে পারছে না। উত্তেজনায় মনে হচ্ছে তার মাথার রগ ছিঁড়ে যাবে।

অমৃতা কয়েকটা ক্ষণ নিষ্পলক বন্ধুদের দিকে চেয়ে থাকার পর শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, 'আকাশ, রুদ্র! তোদেরকে আমার একটা কথা বলার আছে।'

বিভা চট করে বুঝে ফেলল যে অমৃতা ঠিক কী বলতে চাইছে ওদেরকে। কিন্তু এই কথা বলার সময় এখন না। এমনিতেই সবাই সামি আর হৃদির ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। অমৃতাকে আগে বর্তমান সমস্যাটার কথা জানানো উচিত। সে তড়িঘড়ি করে বলল, 'অমৃতা, দোস্ত, আমাদের এখানে একটা সমস্যা হইছে।'

আকাশ বিভাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে দাঁড়া, ও কী বলতে চায় শুনি আগে।'

বিভা দমল না। জোরালো ভাবে বলল, 'ওর কথা পরে শুনব। আগে সামির সমস্যাটা সলভ কর। সময় নাই।'

অমৃতা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইল বিভার দিকে, 'সামির কী সমস্যা?'

সংক্ষেপে খুলে বলল ওরা পুরো ঘটনা। শুনে অমৃতা থ বনে গেলো। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় ছোট হয়ে গেলো তার মুখ। সে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'ইম্পসিবল, সামি এখন এই বিয়ের আগের রাতে এইটা করতে পারে না। তোরা বুঝতে পারতেছিস ওর বাপ মা কতটা কষ্ট পাবে?'

রুদ্র বলল, 'কষ্ট পাইলেও কিছু করার নাই। শোন, সামি বলছে আমাদেরকে কথা বলতে আংকেল আন্টির সাথে। ও নাকি আন্টিকে ফেস করতে পারবে না।'

বিভা বলল, 'অমৃতা তোকেই বলতে হবে। তুই আংকেলের সাথে কথা বল প্রথমে।'

অমৃতা দিশাহারা ভাবে বলল, 'অসম্ভব! আমি এই কথা কিছুতেই বলতে পারব না। লোকটা হার্ট অ্যাটাক করবে এই খবর শুনে।'

বাড়ির ভেতর থেকে তখনো গান বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। চারপাশ ঝুমঝুম করছে বিয়ে বাড়ির আনন্দে। অতিথিরা সবাই আকদের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রোমেলা বসার ঘরে বোনদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ের তত্ত্বসমূহ খুলে বসেছেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছেন ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে আগত নানা উপহার। এরকম একটা সুখ ছড়াছড়ি সময়ে একজন মায়ের সামনে অমৃতা এই ভয়ংকর দুঃসংবাদটা নিয়ে দাঁড়াবে কী করে? ভাবতেই তার চোখে মুখে এক ঘোর অন্ধকার নেমে আসলো। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'অসম্ভব! আমি পারব না!'

– 'পারতেই হবে অমৃতা! সামি আর হৃদির জন্য, আমাদের পারতেই হবে!' আকাশ বলল শক্তভাবে।

রুদ্র বলল, 'চল, সময় নষ্ট না করে, এখনই যাই।'

– 'এখন তো রাশেদের মিটিং আছে। উনাকে এখন পাওয়া যাবে না।'

– ‘রাশেদ কে?’ রুদ্রর প্রশ্ন।

– ‘আরে, সামির আব্বা।’

– ‘তুই আবার আংকেলরে নাম ধইরা ডাকা শুরু করলি কবে থেকে?’ আকাশ অবাক!

বিভা ফোড়ন কাটল, ‘সেই কাহিনি পরে হবে। এখন চল। আংকেলকে না পাইলে, আন্টিরেই বলব।’

অমৃতা বলল, ‘না। দুজনকে এক সাথেই বলতে হবে। আচ্ছা, ভেতরে চল। দেখি কী করা যায়।

৫

সামি ফোন করছিল আকাশের মোবাইলে। ধরতেই ওপাশ থেকে হড়বড় করে বলল, ‘বলছিস?’

– ‘ধুর শালা, এত অস্থির হইলে হয় নাকি? বলমু তো!’

– ‘তাড়াতাড়ি কর, মামা টেনশন হইতাছে।’

– ‘তুই আয় বাসায়। শোন আমরা বললেও তোকে তো আংকেল আন্টিকে ফেস করতেই হবে তাই না? বাবা মাও তর, বিয়াও তর, মাঝখান থিকা আমরা খাইতাছি প্যারা। সব শোধ দিবি ব্যাটা!’

– ‘শোধ বোধ সব পরে হবে। কাজ কর আগে তুই।’

– ‘হ করতাছি। তুই আয়।’

ড্রইংরুমে তখনও নাচ গান চলছে। বন্ধুরা ডাইনিং স্পেসে এসে বসল। এদিকটায় আপাতত কেউ নেই। ডাইনিং এর পার্শ্ববর্তী লম্বা করিডোরের একেবারে শেষ মাথায় আছে স্টাডিরুম। এই মুহূর্তে সেখানে মিটিং চলছে। খানিক বাদে বাদে চাকরবাকরদের চায়ের কাপ এবং নানা রকম উপাদেয় খাবার নিয়ে সেই ঘরের দিকে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। বন্ধুরা ডাইনিং এ বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মিটিং শেষ হলে লোকজন এদিকের করিডোর দিয়েই বেরিয়ে আসবে। লম্বা দশ চেয়ারের কারুকাজওয়ালা ডাইনিং টেবিল আর চেয়ার ছাড়াও এই ঘরে একটি সোফা সেট আছে। ওরা সোফার ওপরেই বসল।

– ‘এইটা কোনো কথা হইল? সামির বাচ্চা একাই সবার সাথে প্রেম করবে কেন? আমাদের কি কারো চোখে পড়ে না?’ রুদ্র বলে উঠল, ভারি আফসোসের গলায়।

বিভা উদাস নয়নে চাইল রুদ্রর দিকে –’যে রকম বাঁশপাতার মতো শুকনা তুই, চোখে পড়বে ক্যামনে? কৃমির ওষুধ খা, মোটা গোটা হ, সব্বার চোখে পড়বে।’

রুদ্র চোখে মুখে এক অদ্ভুত মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে কাতর গলায় বলল, 'দোস্ত তোর পায়ে পড়ি, আর নজর দিস না আমার সুন্দর স্লিম বডিটার উপর। আর হিংসা করিস না প্লিজ!'

– 'কিন্তু হৃদি তো আমার ব্যাকআপ ছিল। এখন আমার কী হবে?' হঠাৎ আকাশ বলে উঠল, একঝাঁক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে।

রুদ্র বলল, –'চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়া না হইলে আমার হৃদিরে বিয়া করার কথা ছিল।'

– 'মোটেও না। হৃদি আমার ব্যাকআপ ছিল।' জোরালো গলায় বলল আকাশ।

এই পর্যায়ে রুদ্র বড়ই আকুলিবিকুলি হয়ে অমৃতাকে বলল, 'দোস্ত তুই আমার ব্যাকআপ হ, প্লিজ!'

– 'ভালোই বলছিস, অমৃতা আজকাল শাড়িটাড়ি পরে, বিয়া শাদি ও করে ফেলবে মনে হয়। ভাবসাব ঠিক লাগতেছে না!' ঠেস মারা গলায় বলল আকাশ।

অমৃতা সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বসে ছিল। তার মুখটা সিলিং এর দিকে উঁচু করা, চোখ নিবদ্ধ সিলিং এ ঝুলতে থাকা ঝাড়বাতির দিকে আকাশের কথা শুনতে পেয়ে সে সোজা হয়ে বসল। সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে সরাসরি তাকালো দুই বন্ধুর দিকে। রুদ্র আগের চাইতেও করুণ গলায় বলল, 'প্লিজ দোস্ত, বি মাই ব্যাকআপ!

– ‘আমি কখনও বিয়ে করব না। কথাটা কতবার বলা লাগবে তোদেরকে?’

– ‘কখনো শাড়ি পরবি না এমন কথাও তো বলছিলি তাই না? শাড়ি তো ঠিকই পরলি!’

আকাশের কথায় অমৃতার কপালে সৃষ্টি হলো একটি ক্ষীণ কুঞ্চন রেখা। ধীরস্বরে বলল, ‘আমার হবে না।’

– ‘এটার মানে কী?’

– ‘মানে সবার সব কিছু হয় না। বুঝিস না?’

বিভা অস্বস্তি বোধ করছে। তার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই প্রসঙ্গটা পাল্টানো উচিত। সে তৎক্ষণাৎ রুদ্রকে বলল, –’তোর এত চিন্তা কীসের? আমেরিকা গিয়া একটা ব্লন্ড গার্লফ্রেন্ড বানায় ফেলবি।’

ব্লন্ড গার্লফ্রেন্ডের কথায় রুদ্রর মন ভিজল না। তাকে আগের চাইতে আরও বেশি চিন্তিত দেখাল।

– ‘দোস্ত তোর কি পরকীয়া করার কোনো ইচ্ছা আছে? তুই আমার পরকীয়ার ব্যাকআপ হয়ে যা! ছাইড়া দে ওই গাধার বাচ্চা অভিজিৎরে।’

– ‘জীবনেও ছাড়ব না। আমার বরকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলবি না। লাথি খাবি।
’

– ‘আচ্ছা ছাড়া লাগবে না।’

বিভা একটা হাই তুলে বলল, ‘তোর মতো বোকচোদা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আমি পরকীয়া করব? জীবনেও না!’

– ‘তো কার সাথে করবা তুমি?’ ত্যাড়া গলায় বলে ওঠে রুদ্র।

বিভা কয়েক সেকেন্ড চোখ পিটপিট করে কিছু একটা ভাবল। বলল, ‘সুন্দর ডাক্তারের কথা মনে আছে তোদের? পরকীয়া করলে আমি ওর সাথেই করব।’

সুন্দর ডাক্তারের কথা শুনে এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সময়েও অমৃতা হেসে ফেলল নিজের অজান্তেই।

‘সুন্দর ডাক্তারটা আবার কে?’ আকাশ অবাক

অমৃতা হাসতে হাসতে বলল, ‘মনে নাই তোদের? ওইযে দুই গাধী একবার রিকশা অ্যাকসিডেন্ট করল?’

রুদ্র ঠোঁট উল্টে বলল, ‘কই আমার তো কিসু মনে পড়তেছে না!’

অমৃতা বলল, ‘কী ভয়ংকর দিন ছিল রে বাবা! মানে এত বড় বিপদের মধ্যেও এমন জোকারগিরি করা পৃথিবীতে শুধু এই দুই জনের দ্বারাই সম্ভব।’

– ‘কী হইছিল রে?’ আকাশের প্রশ্ন।

মুচকি হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে রেখেই অমৃতা গল্পটা বলা শুরু করল। ঘটনা ঘটেছিল ঈদের চতুর্থ দিন। ঢাকার রাস্তাঘাট তখন সুনসান নীরব। ঈদের ছুটিতে প্রায় অর্ধেক মানুষ রাজধানী ছেড়েছে। গাড়ির জ্যাম নেই। রাস্তায় কালো ধোঁয়ার ছড়াছড়ি নেই। আছে ঝলমলে স্বচ্ছ রোদ। যেন এক ছিমছাম স্বপ্নের নগরী! রিকশা নিয়ে তিন বান্ধবী যাচ্ছিল বনানীর একটা রেস্তোরাঁয়। ঈদের সময় হুডখোলা রিকশায় চড়ে ঢাকা শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর আনন্দই আলাদা। বনানী এগারো নম্বর রাস্তায় ঢোকার মুখেই ঘটল দুর্ঘটনা। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে একটা টয়োটা গাড়ি প্রবল গতিতে ছুটে আসছিল উল্টো দিক থেকে। রিকশাওয়ালা প্রাণপণ চেষ্টা করেও গাড়িটাকে পাশ কাটাতে পারল না। ধাক্কা লেগে গেলো। ধাক্কার চোটে রিকশা থেকে অতর্কিতে রাস্তায় পড়ে গেলো বিভা আর হৃদি। অমৃতা সিটের উপরে বসেছিল। ঝুঁকিটা তারই বেশি ছিল কিন্তু অলৌকিকভাবে ওর কিছুই হলো না। এমনকি রিকশাওয়ালারও কোনো ক্ষতি হলো না। শুধু দুই বান্ধবী রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কোঁকাতে লাগল। বিভার কপাল গেছে কেটে। হাতের কনুইয়ের চামড়া ছিলে গেছে। হৃদির হাঁটু পিচঢালা রাস্তায় এমনভাবে ঘর্ষণ খেয়েছে যে মনে হচ্ছিল যেন আরেকটু হলেই হাঁটুর বাটি খুলে আসবে ব্যথায়। অমৃতার মুখ তখন আতঙ্কে সাদা। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে সে। দুই সুন্দরীকে রাস্তায় চিৎপটাং হয়ে পড়ে যেতে দেখে হইহই করে ছেলে বুড়ো নানা বয়সী লোক ছুটে আসতে লাগল। গাড়ির ড্রাইভার ধাক্কাটা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যেই। আমজনতা সেই ড্রাইভারকে গালাগালি করে গুষ্টি উদ্ধার করতে লাগল। বিভা বরাবরের মতোই জম্পেশ একটা সাজ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। তার পরনে ঈদের নতুন জামা। ঈদ এবং পূজা এই দুটোতে তার নতুন জামা চাইই চাই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় যেই চিন্তাটা

সবার প্রথমে এলো তা হলো ফাটা মাথা থেকে ঝরে পড়া রক্তে তার মেকআপ এবং নতুন জামা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ভিড়ের দিকে ঝাপসা চোখ মেলে তাকালো। এক দাড়িওয়ালা বুড়ো তার দিকে তখন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'উঠেন আম্মা, উঠেন, আমার হাত ধরেন।'

বিভা ঘোলাটে গলায় বলল, 'চাচা, আমার মেকআপ কি নষ্ট হয়ে গেছে?'

বুড়ো প্রশ্নটা ঠিক মতো বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বিভার ব্যথিত মুখখানার দিকে। হৃদি হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা অবস্থায়ই সামনে দাঁড়ানো এক দোহারা চেহারার কিশোরের দিকে হাত পেতে বলল, 'ব্রাদার, তোমার কাছে এক টুকরা বরফ হবে? প্লিজ?'

– 'বরফ দিয়ে কী করবেন আফা?'

হৃদি বশীভূত গলায় বলল, 'একটু লাগবে ভাই, একটু বরফ লাগবে!

অমৃতা তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেলো। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীদের ধমক দিয়ে উঠে বলল, 'তাকায় তাকায় দেখতেছেন কী? এদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে না? আসেন, হাত লাগান!'

কাছাকাছি একটা হাসপাতালে অতি দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। হাসপাতালে যাবার পর অপেক্ষা করতে হলো পাক্কা দশ মিনিট। হৃদির ডান হাঁটুর চামড়া ছিলে গিয়ে ক্রিম কালারের পাজামা হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত। বিভার কপাল ফুলে রক্তবর্ণ হয়ে

গেছে। কিছুক্ষণ বাদে ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। তখন ডিউটিতে ছিলেন এক সুদর্শন তরুণ ডাক্তার। সুদর্শন ডাক্তার বিভার কপাল দেখেশুনে বিনীতভাবে বলল, 'তেমন গভীর ক্ষত হয়নি। সেলাই টেলাই লাগবে না। আপনার পেইন কি বেশি?'

ডাক্তারের চেহারা এবং ভদ্রতার বাহার দেখে বিভা মুগ্ধ হয়ে গেলো, আপ্লুত কণ্ঠে বলল, 'জি বেশি!'

– 'একটু ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ দিয়ে দেবে। পেইন কিলার খেয়ে নিয়েন একটা। আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি। ব্যথা চলে যাবে। গুরুতর কিছু নয়।'

এবার ডাক্তার সাহেব হৃদির দিকে এগিয়ে গেলো। অমৃতা বিভার পাশেই বসে ছিল। ডাক্তার অন্য দিকে যেতেই বিভা ফিসফিস করে বলল, 'ডাক্তারটা জোশ না?'

অমৃতা দুই বান্ধবীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিন্তিত এবং বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিভার কথা শুনে সে একদম ব্যাকুল বনে গেলো। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এখন তুই ডাক্তারের সৌন্দর্য দেখতেছিস? মানে তোদের দ্বারাই সম্ভব।'

বিভা নির্বিকার গলায় বলল, 'খুব পছন্দ হইছে। নামটা জেনে নিস তো।'

ডাক্তার তখন হৃদির হাঁটু পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। একটু দেখে শুনে নিয়ে তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'আপনার পায়জামাটা একটু কাটতে হবে। এইযে হাঁটুর কাছটায়। ঠিক আছে?'

হৃদি লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘না কাটলে হয় না?’

ডাক্তার হাসলেন, ‘না হয় না।’

হৃদির কাঁচুমাচু মুখখানা দেখে ওদিকে অমৃতা আর বিভা তখন মিটমিটিয়ে হাসছে। কম বয়সী ডাক্তার মেয়ে দুজনের বাঁকা হাসি দেখে একটু বুঝি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো তাকে। অমৃতা বলল, ‘ডাক্তার সাহেব, ওর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার যা ভালো মনে হয় তাই করুন।’

খুব বেশি সময় লাগল না। দুজনেরই ব্যান্ডেজ হয়ে গেলে হসপিটালের বাইরে এসে বিভা বলল, ‘অমৃতা যা, দৌড় দিয়া গিয়া ডাক্তারের ফোন নম্বর নিয়া আয়।’

– ‘হ্যাঁ, যা দোস্ত, এখনই যা।’ বিভার কথায় সায় দিল হৃদি।

– ‘নম্বর দিয়া কী করবি?’ অমৃতার প্রশ্ন।

বিভা বলল, ‘প্রেম করব দোস্ত! একটা ডাক্তারের সাথে প্রেম করার আমার বহুদিনের শখ।

– ‘একা একাই করবি? আমারে ভাগ দিবি না?’ হৃদি যোগ করল প্রশ্ন দুটো। বিভা বিরক্ত গলায় বলল, ‘শালি, তোর তো রবিন আছে।’

– ‘তাতে কী? রবিন তো ডাক্তার না!’

বিভা গম্ভীর গলায় বলল, ‘আচ্ছা সেভেন্টি- থার্টি হিসাবে ভাগ হবে।’

– ‘জি না, ফিফটি – ফিফটি।’

অমৃতা ধমক দিয়ে উঠে বলল, ‘কী শুরু করলি তোরা? আমি ফোন নম্বর টম্বর চাইতে পারব না।’

বিভা করুণ গলায় বলল, ‘দোস্ত প্লিজ! আমার স্বপ্নটা পূরণ কইরা দে। প্লিজ দোস্ত।
’

ঠিক সেই সময় ডাক্তার সাহেবকে হসপিটালের গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। হৃদি ফিসফিস করে বলল, ‘দ্যাখ, বলতেই বলতেই সামনে চলে এলো। মনে হচ্ছে এর সাথে আমাদের কোনো কিসমত কানেকশন আছে।’

বিভা অমৃতাকে ঠেলে ঠুলে সামনে এগিয়ে দিলো,বলল, ‘যা দোস্ত, তুই সাহসী। আমাদের তো এত সাহস নাই। আমাদের হয়ে তুই কথা বল, যা।’

অগত্যা অমৃতাকে যেতেই হলো। ডাক্তার সাহেব হাত বাড়িয়ে একটা রিকশা দাঁড় করিয়েছিলেন। অমৃতা পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি দাঁত বের করে সহজ হাসি হাসলেন,

– ‘জি বলুন।’

অমৃতা আদেশ করার সুরে বলল, ‘ফোন নম্বরটা দেন তো!’ ডাক্তার অবাক, ‘কীসের মানে কার ফোন নাম্বার? ‘

– ‘আমার আম্মার।’

– ‘মানে?’

– ‘মানে আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমি আমার মায়ের ফোন নম্বর চাইব না। ডেফিনিটলি আপনার নম্বর!’

ডাক্তার সাহেবের মুখে হতভম্ব একটা ভাব খেলে গেলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি চমৎকারভাবে সামলে নিলেন পরিস্থিতি। দাঁত বের করে ঝিকিমিকি একটা হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে। হাসতে হাসতেই পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলেন। একটা কার্ড অমৃতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনার নামটা?’

– ‘আমার নাম জেনে আপনি কী করবেন?’ কার্ডটা হাতে তুলে নিতে নিতে রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল অমৃতা।

– ‘বাহ্, আপনি আমার ফোন নম্বর চাইতে পারলেন, আর আমি আপনার নাম জানতে চাইতে পারি না?

– ‘না পারেন না।’ এটুকু বলে অমৃতা ডাক্তারের মুখের সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। হৃদি আর বিভা গোল গোল চোখে তাকিয়ে দেখছিল ওদের। অমৃতা সরতেই ডাক্তারের দৃষ্টি সোজা গিয়ে পড়ল ওদের ওপর অমৃতা ওদেরকে দেখিয়ে বলল, ‘ওই দুই সুন্দরীকে দেখতে পাচ্ছেন? আপনার পেশেন্ট? ‘

ডাক্তার হাসে, ‘আমি তো আমার সামনে দাঁড়ানো সুন্দরীর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। অন্যদের দেখার অবকাশ কোথায়?

অমৃতা চোখ কপালে তুলে বলল, ‘সিরিয়াসলি? আমি আমার ফ্রেন্ডদের জন্য আপনার কাছে তদবীর করতে আসছি আর আপনি আমার সাথেই লাইন মারতেছেন।’

– ‘বলুন না, আপনার নামটা!’

– ‘আমার নাম টিংকু রাণী সর্দার।’ অমৃতা বলল, কাটাকাটা গলায়।

ডাক্তার হেসে ফেলল, ‘কী রাণী সর্দার?’

– ‘টিংকু রাণী!’

অতটুকু বলেই অমৃতা জায়গাটা থেকে সরে পড়ল। ডাক্তার রিকশায় উঠে বসলেন। রিকশাটা ওদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি হাত নেড়ে অমৃতাকে বললেন, ‘বায় বায় টিংকু রাণী! আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।’

হৃদি আর বিভা একদম মুখিয়ে ছিল ওকে আক্রমণ করার জন্য। বাগে পাওয়া মাত্র দুজনে হইহই করে বলে উঠল, ‘এই শয়তান মহিলা, তুই আমাদের জন্য লাইন করতে গিয়া, নিজেই লাইন মাইরা আসলি? এত বড় বেইমানী?’

অমৃতা পানসে মুখে বলল, ‘এইসব লাল্টু পোলাপাইনের সাথে লাইন মারার কোনো শখ নাই আমার মামা। এই নে কার্ড। ডাক্তার ইজ অল ইয়োর্স।’

সেই ডাক্তারকে অবশ্য পরবর্তীতে আর কখনোই ফোন করা হয়ে ওঠেনি ওদের। বিভা কার্ডটা পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। কখনো মনে চাইলে ফোন করবে বলে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অমৃতা একটু কেমন নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছিল। তার চোখদুটো হয়ে উঠছিল স্বপ্নাতুর। বিভা বলল, ‘কী সুন্দর দিন ছিল, নারে? আমরা কেমন যেন বদলে যাচ্ছি, একটু একটু করে। তোরা কি টের পাস?

বিভার কথাটায় কী যেন ছিল। সবাই কয়েকটা সেকেন্ড নিজের ভেতরে নিজে ডুব দিয়ে রইল। বদলাতে না চাইলেও যে বদলে যেতে হয়··· ভুলে যেতে হয়··· না চাইতেও আরো কত কী করতে হয় এক জীবনে! বিভা আবারো বলল, ‘অমৃতা সব সময় আমাদের লিডার ছিল। মনে আছে? আকাশের সাথে ফ্রেন্ডশিপটা কীভাবে হয়েছিল?’

শুনে অমৃতা চকিতে তাকালো একবার আকাশের দিকে। বলল, ‘মনে আছে আকাশ?’

আকাশ হাসল। সাথে হাসল ওর চোখ। কত বছর হলো? আট? নাকি নয়? সেই যে কলেজ গেটের সামনে রোদ ডোবা এক দুপুরে পেছন থেকে একটা টমবয় মেয়ে আচমকা বলে উঠল, ‘এই ছেলে, শুনো?’

তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে সেই পুতুল পুতুল দেখতে মেয়েটা নির্বিকার গলায় বলেছিল, ‘ইয়ে, লাইটার হবে?

মনে আছে··· হ্যাঁ আকাশের সবকিছু মনে আছে। সেদিন অমৃতার পরনে কোন রঙের শার্ট ছিল,বয়কাট চুলগুলো আঁচড়ানোর ধরনটা কেমন ছিল, কথা বলতে বলতে কতবার সে আড়চোখে চটপটির গাড়ির পেছনে দাঁড়ানো বিভা আর হৃদির দিকে তাকিয়েছিল, সব··· সমস্ত কিছু মনে আছে আকাশের। মনে থাকবে আজীবন! কিছু ঘটনা মনে থাকে, জমা থাকে আজীবন বুকের তাকের গোপন ড্রয়ারে।

কিছু বলছিল না সে। চুপচাপ বসে থেকে তার আকাশময় হাসিটা হেসে যাচ্ছিল। ডাইনিংরুম সংলগ্ন করিডোরে লোকজনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। মনে হচ্ছে মিটিং শেষ হয়েছে। বন্ধুদের দলটায় তাৎক্ষণিকভাবে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। রুদ্র উঠে পড়ল বসা থেকে। উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হলো যে বৈঠক ভেঙেছে। দশবারো জনের একটা দল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে। সামির আব্বাকেও দেখা গেলো একেবারে শেষ মাথায়। রুদ্র দৌড়ে বন্ধুদের কাছে ছুটে এসে বলল, ‘আংকেল বের হইছে। এখনই ধরতে হবে উনারে।’

৬

বন্ধুরা হেঁটে এসে দাঁড়ালো ডাইনিং এর দরজায়, করিডোরের মুখে। হক ওদের দলটাকে দেখতে পেলেন। চোখে চোখ পড়তেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে সালাম দিল। শুধু অমৃতা বাদে। তিনি হেসে সালামের উত্তর দিলেন। থামলেন না এক মুহূর্তের জন্যও। খুব দ্রুত হেঁটে পার হলেন জায়গাটা। আকাশ ফিসফিসিয়ে বলল, ‘শালা ব্যাক্কলের মতো দাঁড়ায় আছিস ক্যান? ডাক দে না উনারে।’

বিভা শুকনো মুখে বলল, ‘কীভাবে ডাকব? খুব নার্ভাস লাগছে।’

– ‘নার্ভাস লাগলে তো হবে না, বলতে হবে। সামি আর হৃদি ওয়েইট করতেছে।’ আকাশ বলল।

রুদ্র একবার ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাকল, ‘আংকেল! এক্সকিউজ মি, আংকেল!’

রুদ্রর মিউমিউ ডাকটা গন্তব্যে পৌঁছাবার আগেই যাত্রাপথে মৃত্যুবরণ করল। বিভা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, ‘জোরে ডাকতে পারতেছিস না? বোবায় ধরছে নাকি তোরে?’

করিডোরের শেষ প্রান্তে, স্টাডিরুমের মুখোমুখি রয়েছে সদর দরজা। হাতের বামদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। হক তখন সিঁড়ির কাছাকাছি চলে গেছেন। মিটিং এর লোকজন একে একে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হক এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন সিঁড়ির গোড়ায়। প্রস্থানরত লোকজনের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বিদায় জানালেন। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার জন্য উদ্যত হলেন। ঠিক সেই সময় জোরালো স্বরের ডাকটা ভেসে এলো পেছন থেকে।

– ‘এক্সকিউজ মি! একটু শুনবেন?’

গলার স্বরটা চেনা হলেও দাপ্তরিক লোকজনের সামনে ওই আচমকা ডাকটা তাঁকে পুরোদস্তুরভাবে বিব্রত করে তুলল। তিনি থমকে গেলেন। এতক্ষণের সুপ্রসন্ন মুখখানা মুহূর্তের মাঝে থমথমে হয়ে উঠল। চোখে ভেসে উঠল অস্বস্তি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়ালেন। অমৃতা এগিয়ে এলো কয়েক পা।

—‘একটু শুনবেন?’

– ‘সময় নেই এখন।’ এটুকু বলে গম্ভীরভাবে একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেলো কিছু একটা এমন গলায় বললেন, ‘তোমার পার্সটা পাওয়া গেছে। স্টাডিরুমে রাখা আছে। নিয়ে নিও।’

–’ সেটা নেয়া যাবে। কিন্তু আপনাকে যে এখন আমাদের কথা শুনতেই হবে!’

হক এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন মেয়েটার পেছনে তার অন্য বন্ধুরাও দাঁড়িয়ে আছে জড়োসড়ো হয়ে। শুধু তাঁর পুত্রটিকে দেখা যাচ্ছে না এদের মাঝে

– ‘কী ব্যাপার?’

– ‘আপনি এবং আপনার স্ত্রী। আপনাদের দুজনের সাথেই আমাদের একটু কথা আছে।’

হক সাহেবের কপালে তৎক্ষণাৎ একটি চিন্তাজনিত রেখা ফুটে উঠল তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ দেখে নিমেষেই বুঝে ফেললেন যে কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ব্যস্তভাবে বললেন, ‘এসো আমার সাথে।’

বন্ধুরা তাঁর পেছন পেছন সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলো। উপর তলার বাসিন্দাদের বিয়েবাড়ির আমোদ তখনও ফুরোয়নি। রোমেলা বেডরুমে নিজের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তার গায়ে এখনো অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা। পারিবারিক

ফটোসেশন শেষ হলো খানিক আগে। হক সাহেবকে পরিবারের সকলেই কম বেশি ভয় পায়। তিনি ঘরে ঢোকা মাত্র বাচ্চারা দৌড়ে পালিয়ে গেলো। তাঁর শ্যালিকারাও উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। তিনি কারো দিকে না তাকিয়ে সরাসরি স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি একটু শুনে যাও।'

রোমেলা খুব একটা বিচলিত হলেন না। তাঁর স্বামীর স্বভাবটা সর্বদাই খটোমটো। কারণে অকারণে খিটখিট করা মজ্জাগত অভ্যাস। তিনি হাতে ধরে থাকা অলংকারের একটা বাক্স বোনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো। আমি আসছি।'

তাঁর বোন একটু সংকোচের গলায় বলল, 'আপা আমরা অন্যঘরে যাচ্ছি। রাত হয়ে গেছে। দুলাভাই হয়তো শুবেন।'

সেই মুহূর্তে হক একবার হুংকার ছাড়লেন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, 'এত দেরি করছ কেন?'

রোমেলা ধমক খেয়ে পড়িমরি করে ছুটে আসলেন স্বামীর কাছে। পেছন পেছন হেঁটে এলেন ছেলের শোবার ঘরে। ছেলের বন্ধুদের দেখতে পেয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন,

– 'তোমরা সব এখানে? আমার বাচ্চাটা কোথায়?'

হক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। বন্ধুরা সব রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝ বরাবর। বুক কাঁপছে সবার। দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনায় একেকজন অচলিষ্ণু পাথর হয়ে গেছে।

হক অমৃতার চোখে চেয়েই প্রশ্নটা করলেন, 'কী হয়েছে?'

ঐ গম্ভীর কণ্ঠের অনুসন্ধানী প্রশ্ন শুনে অমৃতা একটু ঘাবড়ে গেলো। বন্ধুদের দিকে বিচলিতভাবে তাকালো একবার। বন্ধুরা এখন মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। কোথাও কোনো শব্দ নেই। টিকটিক করে চলছে শুধু দেয়ালঘড়ির সেকেন্ডের কাটা।

রোমেলা অস্থিরভাবে বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন?'

অমৃতা এবার এগিয়ে এসে রোমেলার একটি হাত ধরল আস্তে করে। টেনে নিয়ে বিছানার ওপর বসালো। তারপর নরম গলায় বলল, 'একটা কথা বলবো, কথাটা মন দিয়ে শুনবেন।'

হক সাহেব ধমকে উঠলেন, 'বলছ না কেন এখনো? তামাশা করছ কেন?'

অমৃতা চমকে উঠল ধমক শুনে। এমনিতেই এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে বুকটা সারাক্ষণ ধড়ফড় করছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি প্রাণ পাখিটা বেরিয়ে যাবে ফুড়ুৎ করে। তার ওপর আবার এমন বজ্রপাতের মতো ধমক! লোকটা না··· একদম বেশি বেশি!

– ‘সামি…’

– ‘কী হয়েছে সামির?’

অমৃতা দম আটকে বলে ফেলল, ‘সামি… সামি আসলে গে!’

– ‘কী?’ হক সাহেবের মুখ থেকে আর্তনাদের মতো ছিটকে বেরোলো শব্দটা। রোমেলাকে দেখে মনে হলো তিনি এই মুহূর্তে চোখ উল্টে, মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। বন্ধুরা সব হতভম্ব! অমৃতা এসব কী বলছে?

– ‘সামি আর আকাশ… না না মানে সামি আর রুদ্র ওদের মধ্যে আসলে একটা ব্যাপার আছে!’

হকের মুখটা হা হয়ে গেছে, চোখদুটি পূর্ণব্যাদিত। তিনি নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। রোমেলা কয়েকটা ক্ষণ অমৃতার দিকে অশ্বীভূত হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর কান্না জড়ানো গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠে স্বামীকে বললেন, ‘এই মেয়েটা এসব কী বলছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

হক সেই মুহূর্তে রুদ্রর দিকে একবার অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রুদ্র বিস্ময়ের ধাক্কাটা তখনো সামলে উঠতে পারেনি। থ বনে যাওয়া চেহারা নিয়ে তাকিয়ে ছিল অমৃতার দিকে। এবার হকের আগুন দৃষ্টিটা টের পেয়ে সে একদম কাঁচুমাচু হয়ে গেলো। অনেক কষ্টে মিনমিন করে বলল, ‘অমৃতা, তুই এসব কী বলতেছিস? আমার

সাথে সামি? মানে ক্যামনে কী? দোস্ত আমার এখনো বিয়া হয় নায়। প্লিজ এসব অপবাদ দিস না।'

অমৃতা শক্ত গলায় বলল, 'আরে চুপ থাক তুই। আমাকে কথা শেষ করতে দে।'

হক দাঁতে দাঁত চিবিয়ে অমৃতাকে বললেন, 'তুমি এসব কী বলছ? কেন আজেবাজে কথা বলছ আমার ছেলেকে নিয়ে?'

রোমেলা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'হায় আল্লাহ এই দিনও দেখার ছিল আমার ভাগ্যে। এর আগে কেন আমার মরণ হলো না?'

অমৃতা একটা বড় শ্বাস নিলো। তারপর খুব স্পষ্টভাবে বলল, 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হক, শুনুন আপনারা, এবার আপনাদের আসল ঘটনাটা বলা হবে। সামি যদি সত্যই গে হতো, কিংবা সামি যদি মরে যেত, তাহলে আপনাদের যতটা খারাপ লাগতো, যতটা কষ্ট আপনারা পেতেন, এখন সত্যটা জানার পর সেই তুলনায় কোন কষ্টই পাবেন না। বরং আল্লাহকে থ্যাংকস দেবেন যে…'

হক সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তুমি আসল কথাটা বলো!'

– 'ওকে, আসল কথাটা হচ্ছে সামি তানিশাকে বিয়ে করতে পারবে না।' অমৃতার বুদ্ধিটা খুব একটা কাজে লাগল বলে মনে হলো না। খোলামেলা প্রশস্ত ঘরটায় হঠাৎ করেই যেন বায়ু সংকট দেখা দিল। দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। সামির আম্মার চেহারা আগের চাইতে আরো বেশি ঝুলে গেলো। দিশাহারা চোখে তিনি একবার

স্বামীর দিকে তাকালেন। হক সাহেব জড়বৎ চক্ষু নিয়ে অমৃতার দিকে চেয়ে ছিলেন। তাঁর নিশ্বাস আটকে গেছে গলার কাছে। শরীর হয়ে আসছে অসাড়। তিনি কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা বলতে পারলেন না। এদিকে বন্ধুরা সব নত মুখে প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় ভূমিকম্প টের পাচ্ছে তারা।

– 'এসব কী বলছ?' অনেক কষ্টে স্বরনালি দিয়ে ঠেলেঠুলে শব্দগুলো নির্গত করলেন হক।

অমৃতা স্থির গলায় দ্বিরুক্তি করল, 'সামি তানিশাকে বিয়ে করতে পারবে না।'

কথাটা বলে শেষ করা মাত্র সে আবিষ্কার করল সামনে দাঁড়ানো দীর্ঘকায় শক্তপোক্ত মানুষটার সৌম্যদর্শন মুখখানায় সহসা কেমন অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠল। অমৃতার বুকের ভেতর বিদ্যুতের মতো চিলিক দিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ ব্যথা। জীবনে প্রথমবার সে টের পেলো যে এই মানুষটা কষ্ট পেলে, তারও কষ্ট হয়! কী আশ্চর্য, আকস্মিক এবং অলৌকিক এই অনুভূতি। সে জানে লোকটা তার কেউ না, কিচ্ছুনা, তবুও কী করে যেন সবকিছু!

হক ক্লান্তভাবে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। এই ধরনের একটা আশংকাই তিনি করছিলেন মনে মনে গত দুদিন ধরে। ছেলের মুখে তিনি দ্বিধা এবং সিদ্ধান্তহীনতার উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন। আশংকাটি সত্যে পরিণত হলো শেষমেশ। এখন কী হবে!

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের ভেতর একটি বিস্ফোরণ ঘটল যেন। রোমেলা রুক্ষভাবে চিৎকার করে উঠে বললেন, 'এই মেয়ে, তুমি ফাইজলামি করছ আমাদের সাথে? কোথায় আমার ছেলে? ডাকো তাকে!'

অমৃতা একটু বিব্রতভাবে বলল, 'ফাইজলামি করব কেন? আপনার ছেলেকে কোথায় পাবো? সে তো পালিয়ে গেছে!'

উন্মাদিনীর মতো ক্ষেপে উঠলেন রোমেলা, 'পালিয়েছে মানে? কার সাথে পালিয়েছে?'

– 'হৃদির সাথে!'

অমৃতার বলা শেষ বাক্যটা রোমেলাকে একদম বজ্রাহত করে দিয়ে গেলো। তাঁর চোখের দৃষ্টি এখন নীড় নষ্ট হয়ে যাওয়া পাখির মতো। রাগে গড়গড় করতে করতে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওই মেয়ের এত বড় সাহস! আমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায়!

হক এই পর্যায়ে স্ত্রীকে একটু কড়া গলায় বললেন, 'থামো তুমি। আমাকে আগে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে দাও!' এটুকু বলে তিনি অমৃতাকে প্রশ্ন করলেন, 'পালিয়ে গেছে মানে কী? কোথায় পালিয়েছে?'

এবার আকাশ কথা বলল, 'আংকেল আসলে ওরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন বলে আবার ফিরে আসছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে কালকের আকদের অনুষ্ঠানটা ক্যানসেল করতে হবে।'

রোমেলা ফণিনীর ন্যায় ফুঁসে উঠে বললেন 'অসম্ভব! ওই বেয়াদব মেয়েটা আমার ছেলের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ওই মেয়েকে আমি ছাড়ব না কিছুতেই। আমার ছেলের বিয়ে তানিশার সাথেই হবে! এসব মেয়েদের আমার চেনা আছে। এরা বুদ্ধি হবার পর থেকেই বড়লোকের ছেলেদের কীভাবে ফাঁসাবে সেই মতলব আঁটতে থাকে।

হক বাধা দিলেন স্ত্রীকে, 'আহ, থামো তো!'

হৃদিকে নিয়ে বলা বিরোধপূর্ণ, অরুচিকর কথাগুলো বন্ধুরা কেউ সহ্য করতে পারল না। তাদের মুখ থমথম করে উঠল অপমানে। কান ঝাঁঝাঁ করে উঠল। সবাই অপমানটা চুপচাপ মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকে হজম করে গেলো। কিন্তু অমৃতা তো কখনো চুপ করে থাকতে শেখেনি। সে রুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'এভাবে বলাটা আপনার উচিত হচ্ছে না। হৃদি মোটেও কোনো মতলব করেনি। সামি ওকে পছন্দ করে।'

রোমেলা ধমকে উঠলেন, 'থামো তুমি! ওই মেয়ে ভরা মজলিশে সবার সামনে আমার ছেলেকে আই লাভ ইউ বলেছে কি এমনি এমনি? কোনো মতলব না থাকলে? বেয়াদব মেয়ে একটা! ও কি ভেবেছে ব্যাপারটা এতই সোজা? এত বড় সাহস?'

এরপর রাগে গজগজ করতে করতে রোমেলা এই একটি কথাই বার বার বলতে লাগলেন, 'এত বড় সাহস? এত বড় সাহস?' তাকে দেখাচ্ছে অপ্রকৃতস্থের মতো। শাড়ির আঁচল অবিন্যস্ত। খোঁপা করা চুল খুলে ছড়িয়ে গেছে পিঠময়। গোলগাল, ঢলঢলে পুরু প্রসাধনওয়ালা মুখটায় খেলছে চাপা ক্রোধ। হক স্ত্রীর হাতে একটা হাত রাখলেন, সান্ত্বনার গলায় বললেন, 'চিন্তা করো না। আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

রোমেলা এবার কেঁদে ফেললেন, 'সব আত্মীয়স্বজনরা জেনে গেছে। এত বড় করে এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান হলো। পত্রিকায় পর্যন্ত খবর ছাপা হয়ে গেছে। এরকম সময়ে ছেলে বলছে বিয়ে করবে না? আমার ইচ্ছে করছে বিষ খেয়ে মরে যাই।'

হক বললেন, 'বাজে কথা বোলো না। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বিয়েটা কাল হচ্ছে।'

বন্ধুরা হিমহিম উদ্বেগে ডুবে গিয়ে একে অন্যের দিকে চাইল। একটা হতভম্ব ভাব কাবু করে ফেলেছে ওদেরকে। কী বলছে এই দুজন মানুষ? এদের কি জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে?

অমৃতা বলল, 'বিয়ে হতেই হবে মানে কী? সামি তো তানিশাকে বিয়ে করবে না!'

রোমেলা ঝেঁঝে উঠলেন, 'চুপ থাকো! পাজি মেয়ে কোথাকার! তুমি এত মুখের ওপর কথা বলো কেন? একদম চুপ থাকো!'

অমৃতা মহিলার অভদ্রতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সে চকিতে একবার তাকালো মহিলার পাশে বসে থাকা মানুষটার দিকে। মানুষটার স্ত্রী তাকে আর তার বন্ধুদের ক্রমাগত অপমান করে যাচ্ছে অথচ মানুষটা কিছুই বলছে না। মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। আজব কাণ্ড। সেও দমবার পাত্রী নয়, আগের চাইতেও জোরালো গলায় বলল, 'আপনার ছেলে যদি মরে যেত, কিংবা সত্যিই গে হত, তাহলে কী করতেন?

রোমেলা ডান হাতের তালু দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে উঠে বললেন, 'উফ আল্লাহ! এই মেয়েটাকে এখান থেকে বিদায় করো তো! আমার মাথার রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে এর কথায়।'

আকাশ অমৃতার একটা হাত টেনে ধরল, 'থাক, তুই আর কিছু বলিস না। চুপ করে থাক।'

হক সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাদের ধন্যবাদ বিষয়টা জানানোর জন্য। আমি দেখছি কী করা যায়। আর সামি আসলে আমাকে খবর দেবে।

বন্ধুরা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিভা অমৃতাকে বলল, 'তুই এত কথা বলতেছিলি কেন? ওরা এরকম একটা খবর শুনছে হঠাৎ করে এখন তো রিঅ্যাক্ট করবে এটাই নরমাল তাই না?'

অমৃতা রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'হৃদির নামে কী সব আজেবাজে কথা বলতেছিল শুনিস নাই? আমাকেও তো বলল আমি নাকি পাজি।'

– 'এসব বলবেই। কিছু করার নাই এখন। এই মহিলা তো এরকমই!'

৭

নিচ তলায় নেমে ওরা ডাইনিং স্পেসে এসে বসলো আবার। অমৃতা বলল, 'সামি এটা মোটেও ঠিক কাজ করে নাই। কে বলছিল ওকে তানিশাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা এত তাড়াহুড়া করে নিতে? কেন বলছিল বিয়ে করবে?'

বিভা বলল, 'তানিশা বেচারির জন্যেও খারাপ লাগতেছেরে এখন। কেমন লাগবে মেয়েটার যখন বিয়ের আগের রাতে শুনতে পাবে বিয়ে ভেঙে গেছে?'

আকাশ বলল, 'যা হবার হয়ে গেছে। এখন এসব নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করা বাদ দাও তোমরা। শুনো আল্লাহ সবার জন্যেই আলাদা আলাদা প্ল্যান করে রাখছে। এই বিয়েটা ভেঙে যাওয়াই তানিশার জন্য ভালো হবে।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই রোমেলা তার দুই বোনকে সাথে নিয়ে নিচে নেমে আসলেন। তাঁর গতিবিধি স্বাভাবিক নয়। সর্বাঙ্গে এক উদ্ভ্রান্ত উত্তেজনা। বন্ধুরা তাকে দেখামাত্র বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আঙুল তাক করে বললেন, 'তোমাদের আমি ছাড়ব না। তোমরাই আমার ছেলেকে এসব কুবুদ্ধি দিয়েছ। আমার সহজ সরল ছেলেটার মগজ ধোলাই করেছ তোমরা! যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। এখুনি বেরিয়ে যাও!'

সামনে দাঁড়ানো চারটা ছেলেমেয়ের মুখ ঝুপ করে ছোট হয়ে গেলো। অপমানে কালো হয়ে চোখ নামিয়ে নিল ওরা। হক সাহেবকে দেখা গেলো দৃশ্যপটে। তাঁর পরনে এখন সাদা পাঞ্জাবি, পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। তিনি এসেই দরাজ গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

– 'এদেরকে বেরিয়ে যেতে বলো। আর কোনো দিন যেন এদের আমি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখি!'

হক ঠান্ডা গলায় বললেন, 'এই ছেলেমেয়েগুলোর সাথে দুর্ব্যবহার করছ কেন শুধু শুধু? এদের তো কোনো দোষ নেই!'

– ‘এরাই দোষী। আমার বাচ্চাটার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে এই বাজে ফ্রেন্ড সার্কেল!’ পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে বললেন রোমেলা।

হক রোমেলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শ্যালিকা দুজনের দিকে চেয়ে বললেন, ‘ওকে উপরে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী?’

রোমেলাকে অনেকটা জোর জবরদস্তি করে উপরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ি থেকে এখুনি বিদেয় করতে না পারলে তিনি শান্তিতে নিশ্বাস নিতে পারবেন না। হক ছেলের বন্ধুদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, ‘স্যরি! ওর মাথা ঠিক নেই। মাইন্ড করো না।’

– ‘আমরা চলে যাব। সামির জন্য অপেক্ষা করছি।’ বিভা বলল থমথমে মুখে।

– ‘অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন কারো কোথাও যেতে হবে না। কাল সকালে যেও।’

কথাটা বলে তিনি অমৃতার দিকে একবার তাকালেন। অমৃতা কাঠের কারুকার্য খচিত ডাইনিং টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ফর্সা মুখ রাগে আর অপমানে লাল টকটকে হয়ে গেছে। চোখে ধিকধিক করে জ্বলছে তেজ। হক সেই তেজের ঝলকটা টের পেলেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও আবার বললেন না। ঢোক গিলে ফেললেন। একটু বিচলিত দেখালো তাকে ক্ষণিকের জন্য। এরপর আর কথা না বাড়িয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। হেঁটে করিডোর পেরিয়ে ঢুকলেন স্টাডিরুমে। কাঠের দরজাটা বন্ধ হলো সশব্দে। রুদ্র বলল, ‘একটা ব্যাপার খেয়াল করছিস তোরা?’

– ‘কী ব্যাপার?’ বিভার প্রশ্ন।

– ‘সামির বাপকে একটু কেমন যেন চেঞ্জড মনে হচ্ছে। আমি খুবই অবাক হইছি যে উনি আমাদের স্যরি বলছে।’

বিভা আড়চোখে অমৃতাকে দেখল একবার। অমৃতা তখনো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সটান দাঁড়িয়ে আছে। বিভা একটু তটস্থ গলায় বলল, ‘কই আমার কাছে তো চেঞ্জড মনে হচ্ছে না।’

‘সামিরে ফোন দিয়া দেখি। আমার এখানে আর একটা মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা হইতেছে না।’ পাঞ্জাবির পকেট থেকে সেলফোন বের করল আকাশ।

অমৃতা যেন হঠাৎ গভীর কোনো ধ্যান থেকে জেগে উঠল। কোনো দিকে না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে করিডোরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। বিভা ওর একটা হাত খামচে ধরে বলল, ‘কোথায় যাচ্ছিস?’

অমৃতা এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল, ‘ছাড় আমাকে!’

– ‘তুই কোথায় যাচ্ছিস?’ এবার আকাশের প্রশ্ন।

অমৃতা দায়সারাভাবে বলল, ‘আমার মোবাইলটা পাচ্ছি না।’ কথাটা বলে সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। একটা বিভীষণ রাগ লুপ্ত করে দিচ্ছে তার চেতনা। মহিলাটা কেন তার বন্ধুদেরকে নিয়ে এমন সব আজেবাজে কথা বলে গেলো? কেন অপমান

করল? আর ওই লোকটা সহজে বলে ফেলল মাইন্ড করো না, ওর মাথা ঠিক নেই! বাহ্ মাথা ঠিক না থাকলেই বুঝি যা তা বলা যায়? বেশ তো তাহলে অমৃতার মাথাও ঠিক নেই এখন! এবার সেও যা তা বলবে!

স্টাডিরুমের দরজাটা ভেতর থেকে লক করা ছিল। পরপর কয়েকবার উদ্ধতভাবে দরজায় ধাক্কা দিল অমৃতা। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দরজাটা খুলে গেলো ভেতর থেকে। হক উঁকি দিয়ে দেখলেন অমৃতাকে। দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'এসো।'

তাকে দেখে মনে হলো না অমৃতার উপস্থিতিতে তিনি এক ফোঁটা অবাক হয়েছেন। বরং মনে হলো যেন অমৃতার এই অসময়ের আগমন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

ঘরটা লম্বাটে। খুব একটা আলো নেই। পশ্চিমের দেয়ালে একটা হলদে বাতির ল্যাম্পশেড জ্বলছে শুধু। পুবদিকে প্রশস্ত খোলা জানালা। জানালার পাশে রাখা আছে একটি ছোটখাটো বইয়ের তাক। লাল কার্পেটে মোড়া মেঝে। কার্পেটের মাঝখানে একটি গোল টেবিল। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফাইলপত্র, ল্যাপটপ এবং স্বাস্থ্যবান কয়েকটি বই। টেবিলের মুখোমুখি দেয়ালে একটি বেশ বড় স্ক্রিনের এল ই ডি টিভি। এছাড়া সারা ঘরে এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে বেশ কিছু কাঠের চেয়ার।

অমৃতা ফুঁসছিল ভেতরে ভেতরে। খুব কড়া কিছু কথা লোকটাকে শুনিয়ে দেবে বলে মনস্থির করে এসেছিল। কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্র লোকটার চিন্তিত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন মুখটা দেখে সে থমকে গেলো। ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেলো মনের আকাশের আবহাওয়া। রাগ কেটে গিয়ে তার বদলে ভিড় করল মায়া মায়া এক অনুভূতি!

তিনি গোল টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'কিছু বলবে?'

অমৃতাকে সেই মুহূর্তে একটু নার্ভাস দেখাল, 'ইয়ে, আমার পার্সটা!'

হক হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ওখানে আছে।'

ইশারা অনুসরণ করে চেয়ে দেখল অমৃতা। জানালার পার্শ্ববর্তী বইয়ের তাকের ওপর তার পার্সটা রাখা। সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো। তুলে নিল পার্সটা। টের পেল লোকটা শান্ত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তার মস্তিষ্ক ক্রমশ কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বুক দুরদুর করছে। একটু আগের রাগ, ক্রোধ, উত্তেজনার বিন্দুমাত্র রেশ নেই এখন বুকের মধ্যে। উল্টো সারাটা সত্তাজুড়ে রিমঝিম এক বাজনা বেজে চলেছে। সে পার্সটা বুকে চেপে ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। ম্লান গলায় প্রশ্ন করল, 'চলে যাবো?'

তিনি অমৃতার স্নিগ্ধ, স্মিত মুখখানার দিকে আরো কিছুক্ষণ শান্ত চোখে চেয়ে থেকে বললেন, 'তোমার ইচ্ছা।'

অমৃতা চোখ নামিয়ে নিল, 'আপনার ইচ্ছেটা জানতে চাইছি।'

হক একটা প্রলম্বিত শ্বাস ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'থাকো। একটু পরে যেও।
'

৮

সিএনজি থেকে নেমে বাড়ির গেটের সম্মুখে দাঁড়ালো দুজনে। তখন রাত দুপুর। গেটের মাথায় জ্বলতে থাকা হলুদ আলোটা ঢেকে গেছে জমাট বাঁধা কুয়াশায়। চারপাশ সুনসান নীরব। ওদের গায়ে কোন গরম কাপড় নেই। দুজনেরই শীত করছিল। সামি হলুদ মেশানো কুয়াশার মাঝে আবছা হয়ে থাকা হৃদির মুখটার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বলল, 'তুই রেডি?'

– 'আমার খুব ভয় লাগতেছে সামি!'

সামি একটা হাত বাড়িয়ে হৃদিকে কাছে টেনে নিল। বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ভয় পাস না, আমি আছি তো!'

হৃদির চোখে তখন জলের প্লাবন নেমেছে। ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। কান্না জড়ানো গলায় সে কোনো রকমে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোর বাবা মা রাজি হবে না। এদিকে রাহাতের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়ে গেছে। আমার আব্বা আম্মাকে কীভাবে বলবো কথাটা?'

সামি হৃদির খোলা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোর কিছু বলতে হবে না। কিছু করতেও হবে না। যা করার আমি করব। আমাদের বন্ধুরা তো আছেই। তুই নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ ভরসা।'

এটুকু বলে সামি হাতের আঙুল দিয়ে হৃদির গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের রেখা মুছে দিল, মৃদুভাবে বলল, 'এত কাঁদিস কেন তুই? তোকে না বলছি যখন তখন কান্না করার স্বভাবটা বাদ দিতে? তুই কাঁদলে আমার ভালো লাগে না।'

– ‘তুই এত দেরি করলি কেন সামি? কেন এত সময় লাগল তোর ব্যাপারটা বুঝতে?’

– ‘তুই বুঝিস নাই কেন? সব কি আমার একার দায়িত্ব?’

– ‘আমি বুঝলেই কী? তুই তো সবসময় আমাকে আজেবাজে কথা বলিস। আমি নাকি পেত্নীর মতো দেখতে, বিশ্রী চেহারা আমার। আমি কীভাবে বুঝব যে তুই আমাকে…’

– ‘আমি তোকে?’ সামি হাসে। ফিচেল হাসি।

হৃদি ঢোক গিলল একবার। একটু বোধহয় লজ্জাও পেল। শ্যামবর্ণ লম্বা ধাঁচের মুখটা হঠাৎ কেমন এক মায়াবী লালিমায় ছেয়ে গেলো। আস্তে করে বলল ‘জানিনা…’

– ‘কী জানিস না?’

– ‘তোকে বুঝি না!’

– ‘বুঝিস না কেন?’

– ‘কখনো বলিস না তো কিছু!’

– ‘সব কথা কি বলতে হয়?’

হৃদি মাথাটা আলতোভাবে রাখল সামির বুকের ওপর। আদুরে গলায় বলল, ‘না হয় না। ভালোবাসার কথা অত বলতে নাই।’

সামি হৃদির চুলে মুখ ডুবিয়ে ঠাট্টার ছলে বলল, ‘ভালোবাসা? সেটা আবার কী?’

– ‘সেটা একটা ফুলের নাম।’

– ‘কোথায় পাওয়া যায় সেই ফুলটা?’

– ‘মানুষের বুকের ভেতর। মনের মাঝে।’

– ‘তাই?’

– ‘হুম তাই। সামি! আমি সেই ফুলটার ঘ্রাণ পাচ্ছি এখন। তুই কি পাচ্ছিস?’

সামি হৃদির কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে বলল, ‘পাচ্ছি!’

৯

কথাটা জলতরঙ্গের সুরের মতো স্নিগ্ধ এক আবেশে ডুবিয়ে দিয়েছিল অমৃতাকে, ক্ষণিকের জন্য!

আবছা হলুদাভ আলোয় সে মুখ তুলে তাকাল মানুষটার দিকে। গভীর চোখ দুটো তাকেই দেখছিল। সেই চোখে এখন ক্রোধ নেই, তেজ নেই, নেই কোনো গাম্ভীর্য। আছে শুধু ক্লান্তি, হতাশা, আর ক্লেশের সুস্পষ্ট ছাপ। অমৃতা দরজার কাছ থেকে সরে এলো। নিঃশব্দে দাঁড়াল টেবিলের সামনে, লোকটার মুখোমুখি। দাঁড়িয়েই থাকল বেশ খানিকক্ষণ। চারপাশ বড় বেশি নিস্তব্ধ। সিলিংয়ে ঝোলানো ফ্যান ঘুরছে না, এয়ারকন্ডিশন চলছে না। নিশ্বাসের ওঠানামার শব্দ আর হৃৎপিণ্ডের টিকটিক নাচনটা কানে এসে লাগছে।

– 'বসো।' তিনি বললেন।

অমৃতা বসলো চেয়ার টেনে। বাধ্য মেয়েটির মতো।

– 'সামি এসব কী করছে?'

অমৃতা একটা বড় শ্বাস ফেলল। স্থিরতার সাথে বলল, 'ও তানিশাকে বিয়ে করতে পারবে না রাশেদ!'

এবার রাশেদের গলা চড়ল, 'বিয়ে করতে পারবে না এই বিষয়টা একেবারে বিয়ের আগের রাতে এসে রিয়ালাইজ করল?'

– ‘হ্যাঁ শুনতে বা মানতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি।’

রাশেদ উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পায়চারি করতে করতে বললেন, ‘বিয়ে ক্যানসেল করা এখন কোন ভাবেই সম্ভব নয়।’

– ‘কেনো সম্ভব নয়?’

– ‘সম্ভব নয় কারণ বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। মেয়েটার পরিবারকে আমরা এখন কী জবাব দেবো? এটা কি ছেলেখেলা নাকি? তোমার বন্ধু দেখি আমার মান সম্মান না ডুবিয়ে ক্ষান্ত হবে না!

– ‘আপনার কাছে আপনার ছেলে বড়? নাকি মান সম্মান বড়?’

তিনি হঠাৎ হাঁটা থামালেন। সরাসরি অমৃতার চোখে চেয়ে বললেন, ‘সামিকে আমার ভীষণ কনফিউজড মনে হচ্ছে।’

– ‘এমন কেন মনে হলো আপনার? হঠাৎ?’

তিনি একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘আমি জানতাম একটা সময় বিভার সাথে ওর মানসিক বোঝাপড়া ছিল। কদিন আগে হুট করে তানিশাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলো। আজ শুনলাম হৃদিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এত ফ্লেক্সিবল কেন আমার ছেলেটা? ও কি প্রায়ই এরকম সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে?’

– 'রাশেদ, মাথা ঠান্ডা করে একবার আপনার ছেলের সাইকোলজিটা বোঝার চেষ্টা করুন প্লিজ। আমি বুঝিয়ে বলছি। আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন।'

রাশেদ এগিয়ে আসলেন। এবার টেবিলের উল্টোদিকে নয়, অমৃতার পাশের চেয়ারটাই টেনে নিয়ে ওর মুখোমুখি বসলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বলো, শুনছি।'

– 'সামি তানিশাকে পছন্দ করে না।'

– 'তাহলে বিয়েতে রাজি হয়েছিল কেন? –'বিভাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।'

হক সাহেবের কপালে কয়েকটি কুঞ্চন রেখা তৈরি হলো। তিনি প্রবল বিস্ময় নিয়ে বললেন, 'এসব কী বলছ তুমি?'

– 'সত্যি বলছি।'

– 'বিভাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানে? আমি বুঝতে পারছি না।' অমৃতা বলল, 'ডুয়ার্সে যাবার পর সামি আর হৃদির মাঝে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এক্সিডেন্টলি।
'

রাশেদ বিপন্ন গলায় বললেন, 'কী ঘটনা? '

– ‘প্রথমে একটা বিষয় জেনে রাখুন যে এসব কথা আমি নিতান্তই নিরুপায় হয়ে আপনাকে বলছি। যাতে করে আপনি সামিকে বুঝতে পারেন। এবং বুঝতে পেরে যেন এই বিয়েটা ক্যানসেল করেন। আমার বন্ধুর ব্যক্তিগত বিষয় আপনার সাথে শেয়ার করার উদ্দেশ্য একটাই, বিয়েটা ভেঙে দেওয়া।’

– ‘বুঝলাম। এখন বলো, ডুয়ার্সে কী হয়েছিল?’

– ‘ডুয়ার্সের ঘটনার আগে আপনাকে আরেকটা ব্যাপার বলতে হবে। বিভার বিয়ের পর থেকে হৃদিই সর্বক্ষণ সামির সঙ্গে ছিল। মানে আমরাও সাথে ছিলাম বাট হৃদির থাকাটা একটু স্পেশাল ছিল। এই ধরেন দুজন রাত জেগে কথাটথা বলত, আলাদাভাবে হ্যাং আউট করত। বিভার বিয়ের পর তো প্রায় দুই মাসের মতো বিভার সাথে সামির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওই সময় হৃদি যদি সামির পাশে না থাকত, তাহলে কী হতো আল্লাহ জানে! সো বুঝতেই পারছেন সামি আর হৃদির বন্ধুত্ব কতটা স্ট্রং ছিল।’

– ‘বুঝতে পারছি।’ গম্ভীর স্বরে বললেন তিনি। তার কপাল এখনো কুঞ্চিত। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ।

– ‘তো ডুয়ার্সে যাবার পর…’ অমৃতার চোখে হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক পশলা সংকোচ এসে ভিড় করল। হক দেখলেন সামনে বসা পুতুলের মতো আদুরে মেয়েটার কানের ডগা লাল হয়ে উঠেছে এবং সেই সময় তিনি আবিষ্কার করলেন যে চরম দুঃসময়েও এই আদুরে মুখটার দিকে চেয়ে থাকতে তার ভালো লাগছে। এবং এই ভালো লাগাটাকে তাঁর এখন আর কোনোমতেই অশোভন বা বিধিবিরুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে যেন এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়তি। হ্যাঁ নিয়তি! নিয়তি

মানবজীবনের কোন চোরা পথ দিয়ে যে ঠিক ঠিক গন্তব্যে এসে পৌঁছে যায়, মানুষ যদি তা জানত!

– ‘কী হলো?’ প্রশ্ন করলেন তিনি।

অমৃতা স্তিমিত কণ্ঠে বলল, ‘ডুয়ার্সের প্রথম সন্ধেবেলায় সামি হৃদিকে বিভা ভেবে ভুল করে কিস করে ফেলেছিল।’

হক থমকালেন। অপ্রস্তুত হলেন। অস্বস্তি চিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখে। নিজ পুত্র সম্পর্কে এমন একটি অপ্রীতিকর তথ্য শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। চোখ সরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। কেন কে জানে চোখ সরিয়ে নেবার পরেও আড়চোখে একবার তাকালেন মেয়েটার দিকে। মেয়েটা এখন মিটমিট করে হাসছে। একটা ঐন্দ্রজালিক রহস্য খেলা করছে তার মিটমিটে হাসিটায়।

তিনি কেশে গলা পরিষ্কার করলেন একবার। গমগম করে উঠে বললেন, ‘এটা কোনও কথা হলো?’

অমৃতার কর্ণকুহরে শব্দগুলো প্রবেশ করল না। তার মুখে তখনো মুচকি হাসিটা ঝুলছে। কী যেন ভাবছে সে, আনমনে!

– ‘কী হলো?’

অমৃতার ধ্যান ভাঙল। চোখ তুলে তাকালো একহাত দূরে বসা মানুষটার দিকে। মানুষটা কঠিনভাবে বললেন,

– ‘কথা বলছ না কেন? হাসছ কেন?’

অমৃতা হাসতে হাসতে বলল, ‘হঠাৎ একটা কথা মনে হলো, তাই হাসছি।’

– ‘কী কথা?’

– ‘বলা যাবে না।’

ভ্রূকুটি করে তাকালেন তিনি অমৃতার দিকে। ডুয়ার্সের ঘটনাটা শোনার পর থেকে তাঁর মুখের ভাব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। হয়তো পুত্রের বন্ধুর মুখ থেকে পুত্র সম্পর্কে এহেন অশোভন তথ্য জানতে পারায় তিনি মনে মনে বিব্রত বোধ করছেন। তাঁর বিবেক বরাবরই বেশ জাগ্রত। কিন্তু এই মুহূর্তে বিবেককে ছাপিয়ে দ্বন্দ্বের মতো কিছু একটা কাজ করছে ভেতরে। একটা মন ভাবছে যে নিজের ছেলের বয়সী একটি মেয়ের সাথে এত খোলামেলা আলাপ করাটা তাঁর জন্য ন্যায়সংগত বা মানানসই নয়। আবার আরেকটা মন বলছে, এই মুহূর্তে শুধু এই একটি মাত্র মানুষের সাথেই মন খুলে কথা বলা যায়। তাবৎ সংসারের হরেক রকম ভান ভণিতা আর কৃত্রিমতায় মোড়া দুর্বোধ্য সব মানুষের ভিড়ে এই একটি মাত্র মানুষই যেন প্রত্যয়যোগ্য বিশ্বাসভাজন। তিনি দেশের একজন প্রভাবশালী নাগরিক। টাকা এবং ক্ষমতার জোরে চাইলেই দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন করতে পারেন। অথচ প্রকৃতির কী নির্মম পরিহাস, নিজ পুত্রের হৃদয় ঘটিত মামলায় আজ তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসছে না। তাঁর মতো ক্ষমতাধর মানুষকে মানসিক নির্ভরতার জন্য হাত পাততে

হচ্ছে পুঁচকে এক মেয়ের কাছে। প্রকৃতি সত্যই, বড় বেশি সৃষ্টিছাড়া, গোলমেলে আর বিচিত্র!

তিনি কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, ‘কথা শেষ কর।’

অমৃতা নড়েচড়ে বসে বলল, ‘এরপর হলো কি, বিভাকে যখন ওই ঘটনাটির কথা বলা হলো তখন বিভা ভুল বুঝল। সে সঙ্গে সঙ্গে সামির সাথে ব্রেকআপ করল।’

– ‘হ্যাং অন! ব্রেকআপ মানে? বিভার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ব্রেকআপ আসলো কোত্থেকে?’

– ‘বিভা ঠিক করেছিল সে অভিজিৎকে ডিভোর্স দিবে। তারপর সামিকে বিয়ে করবে।’

হক উত্তেজিতভাবে বললেন, ‘এতো সাংঘাতিক ব্যাপার!’

কথাটা শুনে অমৃতা কেন যেন একটু থমকে গেলো। কয়েকটা সেকেন্ড নিষ্পলক চেয়ে থাকল লোকটার মুখের দিকে। তারপর স্তিমিত গলায় বলল,

– ‘প্রথমে যখন শুনেছিলাম তখন আমার কাছেও ব্যাপারটা সাংঘাতিক খারাপ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি জানি যে ভালোবাসলে মানুষ অবিবেচকের মতো অনেক সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসে।’

একটা ইঙ্গিত ছিল কথাটায়। তিনি বুঝলেন এবং বুঝতে পেরে বাস্তবিকই অস্বস্তি বোধ করে উঠলেন। কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, 'তারপর?'

– 'তারপর বিভা যখন সামির সাথে ব্রেকআপ করল, তখন সামি ঠিক করলো বিভাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকেও একটা বিয়ে করতে হবে। ব্যস রাজি হয়ে গেলো বিয়েতে। কিন্তু তানিশার সাথে ওর মিলছিল না কোনো দিক দিয়েই। আপনি জানেন কিনা জানি না। সামিটা অনেক অন্যরকম। আপনি তো সারাজীবন ওকে বিত্তবৈভবের মধ্যেই বড় করেছেন। কিন্তু সেই বিত্ত বৈভবে আপনার ছেলের কখনোই মন লাগেনি। সম্পদের মোহ তাকে বাঁধতে পারেনি। ধন সম্পদ বা পশ লাইফ স্টাইল না, ওর চাই একজন মনের মানুষ। আপনারা কি এটা বোঝেন?'

একটু থেমে অমৃতা আবার বলল, 'তানিশার সাথে ওর মানসিকতার আকাশ পাতাল ফারাক। তানিশা ধনী লোকদের সঙ্গ পছন্দ করে। এদিকে সামি চব্বিশ ঘণ্টা ওঠা বসা করে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাথে। তানিশার হয়তো পাঁচতারা হোটেলে ডিনার পছন্দ, আর সামির পছন্দ মোস্তাকিমের চাপ সাথে বন্ধুদের আড্ডা। বিভার মতো করে, কিংবা বিভার চাইতেও বেশি করে সামিকে একমাত্র হৃদিই ভালোবাসতে পারবে। বিভা আর হৃদিতে খুব মিল। দুজনের পছন্দও একই রকম। দুজনেই সামিকে ভালোবাসে! তবে একটা জিনিস জেনে রাখুন, বিভা কিন্তু মন দিয়ে সংসার করছে এখন। সামির প্রতি যে আসক্তিটা ওর ছিল সেটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। কেটে গেছেও অনেকখানি। এদিকে সামি প্রথমবার বিভার চলে যাওয়াটা সামলে উঠতে পারলেও, দ্বিতীয় বার হৃদির চলে যাওয়াটা কিন্তু আর সহ্য করতে পারবে না।'

হক চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখে মুখে এক ধরনের বিহ্বল ভাব খেলছে। মেয়েটির অকপট বলে যাওয়া কথাগুলো তাঁকে যেন সম্মোহিত করে ফেলছে ধীরেধীরে। তাঁর

মনে হচ্ছে এত গোছানো এবং যৌক্তিক কথা তিনি এর আগে কখনো কাউকে বলতে শোনেননি।

অমৃতা বলল, 'বিভার চলে যাওয়াটা সামির জীবনের অনেক বড় একটা দুর্ঘটনা ছিল। আপনারা সেটা কতটা বুঝতে পেরেছেন জানি না। আল্লাহর অশেষ রহমত যে আপনার ছেলে বিয়ের আগেই এটা রিয়েলাইজ করতে পেরেছে সে আসলে কাকে চায়। হৃদিকে ছাড়া তার একটা মুহূর্তও চলে না। ট্রাস্ট মি।'

হক একটা বড় শ্বাস ফেললেন। ডান কনুইটা টেবিলের ওপর রেখে নিজের কপাল চেপে ধরলেন হাত দিয়ে। ক্লান্তভাবে বললেন, 'কিন্তু এখন কী করে সম্ভব? কাল এগারোটায় আকদ হওয়ার কথা। আমি ওই মেয়েটার বাবা মাকে কী জবাব দেবো? তাছাড়া সামির আম্মা কোনোভাবেই মানবে না।'

অমৃতার পার্সের ভেতরে সেলফোনটা ভাইব্রেট করছিল। ফোন বের করে দেখল সে। আকাশের ফোন। ধরতেই ওপাশ থেকে আকাশ বলল, 'তুই কোথায়? ওরা চলে আসছে।'

– 'আচ্ছা আমি আসতেছি।'

ফোন রেখেই অমৃতা উঠে দাঁড়ালো, 'সামি আসছে। চলেন।'

হক সাহেব কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকালেন একবার অমৃতার দিকে। গভীর চোখদুটো যেন কিছু একটা বলে উঠল। অমৃতা বোধহয় সেই চোখের ভাষা বুঝে নিয়েই বলল,

– 'আপনাকে স্ট্রং হতে হবে। আপনার স্ত্রীকে বোঝাতে হবে। এবার যদি আপনারা সামির পছন্দ না মেনে নেন, তাহলে··· তাহলে খুব খারাপ হবে।' এটুকু বলে একটু থেমে সে আবার বলল, 'আপনি এত চিন্তা করবেন না রাশেদ, আমি আছি তো!'

অমৃতার বলা শেষ বাক্যটা শুনে রাশেদ তাঁর ধারওয়ালা সুন্দর মুখখানা ভরে চমৎকার হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। অমৃতা মুগ্ধ হয়ে সেই হাসির দিকে অপলক নেত্রে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বলল, 'তখন কী ভাবছিলাম জানেন?

রাশেদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে রোলেক্সের হাতঘড়িটা তুলে নিলেন, 'কী ভাবছিলে?'

– 'ভাবছিলাম যে ভালোবাসার মানুষকে চুমু খেতে কেমন লাগে?'

রক্তের একটা ঝলক এসে লাগল তাঁর মুখে। হাতের কবজিতে ঘড়ির বেল্ট বাঁধতে গিয়ে থমকে গেলেন এক মুহূর্তের জন্য। তারপর খানিক বিচলিত গলায় বললেন, 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

১০

ডাইনিং রুমে বন্ধুদের পাওয়া গেলো। হৃদির মুখটা দুশ্চিন্তায় একদম ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু তার চোখে এখন জল নেই। মনের ওপর কেউ যেন একটা ভারি পাথর বসিয়ে দিয়েছে। সেই পাথরের ভারে চাপা পড়ে গেছে সব আবেগ, অনুভূতি। মিনিট না গড়াতেই স্টাডিরুমের দরজাটা খোলার শব্দ পাওয়া গেলো। ঠিক একই সময়ে একজোড়া পা সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছিল ওপর থেকে। ডাইনিং স্পেসে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর আত্মা কাঁপছিল। প্রবল ঝড় আসার আগে প্রকৃতি যেমন হঠাৎ করেই অসম্ভব রকমের থমথমে হয়ে ওঠে, সেই রকম একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল ওদের চোখে মুখে। হৃদির হাঁটু কাঁপছিল ঠকঠক করে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না আর। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। খুব দুর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে চেতনা হারিয়ে ফেলবে।

হক সাহেবই প্রথমে প্রবেশ করলেন ঘরে। এসে দেখলেন ছেলে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেকে ঘিরে রেখেছে তার বন্ধুরা। সেই মেয়েটি, যার সাথে ছেলে পালিয়েছিল, সে বসে আছে একটি চেয়ারে, জবুথবু হয়ে।

বাবা সামনে এসে দাঁড়াতেই সামি মুখ নামিয়ে নিল নিচে। তার ভেতরটা এখন আত্মগ্লানিতে জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। সে কোনোদিনই চায়নি বাবা মাকে এভাবে কষ্ট দিতে। সে জানে তার জন্য বাবাকে এখন সামাজিকভাবে অপদস্থ হতে হবে। লোকে নানা রকম কথা বলবে। কিছু সংবাদ মাধ্যম রসিয়ে রসিয়ে এই খবর পত্রিকার পাতায় ছাপাবে। বাবাকে সে বরাবরই একটু ভয় পায়। সন্তান মানুষ করার নিমিত্তে বাবা অথবা মা এদের দুজনের একজনকে একটু কঠোর হতে হয়। যে কোনো একজনকে সন্তান শাসনের ভারটা হাতে তুলে নিতে হয়। যে সন্তানের বাবা মা দুজনেই নরম কিংবা আবেগী সেই সন্তানের বেড়ে ওঠাটা ঝরঝরে হয় না। বাবা মায়ের ভালোবাসায়ও একটা ব্যালেন্স দরকার। সামির ক্ষেত্রে কঠোর ভূমিকাটি পালন করে এসেছেন বাবা। মা কখনো তাকে সেভাবে শাসনই করেননি। মা মানেই তার

কাছে সহজ, সরল, মিছরির মতো মিষ্টি একটি অনুভূতি। মায়ের কাছে চাইলে সব পাওয়া যায়। নিজের বুকের কলিজা কেটে দিতে বললেও মা আপত্তি করবেন না।

সে অবনত মুখে ধীরস্বরে বলল, 'বাবা, আই অ্যাম স্যরি!'

হক গম্ভীরভাবে চেয়ে ছিলেন পুত্রের দিকে। তাঁর কপালে ভাঁজ। ভ্রু জোড়া বক্র। সামি আজীবন বাবার এই রুদ্রমূর্তিটিকে ভয় পেয়ে এসেছে। আজও পাচ্ছে। সেই সময় উন্মাদিনীর বেশে ঘরে ঢুকলেন রোমেলা। ছেলেকে দেখামাত্র তিনি উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন। হক তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো। আগে শুনে নিই ও কী বলতে চায়।'

হৃদির ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। তবে বন্ধুরা সবাই মুখের সামনে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিধায় তার একটু সুবিধাই হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা শরীরগুলোর জন্য তাকে কেউ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

সামি মুখ তুলে তাকালো মায়ের দিকে। মায়ের চোখ দুটি ফোলা। চুল অবিন্যস্ত। সারা মুখে একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব। ওই মুখটা দেখে বুক মোচড় দিয়ে উঠল তার। মনে হলো যেন কষ্টে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাবে। তবুও, মা এলো বলেই সে যেন একটু ভরসা পেলো। আজীবন বাবার রাগের প্রকোপ থেকে মা' ই তো তাকে বাঁচায়। এবারও, বাবা না বুঝলেও মা ঠিকই বুঝবে!

সামি বাবার দিকে তাকাল না, মায়ের চোখে চেয়ে বলল, 'মা, আমি তানিশাকে বিয়ে করব না। বিয়েটা তোমরা ক্যানসেল করো। আমি জানি আমি তানিশার সাথে অন্যায় করছি। কিন্তু কিছু করার নেই। বিয়েটা করে ফেললে আরো বড় অন্যায় হবে।'

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়ে কথা বললেন হক, ‘কেন? হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কী?’

বাবার চোখে চোখে তাকানোর সাহস নেই সামির। সে পুনরায় চোখ নিচে নামালো, কম্পনযুক্ত কণ্ঠে বলল, ‘আমি অন্য একজনকে পছন্দ করি।’

এবার রোমেলাকে আর কেউ রুখতে পারল না। চিৎকারে ফেটে পড়ে তিনি বললেন, ‘কাকে পছন্দ করিস? ওই বেয়াদব, বেহায়া মেয়েটাকে? যে তোকে সবার সামনে আই লাভ ইউ বলেছিল?’

হৃদি চমকে উঠল। অপমানে ঝাঁঝাঁ করে উঠল সারা শরীর।

– ‘এভাবে কথা বলছ কেন তুমি?’ মায়ের দিকে করুণ চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল সামি।

রোমেলা ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, ‘তোমার বিয়ে তানিশার সাথেই হবে। এই বিয়ে কোনোভাবেই ক্যানসেল করা যাবে না এখন।’

সামির মুখখানা মোচড়ানো কাগজের মতো কুঁকড়ে গেলো মুহূর্তের মাঝে।

--’তানিশাকে আমি পছন্দ করি না। কেন বিয়ে করব ওকে?’

হক সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'এই বিষয়টা নিয়ে তোমার প্রথমেই চিন্তা করা উচিত ছিল। বিয়ের আগের দিন বিয়ে ভেঙে যাওয়া একটা মেয়ের জন্য কতটা অপমানজনক তুমি বুঝতে পারছ?'

সামি এবার অসহায়ভাবে বন্ধুদের দিকে তাকালো। বন্ধুরা সব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখ ফ্যাকাশে। হৃদি মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে আছে মূর্তির মতো। এতক্ষণের থমকে থাকা কান্নাটা এবার তার চোখের কার্নিশে বাঁধ ভেঙেছে। টপটপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। রোমেলা বললেন, 'বিয়েটা তোমাকে করতেই হবে। এখন আর কিছু করার নেই।'

সামির দুহাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসলো অজান্তেই। দৃঢ় গলায় বলল, 'অসম্ভব! এই বিয়ে আমি করতে পারব না।'

রোমেলা কথাটা শুনে এমনভাবে চিৎকার করে উঠলেন মনে হলো যেন একটু হলেই তাঁর কণ্ঠনালি ছিঁড়ে যাবে। তিনি হুংকার দিয়ে উঠে বললেন, 'ওই বেহায়া মেয়েটা তোমাকে এসব কথা শিখিয়ে দিয়েছে তাই না? জাদু করেছে তোমার ওপর?' এটুকু বলে তিনি ভিড়ের মাঝে কোণার চেয়ারে বসে থাকা হৃদিকে ঠিক ঠিক খুঁজে বের করলেন, হাত উঁচিয়ে শাসানোর গলায় বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ এসব করে এ বাড়ির বৌ হতে পারবে? জীবনেও না। তুমি জানো সামি কার ছেলে? আমাদের ফ্যামিলি স্ট্যাটাস জানো তুমি? আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে ছেলের বৌ হিসেবে কোনো দিন মেনে নেব না!'

সামি প্রতিবাদ করে উঠল, 'মা এসব কী হচ্ছে? তুমি এভাবে কথা বলতে পারো না ওর সাথে!'

হক এগিয়ে এসে রোমেলার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুমি শান্ত হও। মাথা ঠান্ডা করো।'

এতক্ষণে অমৃতা কথা বলল। না সামির বাবা মায়ের সাথে না। সামিকেই সরাসরি বলল, 'যা করার তোকেই করতে হবে। তানিশাকে ফোন দিয়ে বল যে তুই বিয়েটা করতে পারবি না।

রোমেলা সাপের মতো ফুঁসে উঠলেন, 'তোমার এত বড় সাহস? তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ছেলেকে কুবুদ্ধি দিচ্ছ?'

– 'আপনার ছেলে তানিশাকে পছন্দ করে না। হৃদিকে পছন্দ করে। এই সহজ কথাটা আপনার মাথায় ঢুকছে না?' কিছুটা উগ্রভাবেই বলল অমৃতা কথাগুলো।

সেই মুহূর্তে রোমেলা খুব সাংঘাতিক একটা কাজ করে বসলেন। খ্যাপাটে পাগলের মতো হনহন করে এগিয়ে এসে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অমৃতার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, 'এত সাহস তুমি কোথায় পাও? বেয়াদব মেয়ে!'

ঘরের মধ্যে যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেলো। সবাই স্তব্ধ, বিস্মিত এবং বাকরুদ্ধ! থাপ্পড়টা অমৃতার ঘাড় কাত করে দিয়েছে। গালে হাত রেখে মূর্তির মতো স্থবির হয়ে আছে সে।

মুহূর্তের মধ্যে হক সাহেব ছুটে আসলেন। স্ত্রীর বাহু খামচে ধরে বললেন, ‘তুমি এটা কী করলে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যাও ওপরে যাও!’ কথাটা বলে তিনি নিজেই রোমেলাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন।

অমৃতার গায়ে কেউ কোনোদিন হাত তোলেনি। জীবনে এই প্রথমবারের মতো কেউ তাকে শারীরিক ভাবে আঘাত করল। থাপ্পড় খাওয়া গাল এক হাতে চেপে ধরে সে ঝাপসা চোখে দেখছিল জেদি মহিলাটিকে। মহিলার চোখ জ্বলছে বাঘিনীর মতো। সর্পিনীর ন্যায় পড়ছে নিশ্বাস। এই নারী সেই মানুষটার স্ত্রী। সেই মানুষটা, যাকে অমৃতা ভালোবাসে! অমৃতা যাকে খুব করে চায়, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই সেই মানুষটা এই মহিলার একান্ত নিজের। তবুও অমৃতা জানে, তার ভালোবাসায় এত শক্তি আছে যে চাইলেই সে ভালোবাসার যুদ্ধে এই রমণীটিকে হারিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সেই যুদ্ধে তার কোনোদিনই যোগদান করা হবে না। কারণ এই মানবী শুধু তার ভালোবাসার মানুষটির স্ত্রীই নন। এই মানবী তার বন্ধুর মা। বন্ধুর জন্যেই… হ্যাঁ শুধু বন্ধুর জন্যেই অমৃতা এই অভদ্র, অবিবেচক মহিলাকে আজকের থাপ্পড়ের জবাব কোনদিন দিতে পারবে না!

থাপ্পড়টা সে কোনো রকমে হজম করে গেলেও তার বন্ধুদের হজম করতে বেশ বেগ পেতে হলো। হৃদি একদম ঝগড়াটে গলায় সামিকে বলল, ‘কী ব্যাপার? তোর মা তোর সামনে অমৃতাকে থাপ্পড় মারলো, তুই কিছু বললি না যে?’

সামি তখন হতচেতন ভাবে দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে চেয়ারের ওপর বসে আছে। শ্বাস পড়ছে অস্বাভাবিক ভাবে। রুদ্র এগিয়ে এসে সামির পিঠে একটা হাত রাখল, হৃদিকে বলল, ‘ওর তো কিছু করার নাই এখানে। ওর সাথে ঝগড়া করতেছিস কেন তুই?’

হৃদির গলা এবার আরো চড়ে গেলো, ‘কিছু করার থাকবে না কেন? সে তার বাপ মায়ের সামনে এমন মিউমিউ করে কেন? ওর মা আজকে অমৃতারে থাপ্পড় মারছে। কালকে আমারে থাপ্পড় মারবে।’

অমৃতা টানা মিনিট পাঁচেক সময় পরে নিজের গাল থেকে হাত নামাল। ঝটকাটা তখনো পুরোপুরি কাটেনি তার। ফর্সা মুখখানা চাপা রাগ আর অপমানের তোড়ে রক্তিম হয়ে আছে। একটু ভারি গলায় সে বলল, ‘এখন এসব বাদ দে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। সামি! তানিশারে ফোন দে।’

আকাশও সায় দিলো কথাটায়। বলল, ‘হ্যাঁ সেটাই। আর দেরি না কইরা তুই মেয়েটারে ফোন দিয়া খবরটা দে। অনেক রাত হয়ে গেছে। বেচারি হয়তো ঘুমায় পড়ছে এতক্ষণে।’

সামির বুক থেকে একটা বিধ্বস্ত কম্পিত নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। প্যান্টের পকেট থেকে একটু সময় নিয়েই মোবাইলটা বের করল সে। কাঁপা হাতে ডায়াল করলো তানিশার নম্বরে। লাউডস্পিকার অন করা ছিল। বন্ধুরা সব সামিকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ানো। নিশ্বাস বন্ধ করে উৎসুকভাবে চেয়ে আছে সবাই সেলফোনের দিকে। চার নম্বর রিংটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তানিশা ফোন ধরলো। তার গলার স্বর কিছুটা জড়ানো। একটু ঘুম ঘুম ভাব।

সামির মুখটা তখন মাঝ সমুদ্রে প্রবল ঝড়ের মুখে পড়া দিকহারা নাবিকের মতো অসহায়। সে হাতে ধরা ফোনের পর্দায় বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চেয়ে আছে। তানিশা ওপাশ থেকে ক্রমাগত হ্যালো হ্যালো বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত পর অনেক কষ্টে সামি বলতে পারল, ‘তানিশা, তোমার সাথে জরুরি কথা ছিল!’

তানিশা খুব সহজ গলায় বলল, 'কী কথা? তোমাকে এতবার ফোন দিলাম। ফোন ধরলে না কেন?'

সামি তার বন্ধুদের দিকে একবার চোখ মেলে তাকালো। বন্ধুরা চোখের ইশারায় তাকে সাহস দিল। আকাশ এক পা এগিয়ে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরল। সামি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'তানিশা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না!

কয়েকটা সেকেন্ড পিনপতন নীরবতা। মনে হচ্ছিল যেন এই অবিচল নিস্তব্ধতার নিশ্চুপ দাপাদাপিতে ওদের প্রত্যেকের বুকের ভেতর এখুনি একটা বিকট বিস্ফোরণ ঘটবে। তবে তার আগেই বিস্ফোরণটা ঘটল ফোনের অপর প্রান্তে।

– 'কী বললা তুমি?' তানিশার চিৎকারে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো।

– 'তানিশা আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ স্যরি! হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। প্লিজ পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও! আমি জানি আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি তোমার সাথে। কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো বিয়েটা আমি করতে পারব না।'

মিনিট না গড়াতেই ফোনের ভেতর দিয়ে ধুপধাপ পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হচ্ছে তানিশা যেন ছুটে যাচ্ছে কোথাও, ঝড়ের গতিতে। খানিক বাদে তাকে ত্রাসিত কণ্ঠে বলতে শোনা গেলো, 'আম্মা! আব্বা! এই যে কথা বলো। শুনো কী বলছে এই ছেলে।'

একটা রক্ত হিম করা শীতল স্রোত সামির মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেলো। এবার তাহলে তানিশার বাবা মার মুখোমুখি হতে হবে! ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছিল তাকে। হৃদি দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতার পাশে। তার মুখটা আতংকগ্রস্থ। কান্নায় লেপটে গেছে চোখের কাজল। টলটলে, ভাসা ভাসা দুটি চোখ নিয়ে সে সামির দিকে চেয়ে আছে চাতক পাখির মতো। সেই মুহূর্তে হৃদির ওই অশ্রুসজল নিষ্কলুষ মুখটার দিকে চেয়ে থেকে সামির হঠাৎ মনে হলো যে, এই মেয়েটার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফোটাবার জন্য সে গোটা পৃথিবীটা উল্টে দিতে পারবে। লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারবে সব কিছু… হ্যাঁ, স-ব কিছু!

তানিশার আব্বা ফোন ধরল। -'হ্যালো!'

– 'হ্যালো আংকেল!'

– 'কী ব্যাপার? এত রাতে?'

– 'আংকেল আমি বিয়েটা করতে পারছি না। স্যরি!' সামির গলা কাঁপছিল প্রবলভাবে। ওপাশ থেকে ভদ্রলোক কান ফাটানো চিৎকার করে উঠলেন –'কী বলছ তুমি এসব? হ্যাঁ? কালকে বিয়ে আর আজকে ফোন করে বলছ বিয়ে করতে পারবে না? এটা কি ফাইজলামি নাকি? কই তোমার বাবা কোথায়? ফোন দাও তাকে!

– 'এখানে আমার বাবা মায়ের কোনো দোষ নেই আংকেল। আপনারা প্লিজ যা বলার আমাকে বলুন। বাবা মাকে কিছু বলবেন না।'

১১

বেডরুমে এসে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হক তীব্রস্বরে বললেন, 'তুমি মেয়েটার গায়ে হাত তুললে কেন?'

রোমেলা তখনো রাগে কাঁপছিলেন। কাঁপতে কাঁপতেই ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়লেন। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'তুমি দেখনি অসভ্য মেয়েটা কী রকম কুবুদ্ধি দিচ্ছিল আমার ছেলেকে?'

– 'তাই বলে তুমি পরের মেয়ের গায়ে হাত তুলবে?'

রোমেলা সরু চোখে তাকালেন, আগুন গলায় বললেন, 'হাত তুলবো না তো কী করব? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওর বেয়াদবি সহ্য করব? মেয়েটা একটা পয়লা নম্বরের বেয়াদব!'

হক ধীরস্বরে বললেন, 'বেয়াদব নয়।'

– 'বেয়াদব নয়?'

– 'না বেয়াদব না। মেয়েটা একটু অন্যরকম।'

– 'রোমেলা অস্ফুটে বললেন, 'তাই নাকি?' —'হ্যাঁ তাই।'

– ‘তুমি কী করে জানলে?

– ‘জানাজানির কিছু নেই। বোঝা যায়।’

রোমেলা স্বামীর মুখের ওপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রাখলেন। এর আগে এই লোকটা কোনোদিন কারো সম্পর্কে এমন দৃঢ় এবং একপেশে মতামত দেয়নি। কদিন আগে লোকটা নিজেই অমৃতাকে বেয়াদব বলে গালাগাল করেছিল। রোমেলার তা স্পষ্ট মনে আছে। এই কয়েক দিনে কী এমন ঘটে গেলো যে মেয়েটার সম্পর্কে তার ধারণা একদম ভেল্কি দিয়ে পাল্টে গেলো?

হক বরাবরই একটু নাকউঁচু স্বভাবের মানুষ। নিজের শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, এবং বিত্ত বৈভব নিয়ে তাঁর দাম্ভিকতা আকাশচুম্বী। সচরাচর তিনি কারো প্রশংসা করেন না। বছর চারেক আগে এক মডেল কন্যার সাথে পরিচয় হয়েছিল একটি টিভি চ্যানেলের টকশোতে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মডেল কন্যা তার অন্ধ ভক্ত হয়ে গেলো। পরদিন ফোন দিয়ে বলল, দেখা করবে। তিনি অফিসে আসতে বললেন। এ কথা, সে কথায় বোঝা গেলো মডেলের দেখা করার পেছনে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ বা উদ্দেশ্য নেই। ইংরেজিতে ‘স্মল টক’ যাকে বলে তাইই করে যাচ্ছিল ক্রমাগত। তিনি মেয়েটাকে কেনো রকমে এড়িয়ে গেলেন। কদিন বাদে এক শুক্রবারে মেয়েটা হঠাৎ বিনা নোটিশে সরাসরি বাড়ি চলে এলো। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ফোন করল তাঁর মোবাইলে। হক স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ‘শোনো, একটা মেয়ে এসেছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি নিচে গিয়ে মেয়েটাকে খুব করে বকে দিয়ে আসো তো! এমনভাবে বকবে যেন সে আর কোনোদিন এ বাড়িতে না আসে।’

রোমেলা স্বামীর কথা মতন কাজ করলেন। নিচে নেমে দেখলেন গেটের সামনে ছিপছিপে শরীরের এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। চোখে রোদ চশমা। বয়স তিরিশ ছুঁই

ছুঁই হবে। কাটা কাটা নিখুঁত ছাঁচের মুখখানায় ঢলঢল করছে এক মায়াবী সৌন্দর্য। তিনি শক্ত গলায় বললেন, 'তোমার কী চাই?'

মেয়েটি চোখ থেকে সানগ্লাস নামিয়ে বলল, 'স্যারের সাথে একটু দরকার ছিল। স্যার কি আছেন বাসায়?'

- 'কী দরকার?'

মেয়েটি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করল, 'আপনার পরিচয়টা?'

– 'আমি উনার ওয়াইফ।'

একটু বিব্রত দেখালো সুন্দরীকে। আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে, স্যারের সাথে জবের ব্যাপারে একটু কথা ছিল।'

রোমেলা স্বামীর হুকুম মোতাবেক কাজ করলেন। একটা রাম ধমক দিয়ে উঠে বললেন, 'জবের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছ ছুটির দিনে? ফাজলামোর জায়গা পাও না আর? যাও এখান থেকে। বাড়িতে উনি কারো সাথে দেখা করেন না!'

মেয়েটি ধমক খেয়ে নতমুখে প্রস্থান করল। ফিরে এসে রোমেলা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বেচারি চাকরির জন্য কথা বলতে এসেছিল। তুমি তাড়িয়ে দিতে বললে কেন? মেয়েটি কিন্তু দেখতে দারুণ। মডেলদের মতো সুন্দর। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এই মেয়েকে কোন যাচাই বাছাই ছাড়াই নিয়ে নিত চাকরিতে।'

হক ঠোঁট উল্টে বললেন, 'সুন্দরী হলে কী হবে? মাথার ভেতরে বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নেই। একদম নিরেট। সুন্দরীদের এটাই সমস্যা, তারা সৌন্দর্য দিয়ে দুনিয়ার সব পুরুষদের বশে আনতে চায়।'

– 'তোমার দেখার চোখই নেই।' আক্ষেপের গলায় বললেন রোমেলা।

হক হাসলেন, 'বেশির ভাগ মেয়েরা একই রকম। বাইরের চাকচিক্যটাকেই তারা যোগ্যতা নির্ধারণের পরিমাপক বলে মনে করে। প্রসাধন সামগ্রী, শাড়ি, গয়না, টাকা পয়সা এর বাইরেও যে আরো কিছু ব্যাপার আছে সেটা এসব সাধারণ মেয়েদের মাথায়ই ঢোকে না।'

– 'আরো কিছু ব্যাপার বলতে কী বোঝালে?'

হক একটু আনমনা হলেন ক্ষণিকের জন্য। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, 'অন্যরকম কিছু।'

– 'অন্যরকম?'

– 'হ্যাঁ অন্যরকম।'

ওই শব্দটা সেদিন রোমেলার কানে এবং মনে কেন যেন স্ট্যাপলারের পিনের মতো গেঁথে গিয়েছিল। কী করে যেন বুঝে গিয়েছিলেন তিনি যে, তার সুদর্শন, শিক্ষিত, ধনাঢ্য পতিদেবের মনটা আদতে 'অন্যরকম' কিছু চায়। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

এবং মার্জিত রুচি দেখে কিঞ্চিৎ গর্ববোধ করলেন। আবার কেন যেন একটু আহতও হলেন মনে মনে। তিনি জানেন তাঁর স্বামী রূপের মোহে আটক হওয়ার বান্দা না। সেরকম হলে মানুষটার মনের ঘরের সন্ধান বহু আগেই পেয়ে যেতেন। যৌবনে তিনি ছিলেন ডাকের সুন্দরী। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের দুই আনা দামও তার স্বামী কখনো দেননি, দিতে জানেননি। কেন যেন মনে হয়েছে মানুষটা তাকে ঠিকমতো ভালোবাসছে না। তাঁর হৃদয়পুরের প্রবেশদ্বারটি চিরকালের জন্য বন্ধ। হ্যাঁ সংসার জীবনে লোকটার একাগ্রতা ছিল শত ভাগ। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু সব থেকেও কী যেন একটা নেই নেই ভাব ছিল আজীবন। এত কাছে থেকেও, নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও মানুষটাকে তিনি আজ অবধি নিজের করে পাননি। অবশ্য শত ভাগ ভালো তো তিনি নিজেও বাসতে পারেননি কখনও লোকটাকে। প্রথম যৌবনের ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে বিবাগি জীবনের অনেকগুলো বছর। তাড়া করে বেড়ায় এখনও!

কোনো এক বিচিত্র কারণে ওই ‘অন্যরকম’ শব্দটা তাঁর বুকের পরে কেমন শেলের মতো গিয়ে বিঁধল। তিনি আর কিছু ভাবতে পারছিলেন না। এদিকে তাঁর একমাত্র আদরের সন্তানের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ মেয়ে তার ছেলেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু এই সমস্ত বাস্তবিক চিন্তাকে ছাপিয়ে তার বুকটা আচমকা এক অজানা, অদ্ভুত, নিষিদ্ধ শঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ছেলের এই বন্ধুদলটিকে আজকের পর থেকে এ বাড়িতে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। যে করেই হোক এই বাজে ছেলেমেয়েগুলোর হাত থেকে তাঁর পরিবারকে বাঁচাতেই হবে!

সেলফোনটা বাজছিল। হক পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফোন বের করে দেখলেন। তানিশার বাবা ফোন করেছে। তাঁর বুক থেকে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে গেলো। জীবনে এতটা অপমানিত বোধ তিনি এর আগে কখনো করেননি। ছেলেটা তাঁর মান সম্মান ডুবিয়েই ছাড়ল!

১২

সামির কাঞ্চনবর্ণ কপালে চিকচিক করছে কয়েকবিন্দু ঘাম। মুখ হা করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে সে। অপরাধ বোধের প্রাবল্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে হৃদয়। কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে যাওয়ার পর আকাশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে গলায় একটা নকল উচ্ছ্বাস টেনে এনে হাততালি দিয়ে উঠে বলল, 'সাবাশ ম্যান, ইউ ডিড ইট! কুডোস টু ইউ!'

ওর হাততালিতে সম্বিৎ ফিরল বন্ধুদের। বাকিরাও হাততালি দেওয়া শুরু করল। শুধু হৃদি কিছু বলল না। হাত তালিও দিল না। একটু কেমন লাজুক ভাবে বসে রইল চুপচাপ। বন্ধুদের উল্লাস দেখে সামির মুখ থেকে আস্তে আস্তে মেঘ সরতে লাগল। রুদ্র বলল, 'এক কাজ করি কালকে তো কাজী সাহেব আসতেছেই। আমরা তাহলে সামির সাথে হৃদিরেই বিয়া দিয়া দেই। খাওয়া দাওয়াটা মিস হবে না তাহলে।'

একথা শুনে সামির যেন হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেলো। টেবিলের ওপরে তাজা ফলসহ একটা ফলের ঝুড়ি রাখা ছিল। তার পাশে একটি চকচকে ফল কাটার ছুরি। সামি ত্রস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ করতে হবে।'

বন্ধুরা প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তাকালো ওর দিকে। সামি গম্ভীর গলায় বলল, 'কান কাটতে হবে! এমনটাই কথা ছিল।'

শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। যেন এমন মজার ঘটনা এর আগে কেউ কোনোদিন শোনেনি। সামি কিন্তু হাসল না। চকচকে রুপালি ছুরিটার দিকে অখণ্ড

মনোযোগের সাথে চেয়ে থেকে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল, ‘কান কাটার সহজ উপায় কী?’

হৃদি কয়েক পা এগিয়ে এসে সামির মুখোমুখি দাঁড়ালো। ছুরিটা টেনে নিল নিজের হাতে। নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর সামির ডান কানের ডগায় আলতোভাবে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়ে বলল, ‘কান দুটো আমার। যখন প্রয়োজন হবে তখন কেটে নিবোনে। এখন থাক!’

কথাটা শুনে সামি ঘোলা চোখে টানা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে চেয়ে রইল হৃদির দিকে। তারপর আচম্বিতে ওর ঠোঁটে এঁকে দিল একটি তপ্ত, প্রলম্বিত চুম্বন। বন্ধুরা হইহই করে উঠল। আনন্দে শিস দিয়ে উঠল রুদ্র। শুধু বিভা, কোনো এক দুর্বোধ্য গোপন কারণে পুরো দৃশ্যটা চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারল না। দৃষ্টি সরিয়ে নিলো চকিতে, অন্যদিকে। বুকে চিলিক দিয়ে উঠল এক চাপা যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই তার কাছে। সামির সাথে হৃদির প্রেমটা হয়ে যাক এটাতো সে মনপ্রাণ দিয়ে চাইছিল। তবে আজ কেন ওদের দুজনকে অমন অন্তরঙ্গভাবে দেখে তার বুক জ্বলছে অনর্থকভাবে?

নিজের জীবনে সে পরিপূর্ণভাবে সুখী। কখনো মুখ ফুটে বলেনি, কিন্তু সে জানে এবং মানে যে অভিজিৎকে সে ভালোবাসে। অমন একটা মানুষকে কি ভালো না বেসে পারা যায়? কিন্তু সামির সাথে অভিজিতের কোথায় যেন একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। সামি খেপাটে এবং উন্মত্ত প্রেমিক। প্রেমে পড়লে সে অন্ধ হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়। অন্যদিকে সুশীল, ভদ্র এবং অমায়িক অভিজিতের প্রেমের ধরনটাও ভারি মার্জিত। বইপড়ুয়া অভিজিতের কাছে ভালোবাসাটা যেন এক রুচিশীল, উঁচুদরের শিল্প। সামি যেরকম ডাকাতের মতো দুনিয়া জাহান ভুলে সবার সামনে হামলে পড়ে প্রেমিকার ঠোঁটে চুমু খেলো, অভিজিৎ এমনটা কখনো পারবে না। ভালোবাসবে নিবিড়ভাবে

কিন্তু ভালোবেসে পাগল হবে না, তারছেঁড়া হবে না, বৈরাগী হবে না। সামিটা পাগলাটে, নির্ভীক এবং জোরালো পুরুষ। প্রেমিক হলে, এরকমই হতে হয়। মনে হলো বিভার। কেন যে মনে হলো হঠাৎ, কে জানে!

– 'সামি!' বোমার মতো উড়ে এসে শব্দটা ফেটে পড়ল ঘরের মাঝে। রোমেলা আগুন ঝরা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডাইনিং এর দরজায়। হৃদি এক ঝটকায় দূরে সরে এলো সামির কাছ থেকে।

– 'তোমার বন্ধুদের বেরিয়ে যেতে বলো এ বাড়ি থেকে, এখুনি!'

হিম শীতল গলায় বললেন রোমেলা। পুত্রের চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে। সামিও যেন এরকম কিছু শোনার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ছিল। রোমেলা কথাটা বলে শেষ করা মাত্র সে একটুও সময় ব্যয় না করে দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার বন্ধুরা যদি বেরিয়ে যায় এত রাতে, তাহলে আমারও আর এ বাড়িতে থাকা হবে না!'

রোমেলা বললেন, 'তোমার কাছে যদি মায়ের চাইতে বন্ধুরা বড় হয়ে থাকে। তাহলে তুমিও বেরিয়ে যেতে পারো ওদের সঙ্গে। আমার কিছুই বলার নেই।'

মায়ের মুখ থেকে এ ধরনের নিষ্ঠুর এবং কঠোর কথা শোনার পর কোনো সন্তানেরই মাথা ঠিক থাকার কথা না। সামিরও থাকল না। সে অধৈর্য গলায় বলল, 'আম্মা প্লিজ! একটু বোঝার চেষ্টা করো!'

অমৃতা ফোড়ন কাটল মা ছেলের কথার মাঝখানে, 'সামি শোন, তুই থাক। আমরা আসছি।'

– 'কিন্তু তোরা যাবি কীভাবে এত রাতে? আচ্ছা চল তোদের নামায় দিয়ে আসি।' সামি বলল ব্যাকুল গলায়।

ছেলের কথা শুনে রোমেলা এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও উপহাসটা করতে ভুললেন না। টিটকিরি মেরে বলে উঠলেন, যাও তোমার বন্ধুদের যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো সসম্মানে। তুমি ছাড়া যে ওদের আর কোনো গতি নেই। একটা গাড়ির ব্যবস্থাও তো কেউ করতে পারবে না।'

সামি কড়া গলায় বলল, 'কথাটা ভুল। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে বলেই রাস্তাঘাটে কিছু পাওয়া যাবে না। নইলে ঢাকা শহরে যানবাহনের অভাব নেই।'

আকাশ বলল, 'কিছু পাওয়া যাবে না কেন? আমি উবার কল করতেছি। তোর যাওয়া লাগবে না।'

– 'আরে না, আমি থাকতে উবার ডাকবি কেন?' সামি মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দিল আকাশের সিদ্ধান্তটা।

ধুপধাপ শব্দে সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ডাইনিং এ প্রবেশ করলেন হক সাহেব। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন ঘরে উপস্থিত মানুষগুলোর

দিকে। তারপর সামির দিকে চেয়ে ভারি গলায় বললেন, 'তোমার সাথে কথা আছে। একটু শুনে যাও।' '

সামি বলল, 'বাবা আমি আমার বন্ধুদেরকে নামিয়ে দিতে যাচ্ছি। ফিরে এসে কথা বলছি। একটু অপেক্ষা করো।'

– 'এখন তো অনেক রাত। কাল সকালে যেও তোমরা। আজ থেকে যাও।'

– 'না আংকেল। আমরা এখুনি বেরোবো।' আকাশ মতামত জানালো। দৃঢ় গলায়।

হক এবার আর কোনো দ্বিরুক্তি করলেন না। একবার তাকালেন অমৃতার দিকে। তাকালো অমৃতাও। হক লক্ষ্য করেছেন থাপ্পড়টা খাবার পর মেয়েটার চোখে মুখে এক অবিমিশ্র অন্ধকার নেমে এসেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো মেয়েটা চুপচাপ অপমান হজম করেছে। প্রতিবাদ করেনি। এই সহনশীল আচরণ তাঁকে বিস্মিত করেছে। এখন ওই অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন মুখখানা দেখে তাঁর মনটা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেলো। মেয়েটি গত বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁকে নানাভাবে মানসিক শক্তি যুগিয়ে এসেছে। পুত্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। প্রতিদানে মেয়েটিকে তিনি কিছুই দিতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর স্ত্রী আজ মেয়েটিকে চরমভাবে অপমান করে ছাড়ল। একটা সুতীব্র অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো তাঁর ভেতরটা। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড অমৃতার দিকে চেয়ে থেকে তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিলেন। হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল অমৃতাও। কিন্তু যে কথাগুলো হারিয়ে যাবার জন্যেই নির্দিষ্ট, সে কথাগুলো অনর্থক মুখে উচ্চারণ করে কোনো লাভ নেই জেনেই হয়তো ওরা কেউ কিছু বলল না শেষ পর্যন্ত। না বলাই থাক। বলে ফেললেই কথাগুলোর প্রাণময় রূপখানি নষ্ট হয়ে যাবে।

গাড়িতে ওঠার সময় অমৃতার হঠাৎ চোখ পড়ল মূল গেটের পাশে প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা সুলেমানের দিকে। অন্য কারো দিকে নজর নেই তার। শুধু অমৃতাকেই কুটিল বক্র দৃষ্টি দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখছে ওই তীক্ষ্ণ দুটি চোখ।

কেন জানে না, আরো একবার নতুন করে বুক কাঁপলো অমৃতার লাইব্রেরি ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনার একমাত্র সাক্ষী সুলেমান। লোকটা যদি কাউকে কিছু বলে দেয়?

১৩

বসন্ত এসে গেছে। নগরের আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে থাকা শুকনো গাছের ডালপালায় উঁকি দিয়েছে নবীন পাতা। অলস দুপুরে কানে এসে লাগছে কোকিলের কুহুতান। বিকেলের দিকে হঠাৎ হঠাৎ বয়ে যাচ্ছে মন কেমন করা স্নিগ্ধ বাতাস।

হৃদির আব্বা আম্মা বলেছিলেন সামিদের বাসা থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া না হলে রাহাতের সাথে হৃদির বিয়েটা ক্যানসেল করা হবে না। কিন্তু হৃদি তার বাবা মায়ের আদেশ অমান্য করে অসীম সাহসিকতার একটা কাজ করে ফেলেছে। রাহাতকে সব খুলে বলেছে। রাহাত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকবান ছেলে। সম্পর্কটা খুব বেশি দূর এগোনোর আগেই হৃদি সবকিছু খোলামেলাভাবে জানিয়ে দিয়েছে বলে সে কৃতজ্ঞ হলো। তার পরিবার এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদার এবং বিচক্ষণ মানসিকতার পরিচয় দিল। অযথা উচ্চবাচ্য করে জল ঘোলা করল না তারা। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে হৃদির পক্ষে নিজের বাবা মায়ের সাথে এক ছাদের নিচে দিন কাটানো রীতিমতো অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। বাবা তার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলছেন না। মা উঠতে বসতে কথা শোনাচ্ছেন। সে এক দুঃসহ অবস্থা!

রোমেলা বিয়ে ভাঙার পরদিন হৃদির আম্মাকে ফোন করে যা তা কথা বলেছেন। তার ছেলের বিয়ে ভাঙার দায় সমস্তটাই তিনি চাপিয়েছেন হৃদির ঘাড়ে। হৃদির আম্মাও অবশ্য কম যান না। তিনিও দু চার কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন সামির কারণেই আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার পাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলো। দুই মায়ের তর্কযুদ্ধ চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক। ফোন রাখার পর হৃদির আম্মা ঘোষণা দিলেন যে, কোনোমতেই তিনি নিজের মেয়েকে ওই জল্লাদ মহিলার বাড়িতে বিয়ে দেবেন না।

এদিকে তানিশার বাবা মা সামির পরিবারকে চূড়ান্ত ভাবে অপমান করে ছাড়ল। সংসদ সদস্য এবং স্বনামধন্য শিল্পপতির একমাত্র পুত্রের বিয়ে ভেঙে যাবার ঘটনা কয়েকটি পত্রিকা ফলাও করে বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দিল। এর মাঝে দুটি সংবাদপত্র সামিকে কোটিপতির বখে যাওয়া ছেলে, মাদকাসক্ত এবং দুশ্চরিত্র বলে আখ্যায়িত করেছে। সংবাদটি ভুল। কারণ সামির জীবনে সিগারেট ছাড়া অন্য কোন নেশা নেই। মদ গাঁজা সে ছুঁয়েও দেখেনি কখনো। ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার জীবনে এসেছে শুধু দুজন নারী। দুই নারীই তার বন্ধু। দুজনকেই সে মন থেকে ভালোবেসেছে। তার ভালোবাসায় কখনো কোনো লাম্পট্য বা ছলচাতুরী ছিল না। বাবার পয়সা উড়ানোর মতো বাজে অভ্যাসটাও গত এক বছর যাবৎ সে পরিত্যাগ করেছে। অতএব এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মনগড়া। এরকম বানোয়াট খবর প্রকাশ হবার পেছনে যে তানিশার পরিবারের হাত আছে ষোলো আনা সে বিষয় জলের মতো পরিষ্কার। একমাত্র পুত্র সম্পর্কে এই মিথ্যে অপবাদ হক এবং রোমেলাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিল। যে পত্রিকাগুলো এই ভুল সংবাদ প্রকাশ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করছেন হক। এর মাঝেই দুজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়েছে। তানিশার বাবা মেয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। হক দম্পতি তার বাড়িতে গিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছেন। সামি নিজে অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু তানিশা এবং তার পরিবারের বরফ শীতল মন কিছুতেই গলছে না। ইতোমধ্যে কয়েকজন ভাড়া করা গুন্ডাকে উত্তরা বাসার সামনে টহল দিতে দেখা গেছে। উড়ো ফোন এসেছে বেশ কয়েকবার। জানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া

হয়েছে। হক সাহেব নিজের জীবনের ভয় করেন না। তিনি রাজনীতির লোক। তাঁর চারপাশে শত্রুরা সর্বক্ষণ প্রেতের মতো ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়ায়। এসব ঝুঁকি মাথায় নিয়েই বেঁচে আছেন তিনি। তবে তাঁর লোকবলের অভাব নেই। পার্টির মিটিং, সভা সমিতিতে তিনি নিজস্ব দেহরক্ষী সঙ্গে রাখেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের ওপর এর আগে কোনোদিন কোনো রকম হুমকি আসেনি। এই সমস্যাটা নতুন। ছেলেকে তিনি ঘরের বাইরে বেরোতে দিচ্ছেন না। থানায় জিডি করে রেখেছেন। তবুও দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া যাচ্ছে না। জোয়ান ছেলেকে কাঁহাতক ঘরবন্দি করে রাখা যায়? ঘরে থাকতে থাকতে ছেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। রোমেলা ছেলের বন্ধুদের সাথে মেলামেশায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে সামির বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ বন্ধ। বাড়ির বাইরে বেরোনোও বন্ধ। শেষমেশ ঠিক হলো বাড়ি থেকে বেরোতে হলে দুজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে।

আকাশের ইউনিভার্সিটিতে সেমিস্টার ফাইনাল চলছে। একটু ব্যস্ততার মধ্যেই কাটছিল তার দিন। তবে আজকাল তার আর কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে অতটা খারাপ লাগে না। ঝুমকির রান্নাটা ভালোই। বাড়ি ফিরে সে পেটপুরে ভাত খায়। ঘুমোতে যাবার আগে রোজ ঝুমকি গ্লাস ভর্তি দুধ ওর পড়ার টেবিলে রেখে যায়। মাঝে মাঝে হাতেও তুলে দেয় যত্ন করে। আকাশ আগের মতো ঝুমকিকে দেখে দূর দূর করে না। আগ্রহ নিয়ে ওর হাত থেকে গ্লাস তুলে নেয়। চুমুক দেয়। দেখে ঝুমকির চোখে জল আসে। ছেলেটা তাকে আর আগের মতো ঘেন্না করে না। তার শূন্য জীবনটা একটু একটু করে যেন ভরে উঠছে। আকাশ তাকে বাগান করার সরঞ্জামাদি কিনে দিয়েছে। এই ফ্ল্যাটের উত্তর দিকে একটা ছোট্ট ব্যালকনি আছে। সেই এক টুকরো বারান্দায় ঝুমকি এখন ফুলগাছ আর সবজির গাছ লাগিয়েছে। দুদিন হলো গোলাপ গাছে কলি এসেছে।

রুদ্রর আম্মা ঢাকায় আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারলেন না শেষ অবধি। হঠাৎ করেই তার এপেন্ডিক্সের ব্যথা উঠল। অপারেশন করা জরুরি হয়ে পড়ল। রুদ্র

দুদিনের ছুটি নিয়ে চলে গেলো চট্টগ্রাম। এর মাঝে বিভা আর অভিজিৎ ঘুরে আসলো বিভার খালার বাড়ি দোঘর থেকে, সপরিবারে। অভিজিতের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। বিভাকে এবার যেতে হবে। এবার যাবার পর আবার কবে নাগাদ ঢাকায় আসার সুযোগ পাবে সে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

সামির ডিপ্রেশনটা দিনদিন বেড়ে চলেছে। বাড়িতে মায়ের সাথে তার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। কাজকর্ম নেই। বাইরে বেরোলেই সর্বক্ষণ আশেপাশে দুজন বডিগার্ড ঘুরঘুর করছে। গেলো সপ্তাহে হৃদির সাথে দেখা করতে গিয়েছে বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে। ভারি বিরক্তিকর ব্যাপার। তানিশা প্রায়ই তাকে ফোন দেয়। ফোন দিয়ে ইচ্ছেমতো গালিগালাজ করে। সামি চুপ করে শোনে।

তাদের কোম্পানি থেকে প্রতি বছর এ সময় একটি ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। এ বছরও হচ্ছে। গতবছর সবাই গিয়েছিল নেপাল। এ বছর যাবে বান্দরবান। কোম্পানির প্রতিটি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর এই ট্যুরে অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। রোমেলা ফি বছর নিজের বোনদেরও সঙ্গে নিয়ে যান। এ বছরও নেবেন। সামি কখনোই এসব অফিসিয়াল ভ্রমণে বাবা মায়ের সাথে যায়নি। এবার হক একরকম জোরই করলেন ছেলেকে। তাঁর মনে হলো ছেলের এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় হাওয়া বদল আবশ্যিক। শুনে সামি শর্তজুড়ে দিল, যদি তার বন্ধুদের সাথে নেয়া হয়, তবেই সে যাবে। হকের আপত্তি না থাকলেও আপত্তি জানালেন রোমেলা। কিন্তু আপত্তিটা খুব বেশিক্ষণ টিকল না। শেষমেশ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি রাজি হলেন।

অমৃতার ব্যস্ততা নিছক কম নয়। সামনের মাসের শেষের দিকে তার সুপ্রিম কোর্ট নিবন্ধন পরীক্ষা। প্র্যাক্টিসের পাশাপাশি পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে হচ্ছে সমান তালে। চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। পড়তে হয় রাত জেগে।

কিন্তু অমৃতা আর আগের মতো শুধু কাজপাগল মেয়েটি নেই। পড়তে পড়তে সে আজকাল হঠাৎ করেই আনমনা হয়ে যায়। পড়া ফেলে ইউটিউবে টক শো দেখে। একই শো বার বার দেখে। লোকটার খুব সাধারণ কথাও তার কাছে অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হয়। আচ্ছন্ন হয়ে শোনে সে, বিভোর হয়ে দেখে। এক অদম্য মুগ্ধতার সঞ্চার হয় তার মনে। বুক দুরুদুরু করে। কষ্ট কষ্ট একটা অনুভূতি হয়। বৃষ্টির দিনে একলা বসে মেঘলা আকাশের দিকে চুপচাপ চেয়ে থেকে মানুষটার কথা ভাবতে তার ভালো লাগে।

সেদিনও সন্ধে থেকে টানা বৃষ্টি। বারান্দায় বসে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ কবিতার কয়েকটি লাইনে চোখ আটকে গেলো। অমৃতা একেবারেই কবিতা পড়া মেয়ে না। কিন্তু এই কবিতাটির লাইনগুলো যেন ড্যাবড্যাব করে তার দিকেই চেয়ে আছে। এ কবিতা যেন তার জন্যেই লেখা। লোকটা সেই রাতে লাইব্রেরি ঘরে বলেছিল যে, অমৃতা যেন আর কখনো তার সাথে কোনরকম যোগাযোগ না করে। অমৃতা কথা রেখেছে। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু সেদিন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল সে। কবিতার পঙক্তিগুলো কপি পেস্ট করে মানুষটার ফোন নম্বরে পাঠিয়ে দিল।

হক সাহেব একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে মাত্র বাড়ি ফিরেছেন। গাড়ি থেকে নেমেছেন সদ্য। সাথে আছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র। এমন সময় টুং করে মোবাইলের মেসেজ টোন বেজে উঠল। ফোন হাতে নিয়ে তিনি দেখলেন অমৃতার নম্বর থেকে বার্তা এসেছে। গত সপ্তাহটা এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর ব্যস্ততার মাঝে কেটেছে যে মেয়েটার কথা তিনি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। গতকাল মানহানির মামলা সংক্রান্ত কাজে জর্জ কোর্ট যেতে হয়েছিল একবার। কোর্ট পাড়ায় ঢুকতেই মেয়েটিকে খুব করে মনে পড়ল। কোথায় আছে, কেমন আছে, তা একটিবারের জন্য জানতে ইচ্ছে করছিল খুব। আজকে মেসেজটা পেয়ে তিনি বাড়ির দিকে আর পা বাড়ালেন না।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হেঁটে চলে এলেন লাইব্রেরি ঘরে। ঘরের বাতি নেভানো। তিনি অন্ধকারে বসলেন খোলা জানালার পাশে। অমৃতা লিখেছে,

পরের জন্মে বয়স যখন ষোলোই সঠিক,

আমরা তখন প্রেমে পড়বো,

মনে থাকবে?

বুকের ভেতর মস্তবড় ছাদ থাকবে,

শীতলপাটি বিছিয়ে দেবো,

সন্ধ্যে হলে বসবো দু' জন।

একটা দুটো খসবে তারা,

হঠাৎ তোমার চোখের পাতায় তারার চোখের জল গড়াবে,

তখন আমি চুপটি করে দুচোখ ভরে থাকব চেয়ে

মনে থাকবে?

বৃষ্টির তোড় বাড়ছিল। শব্দ করে বাজ পড়ল কয়েকবার। জানলা গেলে আসা উতলা বাতাসে টেবিলের ওপর রাখা কাগজ উড়তে থাকল খসখস শব্দে। তিনি মেয়েটার পাঠানো কবিতার লাইনগুলো পড়তে পড়তে নিজের অজান্তেই হেসে উঠলেন। কী ভীষণ ছেলেমানুষি কথাবার্তা! হাসলেন ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা কারণে তার মনটা কেমন উদাস হয়ে উঠল। তিনি শেষের কয়েকটা লাইন আবার পড়লেন।

এই জন্মের দূরত্বটা পরের জন্মে চুকিয়ে দেবো,

এই জন্মের মাতাল চাওয়া পরের জন্মে থাকে যেন!

আমার অনেক কথা ছিল,

এ জন্মে তা যায় না বলা,

বুকে অনেক শব্দ ছিল

সাজিয়ে গুছিয়ে তবুও ঠিক

কাব্য করে বলা গেলো না!

–(কবি-আরণ্যক বসু)

১৪

থানচি পৌঁছুলো ওরা ছ' টা নাগাদ। তখনো সন্ধে পুরোপুরি নামেনি। নামব নামব করছে। ধোঁয়াটে মেঘে মেঘে আবীর রঙ ছড়িয়ে দিয়ে চিম্বুক পাহাড়ের পেছনে অস্ত যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দিনমণি। বসন্ত বাতাস প্রাণ স্পন্দনে ভরপুর! ভ্রমণের জন্য এর চেয়ে উত্তম দিন বুঝি আর হয় না!

বান্দরবান থানচি সড়কের পাশ ঘেঁষে প্রায় আঠারোশ ফিট উপরে অবস্থিত যে রিসোর্টটিতে ওরা এলো, সে রিসোর্টটি এক কথায় নান্দনিক। বর্তমান বাংলাদেশের অভিজাত রিসোর্টগুলির মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির প্রায় আশিজন লোক আজ রাতের মধ্যেই উপস্থিত হবার কথা এখানে। এখনও অবশ্য কেউ এসে পৌঁছয়নি। বন্ধুরা সবার আগে রওয়ানা দিয়েছে এবং আগেই এসে পড়েছে। বান্দরবান শহর থেকে জিপ গাড়ি করে রিসোর্টে পৌঁছুতে সময় লেগেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সামি নিজের গাড়ি আনতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবা তাকে অনুমতি দেননি। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোটা ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে বলে এই নিষেধাজ্ঞা। নিজস্ব গাড়ি আনলে অবশ্য খুব একটা সুবিধাও হতো না। কারণ এই যাত্রায় তাদের দলের সদস্য একজন

বেড়েছে। অভিজিৎ। সামির গাড়িতে ঠেসে ছয়জন এঁটে গেলেও সাতজন কোনো রকমেই আঁটানো সম্ভব না।

রিসোর্টের ড্রাইভওয়েটি বেশ লম্বা এবং বড়। ওরা জিপ গাড়ি থেকে নামতেই দুজন সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে এলো। লাগেজ বলতে খুব বেশি কিছু নেই ওদের। সবার হাতে একটি করে ব্যাকপ্যাক। সিকিউরিটির লোক ব্যাগগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে চাইল বিনয়ের সাথে। বন্ধুরা কেউ অবশ্য ব্যাগ হস্তান্তর করল না। গেটের সামনে থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি পেরোনোর পর রিসিপশন রুম। বিশাল বড় হলঘর। আধুনিক সাজসজ্জা। ঠান্ডা একটা ভাব। এতদূর জার্নি করে আসবার পর ওই শীতল ভাবটায় সবার মনপ্রাণ একদম জুড়িয়ে গেলো। দু দিনের জন্য সামিদের কোম্পানি এই পুরো রিসোর্টের বিশটি কটেজ রিজার্ভ করে ফেলেছে। বন্ধুরাই প্রথম অতিথি। বাকিরা পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হবে হয়তো! বন্ধুদের জন্য একটি কটেজের তিনটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। একটা বিভা আর অভিজিতের। বাকি দুটো ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি করে নেবে।

প্রায় বারো একর জমির ওপর তৈরি রিসোর্টটিতে কটেজগুলো বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাহাড়ি এলাকা বিধায় কটেজগুলির কোনোটির অবস্থান উঁচুতে আবার কোনোটির নিচুতে। এক কটেজ থেকে অন্য কটেজে যেতে বেশ অনেকখানি পথ হাঁটতে হয়। প্রতিটি কটেজের চারপাশে আছে ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষ রাজি। কটেজের ভেতরে অবস্থানরত পর্যটকদের মনে হবে যেন তারা গভীর জঙ্গলের ভেতর কোনো শান্ত সুনিবিড় কুটিরে বাস করছে। রিসিপশন রুম থেকে কটেজ পর্যন্ত যাবার জন্য রয়েছে চার চাকার গো কার্ট। অতিথিদের লাগেজ নিয়ে হাঁটতে যেন কষ্ট না হয় সে কারণেই গো কার্টের ব্যবস্থা। বিভা ছাড়া অন্য কেউ অবশ্য কার্টে উঠতে চাইল না। সবাই হাঁটতে চায়। অগত্যা বিভাকেও হাঁটতে হলো। সরু পিচঢালা পথ দুপাশে সবুজ গাছের ঝোপ নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে উড়ছে পাখি, ডাকছে টিউ টিউ শব্দে।

হৃদির পরনে আড়ং থেকে কেনা বাদামি রঙের একটা ঘেরওয়ালা কুর্তা ছিল। সাথে কালো জিন্স। কোমর পর্যন্ত গড়ানো লম্বা চুলগুলো মুড়িয়ে বড় একটা খোঁপা করেছে সে। চোখে ক্লান্ত ভাব। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। এমন কি পাউডার পর্যন্ত না। তবে সহজাত ঈশ্বর প্রদত্ত প্রসাধনীতে তার মুখখানা সর্বদা এক সরল সৌন্দর্যে টইটম্বুর হয়ে থাকে। এখনো আছে!

বিভা পরেছে একটি হালকা সবুজ রঙের কোমর অবধি টপ আর কালো কাপড়ের প্যান্ট। তার চোখে সবুজ আর রুপালি রঙের আইশেডো। পাঁপড়িতে মাশকারার ছোঁয়া। গালে ব্লাশন। এত লম্বা জার্নির পরেও তাকে দেখতে একটুও ক্লান্ত লাগছে না। সে সর্বদাই নজরকাড়া সুন্দরী, গ্ল্যামারাস!

অমৃতার গায়ে ছিল লাল সাদা চেকের ঢলঢলে ফুল হাতা শার্ট। মাত্র গতকাল সে চুল কাটিয়েছে পার্লার থেকে। যে মেয়েটি চুল কেটে দিয়েছে সে বলেছে এই বিশেষ স্টাইলের কাটকে নাকি বলা হয় ডায়না কাট। প্রিন্সেস ডায়নার চুলের ধরন এমন ছিল।

হৃদি চুইংগাম চিবোতে চিবোতে বলল, 'আল্লাহ, জায়গাটা না অনেক জোশ!'

হাঁটতে হাঁটতে রুদ্র তার খোলা চুলগুলোতে চিরুনির মতো হাত বুলাচ্ছিল। তার অন্য হাতে ধরা গিটার, কাঁধে ব্যাকপ্যাক। 'জায়গাটা অনেক এক্সপেন্সিভ কিন্তু। সামির জন্যেই আসা হইল।' এটুকু বলে একটু থেমে সে আবার গদগদ গলায় হৃদিকে বলল, 'তোর তো ভালোই হইল। এখন সামির বাপ মা রাজি হইয়া গেলেই কাহিনি খতম। প্রতি মাসে মাসে এরকম ট্যুর দিতে পারবি।'

রুদ্রর কথাটা শুনে হৃদি পেছন ফিরে তাকালো ওর দিকে। হাঁটা থামাল না। উল্টো পায়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলল, ‘এটার মানে কী?’

– ‘মানে সিম্পল। সামির বাপ মা রাজি হয়ে গেলে তোদের বিয়েটা হয়ে যাবে। তারপর যখন তখন যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যাইতে পারবি। টাকা পয়সা তোদের জন্য কোনো ব্যাপার হবে না। আমেরিকা চইলা আসবি আমারে দেখতে।’

হৃদি এবার থামল। রুদ্রর সহজ স্বাভাবিক নির্লিপ্ত মুখটার দিকে কয়েক সেকেন্ড ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল। ওর ওই নিষ্পলক চেয়ে থাকা দেখে রুদ্রও হাঁটা থামালো। থামল সামি আর অমৃতাও। আকাশ, বিভা আর অভিজিৎকে অবশ্য থামতে দেখা গেলো না। রিসিপশনের লোকটার দেখানো পথ ধরে হেঁটে যেতে থাকল ওরা।

হৃদি বলল, ‘তুই এটা কেমন কথা বললি রুদ্র?’

রুদ্র অবাক, ‘ভুল কিছু বললাম কি?’

হৃদির একটা হাত নিজের অজান্তেই কোমরে উঠে গেলো, তিরিক্ষি গলায় বলল, ‘সামির বাপ মা রাজি হয়ে গেলেই কাহিনি খতম, এই কথা দিয়া তুই কী বুঝাইতে চাইলি? সামির বাপ মায়ের মতামতই সব? আমার বাপ মায়ের মতামতের কোনো দাম নাই?’

রুদ্র একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। হৃদি যে তার বলা সোজাসাপটা কথাগুলোর এহেন বিপ্রতীপ, কুটিল অর্থ দাঁড় করাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বিস্মিত গলায় বলল, 'আমি কি সেটা বলছি?'

– 'সেটাই তো বললি তুই।' কথাটা বলে হৃদি অমৃতার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'কী অমৃতা? রুদ্রর বাচ্চার কথা শুইনা তোর কী মনে হইছে?'

অমৃতা ইতস্তত করে বলল, 'আরে ও এত কিছু চিন্তা কইরা বলে নাই। ড্রপ ইট দোস্ত। ও ইঞ্জিনিয়ার হইলে কী হবে? আসলে একটা আস্ত গাধা।'

সামি বলল, 'এত রেগে যাবার কী হইল? তুই ওভার রিঅ্যাক্ট করতেছিস ক্যান?'

হৃদির মুখ থেকে তিরিক্ষি ভাবটা তখনো গায়েব হয়নি। সে আগের মতো খ্যাপাটে গলায় বলল, 'মানে রুদ্র বুঝাইতে চাইলো যে আমার বাবা মায়ের ডিসিশনের কোনো দাম নাই। কারণ আমার বাপের তো সামির বাপের মতো অত টাকা নাই। আর সামির সাথে বিয়ে হইলে আমি নামি দামি জায়গায় ঘুরতে যাইতে পারব। কারণ সামি বড়লোকের ছেলে। আর আমি তো ফকিরের মাইয়া, এইজন্যে আমি নিজের টাকায় কোথাও যাইতে পারব না।'

রুদ্র চোখ কপালে তুলে বলল, 'সিরিয়াসলি! দোস্ত ইউ আর রিডিকিউলাস! মানে আমি তো এত কিছু চিন্তা কইরা বলিনাই। আরে আজিব!'

– 'তোর অবচেতন মন এসব চিন্তাই করতেছে। তাই মুখ ফসকে বলে ফেলছিস। ক্লিয়ার!' চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করল যেন হৃদি।

সামি হৃদির দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'তোর প্রব্লেম কী? এত মিন কেন তুই? কুটনামি করতেছিস কেন?'

– 'লিসেন আমি কোন কুটনামি করতেছি না। একটা কথা তুই কান খুইলা শুইনা রাখ। আমার ফ্যামিলিকে যদি তোরা ডিউ রেস্পেক্ট না করিস তাহলে আমিও তোর ফ্যামিলিকে দুই পয়সার পাত্তা দিব না। আমার বাবা মা ভাইসা আসে নাই।'

সামি খ্যাক দিয়ে উঠল, 'আজাইরা কথা বলতেছিস ক্যান?'

– 'তুই জানিস তোর মা সেদিন আমার মারে কী বলছে টেলিফোনে?'

– 'উফ! আবার শুরু হইল! হৃদি ফর গড সেক তুই কি এইসব টপিক দুইটা দিনের জন্য অন্তত ভুলতে পারবি?'

– 'আমি অপমানটা কিছুতেই ভুলতে পারতেছি না।'

সামি অমৃতার দিকে চেয়ে অসহায় গলায় বলল, 'এই মেয়েটারে একটু সামলা দোস্ত। এর সমস্যা কী আমি বুঝতেছি না।

হৃদির চোখ দুটো একটু ছলছল করছিল। আর কেউ না বুঝলেও অমৃতা বোঝে ওর অভিমানের জায়গাটুকু। রুদ্রর সত্যই এভাবে বলা উচিত হয়নি। রুদ্রটার বাস্তবজ্ঞান কবে যে হবে তা একমাত্র খোদা জানেন। অমৃতা হৃদির পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'বাদ দে। অবশ্যই তোর ফ্যামিলির মতামতের গুরুত্ব আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই শুধুশুধু রাগ করিস না।'

সামি হিংস্র স্বরে বলল, 'মানে ঝগড়াইট্টা একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতেছি আমি। বালের কপাল আমার। তানিশার মতো সুন্দর মেয়েরে ছাইড়া এই ঝগড়াইট্টার সাথে আসছি এখন ভ্যাকেশনে।'

হৃদি ভস করে জ্বলে উঠল দিয়াশলাই কাঠির মতো। জ্বলতে জ্বলতে বলল, 'তোর মতো কুত্তা আমি আমার জীবনে আর দুইটা দেখি নাই। হারামজাদা, তানিশা সুন্দর আর আমি কি বান্দর?'

– 'তুই বান্দর দেইখাই তো তোর সাথে বান্দরবান আসছি। বুঝস না?' এবার সামির গলায় ঠাট্টার সুর।

হৃদির অবশ্য এখন ঠাট্টা বোঝার মতো অবস্থা নেই। কিছুক্ষণ আগুন চোখে সামির দিকে চেয়ে থেকে আর একটাও কথা না বলে সে ঘুরে দাঁড়ালো। গটগটিয়ে হেঁটে যেতে লাগল সামনে।

রুদ্র এগিয়ে গিয়ে হৃদির হাত চেপে ধরল পেছন থেকে। অনুনয় করে বলল, 'শোন! আমি আসলে বুঝি নাই যে কথাটা তোকে এত হার্ট করবে। দোস্ত প্লিজ, ফানিমুনে আইসা এরকম রাগারাগি করলে তো ভাল লাগে না।'

হৃদি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুদ্রর হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। চিৎকার করে বলল, ‘হাত ছাড়! ফালতু কোথাকার!’

রুদ্র হাত ছাড়ল না। হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতেই বলল, ‘ভুল হইছে দোস্ত। মাফ কইরা দে।’

হৃদি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, ‘এত সহজে তো মাফ হবে না।’ রুদ্রর করুণ মুখটা দেখে মনে হলো অনুতাপের ঠ্যালায় সে মারা যাচ্ছে। -’প্লিজ দোস্ত। ভুল কথা বলে ফেলছি। তোর বাবা মা হইল আসল সর্দার। উনারাই রাজা রাণী। উনারা হইল ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মালানিয়া ট্রাম্প! আজকে থেকে এইটা আর ভুলব না!’

– ‘কানে ধর!’

রুদ্র চমকে উঠল, ‘কী?’

– ‘মাফ পাইতে চাইলে কানে ধর। নইলে মাফ হবে না।’

– ‘এইটা কোনো কথা হইল?’

– ‘এইটাই কথা!’

রুদ্র আশেপাশে তাকালো একবার। রিসোর্টের কর্মচারীরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম অবস্থায় কান ধরে উঠবস করাটা একেবারেই সমীচীন হবে না। সে বলল, ‘আচ্ছা কান ধরবো। এখন না। পরে।’

হৃদি ‘তাহলে মাফ করাও পরে হবে।’ বলে হাঁটা ধরল।

১৫

জানালার কাচ তুলে দিয়েছিল বিভা। তুলতেই এক থোকা মেঘ ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসলো ঘরের ভেতর। সেই সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিচিরমিচির পাখির ডাক আর বাসন্তী হাওয়া। ঘরটা চারকোণা। আধুনিক ডিজাইনের একটি ডাবল খাট ঘরের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। খাটের ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধবধবে সাদা রঙের বেডকাভার, বেডশিট এবং বালিশ। খাটের পাশে একটি লম্বা চমৎকার দেখতে ল্যাম্পশেড। দখিনের দেওয়ালে বড়সড় একটি এল ই ডি টিভি। খাটের সামনের মেঝেতে পাতা আছে লাল, সবুজ এবং হলুদ রঙের ডোরা কাটা ছোট একটি কার্পেট। কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তেপায়া কালো রঙের কাঠের ভারি টেবিল। টেবিলের ওপর শ্বেতপাথরের মোমদানী। দানীতে রাখা সেন্টেড মোম। মোমবাতি জ্বলছে আর ঘরময় একটা ফুলেল সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে।

– ‘চমৎকার! হানিমুনের জন্য এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর হতেই পারে না।’ বিভা বলল, বুকভর্তি মুগ্ধতা নিয়ে।

অভিজিৎ হাতের ব্রিফকেসটা টেবিলের ওপর রাখল। চেয়ারে বসে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে মুচকি হেসে বলল, ‘হানিমুন? নাকি ফানিমুন?’

বিভা বলল, 'দুটাই! আমি কতটা লাকি চিন্তা করতে পারো? হানিমুন আর ফানিমুন দুটাই একসাথে করছি।'

বিভা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সম্মুখে পাহাড় চূড়ো। সবুজাভ পাহাড়ের মাথার ওপর সূর্যদেব এখন দিনের শেষ আসনে অধিষ্ঠিত। নীল মেঘের পালে আগুন লেগেছে। আকাশের ফিরোজা বুকের ওপর দিয়ে সেই আগুন লাগা মেঘেরা সাঁতার কাটছে নিরুদ্দেশ ভাবে। একঝাঁক সবুজ টিয়া পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে ডিমের কুসুমের মতো গোল নরম সূর্যটার দিকে।

পাহাড়ের কাছাকাছি এসে বিভার খুব ডুয়ার্সে ফেলে আসা তার ছোট্ট সংসারটির কথা মনে পড়ছিল। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল বাগানের গোলাপগুলো, পোষা পায়রাগুলো কেমন আছে। কেমন আছে উঠোনের মাঝখানের তুলসীগাছটা, নিজের ঘরে প্রিয় কাপড়চোপড়ে ঠাসা কাঠের আলমারিটা। মনে পড়ছিল রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিল, চায়ের কাপ, ডাইনিং টেবিলের ক্লথ আরও অনেক খুঁটিনাটি জিনিসের কথা। আসলে, বাঙালি মেয়েদের প্রথম ভালোবাসা হলো সংসার। পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে ছুটে যাক না কেন, সংসারটা তাকে চুল বাঁধার কাঁকড়ার মতোই আঁকড়ে ধরে রাখে সর্বক্ষণ

অভিজিৎ ঠান্ডা টাইলসের মেঝেতে পা ফেলে হেঁটে এসে দাঁড়ালো বিভার কাছে। পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে চিবুকটা রাখল ওর কাঁধের ওপর। ঘরের ভেতর বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া টুকরো মেঘটা তখন ভারি নিশ্চিন্তে ওদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মেঘের ভেজা স্পর্শ, মোমবাতির ফুলেল সুগন্ধ, আর সম্মুখের ওই রক্তিম পাহাড়ি সূর্যাস্ত ওদের দুজনের মনের আকাশে মখমলের মতো রেশমি, নরম এবং পবিত্র একটি অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল ধীরেধীরে।

অভিজিৎ চাপা গলায় বলল, 'আজ সকালে মা ফোনে কী বলছিল জানো?'

– ‘কী বলছিল?’

– ‘বলছিল যে তার একটা জুনিয়র অভিজিৎ চাই।’

বিভা হাসল, ‘জুনিয়র অভিজিৎই হতে হবে? জুনিয়র বিভা হলে হবে না?’ অভিজিৎ বিভার সুন্দর সিল্কি চুলের গোছায় মুখ ডুবিয়ে বলল, ‘আমার তো একটা ছোট্ট বিভাই চাই।’

বিভার বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করছিল। এতকাল তার শাশুড়ি মা এ ব্যাপারে হরহামেশাই কথা বলে এসেছেন। কিন্তু অভিজিতের মুখ থেকে এমন কিছু এই প্রথম শুনল সে। মা হবার মতো সময় কিংবা সাহস কোনোটিই এখনো তার হয়ে উঠেছে কিনা তা নিয়ে ষোলো আনা সন্দেহ আছে। কিন্তু সত্যই যদি এমনটা হয়? তার শরীরের ভেতরে আরেকটা শরীর! একদম নিজের একটা মানুষ! ভাবতেই তার হাত পা কেমন শিরশির করে উঠল।

বিভা ঘুরে দাঁড়ালো। ধারালো বাতাস ওর খোলা চুল উড়াচ্ছিল পূর্ণ উদ্যমে। সে অভিজিতের বুকের ওপর মাথাটা আলতোভাবে রেখে বলল, ‘আমার ছোট্ট অভিজিৎ চাই। বোকা বোকা ভালোমানুষী চেহারার বাচ্চা একটা অভিজিৎ।’

– ‘না, আমার বিভাই চাই। ছোট্ট বিভার নাম রাখব আশাবরী।’

বিভা নাক কুঁচকে ফেলল, ‘আশাবরী? ইশ ভীষণ খ্যাৎ নাম।’

– ‘খ্যাৎ হবে কেন? বিভাবরীর মেয়ের নাম হবে আশাবরী। এটাই তো পারফেক্ট ম্যাচ।’

– ‘পারফেক্ট ম্যাচ না ছাই। আচ্ছা শোনো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। রিসোর্টে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। চলো কিছু খাব।’

– ‘এখনই যাবে? চান করে নিই? একটু অপেক্ষা করো সোনা।’

অগত্যা বিভাকে অপেক্ষাই করতে হলো। বাথরুমটা দারুণ অত্যাধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত। ডিম আকারের চমৎকার বাথটাব। বাথটাবের পাশেই কাচের জানালা। জানালার ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি সবুজ। সাবান সুগন্ধি ফেনা ওঠা গরম জলে ডুবে থেকে সবুজের মায়াজাল দেখতে ভারি চমৎকার লাগে। বিভা নিজেও স্নান করে নিল। জামা পাল্টে পরলো একটা সমুদ্র নীল রঙের শাড়ি। চুল শুকিয়ে নিল ড্রায়ার দিয়ে। ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে নতুন করে সাজল আবার। নীল কাজল পরলো চোখে। কানে পরলো নীল পাথরের দুল, গলায় নীল পাথরের পেন্ডেন্ট। অভিজিৎ এই পুরো সময়টা সোফায় বসে বসে নিবিড় চোখে দেখল ওকে। বিভার এই যত্ন করে নিজের সুন্দর মুখটাকে আরো বেশি সুন্দর করে তোলার গোটা প্রক্রিয়াটা চুপচাপ বসে দেখতে তার ভালো লাগে। মেয়েটা জীবনে দুটা জিনিসই সবচেয়ে ভালো পারে। নাচ আর সাজগোজ!

১৬

বিভা আর অভিজিৎ রেস্টুরেন্টে এসে দেখল বন্ধুরা আগে ভাগেই একটা টেবিল দখল করে বসে আছে। রিসোর্টের অতিথিরা ছাড়াও এই রেস্টুরেন্টে বাইরের লোকজন

এসে খাওয়াদাওয়া করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শুধু রেস্টুরেন্ট ছাড়া রিসোর্টের অন্য কোনো স্থান ঘুরে দেখার অনুমতি নেই।

বিভাকে দেখামাত্র সামি বলে উঠল, 'আরে বাহ্! তোকে অনেক সুন্দর লাগতেছে তো!'

কথাটা খুব সাধারণ। এর আগে কতবার কতভাবে যে সামি বিভাকে সুন্দর বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজ অভিজিতের পাশে দাঁড়িয়ে সামির করা আচমকা প্রশংসাটা বিভাকে একটু বিব্রত করে তুলল। সে চকিতে একবার তাকালো অভিজিতের দিকে। অভিজিৎ হাসল। সেই হাসিতে একটা আস্থার আভাস ছিল। যে আভাসটা বিভার ভালো লাগল। আর ওদিকে সামি কথাটা বলেই নিজের নতুন কেনা আইফোন ইলেভেন প্রো ম্যাক্স এ চোখ ডুবিয়েছে। সে লক্ষ্য করল না যে হৃদির মুখে ভাসতে থাকা কালো ছায়াটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। সামি সবসময় যেভাবে তানিশা এবং বিভার রূপের প্রশংসা করে ঠিক সেভাবে হৃদির প্রশংসা কোনো কালেই করেনি।

আকাশের ঠোঁটে অনেকক্ষণ যাবৎ একটি স্ফীত হাসি চিকচিক করছে। তার পরনে একটা ফুলহাতা মেরুন রঙের শার্ট। গালের দাড়ি কামানো। আজ তার মন মেজাজ বেশ ফুরফুরে বলে মনে হচ্ছে। অমৃতা ওর হাসিটা লক্ষ্য করছিল। একসময় প্রশ্নটা করেই ফেলল সে, 'কাহিনি কী? সেই তখন থেকে ব্যাক্কলের মতো হাসতেছস ক্যান?'

আকাশ মুখে হাসিটা বজায় রেখেই বলল, 'পেছনে তাকায়া দ্যাখ।'

অমৃতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটি লাল জর্জেট কাপড়ের সালওয়ার কামিজ পরা মেয়ে একদম একলা বসে আছে একটি টেবিল দখল করে।

– ‘শুরু হয়ে গেলো?’ অমৃতার কণ্ঠে বিরক্তি।

– ‘এই মাইয়ারে আমি আগে দেখছি। তুই কেন নজর দিতেছিস?’ রুদ্র বলল, প্রতিবাদী গলায়

মেয়েটি গালে হাত দিয়ে উদাস নয়নে জানালার বাইরে চেয়ে আছে। তার চোখা নাক, বড় চোখ, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। সামিও দেখল মেয়েটিকে ঘাড় ঘুরিয়ে। বলল, ‘ভালোই তো। বেশ একটা কবি কবি ভাব আছে।’

রুদ্র চোখমুখ অদ্ভুত বানিয়ে বলল, ‘বলিস কী? আসলেই? আমি কোনোদিন কবি দেখি নাই। কবিরা এমন হয় দেখতে?’

তিন বন্ধু অতি মনোযোগের সাথে মেয়েটিকে দেখছিল। অভিজিৎ ওদের কাণ্ড দেখে মিটমিটিয়ে হাসছে। বিভা অভিজিতের হাসি দেখে বলল, ‘এরা জন্ম থেকেই লুনুষ। যেখানে যাবে সেখানে লুনুষগিরি করবে। বুঝছ?’

অভিজিৎ বৌয়ের কথা শুনে আরো বেশি হাসতে লাগল। কেঁপে কেঁপে। খানিক বাদে মেয়েটির টেবিলে খাবার চলে এলো। সাদা ভাত, ডাল আর গরুর মাংস। খাবার দেখে মেয়েটির ধ্যান ভাঙল। কবি কবি ভাবটা উধাও হলো মুখ থেকে। অতি যত্নের সাথে ফুলহাতা কামিজের হাত গুটিয়ে নিলো সে। তারপর গভীর মনোযোগ দিয়ে

শুরু করলো খাওয়া। মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে লোকমা বানিয়ে মুখে পুরল, কাঁচামরিচ আঙুলে তুলে দিল জব্বর কামড়। তারপর কচকচ শব্দ তুলে চিবোতে লাগল। খাওয়ার দমক দেখে আকাশ একদম হা হয়ে গেলো। এত সুন্দর একটা মেয়ে যে এমন হাপুসগুপুস করে খেতে পারে এটা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। রুদ্র আড়চোখে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘এটা কি মেয়ে নাকি রাক্ষস?’

আকাশ হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। বিস্মিত গলায় বলল, ‘মনে হচ্ছে রাক্ষস। হাতি ঘোড়া সব খেয়ে ফেলবে!’

অমৃতা বলল, ‘কেন আমার তো ওর খাওয়ার স্টাইলটা বেশ ভালো লাগতাছে। অনেক ডেডিকেটেড সে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। রুদ্রর মতো। রুদ্র তোর সাথে মানাবে খুব।’

রুদ্র বলল, ‘মরে গেলেও আমি এরকম রাক্ষস মেয়ের সাথে প্রেম করব না। আমার খাবার সব খেয়ে ফেলবে। আমি খাব কী? ‘

বন্ধুদের টেবিলেও খাবার চলে এলো কিছুক্ষণের মাঝে। গলদা চিংড়ি, মুরগির মাংস, লইট্টা ফ্রাই, সাদা ভাত আর ডাল। সন্ধ্যার সময়ই পুরোদস্তুর ডিনার হয়ে যাচ্ছে।

গলদা চিংড়ি সাতটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। রুদ্র তার পাতে প্রথম দফায়ই দুটো তুলে নিল। এই দৃশ্য দেখে রেগে গেলো অমৃতা।

– ‘এই খাদকের বাচ্চা। দুইটা নিছস ক্যান। সবার ভাগে একটা।’

রুদ্র খেতে খেতে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি সকাল থেকে কিছুই খাই নাই। তাই আমার এখন একটু বেশি খাওয়া লাগবে।'

কিন্তু রুদ্রর কথা কে শোনে, আকাশ ছোঁ মেরে তুলে নিল চিংড়িটা নিজের প্লেটে। রুদ্রও দমবার পাত্র নয়। আকাশের প্লেট থেকে পুনরায় ছিনিয়ে নিল সে চিংড়ি মাছ। দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। ঝোল ছিটকে গিয়ে পড়ল হৃদির কুর্তায়। হৃদির মেজাজ আগে থেকেই খারাপ আজ। এই মুহূর্তে ঝোলের ছিটা খেয়ে তার মধ্যে যেন একটা আগ্নেয়গিরি ঘটে গেলো। সে গলা ফাটানো চিৎকার করে বলে উঠল, 'কুত্তার বাচ্চা! এত বড় সাহ হ হ স স!' রেস্টুরেন্টে উপস্থিত লোকজন বড় বড় চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। এমন কি কবি মেয়েটাও খাওয়া থামিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। রুদ্র আর আকাশের চিংড়ি মাছের যুদ্ধ গেলো থেমে।

১৭

খাওয়া দাওয়ার পর ওরা রেস্টুরেন্টের ওপেন টেরেসে এসে বসল। বিভা আর অভিজিৎ অবশ্য বসল না। আশপাশটা ঘুরে দেখতে বেরোলো। টেরেসের চারদিক খোলা। দিগন্ত জোড়া অন্ধকার রূপের ঝাঁপি খুলে বসেছে। সাদা পেঁজাতুলো মেঘ ভেসে ভেসে উড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের মাথায়। টেরেসের ওপর কুয়াশার মতো সাদা যে আস্তরটা ওদের ঘিরে রেখেছে ওটা আদতে কুয়াশা নয়, মেঘ। নিচে সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে সাঙ্গু নদী। অন্ধকারেও ওই বয়ে চলা নদীর ঢেউ দূর থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে। ঝিঁঝি পোকার ঝংকার বেজে চলেছে অনবরত। টেরেসে আপাতত বন্ধুদের দলটা ছাড়া অন্য কেউ নেই। রুদ্র গিটার নিয়ে বসে গেছে। টুংটাং করে তুলছে একটা চেনা সুর। সামি হৃদির পাশে এসে বসেছিল। হাতের ওপর রেখেছিল একটা হাত। হৃদি হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোকে আমার বিরক্ত লাগতেছে। দূরে যা।'

সামি হাতটা আবার ধরল, কঠিনভাবে বলল, 'তোর সমস্যা কী?'

– 'দূর হ এখান থেকে।' কথাটা বলে হৃদি হাতটা পুনরায় সরিয়ে নিল। সেই সময় সামির সেলফোন বেজে উঠল। উঠে পড়ল সে, 'আব্বা ফোন দিচ্ছে। ওরা চলে আসছে মনে হয়। থাক তোরা, আমি দেখা কইরা আসি।'

হৃদি একবার অমৃতার দিকে তাকালো। অমৃতা হৃদির ঐ চোখের দৃষ্টির অর্থটা বুঝেই হয়তো চোখ সরিয়ে নিল। বুকটা নিজের অজান্তেই ঢিবঢিব করে উঠল তার। হঠাৎ আকাশ বলল, 'তোরা কি আজকাল ইশারায় কথা বলিস?'

হৃদি একটু অবাক, 'মানে কী? ইশারায় কথা বলব ক্যান?'

– 'কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে তোরা একটা কিসু লুকাইতেছিস আমাদের কাছ থেকে। কাহিনি কী?

হৃদি আর অমৃতা আরও একবার চোখে চোখ ফেলল। অমৃতা বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ দোস্ত, তোদের আমার একটা কথা বলার আছে।'

রুদ্র গিটারের টুংটাং থামিয়ে মুখ তুলল, 'কী কথা?'

হৃদি ঢং করা গলায় বলল, 'মোহাব্বত হয়ে গেছে।'

আকাশ অবাক, ‘মানে কী?’

অমৃতা পরিষ্কার গলায় বলল, ‘আমি একজনকে পছন্দ করি দোস্ত!’ গিটারের তারের ওপর অনবরত চলতে থাকা হাতের আঙুল গুলো থামিয়ে রুদ্র অস্ফুটে বলল, ‘পছন্দ? কাকে?’

অন্ধকারে আবছা হয়ে থাকা দুই বন্ধুর তীব্র এবং অনুসন্ধানী চোখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারছিল না অমৃতা। সে চোখ নামিয়ে নিলো। তার বুক ধড়ফড় করছে। তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে যাচ্ছে গলা। হৃদি হঠাৎ তাড়া দিয়ে উঠে অমৃতাকে বলল, ‘বললে বইলা ফ্যাল দোস্ত। তাড়াতাড়ি কর। সামি চইলা আসবে।’

এবার আকাশ থমথমে গলায় বলল, ‘হ্যাং অন! হোয়াট আর ইউ আপ টু গাইজ? সামি চইলা আসবে মানে? কাহিনী কী?’

হৃদি স্পষ্টভাবে বলল, ‘কারণ সামিকেই কথাটা বলা যায় না।’

– ‘কিন্তু কেন?’

অমৃতা মুখ তুলল। কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুই বন্ধুর ফ্যাকাশে মুখের দিকে। তারপর এক দমে বলল, ‘সামির আব্বাকে আমার ভালো লাগে!’

– ‘ভালো লাগে মানে?’ আকাশের প্রশ্ন!

‘প্রেমে পড়ছে।’ উত্তরটা এলো হৃদির কাছ থেকে।

এই নিতান্তই সাধারণ নিরপরাধ দুটি শব্দ সামনে বসা দুই যুবককে অচম্বিতে রূপান্তরিত করল মূর্তিমান পাথরে। সময় যেন থমকে গিয়েছে। থেমে গেছে তাদের ভিতরকার সব তরঙ্গ। অমৃতা মুখ নামিয়ে নিল নিচে। আজকে তার ভীষণ লজ্জা করছে। বিভা আর হৃদিকে ব্যাপারটা বলার সময় কিন্তু একটা ফোঁটাও আত্মা কাঁপেনি। লজ্জা তো অনেক দূরের কথা। গড়গড় করে বলে দিয়েছিল সব। কিন্তু আজ বিপজ্জনক এক অস্বস্তি কেউটে সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছে তাকে চারদিক থেকে। মনের একদম তলানিতে সে টের পাচ্ছে যে এই দুজনের চোখে শুধু বিস্ময় আর ধিক্কার নয় বরং আরো কিছু আছে। ওদের অমন নিগূঢ় চোখের দৃষ্টি অমৃতা এর আগে কোনোদিন দেখেনি!

অনেকক্ষণ পর রুদ্র কথা বলতে পারল, ‘এটা কী ধরনের ফাইজলামি?’ হৃদি বলল, ‘হ্যাঁ ফাইজলামি তো বটেই। এখন তোরাই বোঝা এই গাধিকে। আমি আর বিভা বুঝাইতে বুঝাইতে ক্লান্ত।’

আকাশের মুখটা তখনো হা হয়ে ছিল। চোখের পলক পড়ছিল না তার। রুদ্র অস্থিরভাবে বলল, ‘সামির বাবা? শিট ম্যান! ক্যামনে কী?’

অমৃতা বলল, ‘আমি জানতাম তোরা এরকম রিঅ্যাক্ট করবি। এই জন্যেই শালা তোদের আমি বলতে চাই নাই।’

রুদ্র ক্ষিপ্তবৎ কণ্ঠে বলল, ‘তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? সামি জানতে পারলে কী হবে?’

অমৃতা একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘সামি কি আমাকে বুঝবে না? আমার বিশ্বাস সামি আমাকে বুঝবে।’

রুদ্র এই পর্যায়ে অত্যন্ত হতাশ ভাবে তাকালো বাকি দুই বন্ধুর দিকে। হৃদি একটু কাষ্ঠ হেসে বলল, ‘এবার ঠ্যালা সামলা। গত দুই মাস ধইরা আমরা এসব পাগলামি সহ্য করে আসতেছি।’

– ‘তুই কি লোকটার সাথে প্রেম করতেছিস?’ রুদ্রর খটোমটো প্রশ্ন অমৃতা আঁতকে উঠল, ‘আরে না! উনি তো··· মানে··· উনি প্রেম করা টাইপ মানুষ না।’

– ‘কিন্তু আমি তো ভাবছিলাম তুই লোকটাকে ঘেন্না করিস। হঠাৎ করে এত প্রেম আসলো ক্যামনে?’

অমৃতা মৃদুস্বরে বলল, ‘ঘেন্না করতাম এ কথা ঠিক। লোকটার এত অহংকার, খ্যাতি, সুনাম, এর কোনোটাই আমার সহ্য হতো না। কিন্তু ফোনে কথা বলতে দারুণ লাগত। কথা বলতে গিয়েই একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমার জীবনে এই একজন মাত্র পুরুষমানুষ, যার কণ্ঠস্বর শুনলে আমার বুক কাঁপে। যাকে দেখলে আমার দেবতার চাইতেও বেশি সুন্দর বলে মনে হয়। যার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে···’

অমৃতা কথাটা শেষ করতে পারল না। আকাশ হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার মুখে গনগনে আগুনের আঁচ। চোখে ধকধক করছে তেজ। সে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের গায়ে পা দিয়ে বেশ জোরে একটা লাথি মারল। চেয়ারটাই যেন দোষী। তাই চেয়ারে লাথি মেরে উগরে দিতে চাইছে সমস্ত রাগ। তারপর আর এক মুহূর্তও

দেরি না করে প্রস্থানোদ্যত হলো। অমৃতা পেছন থেকে বলে উঠল 'আকাশ! কই যাস?'

আকাশ হাঁটা না থামিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো অমৃতার দিকে জ্বলন্ত চোখে। ডান হাতের মধ্যাঙুলি প্রদর্শন করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ফাক ইউ!'

রুদ্রও বসল না আর। হাতে ধরা গিটারটা চেয়ারের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। অমৃতার সারা মুখে একটা চাপা কষ্ট থমথম করছে। হৃৎপিণ্ডে ক্রমাগত বিঁধছে সহস্র সুচ। বন্ধুদের সে বড় বেশি ভালোবাসে, বড় বেশি বিশ্বাস করে। তাই তো নিজের জীবনের সবচাইতে অপ্রিয় সত্যটি সে সারা দুনিয়ার কাছ থেকে লুকোতে পারলেও বন্ধুদের কাছ থেকে লুকাতে পারেনি কিছুতেই, লুকোনোর চেষ্টাও করেনি। অথচ সেই বন্ধুরাই তাকে একটা বার বোঝার চেষ্টা করল না। এ পৃথিবীতে কেউ তাকে বোঝে না। এমনকি সেই মানুষটা, যে মানুষটাকে ভালোবেসে সে অষ্টপ্রহর খর দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে মনে মনে, বন্ধুদের বিদ্রুপের কারণ হচ্ছে, সেই মানুষটাও তাকে বুঝল না। সে মানুষ তার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে! এই দূরত্ব হাজার চেষ্টা করেও ঘুচানো যাচ্ছে না, যাবে না!

অমৃতা হেঁটে হেঁটে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। আকাশে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সম্মুখে পাহাড় শৃঙ্গ। দিগন্ত ঢেকে আছে ধোঁয়াটে মেঘে। অমৃতার চোখজোড়া বহুদূরে নিবদ্ধ। সে কিছু দেখছে না। তবুও তাকিয়ে আছে। এ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ কিছু দেখতে না পেলেও তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকা নিয়ম বলে। সত্যটা জানার পরেও মিথ্যে বলে, সত্য লুকোনো নিয়ম বলে। ভালো না বাসলেও ঘর করে, ঘর করা নিয়ম বলে। কেউ নিয়ম ভাঙলে ধিক্কার দিতে আসে, ধিক্কার দেওয়া নিয়ম বলে। আহা! বড়ই নিয়মসর্বস্ব মানুষের জীবন!

হৃদি ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, আলতোভাবে বলল, ‘আপসেট হইস না। এখনো ভুল শোধরানোর সময় আছে। তুই ভুলতে চাইলেই ভুলতে পারবি, সবকিছু। আর বাচ্চামো করিস না।’

অমৃতা হৃদির চোখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখল, অদ্ভুত শীতল গলায় বলল, ‘আমি ভুলতে পারব কি পারব না সেটা শুধু আমিই বুঝি হৃদি! ভেবেছিলাম তোরাও বুঝবি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আসলে আমার জীবনে ভুলের মাত্রা সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভুল মানুষকে ভালোবেসেছি। ভুল মানুষদের বন্ধু ভেবেছি।

কথাটা বলে অমৃতা ঘুরে দাঁড়ালো। টেরেস থেকে বেরোবার সময় সামির মুখোমুখি পড়ল সে। সামি ওকে দেখতেই প্রশ্ন করল, ‘কোথায় যাচ্ছিস?

অমৃতার চোখে তখন চিকচিক করছে কাচের মতো স্বচ্ছ কয়েক বিন্দু জল। সে ঝাপসা চোখে সামির মুখের দিকে চাইল। সামি অবাক গলায় বলল, ‘কী হইছে তোর?’

অমৃতা কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলল। কয়েকটা সেকেন্ড ঠোঁট ফাঁকা করে শুধু বাতাস গিলল সে। বলতে পারল না কিছুই। কেউ যেন তার জিব টেনে ধরেছে। সামি আবার প্রশ্ন করল, ‘কীরে? সব ঠিক আছে তো?’

অমৃতা মুখ নামাল নিচে। অস্ফুটে বলল ‘সব ঠিক আছে।’ তারপর আকস্মিক… খুব আকস্মিকভাবে দুহাত বাড়িয়ে সামিকে জড়িয়ে ধরল। দমবন্ধ গলায় বলল, ‘সামি, আই লাভ ইউ দোস্ত! তুই এটা জানিস তো, তাই না?’

সামি একটু থমকে গেলো। নিজের বুকের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়া অমৃতার অবনত মুখখানার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরেধীরে সে একটা হাত রাখল অমৃতার সুন্দর ছাটের বয়কাট চুলের ওপর। নরম গলায় বলল, 'আই লাভ ইউ মোর!'

কথাটা বলা শেষ করে সামি অমৃতার চিবুক ধরে ওর মুখটা ওপরে তুলল। সরু দৃষ্টিতে তাকাল ভেজা দুখানা চোখের ওপর। দেখামাত্র তার মনে হলো এই অমৃতাকে যেন সে চেনে না। তার চোখে খেলে গেলো এক তীব্র বিস্ময়।

– 'তোর কী হইছে?'

অমৃতা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সামলে নিয়ে বলল, 'কিছু না!' এরপর আর একটিও কথা না বলে খুব দ্রুত বেরিয়ে গেলো জায়গাটা ছেড়ে।

অমৃতা চলে যাবার পর সামি ভারি আশ্চর্য গলায় বলল, 'ওর সমস্যা কী?' হৃদি পাশ কাটানো উত্তর দিল, 'বাদ দে। আংকেল আন্টি আসছেন?'

– 'বাবা আসে নাই। মা আসছে খালাদের সাথে।'

– 'আংকেল আসবেন না?'

– 'কাল সকালে আসবে। কিন্তু অমৃতার কী হইল হঠাৎ?'

– 'আরে ধুর। আজাইরা। বাদ দে।'

সামি সজোরে মাথা নাড়ল, 'উঁহু। কিছু একটা নিশ্চয়ই হইছে।'

হৃদির বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। কী বলবে সে সামিকে এই কথার প্রত্যুত্তরে? সামি অবশ্য হৃদি কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করল না। তার আগেই অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'তুই থাক। আমি আসতেছি।'

– 'কই যাস?'

সামি কোনো উত্তর দিল না। ও চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভা আর অভিজিৎ এসে পৌঁছুলো টেরেসে। হৃদি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একা থাকতে তার একটুও ভালো লাগছিল না।

১৮

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি। দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে অন্ধকারের ঘন জাল। বাতাস একটু ক্ষেপেছে সন্ধের পর থেকে। এখন তার ছোঁয়ায় বৃষ্টি বৃষ্টি আভাস। আকাশ হনহনিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে রিসোর্টের মূল গেটের সামনে চলে এসেছিল সে। রুদ্র দৌড়ে এসে থামাল ওকে। পেছন থেকে চেপে ধরল একটা হাত। টানতে টানতে জোর জবরদস্তি করে নিয়ে এলো গেটের পাশ ঘেঁষা ঝোপ জঙ্গলের কাছে। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস? শালা বোকাচোদা কোথাকার! বলছিলাম না তোকে? অনেক বেশি লেট হয়ে যাচ্ছে? তুই তো আমার কথা শুনিস নাই। এখন বোঝ ঠ্যালা।'

এদিকটায় শাল আর বহেড়ার জঙ্গল। রিসোর্টের কটেজগুলো এমনভাবে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে লুকোনো রয়েছে যে সেইসব কটেজের ভেতর জ্বলতে থাকা বাতির ছিটেফোঁটাও এ পর্যন্ত আসছে না। ঝিঁঝি পোকার তীব্র ঝালা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আকাশ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। শরীরটাকে এ মুহূর্তে নিজের বলে মনে হচ্ছে না।

রুদ্র আবার বলল, 'এখনই যা। খুলে বল ওকে সবকিছু।'

আকাশ অনেক কষ্টে এবার দুটো শব্দ বলতে পারল, 'মাথা খারাপ!' রুদ্র রাগে হিসহিস করে ওঠে, ক্ষ্যাপা গলায় বলে, 'মাথা খারাপের কী আছে?'

– 'তুই ও তো বলিস নাই।'

– 'শালা! আমি কেন বলব? আমি তো বলছি আমি ওরে এখন আর সেই নজরে দেখি না।'

– 'বললেই সব সত্যি হয় না।'

রুদ্র ক্ষিপ্রগতিতে দু পা এগিয়ে এসে আকাশের শার্টের কলার চেপে ধরে। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে, 'তুই বেশি জানোস?'

আকাশ রুদ্রর দুটো হাত নিজের গলার ওপর থেকে সরিয়ে নিল। হাঁপ ধরা গলায় বলল, 'আমি জানি।'

রুদ্র অস্থিরচিত্তে কয়েকবার পায়চারি করল ভূতগ্রস্তের মতো বহেড়া গাছের ছাউনির নিচে। তারপর আঙুল উঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'লিসেন আকাশ, অমৃতা হয় তোর নইলে আমার। অন্য কারো না।'

– 'রুদ্র, ইউ আর সাউন্ডিং লাইক আ ফাকিং জার্ক। এভাবে হয় না। অমৃতা কাকে পছন্দ করবে সেটা তো আমরা ঠিক করে দিতে পারি না। তাছাড়া ও তো অন্য মেয়েদের মতো না। শি ইজ ডিফারেন্ট।'

– 'ডিফারেন্ট তা জানতাম। তাই বলে এতটা ডিফারেন্ট? ফ্রেন্ডের বাবা? কাম অন ম্যান! লোকটা ওর চেয়ে বয়সে কত বড় একবার চিন্তা করে দেখছিস?'

– 'আমি সামির কথা ভাবতেছি। আমার তো এখন মনে হচ্ছে আমরা সবাই সামির সাথে চিট করতেছি।'

– 'সামিকে এসব ফালতু বিষয় কোনোভাবেই জানানো যাবে না। অমৃতাকে যে কোনো উপায়ে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।'

– 'সহজ হবে না ব্যাপারটা ওর জন্য। আমি ওকে চিনি। শতভাগ নিশ্চিত না হলে ও ভালোবাসার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত না। দিস ইজ অমৃতা উই আর টকিং অ্যাবাউট। মেয়েটা জীবনে কোনোদিন কারো উপর ক্রাশ পর্যন্ত খায় নাই। সেই মেয়ে যখন বলতেছে সে একজনকে পছন্দ করে, এটার মানে শি ইজ সো ড্যাম সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট!'

রুদ্র কিছু বলল না। মেঘলা বাতাসে ওর খোলা বাবরি চুলগুলো উড়ছিল। হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিয়ে নিবিড়ভাবে চোখ পিটপিট করে কিছু একটা ভাবলো সে। অসহায় গলায় বলল,

'কী করব কিছুই বুঝতেছি না!'

আকাশ একটা বিষণ্ণ শ্বাস ফেলল। স্থিরতার সাথে বলল, 'লিসেন, যেটাই হোক না কেন সে আমাদের বন্ধু। অমৃতা সবসময় আমাদের সবার বিপদে আগায় আসে। সাহস দেয়। আজকে ওর জীবনের এরকম একটা সময়ে আমরা ওকে একলা ছাইড়া দিতে পারি না। আমাদের ওর সাথে থাকতে হবে।'

– 'আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকতেছে না, ওই বদরাগী, অহংকারী লোকটাকে ও কীভাবে পছন্দ করল?

আকাশ একটু শ্লেষের হাসি হাসল, 'অমৃতার দ্বারাই এসব সম্ভব! তবে লোকটা দেখতে শুনতে ভালো, প্রতিষ্ঠিত, ধনী এবং শিক্ষিত, ওরে যে কেউ পছন্দ করবে।'

– 'ফালতু কথা বলিস না। যে কেউ করতে পারে কিন্তু সেই যে কেউটা কোনোভাবেই নিজের ছেলের বয়সী কোনো মেয়ে হতে পারে না।'

– 'ম্যান! আই ফিল ব্যাড ফর সামি! আমার কিছু ভালো লাগতেছে না।' আকাশ একটা কাটা বহেড়া গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। কাকতালীয়ভাবে ওরা দুজনেই তখন ভাবছিল অমৃতার সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা। রুদ্রর প্রথম দেখা পরীক্ষার

হলে। আর আকাশের কলেজ গেটের সামনে। তখন বয়স কত হবে? ষোলো কি সতেরো? বয়কাট চুলের আজগুবি মেয়েটাকে দেখলে তখন বুক দুরুদুরু করত। সে আশপাশ দিয়ে হাঁটলে হাওয়া ভরে যেত মিষ্টি ঘ্রাণে। কতবার মনের কথা বলতে যেয়ে থেমে যেতে হয়েছে বন্ধুত্ব হারানোর ভয়ে। হ্যাঁ প্রেমের চাইতে হয়তো বন্ধুত্বটাই ওদের কাছে বরাবর বেশি দামি ছিল। বছর চারেক আগের এক গভীর রাতের আড্ডায় সামি যখন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা আমাদের মেয়েদের মধ্যে তোদের কাকে পছন্দ? ধর তোদের যদি চ্যুজ করতে বলা হয় তাহলে কাকে চ্যুজ করবি? আমার বিভাকে পছন্দ। তোরা? ' বলাই বাহুল্য দলের মেয়েরা সেদিন সেই আড্ডায় অনুপস্থিত ছিল।

সামির প্রশ্নের উত্তরে রুদ্র আর আকাশ একত্রে বলে উঠল, 'অমৃতা।'

দুজনেই চমকে তাকালো একে অপরের দিকে। চমকটা কাটতে কিছু সময় লাগল। রুদ্র অবাক গলায় বলল, 'কখনো কিছু বলিস নাই কেন?'

– 'বলার মতো তেমন কিছু না। মানে .. আসলে বলে কী লাভ?'

– 'কী লাভ মানে? গাধা নাকি?'

আকাশ মিনমিন করে বলল, 'না বলাই ভালো। বললে ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট হইতে পারে। '

– 'মামা যা করার তাড়াতাড়ি কর। নইলে অমৃতা আমার।' হালকা রসিকতার সুর বেজে উঠল রুদ্রর গলায়।

– ‘তোরে দিয়া দিলাম। আমার চাই না।’

– ‘ঢং করিস না।’

– ‘ঢং এর কী আছে? আমি তো জানি তুই ওরে পছন্দ করিস।’

মনীষা রুদ্রর জীবনে আসার পর আকাশ একবার বলেছিল, ‘তুই তাহলে অমৃতাকে আর ভালোবাসিস না?’

– ‘ভালোবাসব না কেন?’

– ‘না মানে, রোমান্টিক পার্স্পেকটিভ থেকে।

– ‘ও আচ্ছা, না না, ওইসব আমি ভুলে গেছি।’

বলেছিল ঠিকই রুদ্র, কিন্তু কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি আকাশ।

একটা সময় পুরোনো দিনের জার্নাল বন্ধ করে রুদ্র হঠাৎ বলল, ‘অমৃতার কাছে কি প্রেমটাই সব? বন্ধুত্ব কিছুই না? ও কি বুঝতে পারছে না সামি ব্যাপারটা জানতে পারলে ওদের ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট হয়ে যাবে?’

আকাশ আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আমিও এটাই ভাবছি জানিস? ভাবতে গিয়ে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে, অমৃতা কখনওই কিছু চেপে রাখতে শেখেনি। বন্ধু হারানোর ভয়ে সে সত্য গোপন করবে, এটা কোনভাবেই সম্ভব না। সো ইভেনচুয়েলি সামি উইল গেট টু নো এভরিথিং। অ্যান্ড ইট উইল বি আ ডিজাস্টার!'

১৯

দরজায় ধাক্কা পড়ছিল অনবরত। অমৃতা দরজা খুলে দেখল সামি দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের তারায় হরেক প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। অমৃতা দরজার সম্মুখ ভাগ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আয়!'

একটা হলুদ নরম আলোর বাল্ব জ্বলছিল। ঘরের দু কোণে দুটি সিঙ্গেল খাট বসানো। একটি খাটের ওপর সামি বিনা বাক্য ব্যয়েই বসে পড়ল।

অমৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা খুঁজল যেন, তারপর বলল, 'তোর মন খারাপ?'

অমৃতা উল্টোদিকের খাটের ওপর বসল। মেঝেতে বিছানো লাল কার্পেটের ওপর চোখ নিবদ্ধ করে বলল, 'একটু টেনশন হচ্ছিল। এখন ঠিক আছি।'

– 'কীসের টেনশন?'

অমৃতার বিষণ্ণ মনটা এবার ভয়ংকর রকমের খারাপ হয়ে গেলো। তীব্র এক অপরাধবোধ হাতুড়ির মতো ঠকঠক শব্দ তুলে আঘাত হানতে লাগল মনের দেয়ালে।

কষ্টে মুচড়ে যাচ্ছে ভেতরটা। মিথ্যে কথা বলা তার অভ্যাসে নেই। পেশাগত প্রয়োজনে নিতান্তই বিপাকে পড়ে টুকটাক মিথ্যা তাকে বলতে হয় বৈকি, কিন্তু বন্ধুদের সাথে আজ অবধি সে কোনো মিথ্যা কথা বলেনি।

সে চোখ কার্পেটের ওপর নিবদ্ধ রেখেই অনেক কষ্টে বলল, 'তেমন কিছু না।'

– 'তুই কিছু লুকাচ্ছিস আমার কাছ থেকে?'

– 'তোদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল।'

সামির মুখে একটা বিভ্রান্তি খেলে গেলো ক্ষণিকের জন্য।

– 'আমাদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল?'

– 'হ্যাঁ। তুই কী ভাবলি? প্ল্যান কী?'

– 'কীসের প্ল্যান?'

– 'চুপচাপ বসে থাকবি হাত গুটায়? বিয়া করতে হবে না?'

– 'তুই কানতেছিলি কেন তখন?'

অমৃতা হাসার চেষ্টা করল, ‘আরে ধুর, আমি কখনো কাঁদি নাকি?’

– ‘হঠাৎ করে এত ইমোশনাল হয়ে গেলি?’

– ‘আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি ইমোশনাল হইতে পারি না? এটা অপরাধ?’

সামি বিরক্ত গলায় বলল, ‘অপরাধ হবে কেন? কিন্তু তুই তো কখনো এসব বলিসটলিস না। হঠাৎ কী হইল?’

– ‘আমার কিছু হয় নায়। শোন, তুই আর দেরি করিস না। হৃদির বাসা থেকে কিন্তু বেশি দিন ওয়েইট করবে না। জানিস তো ওর বাবা মা একটু ব্যাক ডেটেড। বিয়ে দেওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে।’

এবার সামিকে একটু চিন্তিত দেখালো। নিচের ঠোঁটে কয়েকবার দাঁত দিয়ে চিমটি কাটলো সে আনমনে। বলল, ‘আমার মা তো রাজিই হইতেছে না। কী করব বল তো?’

– ‘আন্টিরে বোঝা। তুই একমাত্র ছেলে। আন্টি রাজি না হয়ে যাবে কই? আরেকটা বিষয় দোস্ত। তুই তোদের অফিসে জয়েন করিস না কেন?’

– ‘অফিসে জয়েন করব কেন?’

– ‘তোর এবার হাল ধরা উচিত।’

শুনে সামি একটু বাঁকা হাসল, ‘ধুর, হাল ধরার সময় এখনো আসে নাই। আমার বাপ এখনো যথেষ্ট ফিট। বাবাই সব সামলাইতেছে। যখন পারবে না, বুড়া হয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে।’

– ‘এটা কোনো কথা না। তোর বাবা কতদিক সামলাবেন? আমার মনে হয় এখন থেকেই তোর বিজনেসটা বুঝে নেয়া উচিত। কাজ শিখতেও তো সময় লাগবে! আর বাসায় বসে বসে করিস কী তুই? এমনে বসে থাকলে তো এমনিই মাথা খারাপ হয়ে যাবে।’

– ‘দেখি।’

– ‘দেখিটেখি না। তোর বাবার সাথে কথা বল এ ব্যাপারে। তিনি খুশি হবেন।’

সামি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘দেখা যাক।’

– ‘না দেখা যাক না। এবার ঢাকায় ফিরে গিয়েই তুই তোদের অফিসে জয়েন করবি।’

সামি বিরক্তি নিয়ে বলল,’মুরুব্বি টাইপ কথা বলিস নাতো। বাল, তুই আমার বন্ধু নাকি গার্ডিয়ান?’

অমৃতা হাসে, বলে, ‘গার্ডিয়ান যদি বন্ধু হতে পারে তাহলে বন্ধু কেন গার্ডিয়ান হতে পারবে না? পারহ্যাপ্স আই এম ইওর গার্ডিয়ান এঞ্জেল!’

– ‘বাইরে আয়। মন খারাপ করে বসে থাকিস না।’

– ‘তুই যা। আমি আসতেছি। জরুরি কল করতে হবে একটা।’

২০

সামি টেরেসে ফিরে এসে দেখল বিভা আর হৃদি দুটি চেয়ার দখল করে বসে আছে অন্ধকারে। সে রসিক গলায় প্রশ্ন করল, ‘আমাদের জামাইবাবু কোথায়?’

– ‘ঘরে গেছে। ওর একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবার অভ্যেস।’

সামি চেয়ার টেনে নিয়ে দুই বান্ধবীর মুখোমুখি বসল। বাতাসে এখন একটা ঝড়ো ভাব আছে। রাতে বৃষ্টি হতে পারে। সামি পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল। বিভা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তোরা থাক। আমি যাই।’

সামি খপ করে বিভার একটা হাত ধরে ফেলল। বলল, ‘এত তাড়া কীসের? বয়। পরে যাইস।’

বিভা একবার তাকালো হৃদির দিকে। অন্ধকারে মুখের ভাবভঙ্গি বোঝা যায় না। চুপচাপ মূর্তির মতো বসে আছে হৃদি। কোনো নড়চড় নেই। বিভা বলল, 'না থাক। তোরা এনজয় কর। আমি আসি।'

সামি বিভার হাতটা না ছেড়েই বলল, 'বললাম তো, পরে যা। কথা কানে যায় না?'

অন্ধকারে ওদের দুজনের ধরে থাকা হাতের দিকে চেয়ে ছিল হৃদি। চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই রাতটির কথা। যে রাতে সামি সব বন্ধুদের সামনে বিভাকে বলেছিল 'সব তোর দোষ!' মনে পড়ল আজ সন্ধ্যায় বিভাকে দেখামাত্র সামির মুখে উচ্চারিত হওয়া প্রশংসা বাক্যটি। সামি কেন সবসময় অমন গালভরে, মনভরে বিভার প্রশংসা করে, কিন্তু হৃদির প্রশংসা করে না? হৃদির কি একটা বার ভালোবাসার মানুষটার মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে ইচ্ছে করে না? তার মনের মধ্যে কোত্থেকে যেন হঠাৎ এক কালবৈশাখীর মত্ততা এসে ভিড় করল। কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সবকিছু। দুয়ে এক অস্বস্তিতে গাঁট হয়ে গেলো সমস্ত অন্তর। শুরু হলো মনের সাথে বিবেকের লড়াই। সে বুঝতে পারছে বিভা তার মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় আছে। বিবেক বলছে তার উচিত বিভাকে যেতে না দেওয়া। সামির মতো তারও বলা উচিত, 'এখন যাস না,এত তাড়া কীসের?' কিন্তু ওদের দুজনের যুগলবন্দি হাতের দিকে চেয়ে থেকে হৃদি মুখ দিয়ে বলার মতো কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। বিভা কী মনে করে যেন সামির হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'অভিজিৎ অপেক্ষা করছে। তোরা গল্প কর। আমি এখন যাই। আকাশ, রুদ্র, অমৃতা ওরা আসলে আমাকে কল দিস।'

হৃদি এবারেও কিছু বলতে পারল না। তার বুকের ভেতর থেকে একটা কান্নার স্রোত ধেয়ে আসছে ঊর্ধ্বমুখি হয়ে। বিভা চলে যাবার পর সামি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'অমৃতার কিছু একটা হইছে। কেমন কেমন জানি লাগতেছিল ওরে।'

হৃদি অতর্কিতে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। সামির প্রতি জমে থাকা রাগটা এখন তুঙ্গে উঠেছে। অথচ বিবেক বলছে এত রাগার কোনো কারণ তো নেই, বিভা সামির বন্ধু! বন্ধু বন্ধুর হাতে হাত রাখবে এটাই তো স্বাভাবিক! বিভার হাত ধরার অপরাধে সামির ওপর রেগে যাওয়া যে একেবারেই সমীচীন নয় সে কথাটা হৃদি তার বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে। কিন্তু প্রতিবাদ করে উঠছে মন। ভেতরে ভেতরে একটা প্রবল বিদ্রোহের ঝংকার টের পাচ্ছে সে।

– ‘কোথায় যাচ্ছিস?’

হৃদির কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারল না। কোনো উত্তর না দিয়েই গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেলো টেরেস থেকে। ঘরে এসে দেখল অমৃতা বিছানায় বসে ল্যাপটপ খুলে কাজ করছে। মনে পড়ল অমৃতাও একটু আগে বলেছে সে নাকি ভুল মানুষদের বন্ধু ভেবেছে। পুরো পৃথিবীটার ওপর অভিমান হচ্ছে তার। মনে পড়ে যাচ্ছে সারাজীবনের বিভিন্ন সময়ে পাওয়া বিচিত্র সব কষ্ট, অপমান, অপ্রাপ্তি এবং অতৃপ্তি। ক্লাস নাইনের কেমিস্টি টিচার একবার মুখের ওপর বলে দিয়েছিল ‘তোমার মতো লো আই কিউর মেয়ে এই স্কুলে আর দ্বিতীয়টি নেই। তোমার দ্বারা কিছুই হবে না!’ আজ এতদিন বাদে সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেই ঘটনাটি মনে পড়ায় তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াতে লাগল। মনে হলো, আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। সত্যিকারের ভালোবাসেনি। জীবন নামের সুবিশাল রঙ্গমঞ্চে সে বড়ই দুর্ভাগা, নিগৃহীত এবং অবহেলিত এক মনুষ্য কীট।

অমৃতার সাথে কোনো কথা বলল না হৃদি। চুপচাপ শুয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ চেপে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। আকাশের সব মেঘ যেমন সব সময় বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে না, ঠিক তেমনি সবার মনের সব কষ্ট ও কান্না হয়ে ঝরে না। তাই তো,

হৃদির মনের কষ্টগুলি কান্না হয়ে ঝরলেও, অমৃতার কষ্টগুলি গুমোট মেঘের মতো মনের আকাশে জমা হয়ে রইল।

ছেলেরা খানিক বাদে ফিরল। পাশের ঘরটাই ওদের। পদশব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। হালকা কিছু কথাবার্তাও কানে এলো। কিছুক্ষণ পর নামল বৃষ্টি। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ লেগে বিকট গর্জনে ফেটে পড়তে লাগল মধ্যরাতের আকাশ।

অভিজিতের চোখ লেগে এসেছিল। আধো ঘুমের ভেতর নানা রকম শব্দ কানে এসে লাগছিল তার। বজ্রপাতের শব্দ, বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, পাহাড়ের বুকের ওপর দামাল বাতাসের হুহু করে বয়ে চলার শব্দ··· প্রতিটি শব্দকে অলৌকিক বলে ভ্রম হচ্ছিল। এর মাঝে একটি শব্দ কিঞ্চিৎ অন্যরকম। ঝুম ঝুম ঝুম... কীসের শব্দ ওটা? কী রকম দেখতে? শব্দ কখনো দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু অভিজিতের মনে হলো এই শব্দটি বুঝি দৃশ্যমান। ভারি সুন্দর দেখতে একটি পবিত্র ফুলের মতো এই শব্দটি। ঝুম ঝুম ঝুম··· চোখ খোলার পর কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল সে সম্মুখে। কিছু দেখতে পারছে না কিন্তু শব্দগুলো এখনও কানে এসে লাগছে ক্রমাগত। কিছুক্ষণের মধ্যেই মস্তিষ্ক আলো বাতাস পেলো। চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট হলো। হলদে একটা মলিন আলোয় ভরে আছে ঘর। খোলা জানালা দিয়ে ধেয়ে আসা হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে ঘরের পর্দা। বাইরে বৃষ্টির ঘেরা টোপ। নীল বিদ্যুতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সম্মুখে চিলিক দিয়ে উঠছে জানালার বাইরের বৃষ্টি ডোবা বন পাহাড়। নিমেষেই আবার ছেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিভা। শাড়ির আঁচল বাঁধা কোমরে। পায়ে বাঁধা ঘুঙুর। তার হাঁটার তালে তালে ঘুঙুর বেজে চলেছে। ঝুম ঝুম ঝুম। অভিজিৎকে জেগে উঠতে দেখামাত্র সে বলল, 'সঠিক সময়ে জেগে উঠেছ। এরকম বৃষ্টির রাতে কেউ ঘুমায়?' কথাটা বলে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সে আইপডে চালিয়ে দিল গান। তারপর গানের তালে

তালে শুরু করল নাচ।

‘মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর/নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ
শ্রাবণ মেঘে নাচে নটবর/ ঝমঝম রমঝম রমঝম’

বৃষ্টির রিমঝিম সুরের সাথে গানের সুর আর নুপুরের শব্দ মিশে গেলো। বাতাসে উড়তে লাগল বিভার খোলা চুল। নাচের দমকে খুলে পড়ল কোমরে গোঁজা আঁচল। অভিজিৎ চেয়ে রইল নির্নিমেষ। বন্ধুরা পাশের ঘর থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিল নূপুরের শব্দ। শুনতে শুনতে হৃদির মনে হলো যে, বিভা বাস্তবিকই ভালোবাসার যোগ্য পাত্রী। সে নিজে তো হাজার চাইলেও মাঝ রাত্তিরে বরের সামনে ওরকম মন মাতানো নাচ নাচতে পারবে না। নাচ কেন, মানুষকে মুগ্ধ করার মতো কোন গুণই তো তার ঘটে নেই! কী করে সে বিভার সমকক্ষ হবে? হবে না… কোনো দিনও হবে না। আর এ কারণেই হয়তো, সামির মনের ভেতরেও বিভা রয়ে যাবে চিরকাল। হৃদি কখনোই বিভার জায়গা নিতে পারবে না। হাজার চেষ্টা করলেও না!

অমৃতা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। অমৃতা দোর খুলে দেখল আকাশ দাঁড়িয়ে আছে। কটেজের খোলা বারান্দা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওকে। প্রবল বেগে বইছে মাতাল বাতাস। নীল বিদ্যুতে ঝলসে যাচ্ছে চারপাশ। বিদ্যুৎ আলোয় এক ঝলক দেখতে পেলো অমৃতা আকাশের মুখটা। বুক কেঁপে উঠল এক অজানা আশংকায়। কী হয়েছে আকাশের? ওকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

– ‘অমৃতা!’ আকাশ ডাকল, কেমন আচ্ছন্ন গলায়।

– ‘হ্যাঁ, বলো।’

– ‘শোন, তোর ফিলিংসকে আমি রেস্পেক্ট করি। আই রিয়েলি ডু রেসপেক্ট ইওর ফিলিংস। তুই··· তুই শুধু এটা জেনে রাখ যে যত বড় ঝড়ই আসুক না কেন, আমি সব সময় তোর পাশে আছি। থাকব সব সময়!’

এতক্ষণ অবধি চেপে রাখা কান্নাটা এবার বাধ ভাঙতে চাইল। অমৃতা কোনো কথা না বলে দু পা এগিয়ে এসে আকাশকে জাপটে ধরল। আকাশ থমকে গেলো ক্ষণিকের জন্য। এর আগে কোনোদিন অমৃতা ওকে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেনি। এই প্রথম! তেরছা হয়ে তেড়ে আসা বৃষ্টির জলে ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছিল ওরা। আকাশ অমৃতার পিঠের ওপর একটা হাত রাখল আলতোভাবে। অমৃতাকে দেখতে শুনতে শক্তপোক্ত মনে হলে কী হবে? শরীরটা একদম পাখির মতো নরম! ওর চুল থেকে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ উড়ে আসছিল। আকাশের সমস্ত ইন্দ্রিয় রাশি রাশি শিউলি ফুলের শুভ্রতায় ভরে উঠছিল ক্রমশ। একটা সময় সে অমৃতাকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুনল, ‘থ্যাংক ইউ সো মাচ দোস্ত! থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ! ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড!’ ওর নিশ্বাসের উষ্ণ মসৃণ ছোবলে আকাশের বুক কাঁপছে তখন। অমৃতা বলে চলল, ‘হি হ্যাজ গট ইনটু মাই ভেইনস। মরে গেলেও ভুলতে পারব না। অনেক বেশি ভালোবাসি মানুষটাকে দোস্ত! আমাকে বুঝতে পারার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোকে। আজকে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নাই। এভাবেই সব সময় পাশে থাকিস!’

আকাশ ক্ষীণ গলায় বলল, ‘থাকব। নিশ্চয়ই থাকব।’

২১

ঘড়িতে সকাল সাতটা। আকাশের পেঁজা তুলো মেঘের রুপালি পাড় ভেদ করে এই মাত্র উঁকি দিয়েছে স্ফটিক রঙা রোদ্দুর। ঘোর বসন্ত লেগেছে প্রকৃতিতে! নব যৌবনের প্লাবনে ভাসছে চারপাশ। কাঠ দিয়ে বাঁধানো সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিল তিন বান্ধবী। রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা খাওয়াই তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আশপাশটা সাতসকালেই মানুষজনে গিজগিজ করছে। গতকাল রাত দশটার মধ্যে সব অফিসিয়াল লোকজন চলে এসেছে। এদের বেশিরভাগই এসেছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে। এই রিসোর্টে এত লোক একসঙ্গে জায়গা হবে না বলে কাছেই আরেকটি হোটেলে বেশ কয়েকজনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অমৃতা একটা কালো ট্রাউজারের সাথে বেগুনি রঙের টি শার্ট পরে ছিল। টি শার্টের বুকের ওপরে ছোট্ট একটা টিংকারবেল আঁকা। অনেক দিনের পুরোনো এই শার্ট। সাজপোশাক নিয়ে সে অতটা শৌখিন নয় বলে একই জামা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পরে। পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরা তাকে একই পোশাকে বহুবার দেখে অভ্যস্ত।

রেস্টুরেন্টের ছাদটা দোচালা। দোচালা বাড়িটির দুপাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট্ট জলাশয়। বাড়িটির সম্মুখ ভাগ গড়ে উঠেছে জলাশয়ের ওপরে। হঠাৎ চোখ পড়লে মনে হয় বুঝি বাড়িটি ভাসন্ত। জলাশয়ের বুকে ফুটে আছে কয়েকটি শাপলা ফুল। ওরা তিনজন রেস্টুরেন্টের পোর্চে এসে দাঁড়ালো। ছেলেরা তখনো ঘুমোচ্ছে। এমন কি অভিজিৎও। বিভা বলল, ‘আজকের প্ল্যান কী? কোথায় যাব আমরা? ‘

বিভার পরনে একটা হালকা হলুদ রঙের সালওয়ার কামিজ। চুলগুলো চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা। তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। মসৃণ, ঝকঝকে মুখের ত্বক বসন্তের নতুন সবুজ পত্রপল্লবের মতোই সতেজ। চোখের কোল ভরাট।

ঠোঁটে হালকা বাদামি লিপস্টিক। বিভার প্রশ্নের উত্তরে অমৃতা বলল, ‘আপাতত রেস্টুরেন্টে গিয়ে নাশতা করব, চা খাব। এরপরেরটা জানি না।’

বিভা আড়চোখে হৃদিকে দেখছিল। হৃদির পরনে একটা ছাই রঙের গেঞ্জি, কালো জিন্স। খোলা চুল ছড়ানো পিঠময়। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। চোখজোড়া ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঠোঁট শুকনো। বিভা ওর ক্লান্ত চোখের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে বলল, ‘তোরে দেখতে এরকম লাগতেছে ক্যান?’

- ‘কী রকম?’ হৃদি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করল পানসে গলায়।

– ‘কেমন জানি, মাছের মতো!

– ‘ফালতু কথা বলিস না।’

– ‘ফালতু কথা না, সত্য। চোখে কাজলটাজল কিছুই দিস নাই। দেখামাত্র মনে হচ্ছে মাছ, মানুষ না। মাছ মাছ একটা গন্ধও পাচ্ছি আমি তোর গা থেকে।’

হৃদি আগুন গরম চোখে তাকালো বিভার দিকে। তারপর অমৃতাকে বলল, ‘ওরে চুপ করতে বলো। মেজাজ কিন্তু গরম আছে।’

অমৃতা হৃদির কথাটা শুনল কি শুনল না কে জানে! তার দৃষ্টি আটকে গেছে বিশ গজ দূরে দাঁড়ানো একটি দলের দিকে। মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটা আবিষ্ট ভাব। চোখজোড়া প্রচ্ছন্ন। অমৃতার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকি দুই বান্ধবী তাকালো

সামনে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন ছোট্ট একটা জটলার মধ্যমণি হয়ে। তাঁর চোখে কালো কাচের রোদ চশমা। গায়ে হালকা আকাশি রঙের ফুল হাতা শার্ট। গালে গুড়িগুড়ি দাড়ি। রোদ এসে পড়ায় তাম্রবর্ণের গালের চামড়া ফর্সা ফর্সা দেখাচ্ছে। কালো কাপড়ের প্যান্টের পকেটে দু হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কিছু একটা বলছেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে। চোখে সানগ্লাস থাকায় বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কোনদিকে তাকিয়ে আছেন এই মুহূর্তে। হৃদি অমৃতার কনুইয়ে একটা চিমটি কেটে বলল, 'এভাবে চায়ে থাকিস না। লোকে কী বলবে?'

অমৃতাকে হঠাৎ করেই খুব প্রাণবন্ত দেখাতে লাগল। মনে হলো যেন অনেক দিন পর ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ ভেঙে রোদ হেসে উঠেছে ঝলমলিয়ে। সে বান্ধবীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আল্লাহ! এই লোকটা এত জোশ কেন? আমি তো পাগল হয়ে যাব!'

বিভা অমৃতার কথাটা শুনে গুনগুন করে একটা সুর ভাজতে লাগল, 'পাগল হয়ে যাব আমি··· পাগল হয়ে যাব।' গানটা গাইতে গাইতেই সে আড়চোখে বিশ গজ দূরে দাঁড়ানো লোকটার দিকে মনোযোগ দিয়ে আরেকবার তাকালো। তার মুখে একটা বিভ্রম খেলা করল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। একটু উদাস গলায় বলল, 'ফ্রেন্ডের বাপ না হইলে একটা কথা কইতাম। কিন্তু এখন কিসু কমু না।'

– 'আমার শ্বশুরের দিকে এমন কুনজর দিস না তোরা। প্লিজ!' অসহায় ভাবে বলল হৃদি।

বিভার মনটা আজ ফুরফুরে। সে কণ্ঠে ফুরফুরে ভাবটা জীবিত রেখেই বলল, 'অমৃতা, তুমি কেন বুঝো না যে তোমার হ্যান্ডসাম ড্যাশিং ম্যান কারো বাবা এবং কারো শ্বশুর?

আবার কারো সোয়ামি? এরকম ফ্যালফ্যাল করে বেহায়ার মতো চায়া থাইকো না। লোকে খাররাফ বলবে।'

– 'দোস্ত ড্যাশিং ম্যান কি এখন আমার দিকে তাকায় আছে?' অমৃতার প্রশ্ন।

বিভা নিজের কপালের কাছে পড়ে থাকা এক গাছি চুল আঙুল দিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে ভারিক্কি গলায় বলল, 'সেটা তো একটা রহস্য। তার চোখে চশমা দেওয়া। সে তোমাকে দেখতেছে নাকি আমাকে, সেটা বলা মুশকিল।'

এটুকু বলেই বিভা একটু অপ্রস্তুতভাবে খকখক করে কাশল মুখে হাত দিয়ে।

– 'মাই গড ড্যাশিং ম্যান তো এই দিকেই আসতেছে! আমরা ভিতরে যাই।' বিভা কথাটা বলেই হৃদির হাত ধরে টানতে টানতে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে গেলো। লোকটা দলবল নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। অমৃতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেস্টুরেন্টের পোর্চে, ব্যাক্কলের মতো। এখন যদি লোকটা তাকে দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তাহলে কেমন হবে? সহ্য করতে পারবে কি সে এই অপমান? কী করবে অমৃতা? এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে যাবে? মনে হচ্ছিল যেন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগির মতো হাতে পায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আছে। হৃদয়ে ধুকপুক। মানুষটা আসছেন। অমৃতা তাকাতে পারছে না সরাসরি। মুখ নিচের দিকে নামিয়ে রেখেছে সে। লোকটা আজকে তাকে পাত্তা না দিয়ে ভেতরে চলে গেলে সে নির্ঘাৎ একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে!

দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা, নতমুখে। পাঁচ··· চার··· তিন··· দুই··· ঠিক তার সামনে এসে পা দুটো থামল। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল একটা। সে শুনতে পেলো চেনা গলাটা বলছে, 'আপনারা ভেতরে যান প্লিজ। আমি আসছি।'

মুখ তুলে তাকালো অমৃতা। তিনি রোদ চশমাটা খুলে হাতে নিলেন। অমৃতার চোখে চেয়ে হাসলেন। সেই হাসি, যে হাসিটা দেখলে অমৃতার পাগল পাগল লাগে!

– 'কেমন আছ?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

অমৃতার ভেতরটা এক আশ্চর্য সুখের আবেশে অবশ হয়ে গিয়েছিল। সুখের পাশাপাশি বুকের মাঝে ব্যথার মতো কী যেন বিঁধছিল অনবরত। চোখ দুটি অকারণে হয়ে উঠেছিল ভাসা ভাসা, টলটলে। সে অনেক কষ্টে মুচকি হেসে বলল, 'ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন রাশেদ?'

স্ফটিক রঙের রোদ্দুরে ডোবা ওই বাসন্তী সকালটায়, ভাসা ভাসা, টলটলে চোখওয়ালা মুচকি হাসির অমৃতাকে হঠাৎ ভারি সুন্দর দেখতে লাগল। রাশেদ একটু সময় চুপ করে চেয়ে রইলেন ওই মুখের দিকে স্থির চোখে। তারপর মনের অনেক আবছা একটা কোণে তিনি টের পেলেন যে মেয়েটিকে দেখলে তাঁর মনটা হঠাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ বিনা কারণেই স্নিগ্ধতায় ছেয়ে যায়। এই স্নিগ্ধতা অনেকটা আচমকা আসা ঝাপটা বাতাসের মতো। সব ধরনের বাস্তবিক অনুভূতির ঊর্ধে। কোত্থেকে যেন হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসে সারাটা দেহ মন সূক্ষ্ম ভালোলাগায় একাকার করে দেয়। সেই ভালো লাগার ঝাপটাকে ধরে রাখা দায়। সে বন্দি থাকে না। আসে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে, ক্ষনিক পরেই আবার কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

– ‘আমি ভালো আছি। তুমি কী করছ এখানে? একলা দাঁড়িয়ে?’

প্রশ্নটা অমৃতাকে বেশ ভালোই বিব্রত করে তুলল। এখন সে কী উত্তর দেবে? মানুষটার সাথে দুটা কথা বলবার জন্যেই যে এই দাঁড়িয়ে থাকা একলা একলা, সেই নির্লজ্জ সত্য কথাটা কেন যেন তার এই মুহূর্তে একেবারেই বলতে ইচ্ছে হলো না। কী দরকার অতটা সস্তা হবার? একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, ‘আমি··· এই তো দাঁড়িয়ে আছি। এমনিই।’

– এমনিই?’

– ‘না মানে, ফুল দেখছিলাম।’

– ‘ফুল দেখছিলে?’ একটা ভ্রু উঁচু করে কপালে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করলেন রাশেদ।

অমৃতা কেশে গলা পরিষ্কার করল। স্মার্টভাবে বলার চেষ্টা করল, ‘হ্যাঁ, ওইযে দেখেন পানির ওপর শাপলা ফুটে আছে। খুব সুন্দর লাগছে গোলাপি রঙের ফুলটা দেখতে, তাই না?’

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে জলাশয়ের ওপর ফুটে থাকা শাপলার দিকে তাকালেন একবার। তাঁর মুখে ধারওয়ালা হাসিটা ফিরে আসলো আবার। অমৃতার চোখে চেয়ে তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ সুন্দর। কিন্তু বেগুনি রঙের ফুলটা সবচেয়ে সুন্দর!’

কথাটা বলা শেষ করেই তিনি পা বাড়ালেন। হেঁটে ঢুকে গেলেন রেস্টুরেন্টের ভেতর। অমৃতা কয়েক সেকেন্ড বোকার মতো তাঁর চলে যাওয়া পথটার দিকে চেয়ে থেকে স্বগতোক্তি করল, ‘বেগুনি ফুল?’ আশেপাশে তাকিয়ে সে কোনো বেগুনি ফুল খুঁজে পেলো না। একটু দূরের পলাশ গাছ ছেয়ে আছে লাল ফুলে ফুলে। কলাগাছ, বহেড়া আর শিমুল গাছের অরণ্যে কোথাও কোনো বেগুনি রঙের অস্তিত্ব চোখে পড়ল না তার।

২২

রেস্টুরেন্টে নাশতার বুফে চলছে। বেশ ভিড় আছে এখন। মানুষজন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছে প্লেটে খাবার তুলে নেবার জন্য। প্রায় পঁচিশ রকমের আইটেম সাজানো আছে টেবিলে। সাথে তাজা ফলমূল, ফ্রেশ ফ্রুট জুস্, চা এবং কফি। অমৃতা ভেতরে ঢুকে দেখল বিভা আর হৃদি কর্ণারের একটা টেবিল দখল করে বসেছে। এর মাঝে তারা খাওয়ার পালাও শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন রকম খাবারে ভরে গেছে টেবিল। অমৃতা ওদের সাথে যোগ দিল। আড়চোখে দেখল মানুষটা কাছাকাছিই বসেছেন দলবল নিয়ে। থানচি উপজেলার ইউ এন ও এসেছেন। নাশতার টেবিলে খুব জোরেশোরে আলোচনা চলছে। অমৃতাকে দেখতে পেয়ে বিভা বলল, ‘কী বলে মিস্টার ড্যাশিং ম্যান?’

অমৃতা বলল, ‘কী যে বলল, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।’

বিভা ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় দিয়ে বলল, ‘ক্যান? চাইনিজ ভাষায় কথা বলছে নাকি?’

– ‘আরে নাহ!’

– ‘হিব্রু ভাষায় বলছে?’

– ধুর।’

– ‘তাইলে বুঝস না ক্যান কথা?’

অমৃতা পানির বোতলের ক্যাপ খুলে দুই তিন ঢোক পানি গিলল। অপর হাতের উল্টো পাশ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, ‘আমি বললাম গোলাপি রঙের শাপলা ফুলটা খুব সুন্দর। উনি বললেন, বেগুনি রঙের ফুলটা সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু ওখানে কোনো বেগুনি ফুল ছিল না।’

কয়েক সেকেন্ড থমকানো চোখে অমৃতার দিকে চেয়ে থেকে হৃদি আর বিভা একযোগে হেসে উঠল। হৃদি হাসতে হাসতে বলল, ‘ওয়াও! আমার শ্বশুর তো অনেক রোমান্টিক আছে! আর তুই আসলে অনেক গাধা হয়ে গেছিস অমৃতা। প্রেমে পড়লে মানুষ এত গাধা হয়ে যায়। আল্লাহ!’

অমৃতা চোখ কটমটিয়ে বলল, ‘গাধা বলতেছিস ক্যান আমাকে?’

– ‘তো কী বলব? তুই নিজেই তো বেগুনি রঙের টি শার্ট পরে আছিস। তুই বুঝিস নাই উনি কী বলতে চাইছে?’

অমৃতা চট করে নিজের পরনের পোশাকের দিকে তাকালো একবার ঘাড় নিচু করে। সে কিছু একটা গায়ে চড়ানো দরকার বলেই চড়িয়ে ফেলে। বেশির ভাগ সময় তার

মাথায় সক্রিয়ভাবে এই বিষয়টা কাজ করে না যে ঠিক কোন জামাটা এই মুহূর্তে পরে আছে। বেগুনি ফুলের বিষয়টা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে একটা অপ্রতিরোধ্য খুশিতে তার সারা মুখ ঝলমল করে উঠল। পিঠে চট করে গজিয়ে গেলো দুটো অদৃশ্য ডানা। তারপর পাখির মতো উড়তে লাগল সে শূন্যে, মনে মনে! উড়তে উড়তে খানিক দূরে বসা মানুষটার চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছিল বারংবার। নিগূঢ় এক জালের বুনন তৈরি হচ্ছিল সকলের অলক্ষ্যে, দুটি মানুষের মাঝে। কেউ বুঝতে পারছে না কিন্তু জালের বিস্তার ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে! রোমেলা তার দুই বোনের পরিবার নিয়ে প্রবেশ করলেন রেস্টুরেন্টে। তিন বান্ধবীর দিকে নজর পড়ল না তার। দুই বোন আলাদা একটি টেবিলে বসলেন। তিনি নিজে বসলেন স্বামীর পাশে। সেই মুহূর্তে বন্ধুদলের ছেলেরাও প্রবেশ করল। তিন বন্ধু, সাথে অভিজিৎ। অমৃতার একটা বিষয় ভাবতে ভালো লাগছিল যে বিভা আর হৃদির ব্যবহার আজ যথেষ্ট স্বাভাবিক। রাশেদের ব্যাপারটা নিয়ে অন্যান্য দিনের মতো রেগে যায়নি ওরা। তাছাড়া গতরাতে আকাশ বলেছে যে সে অমৃতার ফিলিংসকে রেসপেক্ট করে। সেই থেকে মনটা এক স্নিগ্ধ তৃপ্তিতে ভরে আছে। আজ বিভা আর হৃদির সহজ সাধারণ ব্যবহার সেই তৃপ্তির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল। সে জানে বন্ধুরা খুব বেশি দিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে টিকতে পারবে না। সারা পৃথিবী উল্টোপথে হাঁটলেও, বন্ধুরা তার সাথেই হাঁটবে, হাতে হাত রেখে, পাশাপাশি। শুধু একটা ব্যাপার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। রুদ্র গতরাতে ব্যাপারটা শোনার পর থেকে আর একটি কথাও বলেনি তার সাথে। রাতে বেশ কয়েকবার রুদ্রর মোবাইলে ফোন করেছিল। রুদ্র ধরেনি। ফোন কেটে দিয়েছে। এখন এই সকাল বেলাতেও তার মুখখানা গম্ভীর। স্বভাবসুলভ আমুদে আচরণ উধাও। সব কিছু ঠিক থাকলে সে আসা মাত্র নাচতে নাচতে বুফের লাইনে দাঁড়িয়ে যেত। আবোল তাবোল কথা বলে লোক হাসাতো। কিন্তু আজ তাকে দেখাচ্ছে ম্লান, চিন্তিত এবং ক্লান্ত।

সামি বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে গেলো প্রথমেই। তারপর বন্ধুদের টেবিলে এসে কোনো ভূমিকা ছাড়াই হৃদিকে বলল, ‘তুই ফোন ধরিস না ক্যান?’

হৃদি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ফোনে চার্জ ছিল না।'

– 'মানে কী? তুই চার্জার নিয়ে আসিস নাই?'

– 'নিয়ে আসছি তো।'

সামি হঠাৎ হৃদির ডান কনুইটা খামচে ধরে জোর করে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। হৃদি আর্তনাদ করে উঠে বলল, 'আজিব, চা খাইতেছি তো!'

সামি গমগম করে বলল, 'চা পরেও খাওয়া যাবে। এখন বাইরে আয়। কথা আছে তোর সাথে।'

ওদের দুজনের বাক বিতণ্ডায় বাকি বন্ধুরা একটু চুপসে গিয়েছিল। বিভা অভিজিৎকে তাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'বসে রইলে কেন? যাও খাবার নিয়ে এসো। লাইন ধরো।' 'এটুকু বলে সে আবার কী মনে করে যেন সুর পাল্টে বলল, 'আচ্ছা তুমি বসো। আমি যাচ্ছি।' '

বিভার পেছন পেছন আকাশ আর অমৃতাও উঠল। রুদ্র বসেই ছিল। তার হাতে মোবাইল। চোখ নিবদ্ধ মোবাইলের স্ক্রিনে। অমৃতা ডাকল, 'এই রুদ্র, নাশতা খাবি না?'

রুদ্র চোখ না তুলেই দায়সারা গলায় বলল, 'খাব। একটু পরে।'

এদিকে হৃদির হাত ধরে সামির ওই হনহনিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা, হক এবং রোমেলা দুজনের কারোরই চোখ এড়াল না।

– 'তুই কি আমাকে এভয়েড করার চেষ্টা করতেছিস?'

কড়া ভাবে বলল সামি। ওরা রেস্টুরেন্টের পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আপাতত এখানটায় কেউ ভিড় করে নেই। সামির পরনে একটা নেভিব্লু টি শার্ট। গালে এবড়োখেবড়ো দাড়ি। কালো কোঁকড়া চুলগুলো কিছুটা অবিন্যস্ত। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

হৃদি গলায় একটু নির্বিকার ভাব আনার চেষ্টা করে বলল, 'এভয়েড করার চেষ্টা করব কেন?'

– 'তাহলে আমার ফোন ধরিস নাই কেন? ফোনে চার্জ দিস নাই কেন?'

– 'ইচ্ছা করে নাই তাই।'

– 'ইচ্ছা করে নাই?'

- 'করে নাই!'

– 'ফাইজলামি করিস?'

– ‘ফাইজলামির কী আছে?’

সামির মুখ দেখে মনে হলো রাগের চোটে তার ভেতরে যে কোনো মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘প্রব্লেম টা কী হৃদি? তুই এখানে আসার পর থেকে আমার সাথে এরকম করতেছিস কেন?’

হৃদি অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘আমি আবার কী করলাম!’ সামি হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে হৃদির গাল টিপে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল।

– ‘এটার মানে কী?

হৃদি সামির চোখে চেয়ে ম্লান গলায় বলল, ‘মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুই আমাকে আসলে সত্যিকারের ভালোবাসিস না।’

– ‘আমি তোকে ভালোবাসি না?’ টেনে টেনে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সামি।

-’ বাসিস কিন্তু… ইউ নো হোয়াট? ডিপ ডাউন ইনসাইড আই ফিল লাইক তুই… তুই আমাকে আন্ডারেস্টিমেট করতেছিস। দাম দিচ্ছিস না।’

সামির মুখ থেকে রাগের প্রকোপ কেটে গিয়ে হঠাৎ একটা দারুণ হতভম্ব ভাবের প্রাদুর্ভাব হলো।

– ‘কী বলতেছিস তুই এসব বোকার মতো?’

– ‘সামি শোন, তুই হয়তো এটাকে হীনমন্যতা বলতে পারিস। হিংসা বলতে পারিস। যা ইচ্ছা বলতে পারিস। বাট সত্যি আমার এরকম মনে হচ্ছে। আই ক্যান্ট হেল্প। এখন আমি কী করব বল?’

– ‘এরকম মনে হচ্ছে কেন?’

– ‘জানি না কেন মনে হচ্ছে। আর আমার মনে হয় তোর বাবা মা কখনওই আমাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে না। উনারা প্রস্তাব না দিলে তো বিয়েটা আল্টিমেটলি হবে না।’

– ‘তুই কী বলতে চাচ্ছিস?’

– ‘পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে বা ভাবতে পারতেছি না এখন। একটু সময় দে।’

– ‘কীসের সময়? হৃদি তোর সাথে আমি আমার বিয়ের আগের দিন পুরা ফ্যামিলির সাথে বিট্রে করে পালায় গেছিলাম। তুই কি ভুলে গেছিস?’

– ‘আমি ভুলি নাই। আমি জানি আমাকে ছাড়া তুই থাকতে পারবি না, কিন্তু আমার … আমার আরো কিছু দরকার!’

সামি বিমূঢ়ভাবে তাকায়, মন্ত্র উচ্চারণের মতো বিড়বিড় করে বলে, ‘আরো কিছু দরকার?

– ‘সামি! তুই বুঝবি না!

হৃদি কথাটা বলা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালো। দ্রুত পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল রেস্টুরেন্টের ভেতর। সামি আরো কয়েকটা মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জায়গাটায়।

২৩

মেঘের বাড়ি বোধহয় একেই বলে। গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘের দল পায়রার মতো উড়ছে চিম্বুক পাহাড়ের বুকে। ফিরোজা আকাশে চিকচিক করছে শেষ দুপুরের রুপো রঙের রোদ্দুর। প্রেতের মতো অট্টহাসি হেসে দাপটের সাথে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে ডাকাতিয়া বাতাস। সামি ড্রোন উড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। নব চত্বরের লাল সাদা জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরা। ড্রোন উড়ার আগে সবাইকে একত্রে একবার ক্যামেরার সামনে জড়ো হতে হবে। ড্রোন ক্যামেরা বন্ধুদের সবাইকে প্রথমে একবার ফ্রেমবন্দি করবে তারপর উড়ে যাবে আকাশে।

চত্বরজুড়ে নানা বয়সি লোকজনের ভিড়। জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০০ ফুট উঁচুতে। চত্বরের কিনার রেলিং দিয়ে ঘেরা। আকাশ রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে। খানিক বাদে বাদে সে ডান দিকে রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাটো একটা দলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ বিনা কারণে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় শব্দটা আচমকা তার কানে এসে লেগেছিল।

‘স্যার!’

আকাশ তাকাল পেছনে। থপথপ করে পা ফেলে প্রায় দৌড়ে আসছে একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। মেয়েটিকে আকাশ চেনে। তার ছাত্রী। কোনো এক বিচিত্র কারণে সে এই মেয়েকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ক্লাসে লেকচার দেবার সময় মেয়েটি মোটা চশমার আড়াল থেকে অদ্ভুত চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ঠোঁটে থাকে বিজলী হাসি। চোখের দৃষ্টি অনেকটা ফণা তোলা সাপের মতো। মনে হয় এই বুঝি ছোবল দেবে। মেয়েটির শরীরের ওজন আকাশের চেয়ে দ্বিগুণ হবে। ফোলা ফোলা ফর্সা গাল। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো বব চুল। একদিন ক্লাস শেষে মেয়েটি আকাশের রুমে ঢুকে পড়েছিল। হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটি তিন পাতার প্রেমপত্র। আকাশ মেয়েটিকে মিথ্যে করে বলেছিল যে তার গার্লফ্রেন্ড আছে। মেয়েটি গার্লফ্রেন্ডের কাহিনি শুনে সুর করে মুখের ওপর বলে দিয়েছিল ‘বিশ্বাস করলাম না!’

এরপর রোজ রোজ টেক্সট করত। গোটা একটা সেমিস্টার ধরে টানা চলেছিল তার এই টেক্সট টেক্সট খেলা। গেলো সেমিস্টারে পাশ করে ভার্সিটি ছাড়ল মেয়েটা। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল আকাশ। কে জানত বান্দরবানে এসে এই সর্পিণী নাগিনীর সাথে পুনরায় দেখা হয়ে যাবে? জানা থাকলে সে জীবনেও আসত না এই ট্যুরে। আকাশের পাশে রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিল। হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটিকে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে তরতর করে উঠে আসতে দেখে সে অবাক গলায় বলল, ‘কে এই রসগোল্লা?’

আকাশের মুখখানা তখন ঝুলে গেছে। ঝুলন্ত মুখ নিয়েই বলল, ‘কে আবার? সাক্ষাৎ নাগিন!’

খুশিতে ঝুমঝুম হয়ে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি বলল, ‘স্যার?’

স্যার শব্দটির পরে প্রশ্নসূচক সুরটি ঠিক কী কারণে আকাশ তা বুঝে পেলো না। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘হ্যাঁ?’

– ‘স্যার?’

– ‘হ্যাঁ স্যার। বলো!’

– ‘স্যার আপনি এখানে? বান্দরবানে?’ মেয়েটির গাল দুখানা হাসির দমকে এখন বেলুনের মতো ফুলে গেছে।

– ‘হ্যাঁ আমি বান্দরবানে।’ আকাশকে দেখে মনে হলো সে আরেকটু হলেই কেঁদে দেবে।

– ‘স্যার আমি জারা। আমাকে চিনতে পেরেছেন?’

– ‘হ্যাঁ জারা আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি।’ বলল আকাশ। কিন্তু নামটা সে আদতে ভুলে গিয়েছিল।

জারা খুশিতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘ওয়াও স্যার! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কী যে খুশি লাগছে!’

আকাশ আড়চোখে দেখল রুদ্র তেরছা ঠোঁটে হাসছে। সে জারাকে বলল, 'নাইস টু সি ইউ জারা। আমার ফ্রেন্ডরা অপেক্ষা করছে। আসি।'

কথাটা বলে আকাশ রুদ্রর হাত ধরে টানতে টানতে উপরে উঠতে লাগল। খাড়া রাস্তা বলে অত সহজে হাঁটা যায় না। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। রুদ্র বলল, 'রসগোল্লা কী চায়?'

– 'আরে এইটা তো ওই বদ মাইয়া যে আমারে লাভ লেটার দিছিল। বলছিলাম না?'

শুনে রুদ্র হো হো করে দুনিয়া কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'রসগোল্লাটা কিন্তু কিউট আছে মামা। ছোটখাটো একটা হাতির বাচ্চা।'

– 'কিউট নাকি কেউটে সাপ সেটা কিছুক্ষণ মিশলেই বুঝবি তাড়াতাড়ি পালা দোস্ত।'

চত্বরে এসেও নিরাপদ বোধ করছে না আকাশ। জারা তার পরিবারের সাথে দাঁড়িয়ে আছে খানিক দূরে। হা করে অপলক তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আকাশের মনে হচ্ছে মেয়েটি চোখ দিয়ে তাকে আস্ত গিলে খাবে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। জীবনে এত ভয় সে অন্য কোনো মেয়েকে দেখে পায়নি কখনো। তার বুক ধুকপুক করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

সামি ড্রোন উড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। রিমোট দিয়ে ড্রোন কন্ট্রোল করছে মনোযোগের সাথে। বিভা আর অভিজিতের যুগল ছবি তুলে দিচ্ছে রুদ্র। অমৃতা, আকাশ আর

হৃদি, সামির পাশে দাঁড়িয়ে আছে জড়ো হয়ে। অমৃতা আকাশের হাঁসফাঁস অবস্থাটা টের পেয়ে বলল, ‘তোর কী হইছে?’

– ‘কিছু না।’

– ‘মুখটাকে এরকম বানাইছিস ক্যান? বাথরুম আসছে? পেট খারাপ?’

– ‘আরে না!’

হৃদি বলল, ‘ক্ষিদা লাগছে?’

আকাশ চোরা চোখে জারার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘নারে ভাই!’ শব্দ দুটো বলা শেষ করা মাত্র সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হৃদির একটা হাত ধরে ফেলল। এরপর ওর হাত ধরে টানতে টানতে চত্বরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল হনহন করে। পেছন থেকে অমৃতা বলে উঠল, ‘মানে কী? কোথায় যাইতেছিস তোরা?

হৃদি ঘাড় ঘুরিয়ে অমৃতাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। আকাশ তার আগেই চাপা আর্তনাদ করে উঠল, ‘চুপ করে থাক। কথা বলিস না!’ এই ঘটনায় জারার ঠোঁটে ঝুলে থাকা মুচকি হাসির রেখাটা মুছে গেলো চকিতে সে বড়ই চোখ নিয়ে আকাশ আর হৃদির চলে যাওয়া দেখতে লাগল। অভিজিৎকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ছবি তুলতে তুলতে সে ক্লান্ত। কিন্তু বিভার মধ্যে ক্লান্তির ক ও নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে যেন নামিদামী কোন মডেল। ছবি তোলা শুধু তার নেশা নয়, পেশাও। তার পরনে ঘেরওয়ালা লম্বা একটা সাদা রঙের কামিজ। কামিজের ঘেরজুড়ে রয়েছে সোনালি

পাড়। কাঁধে ঝুলছে সোনালি ওড়না। তার মাথার চুলে ভারি স্টাইলিশ এক হাত খোঁপা। বোঝা যাচ্ছে ছবি তোলার জন্যেই আঁটঘাট বেঁধে সাজগোজ করেছে সে আজ। অভিজিতের গোবেচারা মুখটা দেখে রুদ্রর হাসি পাচ্ছিল। সে হাসতে হাসতে বিভাকে বলল, ‘বাপ, অনেক তো ছবি তুলছিস। এখন একটু আমাদের জামাই বাবুকে ছাড়। ছবি তুলতে চাইলে একা একা তোল। জামাই বাবু তো কাইন্দা দিবে আরেকটু হইলে।’

শুনে অভিজিৎ টিটকিরির হাসি হেসে বলল, ‘বিয়েটা একবার করে নাও না দাদা! তারপর হাড়ে হাড়ে টের পাবে বুদ্ধিমান লোকেরা কেন বিয়ে করতে চায় না।’

বিভা বরের পেটে একটা খোঁচা মেরে বলল, ‘এই এত কথা বলো কেন? হাসো হাসো। সুন্দর করে হাসো। না হাসলে ছবি বিশ্রী হয়ে যাবে।’

অমৃতা হঠাৎ রুদ্রর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ‘দোস্ত, তোর সাথে একটু কথা ছিল।’

‘বল।’ ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখেই বলল রুদ্র।

– ‘এভাবে বলতে পারব না। সিরিয়াস কথা।’

– ‘কাজ করতেছি দেখতেছিস না?’

অমৃতা চট করে রুদ্রর হাত থেকে ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ‘বালের কাজ তোমার। অনেক কাজ করছ। আর লাগবে না করা।’ কথাটা বলা শেষ করে সে বিভার হাতে ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘এত ছবি তুলার কী আছে। একটা ফটোই যথেষ্ট। এক জায়গা এক ফটো। একটা জায়গায়ই যদি একশোটা ফটো তুইলা ফেলো তাহলে অন্য জায়গায় গিয়া কী করবা? আর পাহাড়ে আসছ তুমি এরকম মাঞ্জা মাইরা আসছ ক্যান? পাহাড়ে মানুষ এইসব পইরা আসে? খ্যাত কোথাকার!

বিভা ঝেঁঝে উঠে বলল, ‘একশবার ছবি তুলব। আর একশবার মাঞ্জা মারব। আমার জামাইয়ের সাথে আমি ছবি তুলতেছি। তাতে তোমার কী? হিংসা হয়?’

দুই বান্ধবীর কাণ্ড দেখে অভিজিৎ হেসে ফেলল। অমৃতা ফিরে এলো রুদ্রর কাছে। বাতাসটা ঠাণ্ডা আর বড্ড একরোখা। সাঁই সাঁই করে বয়ে চলেছে গোটা চত্বরজুড়ে। অমৃতা একটা ফুলহাতা কালো রঙের শার্ট পরেছিল। শার্টের সুতি কাপড় ভেদ করে নির্লজ্জের মতো ওর শরীর ছুঁয়ে দিচ্ছিল দুষ্টু বাতাস। শীত করছিল ওর। দুই বাহু বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে রুদ্রর সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো সে। রুদ্রর গায়ে একটা ছাই রঙের টিশার্ট। অকাল্ট থেকে কেনা। শার্টের বুকের ওপর ভয়ংকর একটা চেহারা আঁকা এবং বড় করে ইংরেজিতে লেখা ‘দ্যা ডেভিল।’ ওর খোলা চুল উড়ছে। হাত দিয়ে চুলগুলো মুঠোবন্দি করার চেষ্টা করছে সে। ঠোঁটে ধরে রেখেছে একটা রাবার ব্যান্ড। অমৃতা ওর মুখের দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ‘তুই কি আমার ওপর রেগে আছিস?’

রুদ্র ঠোঁট থেকে রাবার ব্যান্ডটা তুলে নিল আঙুলে। অন্য হাত দিয়ে ধরে থাকা চুলের গোছায় রাবারটা পেঁচাতে পেঁচাতে বলল, ‘কোন দুঃখে রাগ করব তোর সাথে?’

– ‘তা তো আমি জানি না।’

– ‘আজাইরা কথা বলিস না।’

অমৃতা একটু অধৈর্যভাবে বলল, ‘সিরিয়াসলি রুদ্র। কী হইছে বল না!

চুল বাঁধা শেষ করে রুদ্র ধীরেসুস্থে ওর ক্যাটস আই চোখ দুটো অমৃতার চোখের ওপর স্থিরভাবে রাখল। বলল, ‘অমৃতা শোন, তুই একটা ভয়ংকর ভুল কাজ করতেছিস। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তুই বুদ্ধিমতী। একটু মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করলেই পুরা ব্যাপারটা তোর কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।’

অমৃতা বুঝতে পারল রুদ্র ঠিক কোন বিষয়ে কথা বলছে। সে পরিষ্কার গলায় বলল, ‘আমার মাথা ঠাণ্ডাই আছে। ভয়ংকর ভুল কাজটা করতে দোস্ত আমার ভয়ংকর ভালো লাগতেছে! কী করব বল?

রুদ্র আশেপাশে একটা সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হলো যে সামি এই মুহূর্তে নিরাপদ দূরত্বে আছে। সে এক পা এগিয়ে অমৃতার আরো কাছে আসলো।

‘লিসেন অমৃতা, আই অ্যাম গিভিং ইউ আ ওয়েক আপ কল। প্লিজ ওয়েক আপ!’

– ‘বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েক আপ দোস্ত। তুই ও তো মনীষাকে ভালোবাসছিস। মনীষা কম করে হলেও তোর থেকে নয় বছরের বড়। সেটা দোষের কিছু না?’

রুদ্র দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'মনীষা আমার ফ্রেন্ডের মা হয় না!

– 'হইলে কী করতি? পছন্দ করতি না?'

– 'না করতাম না!'

– 'ইউ নেভার নো! এরকম মনে হয়। অন্যের ব্যাপারে খুব সহজে মানুষ মতামত দিয়ে ফেলতে পারে। নিজের সাথে হুবহু একই রকম ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত রিয়েল জিনিসটা ফিল করতে পারে না।'

– 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস অমৃতা?'

অমৃতা ধীরস্বরে টেনে টেনে বলল, 'হ্যাঁ রুদ্র, আমি পাগল হয়ে গেছি। পাগল হওয়ায় যে এত আনন্দ তা আমি ওই লোকটাকে না দেখলে কোন দিন জানতাম না!'

– 'অমৃতা, তোর এই জিদটা তোকে কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দেবে না। নিজেও কষ্ট পাবি। সেই সাথে আরো কিছু মানুষকে কষ্ট দিবি।'

অমৃতা রুদ্রর একটা হাত আলতোভাবে ধরল। নরম গলায় বলল, 'অন্য কাউকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। আর আমার কষ্টের কথা কী বলব? আমার মনে হয় পৃথিবীতে

কিছু কিছু কষ্ট থাকে যেগুলো সুখের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর। তাই ওই সুন্দর কষ্টটা মাথা পেতে নিতে আমার কোনো আপত্তি নাই।'

– 'তোর কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নাই। তোকে আমি বুদ্ধিমতী বলে জানতাম।' খুব মন খারাপের গলায় বলে রুদ্র।

– 'বুদ্ধিমতীই ছিলাম। হঠাৎ বোকা হয়ে গেছি দোস্ত। তুই চিন্তা করিস না। সামিকে আমি কষ্ট দিব না। সামির আম্মাকেও কষ্ট দিব না। বিশ্বাস কর!'

রুদ্র কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল। সামিকে এগিয়ে আসতে দেখে হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেলো। সামি বলল, 'হৃদি কোথায়রে?'

অমৃতা হাত উঁচিয়ে ইশারা করে বলল, 'আকাশের সাথে গেছে। ঐদিকে।'

– 'কই গেছে?'

– 'জানি না।' নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিল অমৃতা।

২৪

– 'কোথায় যাচ্ছিস? সমস্যা কী তোর?' হৃদি আর্তনাদ করে বলে উঠল তৃতীয়বারের মতো।

সুন্দর পিচঢালা রাস্তা বয়ে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে, এঁকেবেঁকে। এই রাস্তায় দুটি ভিউ পয়েন্ট আছে। ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে পর্যটকরা বিশ্রাম নিতে পারবে। বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে পাহাড়ি সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারবে। ঢালু পথ বেয়ে দর্শনার্থীরা দলেদলে উঠে আসছিল। কেউ কেউ আবার নেমে যাচ্ছিল।

আকাশ আঁকুপাঁকু হয়ে বলল, ‘বিপদে আছি দোস্ত, আমারে বাঁচা!’

হৃদি থতমত খেয়ে গেলো, ‘কী হইছে? কী বিপদ?’

– ‘আমার এক ছাত্রী আমার পিছে লাগছে।’

– ‘তো সমস্যা কী? সবসময় তোরা মেয়েদের পিছে লাগিস, আজকে একটা মেয়ে তোর পিছে লাগছে। এটা তো আনন্দের বিষয়। ভয় না পেয়ে সেলিব্রেট করো শালা।’

আকাশ কুঁকড়ে গিয়ে বলল, ‘দেখিস নাই তো এই জন্যে বলতেছিস এসব। দেখলে বুঝতি। আস্ত একটা হাতির বাচ্চা। রসগোল্লার মতো মুখ।’

ততক্ষণে জারা ওদের অনুসরণ করে অনেকটা পথ এসে গেছে। পথের ধারের একটা শিমুল গাছের নিচে চোরের মতো ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর উল্টোপাশেই দাঁড়িয়ে আছে আকাশ আর হৃদি। দুই দলের মধ্যে দূরত্ব দশ কদমের মতো হবে। জারা বড় বড় চোখ মেলে, কান খাড়া রেখে চেয়ে আছে ওদের দিকে। আকাশ ওকে দেখামাত্র একেবারে পিলে চমকে উঠল। চট করে হৃদির দুটি হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘কিছু একটা কর। প্লিজ বাঁচা আমারে।’

আকাশের কাণ্ড দেখে হৃদি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, ‘এখন কি আমার প্রেমের অভিনয় করতে হবে তোর সাথে?’

– ‘হ্যাঁ তাই কর। বেটিরে আমি আগে একবার বলছিলাম আমার গার্লফ্রেন্ড আছে। বেটি বিশ্বাস করে নাই।’

– ‘কেন কষ্ট দিচ্ছিস বেচারিকে? আহারে আমার তো দেখে কিউট লাগতেছে। কী সুন্দর গোল্লা গোল্লা মুখ!’

আকাশ হৃদির হাত ধরে টেনে রাস্তার আরেকটু কিনারে নিয়ে আসলো। ওদের মাথার ওপর ছাউনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি পলাশ গাছ। আগুন রঙের ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছটা। বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে চিরল পাতায়। ঝিরিঝিরি একটা মিহি শব্দ হচ্ছে সেই বাতাসে। এই পাহাড়ি রাস্তার দুপাশেই খাদ। খাদের ওপর নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ।

হৃদি বলল, ‘কিন্তু প্রেমের অভিনয় তো আমি করতে পারি না দোস্ত।’

– ‘কিছু করতে হবে না। হাত ধরে চুপচাপ দাঁড়ায় থাক।’

হৃদি অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, ‘শুধু দাঁড়ায় থাকলেই হবে?’

– ‘হুম হবে।’

হৃদি আকাশী আর সাদার মিশেলের একটা সালওয়ার কামিজ পরেছিল। কোমর পর্যন্ত চুলগুলো খোলা। চোখের কোল ভরাট করে কাজল পরেছে সে। কপালের মাঝ বরাবর একটি কালো টিপ। মুখে এসে পড়েছে চম্পক রঙের এক টুকরো ঝিকিমিকি রোদ্দুর। সেই টুকরো রোদ্দুরে চিকচিক করছে নাকের ডগা। আকাশ হঠাৎ ওর ওই রোদে ডোবা মুখখানার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলে উঠল, 'আরে দোস্ত, তোরে তো খুব সুন্দর লাগতেছে!'

হৃদির চোখে একটা প্রচ্ছন্ন খুশি খুশি ভাব ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই চোখে এসে ভর করল হালকা গম্ভীর ভাব। বলল, 'এটা কি সত্যিকারের কমপ্লিমেন্ট ছিল? নাকি অভিনয়ের অংশ?'

– 'কীসের অভিনয়? সত্যিই তোকে অনেক সুন্দর লাগতেছে।'

শুনে হৃদি হাসল। আজ একটু যত্ন করেই সেজেছিল সে। কিন্তু যার জন্য সাজা, সেই মানুষটা একটাবারের জন্যে ভুল করেও প্রশংসা করেনি 1 হৃদির প্রশংসা করা যেন পাপ। এই যে আকাশ কত সহজে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিল। কত ভালো হতো যদি সামিও মুখের ওপর এমন হুটহাট প্রশংসা করে বসত! ভাবতে ভাবতে হৃদির কপালে ধীরেধীরে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠছিল।

– 'কী হলো? কী ভাবতেছিস?'

– 'ভাবতেছি যে, তোর কাছে সুন্দর লাগলে কী হবে? যার জন্য সাজলাম সে তো করুণা করেও কিছু বলল না।'

– ‘বাহ্, এর মানে আমার বলার কোনো দাম নাই?’

কথাটা বলতে বলতে আকাশ একটা বেশ বড়োসড়ো কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল। খাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে, ধোঁয়া ধোঁয়া উড়ন্ত মেঘ গুচ্ছর ওপর চোখ রেখে। বসল হৃদিও ওর পাশাপাশি। কাছেই পিটিশ ঝোপের মধ্যে কয়েকটা টুনটুনি পাখি উড়ছিল। ডাকছিল টিউটিউ করে। জারা তখনও দাঁড়িয়ে আছে ওদের পেছনে। অখণ্ড মনোযোগের সাথে দেখছে দুজনকে।

– ‘দাম থাকবে না কেন? দাম আছে। কিন্তু সামির চোখে আমি সুন্দর না কেন, এটা তুই বলতে পারিস?’

আকাশ এবার একটু বিরক্ত গলায় বলল, ‘তোর এইসব নকড়া আমার একদম পছন্দ না। আচ্ছা সুন্দর হইলেই কি সবসময় বলতে হবে নাকি?’

– ‘একটু বললে কী হয়?’ করুণ শোনায় হৃদির গলা।

‘বলতে হবে কেন? তুই জানিস না তুই সুন্দর?’

– ‘না জানি না।’

এবার আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে হৃদির মুখের ওপর পূর্ণ চোখ মেলে চেয়ে বলল, ‘জেনে রাখ হৃদিতা তুই অনেক সুন্দর! তোর সৌন্দর্যটা খুব স্নিগ্ধ। দেখলে মন পবিত্র হয়ে যায়।’

হৃদি আপ্লুত স্বরে বলল –’বাহ্, তুই কী সুন্দর করে বললি দোস্ত! এত সুন্দর করে এর আগে আমাকে কেউ কোনোদিন বলে নাই।’

– ‘সব সময় এসব বলতে হয় না। মনে মনে রাখতে হয়।’

– ‘সব সময় বুঝি তোর আমাকে সুন্দর লাগে?’

আকাশ প্রশ্নটা শুনে একটু সময় কী যেন ভাবল ভ্রু কুঁচকে। তারপর বলল, ‘প্রায়ই লাগে!’

হৃদি মিটমিট করে নিজের মনে হাসল একটু। তারপর আকাশের কাঁধের ওপর ডান হাতের পাঁচ আঙুল বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর নিজের চিবুকটা রাখল। আহ্লাদী গলায় বলল, ‘তাহলে এরপর থেকে যখনই আমাকে সুন্দর লাগবে তুই আজকের মতো মুখের ওপর বলে দিবি। কেমন?’

আকাশ বাঁকা গলায় বলল, ‘ইশ নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভালো লাগে তাই না?’

– ‘কার না ভালো লাগে? তবে এবার কিন্তু গোল্লা মেয়েটা নির্ঘাৎ মনে করবে আমরা প্রেম করছি। আহারে বেচারি। কষ্টই হচ্ছে আমার ওর জন্য।’

কথাটা শুনে আকাশ খুব হাসতে লাগল। ওর আকাশময় হাসিটা। যে হাসি হাসলে চোখও হাসে। ওদের তখনও নজরে পড়েনি যে জারা এরমাঝেই জায়গাটা থেকে সরে গেছে। ও চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পথে সামিকে দেখা গেলো। তার

হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। পরনে কালো জ্যাকেট, কালো জিন্স। হৃদি আর আকাশের খোঁজেই এসেছিল সে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করেই চোখ পড়ল গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা দুই যুবক যুবতীর ওপর। হৃদির চিবুক তখনো আকাশের কাঁধের ওপর রাখা। দুজনে বসে আছে খুব কাছাকাছি। কিছু একটা বলছে হৃদি আর আকাশ খুব হাসছে। সামি থমকে গেলো। কেন যে অমনভাবে থমকে গেলো সে কে জানে! একটা ব্যাখ্যাতীত অস্বস্তিকর অনুভূতিতে গাঁট হয়ে রইল ভেতরটা অল্প কয়েকটা ক্ষণ। চেয়ে রইল ওদের দিকে নিষ্পলক! তারপর একটা কথাও না বলে ফিরে চলল।

২৫

ঠিক হয়েছে আজ রাতে কেউ ঘুমোবে না। সারা রাত আড্ডা হবে। আড্ডার জন্য ওরা গিয়ে বসবে রিসোর্টের পুল সাইডে। এই রিসোর্টে ইনফিনিটি সুইমিংপুল আছে। পুলে নামলে মনে হয় পাহাড়ের কোলে কোনো এক প্রাকৃতিক জলাশয়ে বুঝি সাঁতার কাটা হচ্ছে। সন্ধের পর মেয়েরা তাদের নিজস্ব রুমে এসেছিল সাজসজ্জা পাল্টাবে বলে। বিভা ঢাকা থেকে চিরুনি আনতে ভুলে গেছে। বিছানার ওপর বসে হৃদির চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল সে। হৃদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ রিমুভার দিয়ে ঘষে ঘষে চোখের কাজল তুলছিল। আর অমৃতা চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায়।

বিভা চোখ না তুলেই বলল, ‘তোর কী হইছে? মতলবটা কী?’

অমৃতা হাঁটা থামিয়ে বলল, ‘দোস্ত লোকটার সাথে আমি দেখা করতে চাই।’

বিভা চিরুনি চালানো বন্ধ করে চোখ তুলে তাকালো অমৃতার দিকে, ‘কী? কী বললি?’

– ‘দেখা করব!’

– ‘মাথার মধ্যে কি গোবর? তুই না কত বড় এডভোকেট? এরকম গোবরভর্তি মাথা নিয়া ওকালতি করস ক্যামনে?’

অমৃতা অনুনয় বিনয় করে বলল, ‘প্লিজ দোস্ত আজকে একটা দিন দেখা করি? আর করব না। দ্যাখ ঢাকায় চলে গেলে উনার সাথে আমার আর কোনোদিনও দেখা হবে না।’

– ‘কে বলছে দেখা হবে না? তুমি কোনো না কোনো বাহানায় নাচতে নাচতে যাবা দেখা করতে। তোমারে আমার চিনা আছে।’

– ‘না করব না। লাস্ট এক মাস তো দেখা হয় নায়। প্লিজ আজকে একটু ব্যবস্থা করে দে!

– ‘আমি কী করব? আমার কী করার আছে এখানে? আজিব!’

হৃদি ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এসে বলল, ‘দ্যাখ অমৃতা, তোর দেখাদেখি আমার শ্বশুর মশাইও কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখন। এইসব কী হ্যাঁ? বেগুনি ফুল সুন্দর মানে? ঢং নাকি এইগুলা? শাশুড়ি জানলে কী হবে জানিস?’

বিভা বলল, 'তোর শ্বশুরের আর দোষ কী? সারাক্ষণ যদি আগুনের মতো সুন্দর একটা জোয়ান মাইয়া পিছন পিছন ঘুরে তাইলে তো ভাই বনবাসে থাকা সাধু সন্ন্যাসীর ধ্যানও ভেঙে যাবে। সব দোষ এই বেগুনি সুন্দরীর। উনার দোষ নাই!'

বিভা আর হৃদির কথা শুনে হেসে ফেলল অমৃতা, 'আচ্ছা এসব কথা তোমরা পরে বইল। এখন একটা বুদ্ধি দাও কীভাবে দেখা করব।'

– 'টেক্সট কর।' বিভার মতামত।

অমৃতা ঠোঁট উল্টে বলল, 'ব্যাটা জীবনেও টেক্সটের রিপ্লাই দেয় না। কত সুন্দর একটা কবিতা পাঠাইছিলাম একদিন। সেইটারও রিপ্লাই দেয় নায়।

শুনে হৃদি বিভার হাতে একটা চিমটি কেটে ঠেসমারা গলায় বলল, 'দ্যাখ না, আবার কবিতাও পাঠায়!'

– 'একবারই পাঠাইছিলাম ভাই! এরকম করার কিছু নাই।'

– 'টেক্সট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। তুই টেক্সট কর যদি উনি রাজি হয় তাইলে আমরা হেল্প করতে পারি। তবে এটাই লাস্ট। প্রমিজ করতে হবে যে জীবনে আর কখনো তুই উনার সাথে দেখা করবি না।

অমৃতার এতক্ষণের হাস্যোজ্জ্বল মুখটা একথা শুনে দপ করে নিভে গেলো। ম্লান গলায় সে বলল, 'প্রমিজ করতে হবে?'

হৃদি দৃঢ় গলায় বলল, ‘হ্যাঁ। এই প্রমিজ যদি করতে পারিস তাহলে আমরা তোকে হেল্প করতে পারি। নইলে…’

– ‘নইলে?’

– ‘নইলে আমার শাশুড়িকে গিয়ে বলে দিব।’

অমৃতা হেসে ফেলল, ‘এটা তোরা জীবনেও করবি না।’

– ‘কে বলছে করব না? একশবার করব।’

অমৃতা এ কথার পরে কিছু বলল না। চুপ করে বসে রইল বিছানার ওপর। মাথা নিচু করে। বিভা বলল, ‘কি প্রমিজ করবি না? ঢাকায় গিয়ে আবার দেখা করবি?’

– ‘যদি দেখা হয়ে যায়?’

– ‘জীবনেও দেখা হবে না। আর দেখা হয়ে গেলে সেটা অন্য কথা। তুমি নিজ থেকে দেখা করবা না। আজকেও দিতাম না দেখা করতে। কিন্তু তুমি কান্নাকাটি করতেছ দেখে আমরা তোমাকে পারমিশন দিচ্ছি। বুঝছ?’

অমৃতা বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ সে বুঝেছে। ক্ষীণ গলায় বলল, 'আচ্ছা প্রমিজ করলাম। নিজ থেকে দেখা করব না। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেলে সেই দোষ আমার না।'

– 'তাহলে এখন টেক্সট কর। দেখি কী রিপ্লাই দেয়।' বলল বিভা চিন্তিত গলায়।

অমৃতা একটা বড় শ্বাস ফেলে মোবাইলটা হাতে নিল। অনেকটুকু সময় নিয়ে একটা মাত্র লাইন লিখল ইংরেজিতে, 'ক্যান উই মিট?'

লেখার পর কাঁপা হাতে চোখ বন্ধ করে মেসেজটা সেন্ড করল। শব্দ করে বলল 'বিসমিল্লাহ!

২৬

একটা হলুদ আলো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল। সামি হাতের আঙুলে ধরে থাকা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। নাচতে নাচতে এগিয়ে আসা টর্চের আলোটার দিকে তাকিয়ে নিস্তরঙ্গ গলায় প্রশ্ন করল, 'কে?' আগন্তুক তাৎক্ষণিকভাবে কোনো উত্তর দিল না। আঁধারে মিশে থাকা শরীরটা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল নিচে। কয়েক ধাপ নেমে কাছে আসতেই টর্চের আলোতে তার মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

– 'কী ব্যাপার?'

সামির পাশে কাঠের সিঁড়ির ওপর বসতে বসতে প্রশ্ন করল আকাশ। মোবাইলের টর্চ নিভিয়ে দিল। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার তীব্র ঝালা। বন্ধুরা সবাই পুলসাইডে গিয়ে বসেছে। সামিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। মোবাইলের চার্জার নেবার জন্য আকাশের একবার কটেজে আসতে হয়েছে। আসবার পর পেছন দিকের সিঁড়িতে সামিকে আবিষ্কার করল আচমকা। অন্ধকারে ওকে খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর ব্যাপার ছিল। হঠাৎ সিগারেটের আগুনটা নজর কাড়ল। শূন্যে ওঠানামা করা অগ্নিবিন্দু দেখেই বুঝতে পারল সে, এই আঁধার মানুষ সামি ছাড়া অন্য কেউ না।

– ‘কী ব্যাপার মানে?’ প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করল সামি।

– ‘এইখানে একলা একলা বইসা আছস কেন? ফোন বন্ধ কেন?

– ‘বন্ধ না।’

– ‘তাহলে তোর ফোনে যায় না কেন?’

– ‘কী জানি! নেটওয়ার্ক প্রব্লেম মনে হয়।’

– ‘তুই ঠিক আছস?’

– ‘হুম।’ একটু গম্ভীর শোনায় সামির গলা।

‘সবাই খুঁজতেছে তোরে। চল যাই।’

– ‘তুই যা। আমি একটু পরে আসতেছি।’

আকাশ ভ্রু কুঁচকে তাকালো সামির দিকে। ঝুপসি অন্ধকারে ডুবে থাকা অস্পষ্ট মুখটায় কী যেন খুঁজল কয়েক সেকেন্ড। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল,

– ‘ড্যুড, ইজ এভরি থিং অলরাইট?’

সামি চোখাভাবে বলল, ‘হৃদি কী বলতেছিল তখন?’

– ‘কখন?’ আকাশ অবাক।

– ‘বিকালে।’

– ‘বিকালে?’

– ‘পাহাড়ে!’

আকাশের মুখে একটা ধাঁধাঁ খেলে গেলো, ‘পাহাড়ে মানে? কীসের কথা বলতেছিস?’

– 'বিকালে দেখলাম তোরা দুইজন গাছতলায় বইসা কথা বলতেছিলি। কী কথা বলতেছিলি?'

আকাশ হতভম্ব গলায় বলল, 'মানে কী?'

– 'বুঝতে এত সমস্যা হইতেছে কেন? বাংলা ভাষায়ই তো কথা বলতেছি।'

সামিকে হঠাৎ কেমন দুর্বোধ্য ঠেকল আকাশের কাছে। সন্ধ্যা থেকেই লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। রিসোর্টে ফিরে আসার সময় সামি গাড়ির মধ্যে কারো সাথে কোনো কথা বলেনি। পৌঁছুবার পর থেকেই লাপাত্তা। বন্ধুরা ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছে তার মোবাইলে। কিন্তু ফোনের লাইন কিছুতেই লাগছে না।

আকাশ গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, 'কেন জানতে চাইছিস?'

এ প্রশ্নে সামির মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেলো না বটে, তবে একটা তেজের হলকা টের পাওয়া গেলো। সে জাড় গলায় বলল, 'কেন? জানতে চাইলে কোনো সমস্যা আছে?'

– 'থাকতেই পারে।'

– 'আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে তোর কী কথা হইছে, সেইটা আমি জানতে চাইতে পারি না?'

আকাশ চমকে উঠল।

– 'কী বললি?'

– 'যা বলার একবারই বলছি। বারবার বলব না।'

আকাশ হতচেতন ভাবে চেয়ে রইল সামির দিকে। বুকের মধ্যে অনির্বচনীয় এক ব্যথা টের পাচ্ছে সে, কিন্তু মাথায় কোন শব্দ খেলছে না এই মুহূর্তে। মস্তিষ্ক শূন্য। অনেক কষ্টে শূন্য মস্তিষ্ক থেকে হাতড়ে হাতড়ে কয়েকটা এলোমেলো শব্দ খুঁজে নিয়ে সে বলল, 'তোর গার্লফ্রেন্ডটা আমার কী লাগে? তুই জানিস?'

সামি উত্তর দিল না। লাইটার দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো সময় নিয়ে। আকাশ এবার চড়া গলায় বলল, 'উত্তর দিস না কেন?'

– 'কী লাগে?' কিছুটা নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করে সামি।

– 'শালা! আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে কী কথা কইছে সেটা তোরে বলা লাগবে কেন?'

– 'কী এমন কথা কথা বলতেছিলি হাতে হাত ধইরা? যা আমারে বলা যায় না?'

কথাগুলো বলার সময় সামি লক্ষ্য করল না আকাশের মুখে ধীরেধীরে একটা কষ্টের নীল ছাপ পড়ছিল। অদ্ভুত তোলপাড় হচ্ছিল তার বুকের ভেতর। রাগ হচ্ছে। অন্ধ

বোবা রাগটা শুঁয়োপোকার মতো রোমকূপে রোমকূপে কামড়াতে শুরু করেছে। সে সামিকে কিছু না বলে হঠাৎ করেই ফোন হাতে নিয়ে হৃদির নম্বরে ডায়াল করল। খুব দ্রুত ফোন রিসিভ করল হৃদিতা। আকাশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'তুই একটু আমাদের কটেজে আয় তো। এখুনি আয়!'

– কেন?'

– 'দরকার আছে। শোন ব্যাকসাইডের সিঁড়িতে আসবি।' সামি বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল, 'ওরে ডাকতেছিস ক্যান?'

আকাশ কোনো উত্তর দিল না। কাঠ হয়ে বসে রইল। সামি উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। সিঁড়ির রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল তারপর অধৈর্য গলায় বলল, 'চুপ কইরা আছিস যে?'

আকাশ এবারেও কিছু বলল না। কথা না বলার ব্রত নিয়েছে যেন সে। হৃদি আসলো মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। আসামাত্র চ্যাঁচামেচি করে বলে উঠল, 'এই অন্ধকারে বইসা আছিস ক্যান তোরা?

আকাশ কোন ভূমিকা ছাড়াই উত্তেজিত গলায় বলল, 'হৃদি শোন, তোর বয়ফ্রেন্ড আমারে জিগাইতেছে যে আজকে বিকালে তুই আর আমি গাছ তলায় হাত ধইরা বইসা কী কথা বলতেছিলাম। আমি কি তারে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিব? যেহেতু তুই আমার ফ্রেন্ড তাই ওরে কিছু বলার আগে তোর পারমিশন আমার নিতে হবে!

হৃদি বিস্ময়ে ডুবে গিয়ে বলল, 'এটার মানে কী? আমরা কী কথা বলতেছিলাম তা দিয়ে ওর কী?'

সামি তখনো রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনোযোগের সাথে সিগারেট ফুঁকছে। তার আচরণে কেমন একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক না। হৃদি অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'কাহিনি কী আমারে খুইলা বল। আমি কিছুই বুঝতেছি না।'

আকাশ বলল, 'না বুঝার কী আছে? সামি জানতে চায় ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে আমার কী কথা হচ্ছিল।'

বিষয়টা পুরোপুরি বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল হৃদির। প্রথমত, আকাশের সাথে তার গাছতলায় বসে থাকার দৃশ্যটা জারা ব্যতীত অন্য কারো দেখে থাকার কথা নয়। আর সামি যদি সেই দৃশ্য দেখেও থাকে তাহলে তার উচিত ছিল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধু দুজনকে নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়া। তা না করে এতক্ষণ বাদে আকাশকে আলাদা ভাবে সেই ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার কারণ কী? সামি তো কখনও এমন সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী ছিল না। হঠাৎ তার কী হয়ে গেলো?

একটা প্রগাঢ় হতভম্ব ভাব হৃদির মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে বলতে পারল, 'আমরা কী কথা বলতেছিলাম সেটা ওরে বলব ক্যান? আমাদের পার্সোনাল কথা থাকতেই পারে।'

– 'পার্সোনাল কথা আবার কীসের? তোরা কি ভুলে গেছিস যে আমাদের বন্ধুদের কিছু লুকানোর নিয়ম নাই?' হৃদি ঝাঁঝালো গলায় বলল, –'তাহলে তুই যখন

আমাদেরকে দেখছিস, তখন জানতে চাস নাই কেন? চোরের মতো দূর থেকে দেইখা পালায় যাওয়ার মানে কী?’

সামি একটু কুণ্ঠা নিয়ে বলল, ‘কেন যেন কিছু বলতে মন চায়নায়।’

– ‘আজিব!’ অস্ফুটে বলল হৃদি।

– ‘ওকে, অনেস্টলি স্পিকিং, তোদেরকে ওইরকম ইন্টিমেট অবস্থায় দেখে আমার ভালো লাগে নাই। কেন ভালো লাগে নাই তা আমি জানি না। তোরা আমার ফ্রেন্ড। তাই মনের মধ্যে চেপে না রেখে বলে দিলাম সরাসরি।’

হৃদি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে ছিল সামির দিকে। অস্বস্তির কাটা বিঁধছিল বুকে। সেই সাথে এক নিদারুণ সীমাহীন লজ্জা। আকাশ তার বন্ধু। সহজ বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয়, প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধু। সেই প্রাণের চেয়ে প্রিয়বন্ধুর সামনে এতটা লজ্জিত সে জীবনে এই প্রথমবারের মতো বোধ করল। হঠাৎ মনে হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর প্রকৃত অর্থে নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করাই মানবিক সম্পর্কের মূল ধর্ম। সামি এবং আকাশ দুজনেই তার ভীষণ কাছের মানুষ। কিন্তু হঠাৎ করেই এই কাছের দুটো মানুষ যেন আয়নার প্রতিবিম্বের মতো উল্টে গেছে। এদের দেখা যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এরা কেউই যেন সত্য নয়। যেন আয়নার ভেতরের উল্টো জগতে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। আজকের ঘটনাটা যদি আকাশ না হয়ে অন্য কোনো পুরুষকে কেন্দ্র করে ঘটত তাহলে হৃদি হয়তো খুশিই হতো মনে মনে এই ভেবে যে সামি তাকে অন্য কারো পাশে দেখে সহ্য করতে পারেনি। এটা হয়তো তার ভালোবাসারই একরকম বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছুতেই খুশি হতে পারছে না। বরং এক অবিমিশ্র কুণ্ঠাবোধে কুঁকড়ে গেছে সমস্ত দেহ মন। সামি তাকে অপমান করেছে! তাদের বন্ধুত্বকে অপমান

করেছে। এই অপরাধের ক্ষমা নেই! সে তারস্বরে বলল, 'আমাদের একসাথে দেইখা তোর ভালো লাগে নাই কেন? তুই কি জীবনে এই প্রথমবার আমাদের একসাথে দেখছিস?'

সামি মিনমিন করে বলল, 'না আগেও দেখছি।'

আকাশ এতক্ষণে কথা বলল, 'শোন তোরা। এসব ঝগড়া পরে করিস। আমি চলে যাচ্ছি। আমি যাওয়ার পর প্রাণ খুলে ঝগড়া করিস। কিন্তু সামি! যাওয়ার আগে তোরে একটা কথা বলতে চাই। কান খুলে শোন।'

– 'বল। শুনতেছি।'

– 'তুই মনের কথা বইলা দিছিস, এ জন্যে তোরে থ্যাংকস। এখন আমিও একটা মনের কথা বলি, কেমন? অনেক কষ্ট পাইছি আজকে তোর আচরণে। কিন্তু এটা জেনে রাখ যে হৃদিতা আমার ফ্রেন্ড আর ওরে তুই কোনোভাবেই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবি না।' এটুকু বলে সে নিজের হাতটা সামির মুখের সামনে তুলে ধরে আঙুলে তুড়ি বাজালো পরপর দুবার। শক্ত গলায় বলল, 'কথাটা মনে থাকে যেন!'

ঘুরে দাঁড়ালো আকাশ। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। ও চলে যাবার পর হৃদি চাপা গর্জনের সাথে বলল,

– 'আমি আকাশের হাত ধরছি দেখে তুই এত জ্বলতেছিস ক্যান?'

– 'হাত ধরাটা ম্যাটার না। তুই ওর কাঁধে মাথা রেখে খুব হাসতেছিলি। আমার সাথে থাকার সময় এই হাসি কই থাকে? আমারে তো বলছিস তোর নাকি আমারে দিয়া হয় না। আরো কিছু লাগবে। আরো কিছুটা কী? গাছতলায় বইসা এইসব রংঢং করা?'

ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠল হৃদির। ধিক্কার দিয়ে উঠে বলল, 'ছিঃ সামি! হাও কুড ইউ বি সো মিন! তুই… তোর সাথে আমার কথা বলতেও ঘেন্না হচ্ছে।'

হৃদির মোবাইলে অমৃতা ফোন করছিল। সে সামির সাথে আর একটা কথাও না বলে ফোন কানে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। সামি নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল ঠাঁয়। মেঘ ডাকছে আকাশে। চারপাশ বড্ড গুমোট। ঝড় আসবে বোধহয়। সামি অন্ধকার অন্তরীক্ষের দিকে মুখ তুলে চাইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকারের মতো বেরিয়ে আসলো তার বুক চিরে। মনে হলো যেন ওই ঘন কালো, গম্ভীর মেঘগুলো জমিনে নেমে এসে ধীরেধীরে তার মনের আকাশে ভিড় জমানো শুরু করেছে। বড়ই বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল সে।

২৭

সুইমিংপুলের পাশে পেতে রাখা চেয়ারে বসে আছে বন্ধুরা। ওরা ছাড়াও আরো তিন চারটি পরিবার এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে পুলসাইডে। এর মাঝে এক দল ছেলে মেয়ে সুইমিংপুলে নেমে গেছে। দুটি তরুণী মেয়ে হলদে বৈদ্যুতিক আলোর নিচে জলপরির মতো সাঁতার কাটছে। রুদ্র আর বিভা মনোযোগ দিয়ে জলপরি দুজনকে দেখছে। অমৃতা বসে আছে চুপচাপ। তার হাতে ধরা সেলফোন। মিনিটে কম করে হলেও দশবার সে ফোনের পর্দার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটাকে মেসেজ পাঠিয়েছে সন্ধ্যা সাতটায়। ঘড়িতে এখন বাজছে রাত নটা। এখন পর্যন্ত কোনো রিপ্লাই আসেনি। হ্যাঁ অথবা না, কিছু একটা তো জানানো উচিত, নাকি? লোকটার অভদ্রতা দেখে

অবাক না হয়ে পারছে না অমৃতা। সারা শরীর অপমানে জ্বলে যাচ্ছে। রক্তের কণায় কণায় ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। অভিজিৎ অমৃতার অস্থিরতাটা লক্ষ্য করছিল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। এবার সে বলল, 'তুমি কি কিছু নিয়ে টেন্সড?'

অমৃতা অভিজিতের পাশের চেয়ারেই বসে ছিল। প্রশ্নটা শুনে সে পাশ কাটানো গলায় বলল, 'না না। আমি ঠিক আছি।'

আকাশ চলে এসেছে ততক্ষণে। তার চোখমুখ শুকনো। সে চুপচাপ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। আকাশের পিছ পিছ হৃদিও আসলো। তার মুখটাও বড় থমথমে। বন্ধুদের কাছাকাছি গোল হয়ে একটি পাঁচ সদস্যের দল বসে ছিল। তিনজন পুরুষ এবং দুজন নারী। দুজন পুরুষের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠায়। অন্যজন বয়সে যুবক। নারী দুজন প্রৌঢ়া। এদের মধ্যে একজন নারী খুব ভালো গান করেন। এর মাঝেই তিন চারটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ফেলেছেন তিনি। সুইমিংপুলে সাঁতরে বেড়ানো মেয়ে দুটি খুব সম্ভবত এদেরই কারো মেয়ে হবে।

রুদ্র আর অভিজিতের মাঝখানে বিভা বসে ছিল। রুদ্র বিভাকে ডিঙিয়ে অভিজিৎকে বলল, 'দাদাবাবু, দুইটার মধ্যে কোনটাকে আপনার ভালো লাগতেছে?'

অভিজিৎ ভারি ইনোসেন্ট গলায় প্রশ্ন করল, 'কী বিষয়ে কথা বলছ?'

রুদ্র বিরক্ত হলো অভিজিতের বোকাটে প্রশ্ন শুনে।

– ‘আপনার চোখের সামনে দুইটা পরির মতো সুন্দর মেয়ে জলকেলি করতেছে। আপনি দেখতেছেন না?’

বিভা ঝেঁঝে উঠে রুদ্রকে বলল, ‘এই লুনুষের বাচ্চা লুনুষ! আমার জামাইটারে খারাপ বানাইতেছিস কেন? এত বড় সাহস? আমি মানুষ জামাই চাই। লুনুষ জামাই চাই না।’

রুদ্র বলল, ‘ওরে বাবা, তোর জামাই হইছে দেখে কি মেয়ে দেখতে পারবে না?’

– ‘না পারবে না!’

অভিজিৎ হাসতে হাসতে রুদ্রকে বলল, ‘এবার বোঝো ভাই, বিয়ে কী জিনিস। একদম দিল্লিকা লাড্ডু। খেলেও পস্তাবে। না খেলেও পস্তাবে।’

বিভা রুদ্রর একটা কান মলে দিয়ে বলল, ‘এখন মেয়ে দেখা বন্ধ করে গান কর। ঐ মহিলা কি স্মার্ট দেখছিস? একটার পর একটা গান গেয়ে গেলো। তুই কী করতেছিস বসে বসে?’

– ‘মেয়ে দেখতেছি।’ কানমলা খেতে খেতে ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দিল রুদ্র।

– ‘মেয়ে দেখতে হবে না। গান কর। গান গেয়ে মেয়েজাতিকে মুগ্ধ কর। অনেক তো মেয়ে দেখলি, এবার মেয়েরা একটু তোকে দেখুক।’

কথাটা বলে বিভা হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তিনবার শব্দ করে হাততালি দিয়ে উঠে বলল, 'এটেনশন প্লিজ। এতক্ষণ আমরা চমৎকার কিছু গান শুনেছি। গানগুলো শোনানোর জন্য গায়িকা আপুটাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা জানেন না যে আমাদের মধ্যে আরো একজন শিল্পী আছে। আমাদের এই বন্ধুটি কিন্তু দারুণ গান করে। এবার ও আপনাদের একটি গান শোনাবে।'

উপস্থিত লোকজন রুদ্রর দিকে তাকালো। একজন মহিলা উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন, 'চমৎকার! প্লিজ শুরু করুন।

সবার এই অখণ্ড মনোযোগ রুদ্রকে বিব্রত করে তুলল ক্ষণিকের জন্য। সে চেয়ারের পায়ের কাছে হেলান দিয়ে রাখা গিটারটা হাতে তুলে নিল কুণ্ঠিতভাবে। গিটার কোলের ওপর রেখে বিভাকে প্রশ্ন করল, 'কোনটা গাইব?'

– 'তোর ইচ্ছা।'

– 'আমার কোনো ইচ্ছা নাই।'

বিভা গালে হাত দিয়ে কিছু একটা চিন্তা করে নিয়ে হুকুম দেওয়ার স্বরে বলল, 'বিউটিফুল-জেমস ব্লান্ট।'

সামিকে দেখা গেলো দৃশ্যপটে। সে আসতেই উপস্থিত নারী পুরুষের দলটার মধ্যে একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ইনারা সবাই কোম্পানির এমপ্লয়ি। প্রত্যেকেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তবুও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের ছেলে বলে কথা। বসের ছেলেকে দেখে সবার

মুখে একটু বিগলিত ভাব চলে আসলো। বয়সে যুবক ছেলেটি এবং একজন প্রৌঢ় পুরুষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামির দিকে এগিয়ে গেলো। সামি দাপ্তরিক লোকজনের সঙ্গ খুব একটা পছন্দ করে না। সে খুব দ্রুত সৌজন্যমূলক কিছু কথা সেরে নিয়ে বন্ধুদের দলে গিয়ে ভিড়ল। বলল, 'ডিনার করবি না? রেস্টুরেন্টে চল। '

রুদ্র তখন গান শুরু করে দিয়েছে। গিটারের টুংটুং বাজনার সাথে চমৎকার গাইছে সে,

My life is brilliant

My love is pure

I saw an angel

Of that I'm sure

You're beautiful

You're beautiful

You're beautiful, it's true

I saw your face in a crowded place

And I don't know what to do

'Cause I'll never be with you

বিভা গানের তালে তালে বিভোর হয়ে যাচ্ছিল। সে অভিজিতের একটা হাত ধরে বলল, 'চলো নাচি।'

অভিজিৎ লাল হয়ে বলল, ‘আমি এসব নাচটাচ পারি না।’

বিভা জোর করে উঠিয়ে নিল অভিজিৎকে বসা থেকে। তারপর নাচ শুরু করল গানের তালে তালে। ওদের দেখাদেখি আরো এক দম্পতি উঠে আসলেন ড্যান্স ফ্লোরে। দৃশ্যটা দেখতে চমৎকার লাগছিল। সুইমিংপুলের নীল জলের ওপর হলদে আলোর ছটা। ওপরে বিস্তৃত খোলা আকাশ। চারপাশে অন্ধকার গায়ে মেখে সমস্ত চেতনা সঙ্গে নিয়ে জেগে আছে মেঘের মুকুট পরা পাহাড় শ্রেণি। তার মধ্যে রুদ্রর ভরাট কণ্ঠের গান আর দুজন যুবক-যুবতী এবং প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার ধীর লয়ের নাচ। আহা, জীবন সুন্দর!

২৮

রেস্টুরেন্টে এসে দেখা গেলো খুব একটা ভিড় নেই। অনেকেই হয়তো খাবার নিজ নিজ ঘরে অর্ডার করেছেন। কষ্ট করে নিচে নেমে আসেননি। সামির পরিবার একটি টেবিল দখল করে বসে ছিল আগে থেকেই। সামিকে দেখামাত্র তার মা হাত ইশারা করে ডাকলেন। সামি বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে গেলো মায়ের কাছে। রোমেলা বললেন, ‘সারাক্ষণ তো বন্ধুদের সাথেই আছিস। এখন একটু আমাদের সাথে বয়।’

সামি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ছোট করে বলল, ‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

সে বসল বাবা মায়ের পাশে। ঠিক উল্টোদিকের টেবিলেই বসল বন্ধুরা। অমৃতা লোকটাকে দেখেছে। কিন্তু সরাসরি তাকায়নি। তার আত্মমর্যাদাবোধ বা সেলফ রেসপেক্ট সর্বদাই টানটান। আজ তার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। ভেতরে একটা অসহায় ভাব টের পাচ্ছে সে। প্রতিটি নিশ্বাসে যেন ফুটছে কাঁটা। লোকটা সামনের টেবিলেই বসে আছে। ছেলের সাথে, স্ত্রীর সাথে খুব কথা বলছে। তার কথার ভঙ্গিতে

বেশ প্রফুল্ল একটা ভাব। অথচ এদিকে একজন মানুষ তার একটি মাত্র উত্তরের আশায় অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছে সন্ধ্যা থেকে। এতে কি তার কিছুই এসে যায় না? মানুষের মনের কোনো মূল্য নেই তার কাছে? শিক্ষা মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। সভ্য এবং বিনয়ী হতে শেখায়। একজন সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা ভদ্রতার খাতিরে হলেও একটা ছোট উত্তর লোকটা দিতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। এর মানে সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে তার জীবনে অমৃতার জন্য কানা কড়ি পরিমাণ জায়গাও নেই। চমৎকার!

টেবিলে খাবার এসে গেছে তখন। সবাই নিজ নিজ প্লেটে খাবার তুলে নিচ্ছে। রুদ্র হাপুস হুপুস করে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। অমৃতা নড়ছে না। স্থির হয়ে বসে আছে। রাগ তাকে বরাবরই বুদ্ধিভ্রষ্ট করে তোলে। খুব বেশি রাগ এবং কষ্টের সময় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। বিভা আর হৃদি একটু একটু বুঝতে পারছিল ঘটনাটা। তাদের দুজনেরই অন্তরের অন্তরাত্মা কাঁপছে। অমৃতা কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসবে না তো আবার? ওদের উচিত ছিল সন্ধেবেলায় অমৃতাকে মেসেজ পাঠানো থেকে বিরত রাখা। ভুল হয়ে গেছে। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে!

বিভা অমৃতার প্রস্তরীভূত মুখটার দিকে চেয়ে একটু ভয়ে ভয়ে বলল, ‘কীরে বসে আছিস কেন? খাবি না?’

অমৃতা বিভার প্রশ্নের উত্তর দিল না। চোখের পাতা সম্পূর্ণ প্রসারিত করে তাকালো সম্মুখে। মানুষটা হাসছে। ধারওয়ালা হাসি। অমৃতার প্রিয় হাসি। হাসতে হাসতেই কথা বলছেন তাঁর স্ত্রীর সাথে। রোমেলা বড়ই যত্নের সাথে স্বামীর প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন। খুব সাধারণ একটি দৃশ্য। কিন্তু এই সাধারণ দৃশ্যটিই অমৃতার বুকের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের ঝংকার বাজিয়ে যাচ্ছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। পুড়ছে হৃদয়। হৃদয় পোড়া গন্ধে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। সে সালাদের প্লেট থেকে একটি

শুকনো শসার টুকরো হাতে তুলে নিল। চিবোতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। আকাশ অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? ডায়েট করতেছিস নাকি? ভাত খাবি না? শুধুই সালাদ?'

অমৃতা আকাশের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। মেশিনের মতো শসা চিবোতে লাগল। শসা শেষ করে একটা কাঁচামরিচ তুলে নিল হাতে। বন্ধুরা সবাই হা করে চেয়ে রইল তার দিকে। সে নির্বিকার। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। চেতনা অন্য কোনো গ্রহে। পুরো কাঁচামরিচটা কচকচ করে চিবোনোর পর তার চোখমুখ রক্তিম হয়ে উঠল। লালচে চোখের তারা টলমল করে উঠল জলে। সে চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো রেস্টুরেন্ট থেকে।

কটেজে ফিরে এসে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানির বোতল বের করল। ঢকঢক গিলে খেলো পুরো এক বোতল পানি। তখনও ঝাল কমেনি তার। ঠোঁট জ্বলছে, মুখ জ্বলছে। সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে সজোরে ছুঁড়ে মারল ঘরের দেয়ালের দিকে। বিকট একটা শব্দ হলো। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা। কাটা গাছের মতো ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অমৃতা মেঝের ওপর। তারপর যে কাজটা সে কখনো কোনোদিন করেনি, ঠিক সেই কাজটাই করে ফেলল আচমকা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হৃদি আর বিভা ফিরে এলো কটেজে। অমৃতার অশ্রুসিক্ত চোখজোড়া দেখে বুক মোচড় দিয়ে উঠল দুজনের। অমৃতার অমন কাঁদো কাঁদো মুখ জীবনে এই প্রথমবারের মতো দেখতে পেল তারা। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে দুই বান্ধবী। বিভা খুব বকতে লাগল, 'কেন এরকম করতেছিস? কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস? এমন বোকা মেয়ে তো আমি জীবনে দেখি নাই!'

হৃদি দু হাতের আঙুল দিয়ে অমৃতার চোখের জলের রেখা মুছে দিতে দিতে বলল, ‘এই পাগলামি থেকে তোকে বের হয়ে আসতেই হবে! ছোট বাচ্চার মতো করতেছিস কেন? আসলে তুই দেখতে শুনতে বড় হইলে কী হবে। ভিতরে একদম বাচ্চা রয়ে গেছিস এখনও।’

খানিক বাদে দরজায় টোকা পড়ল। হৃদি ‘কে?’ বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ওপাশ থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল ‘রুম সার্ভিস!’

হৃদি উঠে গিয়ে দরজা খুলল। সাদা কালো ফরমাল পোশাক করা এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। তার হাতে একটি খাবার সমেত ট্রে। হৃদি হালকা বিস্ময় নিয়ে বলল, ‘কী ব্যাপার?’ ছেলেটি বিনয়ের হাসি হাসল, ‘এই ঘরের জন্য খাবার অর্ডার করা হয়েছে।’

হৃদি দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কে অর্ডার করেছে?’ ছেলেটি ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, ‘দুঃখিত, নামটা বলা যাবে না। নিষেধ আছে।’

টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখল সে। মেয়েরা তখন অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে। সে বুক পকেট থেকে একটা ছোট খাম বের করে বলল, ‘মিস অমৃতা কে? ‘

– ‘কেন? আপনার কী দরকার?’ হৃদির প্রশ্ন।

– ‘এই খামটা উনাকে দিতে বলা হয়েছে।’

হৃদি হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। মুখে বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে।’

ছেলেটির প্রস্থানের পর হৃদি খুব ভালো মতো ঘরের দরজাটা বন্ধ করল। অমৃতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তার চুল আলুথালু। তাকে দেখাচ্ছে ভূতগ্রস্থের মতো। ঘটনা কী ঘটছে সে যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বিভা দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল খামটা। লাফিয়ে উঠে বলল, ‘কী এটা? দেখি দেখি!’

হৃদি আদেশ করল, ‘আহা তুই খুলিস না। অমৃতাকে দে।’

শুনে বিভার আনন্দে একটু ভাটা পড়ল। খামটা তার নিজের হাতে খোলার বড়ই শখ ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে অমৃতার দিকে বাড়িয়ে দিল হাত। অমৃতা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল জিনিসটা। ছোট্ট একটা সাদা রঙের খাম। উপরে কোনো সম্বোধন নেই। সম্পূর্ণ ফাঁকা। সে খামের মুখটা খুলল সন্তর্পণে। ভেতর থেকে একটা ছোট চিরকুট বের হলো। নীল রঙের। তার ওপর কালো কালি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা, ‘লেটস মিট টুমরো মর্নিং। অ্যারাউন্ড ফাইভ ও ক্লক। হ্যাভ ইউ সুইচড অফ ইওর সেলফোন? আই কলড, বাট কুড নট রিচ ইউ।’

এর নিচে কিছু জায়গা ফাঁকা রেখে বাংলায় লেখা,

বি:দ্র: তুমি না খেয়ে চলে গেলে কেন? খেয়ে নাও লক্ষ্মী মেয়ের মতো।

হৃদি আর বিভা চিরকুটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। এক নিমেষে পুরোটা পড়ে নিয়ে ওরা দুজনে হইহই করে উঠল। অমৃতা তখনও কাঁপছিল। বিজলি বাতির মতো চিলিক দিয়ে উঠছিল বুকের ভেতর একটা কষ্ট কষ্ট সুখ। অনেকক্ষণ বাদে সে একটু হাসতে পারল। স্বস্তির হাসি। জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে যেন তার অবতরণ হলো জান্নাতের বাগানে। অলৌকিক সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। বিভা ওর গাল দুটো টেনে দিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'কি এখন খুশি?'

হৃদি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অমৃতাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। ওর অবিন্যস্ত আউলবাউল ছোট ছাটের চুলে একটা আলতো চুমু খেয়ে বলল, 'তোকে হাসলে কী সুন্দর দেখায় অমৃতা! সব সময় হাসবি। আর কোনোদিন এভাবে কাঁদবি না। কেমন?'

২৯

সামি কটেজে ফিরল ঘণ্টা দুয়েক সময় পরে। রেস্টুরেন্ট থেকে সোজা বাবা মায়ের ঘরে গিয়েছিল। কিছুটা সময় ওদের সাথে কাটিয়ে তারপরেই বন্ধুদের কাছে ফিরল সে। ঘরে ফিরে দেখল রুদ্র পায়ের জুতো না খুলেই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার পা জোড়া ঝুলে আছে বিছানার বাইরে। মুখের সামনে ফোন। সে কথা বলছে তার মা এবং বোনের সাথে। নিজের পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলার সময় তার মুখের ভাষাটা অন্যরকম হয়ে যায়। সে তখন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা এবং শুদ্ধ বাংলা ভাষার মিশেলে কথা বলে। তখন তার প্রতিটি বাক্যের শেষে 'যে' শব্দটি যুক্ত হয়। বন্ধুরা ওকে এই টোনে কথা বলতে দেখলেই খুব খ্যাপায়। তবে আজ আকাশের মেজাজ মর্জি ভালো না। তাই রুদ্রর কথাবার্তা শুনতে পেয়েও তার ভেতরে কোনো প্রতিক্রিয়া কাজ করছে না। কফির মগ হাতে নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখের দৃষ্টি দূরে।সামি দরজা একটু হালকা ফাঁকা করে উঁকি দিয়ে দুই বন্ধুকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে একবার দেখে নিল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করল।

এই ঘরে দুটা সিঙ্গেল বেড রাখা। সামি আর রুদ্র বিছানা দুটিতে ঘুমিয়েছে গতরাতে। আকাশ মেঝেতে ফ্লোরিং করেছে।

সামি বিছানার ওপর বসে পায়ের জুতো খুলল একটু সময় নিয়ে। তার সুন্দর সুকুমার মুখখানায় খেলছে এক চাপা উদ্বেগ। আচার আচরণে অস্থির ভাব। সে জুতোজোড়া খুলে রেখে ঘরের মধ্যে কয়েকবার এলোমেলোভাবে পায়চারি করল। অপ্রস্তুতভাবে কাশল মুখে হাত দিয়ে পর পর তিনবার। দু তিন মিনিট পর আকাশের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই আকাশ!'

আকাশ ওর ডাকটা শুনতে পেল না। কিংবা শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করল। সামি আকাশের ডান বাহুতে একটা হাত রেখে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কীরে? ডাকতেছি। শুনতে পাস না?'

আকাশ ঘুরে তাকালো। চোখ পাকিয়ে বলল, 'কী হইছে?'

সামি আকাশের ধমক শুনে একটু হকচকিয়ে গেলো। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারল না। নিজের মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুলগুলোয় অন্যমনস্কভাবে হাত বুলিয়ে নিল দুবার। গালে গজানো খোঁচা দাড়িতে পাঁচ আঙুল রাখল অন্যমনস্কভাবে। তারপর একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'দোস্ত, তুই… তুই আসলে আমাকে ভুল বুঝতেছিস। '

আকাশ জ্বলে উঠল, 'আমি ভুল বুঝছি? তাহলে ঠিকটা কী একটু শুনি তো!

সামি একটা প্রলম্বিত শ্বাস টেনে নিল। বলল, ‘কীভাবে বুঝাবো বুঝতে পারতেছি না। আসল পয়েন্ট হচ্ছে, হৃদির সাথে আমার একটু ঝামেলা চলতেছিল।’

– ‘তো এখানে আমার কী করার আছে? তোর সাথে ঝামেলা চলতেছে দেখে আমি হৃদির সাথে কথা বলতে পারব না? আমি কি তোর পারমিশন নিয়ে হৃদির সাথে ফ্রেন্ডশিপ করছিলাম?’

রুদ্র তখন ফোনে কথা বলা শেষ করে উঠে এসেছে। কান খাড়া করে শুনছে দুই বন্ধুর কথোপকথন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে। সামি বলল, ‘সমস্যাটা তোর সাথে হৃদির ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে না। সমস্যাটা অন্য জায়গায়।’

আকাশের রাগ কিছুতেই কমছিল না। বরং উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সে মুখ ঝামটা মেরে বলল, ‘সমস্যাটা তোর মাথায়। সমস্যা অন্য কোনো জায়গায় না। তোর মাথার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেছিস তুই।’

রুদ্র এই পর্যায়ে চোখ সরু করে গভীর সন্দেহের গলায় প্রশ্ন করল, ‘মামা প্রব্লেমটা কী? কী কাহিনি চলে, হ্যাঁ?’ আকাশ রুদ্রকেও দিল একটা রাম ধমক, ‘চুপ থাক, কী কাহিনি চলে সেটা বুঝতে হলে চোখ খুলে দ্যাখ। কান খুলে শোন। কথা বলিস না এত!’ ধমক খেয়ে রুদ্র চুপ করে গেলো। সামি বলল, ‘আকাশ শোন, হৃদির সাথে আমার আজকে সকালেই ঝগড়া হইছিল। হৃদি আমারে বলছে যে আমাকে দিয়ে নাকি ওর হয় না। তুই কি বুঝতেছিস আমার কথা?

আকাশ গিলে খাবার মতো ভয়ংকর চোখ নিয়ে সামির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘না বুঝতেছি না। তোকে দিয়ে হয় না মানে কী? তুই কি শালা ইম্পোটেন্ট?’

সামি অধৈর্য গলায় বলল, ‘এটাই তো আমি বুঝতেছি না যে আমার প্রব্লেমটা কোন জায়গায়। কেন ওর আমারে দিয়া হইতেছে না। ও কী চায়?’

রুদ্র বলল, ‘তুই ওকে সরাসরি প্রশ্ন করলেই পারিস।’

– ‘প্রশ্ন তো করছি। সে উত্তর দেয় না। বলে আমি নাকি বুঝব না। তার একটু সময় দরকার। বিশ্বাস কর দোস্ত এখানে আসার পর থেকে ও আমার সাথে স্বাভাবিকভাবে, হাইসা একটা কথা বলে নাই। মানে আমি কিছুতেই বুঝলাম না আমার দোষটা কোথায়?

আকাশ বলল, ‘কিন্তু এটার সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমাকে কেন তুই উল্টাপাল্টা কথা বললি?’

সামি একটু বিনীতভাবে বলল, ‘দোস্ত সেই জন্য আমি স্যরি। আমি জানি তোকে আমার ঐভাবে কথাগুলা বলা উচিত হয় নায়। হৃদি তোর বন্ধু। তোরা যা খুশি বলতে পারিস, করতে পারিস, আমার কোনো রাইট নাই এসব নিয়ে কথা বলার। ভুল হয়ে গেছে।’

আকাশ কিছু বলল না এই কথার প্রত্যুত্তরে। রুদ্র সামিকে প্রশ্ন করল, ‘তুই কী বলছিস ওরে হৃদির ব্যাপারে?’

– ‘একটু পরে বলতেছি। আগে ঝামেলাটা শেষ হোক।’ সংক্ষেপে উত্তর দিল সামি। এরপরের কয়েকটা সেকেন্ড আকাশকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অসহিষ্ণু

গলায় আবার বলল, 'আকাশ প্লিজ আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। আমি তোরে আমার নিজের থেকে বেশি বিশ্বাস করি, পিরিয়ড।'

আকাশ এবারেও কোনো কথা বলল না। চুপচাপ কফির মগে চুমুক দিতে লাগল। সামি বলল, 'অনেস্টলি স্পিকিং, আমার এটা খারাপ লাগছে যে আমার সাথে কথা বলতে হৃদির ভালো লাগে না, আমার সামনে আসলে ওর মুড অফ হয়ে যায়, অথচ তোর সাথে ঠিকই মন খুলে হাসতেছে। এই একটা কারণেই দোস্ত আমার হঠাৎ করে রাগ লাগছে। এখন আমি জানি না যে এরকম রাগ লাগাটা আমার দোষ কিনা।' এটুকু বলে সামি খুব বিষণ্ণভাবে চুপ করে রইল কয়েকটা ক্ষণ। বলল, 'এটা যদি আমার দোষ হয়, তাহলে আমি স্যরি দোস্ত। আমার আর কিছুই বলার নাই।'

আকাশ জানালার সামনে থেকে সরে এসে খালি কফির মগটা টেবিলের ওপর রাখল। সামির চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে বলল, 'ব্যাপারটা তুই প্রথমেই আমাকে খুলে বলতে পারতিস। আর তুই যা দেখছিস সেই দৃশ্যটা আসলে পুরোটা সত্য ছিল না।
'

– মানে?'

– 'মানে আমার এক ছাত্রী আমার পিছু নিছিল আজকে বিকালে। এটুকু বলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, 'ওইযে রসগোল্লা।' রসগোল্লার নাম শুনে রুদ্র হো হো করে হেসে ফেলল। আকাশ বলল, 'আসলে রসগোল্লাকে দেখানোর জন্যেই আমরা একটু ইন্টিমেটভাবে বসে ছিলাম। যেন রসগোল্লা মনে করে যে হৃদি আমার গার্লফ্রেন্ড। কারণ এর আগে একবার রসগোল্লাকে বলছিলাম যে আমার গার্লফ্রেন্ড আছে, সে বিশ্বাস করে নাই।'

সামি বিভ্রান্ত গলায় বলল, 'মানে তোরা প্রেম করার অভিনয় করতেছিলি?'

– 'হ্যাঁ। অনেকটা সেরকমই।'

সামির মুখে থমথমে ভাবটা আবার ফেরত আসলো, 'শালা প্রেমের অভিনয়ের জন্যে তুমি আমার গার্লফ্রেন্ডরেই পাইলা?'

আকাশ কড়াভাবে বলল, 'আবার আমার গার্লফ্রেন্ড আমার গার্লফ্রেন্ড করতেছিস? তোর গার্লফ্রেন্ডটা আমার ফ্রেন্ড হয় সামি! এটা ভুলে যাইস না!'

সামি বিরক্তি নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। আজকে তার সিগারেট খাওয়ার মাত্রা সীমা ছাড়িয়েছে। একটু পর পর সিগারেট টানছে সে। লাইটার দিয়ে আগুন ধরাবার সময়টুকুতে সে ভ্রু কুঁচকে কিছু একটা চিন্তা করল অখণ্ড মনোযোগের সাথে। এরপর বুকভর্তি করে নিকোটিন টেনে নিয়ে বলল, 'এজন্যেই আমার কাছে হঠাৎ একটু কেমন জানি লাগতেছিল। হৃদির মুখে একটা কিছু ছিল। শি ওয়াজ ব্লাশিং!'

আকাশ এবার পরিষ্কার গলায় বলল, 'ইয়েস অফকোর্স শি ওয়াজ ব্লাশিং। কজ আমি ওর প্রশংসা করতেছিলাম। আমার কম্পিলিমেন্ট পেয়ে ও বলছে এত সুন্দর করে এর আগে কেউ কোনোদিন ওর প্রশংসা করে নাই।'

সামি অবাক গলায় বলল, 'প্রশংসা করতেছিলি?'

– ‘হ্যাঁ। ওকে বলতেছিলাম যে ও আসলে কতটা সুন্দর। আর কোন মেয়ে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে খুশি হয় না, তুই বল?

সামি ব্যাকুল বনে যাওয়া গলায় অস্ফুটে বলল, ‘বাহ!’

আকাশ থামল না ‘হৃদি আমাকে কী বলছে জানিস? বলছে যে তুই নাকি কখনো ওর প্রশংসা করিস না। ওর সামনে তুই অন্যদের প্রশংসা করিস। তানিশা কত সুন্দর, বিভা কত সুন্দর এইসব হাবিজাবি কথা বলিস কিন্তু নিজের গার্লফ্রেন্ডরে শালা একটা ভালো কমপ্লিমেন্ট দিস না কোনোদিন। প্রব্লেম কী তোর?

সামি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘এইটা একটা কথা হইল? ওর প্রশংসা আলাদা করে করতে হবে কেন? ওরে ভালো লাগে দেখেই তো ওর সাথে প্রেম করতেছি তাই না?’

রুদ্র বলল, ‘গাধার মতো কথা বলিস না সামি। প্রত্যেকটা সম্পর্কেরই পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। ভালোলাগা গুলো শেয়ার করতে হয়। মনের কথা সরাসরি বলতে হয়। তাহলে তো আর এত ঝামেলা হয় না। তোদের রিলেশন হইছে মাত্র কয়দিন? এর মাঝেই এত ঝামেলা। সামনে কী হবে?’

সামি প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দুই বন্ধুর দিকে। তাকে খানিকটা বিচলিত দেখাতে লাগল।

৩০

বাইরে তখনও পুরোপুরি আলো ফোটেনি। মশারির ভেতর থেকে চারপাশটা যেমন ঘোলাটে দেখায়, ঠিক সেরকম একটা আবছা ঘোলাটে ভাব ছড়িয়ে আছে সমগ্র বিশ্বচরাচরে। অমৃতা কটেজের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। হৃদি ঘুমিয়েছে শেষ রাতে। তাই বেরোনোর সময় ওকে আর ঘুম থেকে ডাকেনি সে। কিন্তু না ডেকে লাভ কিছুই হলো না। দেখা গেলো মিনিট না গড়াতেই হৃদি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। অমৃতা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ঘুমো ঘুমো গলায় সে বলল, ‘পাঁচটা বেজে গেছে?

অমৃতা হাত ঘড়িটা দেখল, ‘না, এখনো চার মিনিট বাকি।

হৃদি তার চোখের পল্লব ঘেরা ঢাকনাদুটো প্রসারিত করে আগাগোড়া একবার অমৃতাকে দেখল। অমৃতার পরনে লাল সাদা চেক শার্ট। সাথে ব্লু জিন্স। শার্টের বোতামগুলো খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আকাশী রঙের টি শার্ট। টিশার্টের ওপর ইংরেজিতে লেখা ‘মিয়াও’ তার নিচে ছোট্ট একটি বিড়ালের মুখ আঁকা। হৃদি একটু বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘উপরে এই আলখাল্লাটা পরার কী দরকার?’

অমৃতা ঘাড় নিচু করে নিজের পরনের শার্টটা একবার দেখে নিয়ে বলল, ‘কেন? খারাপ দেখাচ্ছে?’

– ‘জি হ্যাঁ, খারাপ দেখাচ্ছে। আলখাল্লাটা খোল।’

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে আকাশ পাতাল ভাবল ক্ষণিকের জন্য। তারপর শার্টটা খুলে হাতে নিল। বলল, ‘এখন ঠিক আছি?’

হৃদি হাত বাড়িয়ে বলল, 'হুম, শার্টটা আমাকে দিয়ে দে। পাঁচটা বেজে গেছে। তুই যা এখন।

– 'কোথায় যে যাবো সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কোথায় দেখা করবে সেটা তো বলেনি।' কাঁচুমাচু গলায় বলল অমৃতা।

– 'ফোন দিয়ে দ্যাখ।'

অমৃতা প্যান্টের পকেট থেকে ফোন বের করল, 'ফোন দিব? কেমন যেন লাগতেছে!'

-কেমন লাগতেছে?'

– 'কেমন জানি। লজ্জা লজ্জা লাগতেছে।'

হৃদি একটা হাই তুলে নির্বিকার গলায় বলল, 'তাহলে ভিতরে গিয়া ঘুমা।'

অমৃতা চোখ পাকালো, 'ফাইজলামি করিস?'

– 'ফাইজলামি তো তুই করতেছিস, সারারাত দেখা করার জন্য নাচানাচি কইরা এখন বলতেছিস লজ্জা লাগে। তামশা করার জায়গা পাস না।'

অমৃতা ফোনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। মাথার চুলে হাত চালালো কয়েকবার চিরুনির মতো। বড় একটা শ্বাস টেনে নিয়ে ডায়াল করল। তিন নম্বর রিংটা পড়তেই ওপাশ থেকে একজন ফোন ধরল। অমৃতা মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটি নারী কণ্ঠ বিজলিবাতির মতো চিলিক মেরে প্রবেশ করল তার কর্ণকুহরে। থমকে গেলো সে। রক্তশূন্য হয়ে উঠল মুখ। নিশ্বাস গেলো আটকে। নারী কণ্ঠটি ক্রমাগত 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে চলেছে। চারপাশ বড় বেশি নীরব হওয়ায় হৃদিও ফোনের ওপাশের গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। হৃদি চট করে ফোনটা অমৃতার কান থেকে ছিনিয়ে নিল। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে হাঁপ ধরা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'কী সর্বনাশ! সামির মা ফোন ধরছে!'

অমৃতা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল হৃদির দিকে। তার মুখে একটা হতভম্ব ভাব। চোখের পলক পড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে অসদাচরণের কারণে বেশ কিছু সময় অবশিষ্ট থাকার পরেও জোর করে তার পরীক্ষার খাতা টেনে নেয়া হয়েছে। প্রতিবাদ, অপমান, এবং অপরাধবোধের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া খেলছে তার মুখে। হৃদি সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় বলল, 'ওয়েট কর। লোকটা ফোন করবে। অন্যের জামাইয়ের সাথে প্রেম করতে গেলে এসব তো হবেই। মুখ কালা কইরা এখন লাভ নাই। আগেই মানা করছিলাম।'

ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল দু মিনিটের মাথায়। কাঙ্ক্ষিত নম্বর থেকেই ফোন এসেছে। কিন্তু কী করে নিশ্চিত হবে অমৃতা যে ফোনটা সামির মা করছেন না? সে খুব সাবধানে এনসার বাটন প্রেস করল। প্রথমে কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ সুনসান নীরবতার পর ওপাশ থেকে একটা ভরাট পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

অমৃতা সবার প্রথমে যে কথাটা বলল তা হলো,

– ‘আমার নম্বর কি আপনার ফোনে সেভ করা আছে?’

– ‘না।’ শব্দটা শুনতে পেয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস গড়িয়ে পড়ল অমৃতার বুক পিছলে।

– ‘যাক বাঁচালেন!’

– ‘তুমি কোথায়?’

– ‘কটেজে।’

– ‘আমি রিসোর্টের মেইন গেটের বাইরে আছি।’

–’ আচ্ছা।’

– ‘তুমি কি আসছ?’

– ‘আসছি।’

বলে অমৃতা ফোন কাটল। তার বুক তখনও ধড়ফড় করছে। সে হৃদির দিকে তাকিয়ে উদ্বেল গলায় বলল, ‘যাই!’ অমৃতার টি শার্টটা কোমরের দিকে একটু কুঁচকে ছিল।

হৃদি এগিয়ে এসে হাত দিয়ে কাপড়টা ঠিক করে দিতে দিতে বলল, ‘মনে রাখিস। এটাই কিন্তু লাস্ট মিটিং। ঢাকায় গিয়ে তুই আর দেখা করবি না।’

– ‘হুম।’ অমৃতা বলল অন্যমনস্ক গলায়।

– ‘তুই কিন্তু প্রমিজ করছিস আমাদের।’

– ‘মনে আছেরে ভাই। এতো বারবার বলতে হবে না।’ একটু বিরক্তি নিয়ে বলল অমৃতা।

মশারির জালটা একটু একটু করে গুটিয়ে নিচ্ছে কেউ আশপাশ থেকে। শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল বলে পথঘাট এখনো ভেজা। গাছের পাতায় পাতায় টলমল করছে জলবিন্দু। কত পাখি যে ডাকছে! গোটা জগতটা যেন তাদেরই রাজত্ব। টিউটিউ করে সরব মাতামাতিতে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে তারা পৃথিবীবাসীকে। পুব দিকের আকাশে সিঁদুর রঙের খেলা। ওদিকে তাকালে, এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় মন ভরে যায়! রিসোর্টের বাসিন্দাদের কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি তখনো। চারদিক জনমানবহীন। গেটের সামনে শুধু খাঁকি পোশাক পরা একজন সিকিউরিটি গার্ড বসে আছে। অমৃতাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ম্যাডাম কিছু লাগবে?’

অমৃতা হাত নেড়ে বলল, ‘না কিছু লাগবে না। হাঁটতে যাচ্ছি।’

গেট পেরোনোর পরে অমৃতা দেখল গোটা পার্কিং লটটায় শুধু সারিবাঁধা গাড়ি ছাড়া কোনো জনমানবের অস্তিত্ব নেই। একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপছিল শরীরের প্রতিটি

রক্তকণা। স্পষ্টভাবে কিছু ভাবতে পারছিল না সে। পার্কিং লট ফেলে রাস্তায় উঠে আসতেই দীর্ঘকায় মানুষটাকে দেখা গেলো। ভোরের আবছা নরম আলোয় দাঁড়িয়ে আছেন একটি নীল রঙের সাইনবোর্ডের সামনে। সাইনবোর্ডে লেখা রুমা ২৭ কি.মি.এবং নীলগিরি ২৮ কি.মি.। মানুষটার পরনে সাদা টি শার্ট, কালো ট্রাউজার। ছিপছিপে লম্বা মেদহীন শরীর। যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে এই বয়সেও তাঁর বডি ফিটনেস এবং আকর্ষণীয় চেহারা যে কোনো কমবয়সি যুবকের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অমৃতা ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। তিনি লক্ষ্য করলেন না প্রথমটায়। খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা টাইপ করছিলেন স্মার্ট ফোনের কী প্যাডে। এক গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতা। অন্তরটায় বড্ড কাঁপাকাঁপি! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উথালপাতাল করছে বুক! সে কোনো কথা বলতে পারল না। নির্বাক চেয়ে রইল শুধু। কতক্ষণ কাটলো কে জানে। খুব বেশিক্ষণ না বোধহয়। লোকটা একসময় কাজ শেষ করে মুখ তুলে চাইলেন। ফোন রাখলেন ট্রাউজারের পকেটে। তারপর ভোর বেলার ওই সাবান ঘোলা পেলব নরম আলো ভেদ করে গভীর চোখ দুটি যখন অমৃতার চোখের ওপর পড়ল, তখন জীবনে প্রথমবারের মতো অমৃতা বুঝল যে প্রিয় মানুষটাকে কাছ থেকে শুধু এক পলক চোখের দেখা দেখার মধ্যে যে স্বর্গীয় সুখটা নিহিত আছে, তার সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো সুখের তুলনা হয় না!

– ‘কী খবর?’ অমৃতার মুখের ওপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলেন হক।

--’ভালো।’ বলল অমৃতা, স্তিমিত গলায়। যে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সেই রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। মূলত এটি একটি ওয়াই জংশন রোড, অর্থাৎ দুটি রাস্তার মিলনস্থল। একটি রাস্তা গেছে নীলগিরির দিকে। অন্যটি গেছে রুমার দিকে। ভোরবেলা বলে এই মুহূর্তে গাড়িঘোড়া, মানুষজন একেবারেই কম। এক দুজন পাহাড়ি মেয়েকে কাঁধে ঝুড়ি অথবা কাঁখে কলসি নিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে কদাচিৎ। হঠাৎ হঠাৎ সাঁই সাঁই শব্দে জিপ গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে বাস। কয়েকটা মুহূর্ত ওরা দুজনেই চুপ করে থাকল। হক মেয়েটাকে দেখছিলেন

মনোযোগ দিয়ে। অমৃতা বুঝতে পারছিল যে আজকে মানুষটা তাকে যেরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন, ঠিক এতটা গভীরভাবে এর আগে কোনোদিনই তিনি তাকে লক্ষ্য করেননি। আর এটা বুঝতে পেরে অমৃতার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সে যথেষ্ট স্মার্ট বলেই জানত। অযথা হাত পা কাঁপাকাঁপি, অকারণ নার্ভাস ফিল করা, এসব ন্যাকা ন্যাকা মেয়েলি ব্যাপারস্যাপার তার মধ্যে একেবারেই ছিল না। আজকের এই বদলে যাওয়া নিজেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। দুর্বল বোধ করছিল সে ভেতরে ভেতরে। ভীষণ দুর্বল! গভীর চোখদুটো হঠাৎ অমৃতার টিশার্টের ওপর লেখা মিয়াও শব্দটার ওপর থমকে গেলো।

– 'তোমার পোষা বিড়াল আছে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

– 'না নেই। আম্মুর এলার্জি আছে বেড়ালে। তাই আমাদের বাড়িতে আমরা কোনো পেট রাখতে পারি না। আমার ছোটবোনের কুকুর খুব পছন্দ। কিন্তু আমার মায়ের জ্বালায় কুকুর পালা সম্ভব না।'

কথাটা বলে শেষ করে অমৃতা আবার বলল, 'আপনার ওয়াইফ ফোন ধরেছিলেন।'

– 'হ্যাঁ। আমি ভুল করে ফোন ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

– 'ইশ, যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!' খুব স্বাভাবিক গলায় বলল অমৃতা কথাটা। বলবার পরে বুঝি একটু লজ্জিতও বোধ করল মনে মনে। তাই মুখ নামিয়ে নিল নিচে। হক এই কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না। গম্ভীরভাবে অমৃতার নত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আবার ভয়টয় পাও নাকি?

– ‘আগে পেতাম না। আজকাল পাই!’

– ‘কেন? আজকাল এত কীসের ভয় তোমার অমৃতা?’

– ‘হারিয়ে ফেলার ভয়!

কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে অতি স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন –’দেখা করতে চেয়েছিলে কেন?’

– ‘আপনাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল রাশেদ, তাই দেখা করতে চেয়েছি।’ চোখ নিজের পায়ের জুতোর ওপর নিবদ্ধ রেখে কাঁপা অথচ ক্ষীণ গলায় বলল অমৃতা

রাশেদ একটা বড় নিশ্বাস গোপন করলেন। অনেকগুলো বছর একটানা শুধু ব্যবসা, রাজনীতি এবং সাংসারিক গ্যাড়াকলে চাপা পড়ে থেকে তাঁর বুকের ভেতরে একটা লৌহকণ্টক স্থায়ী ভাবে বিঁধে গিয়েছিল। রাগ, অভিমান, ভালোবাসা এই অনুভূতিগুলোর আলাদা কোনো অস্তিত্ব তিনি টের পাচ্ছিলেন না বহুদিন ধরে। আজকে এই মেয়েটির অকপট স্বীকারোক্তি শুনে বুকের ওপর দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা সেই লৌহখনিতে উত্তাপের একটি হালকা আঁচ লাগল যেন। তার মনে পড়ল না এর আগে, শেষবার কে তাঁকে কবে এমন আকুলভাবে মনের কথা বলেছিল!

তিনি অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘কেন এরকম করছ অমৃতা? তুমি তো অবুঝ নও। বোকাও নও। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি ভুল করছ?’

অমৃতা হালকাভাবে বলল, ‘ঠিক ভুল বুঝি না। আমার মনের ইচ্ছাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

– ‘তুমি তো এখনো ছোট, তাই অনেক কিছুই বোঝো না। যেদিন আমার মতো বড় হবে সেদিন বুঝবে যে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ গুলো, সুখগুলো বিসর্জন দিতে হয়। বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে বেঁচে থাকার চরম সার্থকতা।’

অমৃতা এবার স্পষ্টভাবে বলল, ‘রাশেদ! আমি জানি বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, যোগ্যতা অনেক দিক দিয়েই আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি হয়তো কখনোই আপনার মতো করে বুঝতে পারব না, ভাবতে পারব না। কিন্তু আমার এই এতটুকু বয়সে আমি আমার মতো করে বুঝেছি যে, মাঝে মাঝে সমাজের নিয়মকানুন, ট্যাবু সবকিছু বিসর্জন দিয়ে জীবনের ছোট ছোট চাওয়াগুলোকে গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ… কারণ রাশেদ, জীবনটা খুব ছোট! আজকে এই মুহূর্তে আপনি আর আমি একসাথে আছি। কাল কে কোথায় থাকি তা কে জানে! আজকের পরে আপনার সাথে যদি আমার আর কখনো কোনোদিন দেখা না হয়? যদি আফসোস থেকে যায় সারাজীবনের জন্যে? জীবনে আসলে সত্যিকারের পাওয়ার মতো করে কিছুই পায় না মানুষ। টাকাপয়সা, মানসম্মান, খ্যাতি এর কোনোকিছুই মনের সাথে লেগে থাকে না। মনের সাথে লেগে থাকে শুধু স্মৃতি। তাই মানুষের উচিত বেশি বেশি করে স্মৃতি কুড়িয়ে নেওয়া!

রাশেদ মেয়েটির দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন। এত গুছিয়ে কথা বলা এই বাচ্চা মেয়েটিকে কে শিখিয়েছে? অবাক লাগে তাঁর। বড়ই অবাক লাগে! তিনি একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, ‘তুমি হয়তো এখনো বুঝতে পারোনি যে মনের দাবি মেটানোর জন্য একজন শিক্ষিত, সভ্য মানুষ কোনোভাবেই সামাজিক দায় এড়িয়ে

যেতে পারে না। শিক্ষা আমাদেরকে ভাবতে শেখায়। চোখ মেলে দেখতে শেখায়। সমগ্র প্রাণীকূলের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই ন্যায়, নীতির বোধ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি এই বোধটাকে কাজে না লাগিয়ে শুধু ইন্সটিঙ্কট ফলো করে তাহলে কিন্তু মানুষের সাথে পশুর কোনো তফাৎ থাকবে না।'

অমৃতা ঘাড় নিচু করে পায়ের জুতো দিয়ে একটা ইটের টুকরো নাড়াচাড়া করছিল। সে অবস্থাতেই একটু লাজুক গলায় বলল, 'মানুষ যদি মনের পরিচর্যাই না করল, তাহলে আর অত নীতিবোধ দিয়ে কী হবে?' এটুকু বলে সে চোখ তুলে চাইলো, দৃঢ় গলায় বলল, 'আপনি বললে আমি এখনই চলে যাব। আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। দেখে ফেলেছি। আমার কাজ শেষ। এখন চলে যেতে পারি। যাব?'

রাশেদ অমৃতার স্থির দুটি চোখের ওপর থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আশপাশটা একবার দেখলেন কড়া নজর বুলিয়ে। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'যাও।'

শব্দটা শেলের মতো বিঁধল গিয়ে অমৃতার বুকে। হালকা একটা জলজ আভাস পড়ল তার দুচোখের তারায়। পাতলা সুন্দর গোলাপি দুটো ঠোঁট নিজের অজান্তেই বেঁকে গেলো একটু। শ্লেষের গলায় বলল, 'আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?' হক এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্বল চোখে তাকালেন অমৃতার দিকে। তিনি তো এই মুহূর্তে মনপ্রাণ দিয়ে ভীষণভাবে নিষ্ঠুর হতে চাইছেন। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছেন না কেন? কয়েক সেকেন্ড অমৃতার পুতুল মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি, 'চলো হাঁটি!'

কথাটা বলতে বলতে তিনি হাঁটা শুরু করলেন। চোখে পড়ল গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসছেন মালেক সাহেব। কোম্পানীর ট্রেজারার। মালেক সাহেবকে এক পলক দেখে নিয়ে হক অমৃতাকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হাঁটো, পা চালাও!' অমৃতা হাঁটা

শুরু করল। যে রাস্তাটা রুমার দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে। এদিকে কোনো ফুটপাথ নেই। রাস্তার একদম পাশ ঘেঁষেই জংলা ঝোপ আর গাছপালা। গাছের ডালে ডালে কিচিরমিচির করে ডাকাডাকি করছে অগণিত পাখি। একটা মাইক্রোবাস আসছিল রাস্তার উল্টোপাশ থেকে সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে। অমৃতার মুখে তখন চিলতে হাসি লেগে আছে। হাসি নিয়েই আপন মনে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। রাশেদ হাঁটছিলেন রাস্তার ধার ধরে, জঙ্গলের পাশের আগাছা আর মাটিযুক্ত জায়গার ওপর দিয়ে। চলন্ত গাড়িটা দেখতে পেয়ে তিনি হঠাৎ করেই অমৃতার বাহু খামচে ধরে টেনে নিয়ে আসলেন নিজের কাছাকাছি। দাঁড় করিয়ে দিলেন আগাছাওয়ালা মাটির ওপর। একটু কড়া গলায় বললেন, 'গাড়ি আসছে। বি কেয়ারফুল!' অমৃতা ঘটনার আকস্মিকতায় কেঁপে উঠেছিল। হৃৎপিণ্ডে চলকে উঠেছিল রক্ত। সে নিশ্বাস বন্ধ করে সচকিতভাবে একবার তাকালো তার বাহুতে সাঁড়াশির মতো আটকে থাকা লোকটার পাঁচ আঙুলের দিকে। অমৃতার ওই তাকানো দেখে অতর্কিতে মানুষটার ধারালো সুন্দর মুখখানায় একটু লালচে আভাস পড়ল। তিনি চট করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'স্যরি!'

৩১

দূরের বনে কোকিল ডাকছে মন কেমন করা সুরে। সাবান ঘোলা পানির মতো আলোটা এখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা জমাট বাঁধা অন্ধকার। রাস্তার দুপাশে বৃষ্টিভেজা বিশুদ্ধ সবুজ! দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। 'স্যরি' শব্দটা উচ্চারণ করেই লোকটা প্রায় একহাত দূরে সরে গিয়েছিল অমৃতার কাছ থেকে। যেন অমৃতার বাহু খামচে ধরা ভীষণ বড় অন্যায় একটি কাজ। অমৃতা যেন অচ্ছ্যুত, তাকে ছোঁয়া নিষেধ! দূরত্ব রেখেই হাঁটছিলেন তিনি। পথের মাঝখানে একটা ভাঙা শিমুল গাছের পাতলা ডাল পড়ে ছিল, ফুল সমেত। অমৃতা নিচু হয়ে ডালটা তুলে নিল। এদিকের রাস্তায় আপাতত তেমন লোকজন নেই। অমৃতা হাতে ধরা শিমুলের ডাল থেকে ফুল ছিঁড়ে নিতে নিতে প্রশ্ন করল,

– ‘আপনি কি রাগ করলেন?’

অমৃতার দিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন তিনি, বললেন, ‘নাতো!’

– ‘তাহলে এরকম রাগ রাগ হয়ে আছেন কেন?’

হক একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, ‘আমি মানুষটাই একটু রাগি।’

– ‘তাই?’

– ‘হ্যাঁ। আসলে একটু না। যথেষ্ট রাগি।’

হাতের ডানপাশে শাল আর বহেড়ার নিঝুম বন। অমৃতা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ‘চলুন ওইদিকে যাই।’

– ‘কোনদিকে?’

অমৃতা হাতের আঙুল তুলে ইশারা করল, ‘ওই দিকে।’

হক প্রস্তাবটা শুনে একটু দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করলেন কিছু একটা। তারপর কোনো কথা না বলেই অমৃতার দেখানো পথে

পা বাড়ালেন। বনের রাস্তায় পা রাখতেই একদল হলদে রঙের ছোট্ট বুলবুলি পাখি কিচিরকিচির শব্দ তুলে উড়াল দিল দূর আকাশে। শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল বলে মাটি নরম এবং কিছুটা ভেজা এখনো। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল। কিছু দূর এগোনোর পর দেখা গেলো সম্মুখের জংলি পথটা উত্রাই হয়ে নেমে গেছে নিচে, নদীর কাছাকাছি। ওরা যেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালো, সেখান থেকে আঁকাবাঁকা বয়ে চলা সাঙু নদীটা স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর ওপাড়েই পাহাড়। একটা গাছের গুঁড়ি দেখতে পেয়ে হক অমৃতাকে বললেন, 'তুমি বসবে?'

– 'না না, আপনি বসুন। আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।'

তিনি আর কোনো দ্বিরুক্তি না করে গাছের গুঁড়ির ওপর বসলেন। অমৃতা তাঁর পাশেই এক হাত দূরত্বে একটা রাবার গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। শাল, মহুয়া আর রাবার গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝির শব্দে হাওয়ার নাচন চলছিল। ঝিরঝির শব্দটায় কবিতার মতো একটা কোমল ভাব আছে। শুনতে শুনতে কেমন ঘোর লেগে যায়। এই মিহি বাতাস শরীর ছুঁয়ে দিলে বিশুদ্ধ অনুভূতি হয়। মনে হয় যেন নিশ্বাসের সাথে সাথে ফুসফুসে ঢুকে যাচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। ওপারের পাহাড়ের মাথায় মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল নিরুদ্দেশ। একটা নীল পাখনার ভারি সুন্দর দেখতে মাছরাঙা পাখি ওদের চোখের সামনে দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেলো নিচে, নদীর দিকে। মানুষটা দূরের পাহাড়ে চোখ রেখে কী যেন ভাবছেন। খুবই অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। অমৃতা হাতে ধরা ডাল থেকে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছিল অবহেলায়। আড়ে আড়ে দেখছিল খানিক দূরে বসে থাকা মানুষটার ধারালো চোয়াল, তীক্ষ্ণ নাসা, ছোট করে ছাটা চুল, কিছুটা উদ্ধত চিবুক আর চওড়া বুক।

'ভিউটা খুব সুন্দর।' সম্মুখের মেঘ ঢাকা পাহাড়ের ওপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল অমৃতা, কিছু একটা বলা দরকার বলে মনে হলো তাই।

– ‘আমাদের পুরো দেশটাই আসলে খুব সুন্দর!’ বললেন তিনি, বিমুগ্ধ কণ্ঠে!

অমৃতা একটু শ্লেষের হাসি হাসল, ‘সুন্দরের মধ্যে যে অসুন্দরেরা দানা বেঁধে চলেছে দিনের পর দিন। সেদিকে কি আপনাদের খেয়াল আছে?’

হক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন, ‘পারফেকশন বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সব কিছুর মধ্যেই ভালো মন্দ দুটি দিক থাকে। যে লোকটা আজকে সাধু সন্ন্যাসী হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখো সেই সন্ন্যাসীর জীবনেরও একটি কালো অতীত আছে। আবার যে লোকটা ভয়ংকর অপরাধী, তারও সফেদ একটি অতীত অথবা ভবিষ্যৎ আছে। আমি কি কথাটা বোঝাতে পারলাম?’

– ‘পেরেছেন। কিন্তু আপনাদের মতো রাজনীতি করা, সমাজের উঁচু জায়গায় বসে থাকা লোকেরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো কখনোই বুঝবে না। আমাদের সমস্যাগুলো বুঝতে হলে আমাদের লেভেলে নামতে হবে।’

– ‘সমস্যা কোথায় জানো? মূল সমস্যা হচ্ছে আমরা অল্প বিস্তর অক্ষর জ্ঞান লাভ করেই নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে মনে করি। ঘরে বসে বড় বড় উপদেশ বাণী লিখি। নিষ্কর্মা লোকেরা অনলাইনে লাইভে এসে সেইসব মানুষের নিন্দা করে যারা কিনা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের জন্য লড়ছে। মাঠে নেমে সত্যিকারের কাজটা করতে যে কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। আজকে তোমার মনে হচ্ছে আমার জায়গা থেকে সব সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা যায়। কিংবা আমি যা করছি তা ভুল। কিন্তু একবার আমার জায়গায় এসে দেখো। হয়তো তোমার ধারণা পাল্টে যাবে। আজকাল বাস্তবিক অর্থেই আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় যে, অক্ষরজ্ঞান লাভ করা আর প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া দুটো

এক জিনিস নয়। বেশিরভাগ লোকের কাছে ডিগ্রীটা শুধু ড্রয়ারে জমিয়ে রাখা সার্টিফিকেটের কাগজ, জীবিকা নির্বাহের উপায় এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

– 'আমি জানি না আমি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত কিনা, তবে আমার স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে আমি বুঝি যে আমাদের এই পরিণতির জন্য সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। জন্মের পর থেকেই আমরা জেনে এসেছি যে পেটের দায় মেটানোটাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। মৌলিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। অন্যকিছু ভাববার অবকাশ নেই। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানকার মানুষগুলোকে মৌলিক অধিকার নিয়ে অন্তত ভাবতে হয় না। শিক্ষা ওদের মনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম অনেকাংশেই। ওসব দেশে দামি ডিগ্রী না থাকলেও লোকে কিন্তু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে। সার্টিফিকেট ছাড়াও দিব্যি দিন কেটে যায় স্বচ্ছলভাবে। আর আমাদের দেশে সার্টিফিকেটের কাগজ মুখে খাবার তুলে দেয় রাশেদ! তাই অক্ষর জ্ঞানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কোনোদিক দিয়েই মানসিক নয়। পুরোপুরি দাপ্তরিক বা অর্থনৈতিক।'

– 'দাপ্তরিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক! দারুণ বললে তো!'

অমৃতার যেন হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ল, জরুরি গলায় বলল, -'আচ্ছা! আপনারা হৃদির বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'

আচমকা প্রশ্নটা একটু চমকে দিল রাশেদকে। তিনি অমৃতার দিকে ঘুরে তাকিয়ে কিছুটা হতভম্ব গলায় বললেন,

– 'বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবার কথা ছিল নাকি?'

অমৃতা হাসে, 'ছেলের বিয়ে দেবেন না?'

রাশেদ কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'সামি তো এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুই বলে নি। সে কি এখন বিয়ে করতে চায়?'

– 'অবশ্যই চায়। বিয়ে করে ফেলা ছাড়া আসলে আর কোনো উপায় নেই। হৃদির বাসা থেকে ছেলে দেখছে।'

রাশেদকে চিন্তিত দেখালো। কপালের ভাঁজটা সরল না সহজে। বললেন, 'কিন্তু সামির আম্মা তো একেবারেই রাজি না এই সম্পর্কে। তার অমতে তো আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারব না।'

অমৃতা অধৈর্য গলায় বলল, 'উনার সাথে সিরিয়াসলি কথা বলুন। বোঝান ভালোমতো। দেখুন, আপনার ছেলে অনেক লাকি যে জীবনের সঠিক সময়ে সে সঠিক মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছে। সবার ভাগ্য কিন্তু এতো ভালো হয় না!' কথাটা শুনে রাশেদ একটু থমকানো চোখে তাকালেন অমৃতার দিকে। সঠিক সময়ে, সঠিক মানুষ! ঠিক এভাবে তো এর আগে কখনো ভাবা হয় নি!

– 'কিছু কিছু মানুষের জীবনে কী হয় জানেন? দে মিট দ্যা রাইট পারসন অ্যাট আ ভেরি রং টাইম!' অমৃতা বলল বিষাদ জড়ানো গলায়। রাশেদ চুপ করে রইলেন। স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন সম্মুখে। দূর বনের কোকিলটা তখনও কুহুকুহু স্বরে ডেকে যাচ্ছে অক্লান্তভাবে। আকাশ আর পাহাড়ের মিলনস্থলে দিনের প্রথম রোদ্দুর রেখা কোমল ঝিলিক দিচ্ছে। পাতলা মেঘের গায়ে লেগে আছে সদ্য জেগে ওঠা দিনমণির কাঁচা লাল রং। সেই দিকে চেয়ে থেকে ক্রমশ এক চিন্তারাজ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি।

মাথার ভেতরে ঘূর্ণির মতো বাক্যটা ঘুরছিল। Meeting the right person at a wrong time!

– ‘কী ভাবছেন?’ অমৃতার প্রশ্ন।

চিন্তারাজ্যে ডুবে থেকেই তিনি অমৃতার দিকে ফিরে চাইলেন। চোখ থেকে ভাবনার ছায়া তখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। ধীর কণ্ঠে বললেন, —‘তেমন কিছু না। তোমার কথা বলো। তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই?’

অমৃতা ফিক করে হেসে দিল। তারপর ফিচেল গলায় বলল, ‘আমি তো আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথেই আছি এখন!

রাশেদ একটু কড়াভাবে বলে উঠলেন, ‘দুষ্টুমি করো না!’

অমৃতা অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, ‘দুষ্টুমি করছি না। আপনার কি আমার বয়ফ্রেন্ড হতে আপত্তি আছে?’

– ‘তোমাকে এখন আমার খুব জোরে একটা ধমক দেওয়া উচিত, জানো? তোমার বয়সি আমার একটা ছেলে আছে।’

– ‘ছেলে আছে বলে কি আপনার আলাদা একটা জীবন থাকতে পারে না? বাবা মায়েদের কি ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু নেই?’

– ‘আমার শুধু ছেলে আছে তাই ই নয়। স্ত্রীও আছে।’

– ‘জানি তো!’

– ‘তাহলে কেন আবোলতাবোল বকছ?’

– ‘ইচ্ছে করছে তাই।’

– ‘ইচ্ছেতে লাগাম দিতে শেখো।’

– ‘কেন? একটাই তো ছোট্ট জীবন! ইচ্ছেরা ওদের মতোই থাকুক না! বেচারাদের ওপর এত অত্যাচার কেন?’

রাশেদ চুপ করে গেলেন। ঠোঁট টিপে, কপালে ভাঁজ ফেলে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলেন। ভাব দেখে বোঝা গেলো এই আলোচনার এখানেই ইতি টানতে চাইছেন তিনি। অমৃতা বলল,-’সামির সাথে কথা হয়েছে। ওকে বলেছি ঢাকায় ফিরে গিয়ে অফিসে জয়েন করতে। মনে হচ্ছে আপনি একবার মুখ ফুটে বললেই ও রাজি হয়ে যাবে।’

রাশেদ কৃতজ্ঞতার গলায় বললেন, ‘ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি আমার অনেক উপকার করলে। আসলে আমার ছেলের বন্ধুভাগ্যটা খুব ভালো। একটা সময় ওর ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে আমার চরম আপত্তি ছিল। এখন আর নেই।’

– ‘জেনে ভালো লাগল। একটা সময় আপনাকেও আমার চরম অহংকারী বলে মনে হতো। এখন আর মনে হয় না। বরং মনে হয় আপনার মতো মানুষকে বুঝি একটু অহংকারী হলেই মানায়।’

ঝুমঝুম আওয়াজে কিছু একটা ডেকে যাচ্ছিল অনবরত। নিঝুম বনের মধ্যে শব্দটা নূপুরের ঝংকার তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছিল দিগ্বিদিকে। শুনতে ভালো লাগছিল। রাশেদ বললেন, ‘আওয়াজটা কীসের বল তো?’

– ‘কী জানি! ঝিঁঝিঁ পোকা হবে হয়তো!’

– ‘ঝিঁঝিঁ নয়, সিকাডা। বাংলায় বলে ঘুরঘুরে পোকা অথবা উচ্চিংড়ে। এরা জন্মের পর প্রায় সতেরো বছর মাটির নিচে জীবিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা হবার পর মাটির ওপরে উঠে আসে। মাটির ওপর কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচে না। চীনারা এই পোকা ধরে খায়।’

–চৈনিকরা তো সবই খায়। বাদ আছে কিছু? তবে এই ডাকটা কিন্তু ভারি সুন্দর! আমি এর আগে সেভাবে খেয়াল করিনি কখনও। জানতাম না যে এটাই সিকাডার ডাক। যে কবার শুনেছি, ভেবেছি ঝিঁঝিঁ পোকা।’

– ‘হ্যাঁ খুব সুন্দর। গানের মতো মনে হয়। পুরুষ সিকাডা পেটের নিচের একটি অঙ্গ ব্যবহার করে এই শব্দটি করে থাকে। এটা অ্যাকচুয়েলি মেইল সিকাডাদের মেটিং কল। সঙ্গিনীদের আকৃষ্ট করা ছাড়াও এই গানের পেছনের আরেকটি কারণ হলো খাদক পাখিদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। তাদের উঁচুস্বরের গান পাখিদের আভ্যন্তরীণ শব্দের আদানপ্রদানকে ব্যাহত করে এবং দল বেঁধে শিকার

করায় বাধা সৃষ্টি করে। এনশিয়েন্ট পোয়েটরা এই সিকাডা নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। Come, dear cicada, chip to all the grove/The Nymphs and Pan, a new responsive strain/That I, in the noontide sleep, may steal from love/Reclined beneath the dark overspreading plane! এটা এক গ্রিক কবির লেখা কবিতা। কবির নামটা ভুলে গেছি।'

– 'আপনি কবিতা ভালোবাসেন?'

– 'একটা সময় বাসতাম বৈকি, এখন আর সময় কোথায়?'

অমৃতা চপল গলায় বলল, 'একটা ছড়া পড়েছিলাম সিকাডা নিয়ে। মনে পড়ে গেলো, Clickety clack cikada clinging to the wall / When the sun is sleeping you don't sing at all...'

পরের দুটা লাইন রাশেদ বললেন, 'But when the sun is shining on summer days so long, clickety clack cicada what a noisy song!'

বলা শেষ করে তিনি অমৃতার মুখের ওপর চোখ রেখে প্রাণখোলা একটি হাসি হাসলেন। অমৃতা সেই হাসিটার দিকে আবিষ্টভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের অজান্তেই হঠাৎ ছেলেমানুষী গলায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, 'ওয়াও!'

– 'কী হলো?'

অমৃতা হাসতে লাগল, 'কিছু না!'

– 'হাসছ কেন?'

অমৃতা উত্তর দিল না। মিটমিটে হাসি নিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। তার মুখে একটা অপ্রতিরোধ্য ভালো লাগার ছাপ আঠার মতো লেগে আছে অনেকক্ষণ যাবৎ। ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রুর নিচের চোখ দুটি কিছুটা আরক্ত। ফর্সা গায়ে আকাশি রঙের গেঞ্জিটা ফুলের মতো ফুটে আছে। মিশে আছে তার বাঁক খাওয়া, সর্পিল সরু কায়াখানিতে, শৈল্পিক ভাবে!

তিনি আবার প্রশ্নটা করলেন, 'হাসির কী হলো?'

অমৃতা কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'বলতে লজ্জা লাগছে। লিখে দেই?'

মেয়েটার পাগলামো আর ছেলেমানুষী দেখে তিনি আবারও হেসে ফেললেন। আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, পাগলামোগুলো এখন কোনোভাবেই খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। এই রোজকার পূর্ণমানুষী জীবনে একটুখানি ছেলেমানুষী ছোঁয়া যদি কালেভদ্রে লেগেই যায়, তো মন্দ কী?

অমৃতা প্যান্টের পকেট থেকে সেলফোন বের করল। তার আচার আচরণে এখন কিশোরী সুলভ চঞ্চলতা। ঠোঁটে চপল হাসি। সে মোবাইলের কিপ্যাডে আঙুল চালালো খুব দ্রুত। টুং করে একটা শব্দ হলো অন্য প্রান্তের সেলফোনে। হক কিঞ্চিৎ

আড়ষ্টভাবে সেলফোনের মেসেজবক্স খুললেন। অমৃতা লিখেছে, ‘আপনার হাসিটা। ইউ নো ইট হ্যাজ ম্যাজিক! আপনি হাসলে চারপাশটা ম্যাজিকের মতো পাল্টে যায়!’

প্রশংসা তিনি নানাসময়ে নানাজনের কাছ থেকে পেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু হাঁটুর বয়সি একটি মেয়ের কাছ থেকে এমন খোলামেলা প্রশংসা জীবনে এই প্রথমবার পাওয়া। তিনি মেসেজটা পড়ে একটু সময় চুপ করে থাকলেন। তাঁর কি উচিত মেয়েটিকে একটি বড়সড় ধমক দেওয়া? কিংবা এই মুহূর্তে এখান থেকে উঠে চলে যাওয়া? তিনি আজীবন উচিত কাজটাই করে এসেছেন। তাঁর গোটা জীবনটা নিয়মে গড়া, শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। কিন্তু আজকে এই মেয়েটিকে কড়া কথা বলতে কেন যেন বাধছে। তিনি একেবারেই জোর পাচ্ছেন না ভেতরে। কানের কাছে একটা শেকল ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছেন। নিয়মের শেকলটা কেউ ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে যেন, ঝনঝন ঝনঝন শব্দে।

‘থ্যাংক ইউ!’ লিখলেন তিনি, ছোট করে। এরপর দুজনেই চুপ করে গেলো। তাকিয়ে রইল একে অন্যের দিকে। চোখ সরিয়ে নিল, আবার তাকালো। কখনো হাসল, কখনওবা গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। ওপাড়ের পাহাড় থেকে সাদা পায়রার মতো পলকা মেঘের দল উড়ে উড়ে আসছিল এপাড়ের পাহাড়ে। বাতাসের ঝাপটায় নাকে এসে লাগছিল মহুয়া ফুলের ঘ্রাণ। শিমুল গাছের ডালে বসে টিউটিউ করে ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছিল এক জোড়া পাহাড়ি টুনটুনি। সেই সাথে ঘুরঘুরে পোকার নূপুরের মতো ঝুমঝুম গান আর হঠাৎ হঠাৎ কোকিলের কুহুতান চারপাশটাকে ইন্দ্রের সুরসভার চেয়েও মোহনীয় করে তুলছিল ক্রমশ। প্রকৃতির মতোই সতেজ এবং বিশুদ্ধ রকমের একটা হাসি লেগে ছিল দুই নর নারীর মুখে। এই বন পাহাড়ের দেশে… শাল আর মহুয়ার গন্ধে… দূরের বনের কোকিলের ডাকে … ঝিরিঝিরি সুর তোলা হাওয়ায়… কোন এক অদৃশ্য যাদুবলে যেন… হঠাৎ করেই সামাজিক রীতিনীতি, সাংসারিক পিছুটান, বয়সের ব্যবধান সমস্ত কিছু কেমন ঝাপসা হয়ে উঠে ইথারে মিলিয়ে গেলো। প্রকৃতির কাছে হয়তো বয়স বা সময় বলে কিছু

নেই। প্রকৃতির কাছে সবাই মানুষ এবং মানুষী, নারী এবং পুরুষ। প্রাকৃতিক নিয়মেই নারী পুরুষ কাছে আসে··· দূরে যায়··· আবার কাছে আসে!

অমৃতা এবার লিখল, 'একটা জিনিস চাইব। দেবেন?' মেসেজটা পাঠানোর পর সে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সামনে বসে মেসেজ পাঠানোর এই এক মজা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মুখে যা বলা যায় না, লিখে ফেলা যায়। দারুণ কিন্তু ব্যাপারটা! মেসেজ পড়ে তার কপালে ভাঁজ পড়ল। একবার তাকাল অমৃতার দিকে। লিখল, 'বলো কী চাই?

অমৃতা লিখল, 'আমি কি একটাবারের জন্যে আপনার হাত ধরতে পারি?'

টুং করে শব্দ হলো অন্য প্রান্তের মোবাইলে। তিনি মেসেজ খুলে পড়লেন। পড়তে পড়তে তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেলো। কৃষ্ণ মেঘের ছায়া পড়ল চোখে। ধীরে ধীরে চোয়াল হয়ে উঠল শক্ত। কয়েকটা সেকেন্ড থম ধরে বসে রইলেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো ফিরে যাই।'

অমৃতা অপমানে শক্ত হয়ে গেলো। কেউ যেন এইমাত্র বুকের খাঁচায় ধুকপুক করা হৃৎপিণ্ডটা খামচে নিয়ে দুমড়েমুচড়ে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, অবহেলায়। সে জায়গাটা থেকে নড়ল না। নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালেন, উঁচু গলায় বললেন, 'কী হলো? যাবে না?'

অমৃতা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার নাকের পাটা ফোলা। চোখের পাতায় চিকচিক করছে কয়েক বিন্দু জল। রাশেদ পকেটে হাত রেখে

চোখাভাবে তার দিকে কয়েকটা সেকেন্ড চেয়ে রইলেন। এরপর একটু দ্বিধা নিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসলেন। অমৃতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফিরতে হবে না? নাকি এখানে থেকে যাবে আজীবন?'

অমৃতা শূন্য চোখে তাকালো তাঁর দিকে। মানুষটা খুব লম্বা। কাছে এসে দাঁড়ানোর পর ঘাড় উঁচু করে কথা বলতে হচ্ছে।

অমৃতা স্থবিরভাবে বলল, 'আজকের পর থেকে আমি আর কোনোদিন আপনার সাথে দেখা করতে চাইবো না, জানেন?'

বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো মেলে অমৃতার মুখে কিছু একটা খুঁজলেন তিনি লাগাতার কয়েকটা ক্ষণ। কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি খেলা করল তাঁর মুখে। ঠোঁট টিপে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বেশ তো, ওয়াইজ ডিসিশন!'

অমৃতার পাতলা ঠোঁটজোড়া কাঁপছিল হালকা। চোখের কোণ বেয়ে নিঃশব্দে একটা জলের ধারা নেমে আসছিল নাক বরাবর। বাতাসে উড়ছে তার কপালের কাছের ঘাসের মতো ছোট ছোট চুলগুলি। সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'আপনার একটুও কষ্ট হচ্ছে না, তাই না রাশেদ?'

রাশেদ অমৃতার টুলটুলে মুখটার দিকে চেয়ে ছিলেন আবিষ্টভাবে। একটা বিষয় তিনি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন যে, এই মেয়েটির মধ্যে কোনো তঞ্চকতা নেই। তিনি এই সুদীর্ঘ, অভিজ্ঞতাময়, ঘটনাবহুল জীবনে এতটা স্বচ্ছ মনের মানুষ খুব কমই দেখেছেন। এই মুহূর্তে মেয়েটির চোখের পানি তিনি সহ্য করতে পারছেন না। দু পা এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? বোকা মেয়ে?'

– ‘আমি নিজেও জানি না কেন কাঁদছি। আমি আগে এরকম ছিলাম না। বিশ্বাস করেন!’

– ‘প্লিজ কান্নাকাটি করো না। আমার ভালো লাগছে না।’

– ‘কান্নাকাটি আমি কখনোই করতে চাই না। কিন্তু আমার ভাগ্যটা খুব খারাপ, জানেন? আমাকে কেউ ভালোবাসে না!’

রাশেদ ছেলে ভোলানোর গলায় বললেন, ‘তোমার ভাগ্য খারাপ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তুমি খুব ভালো থাকবে। সবাই তোমাকে ভালোবাসবে।’ অমৃতা তার কম্পনরত একটা হাত মানুষটার প্রশস্ত বুকের ওপর রাখল, বলল –’সবার ভালোবাসা যে আমি চাই না। আমি কী চাই আপনি কি তা বোঝেন না?’

রাশেদ নিজের বুকের ওপর রাখা অমৃতার হাতটার দিকে ভাঁজযুক্ত কপাল নিয়ে তাকালেন, একটু দুর্বল গলায় বললেন, ‘তুমি কি বোঝো না যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়?’

অমৃতা একটা বড় শ্বাস ফেলে বিষণ্ণ গলায় বলল, —‘বুঝি! বোঝার পরেও কষ্ট হয়!’

– ‘কষ্ট পেও না!’

– ‘আমি জানি আপনি আপনার স্ত্রী, পুত্রকে অনেক ভালোবাসেন। আমাকে সেই ভালোবাসার ভাগ দিতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, অফ দ্যা রেকর্ড।

আপনি আমার কাছ থেকে যত দূরেই থাকুন না কেন আমার মনটা যে সব সময় আপনার সাথেই থাকে, সেটা কি আপনি টের পান?'

রাশেদ ডান হাতের আঙুল বাড়িয়ে অমৃতার চোখের জল মুছে দিতে দিতে স্তিমিত গলায় বললেন, 'টের পাই!'

– 'সত্যি?'

– 'সত্যি!'

শব্দটা উচ্চারণ করে তিনি নিজের বুকের ওপর রাখা অমৃতার হাতটা আলতোভাবে ধরলেন। মোমের মতো ফর্সা নরম হাতটার দিকে একটু সময় চেয়ে থেকে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এবার চলো!'

৩২

– 'ওই, তোর বয়ফ্রেন্ডের জ্বর আসছে। যা গিয়া একটু সেবা যত্ন কর।' রুদ্র গম্ভীর গলায় ফরমায়েশ দিল হৃদিকে।

হৃদি কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। ভোরে ভেঙে যাওয়া ঘুমটা আর কোনোভাবেই জোড়া লাগানো গেলো না। রুদ্রর কথাটা শুনতে পেয়ে তার কপালে একটি অনভিপ্রেত কুঞ্চন সৃষ্টি হলো। উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'হঠাৎ জ্বর?'

– ‘হুম। বড়লোকের পোলা তো। নকড়া বেশি। ভোররাত থেকে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া আম্মা আম্মা করতেছে।’ হৃদি আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরের দিকে রওয়ানা দিল। চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিল রুদ্রর হাতে।

নব ধরে অল্প ঘোরাতেই খুলে গেলো দরজাটা। ভেতরটা ঠাণ্ডা। বোঝা যাচ্ছে সারারাত এয়ার কন্ডিশন চালানো ছিল। আকাশ মেঝেতে চাদর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত দুটো রাখা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভারি নিশ্বাসে বুক উঠানামা করছে। জানালার পর্দা টানা বলে ঘরের ভেতরে এখনো সূর্যের আলো পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। আধো আলো অন্ধকারে ছেয়ে আছে সারা ঘর। হৃদি পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকল। সে জানে আকাশের ঘুম খুব পাতলা। টুকটাক একটু শব্দ হলেই ঘুম ছুটে যায় ওর। সামি পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিছানায়। তার গায়ের ওপর একটা পাতলা কম্বল জড়ানো। দরজার শব্দ পেয়ে সে একটু নড়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল হৃদিকে। হৃদি ফিসফিস করে বলল, ‘তোর নাকি শরীর খারাপ?’

সামি প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিল না। একটু নড়ে উঠে গায়ের কম্বলটা আরো ভালো মতো টেনেটুনে নিল। তার মাথা ভার। শরীর দুর্বল। হৃদি এগিয়ে এসে ওর কপালে একটা হাত রেখে বলল, ‘জ্বর আসছে তো তোর। হঠাৎ কী হইল?’

কথাটা বলতে বলতে সে সামির পাশে বসলো বিছানায়। সামি এবারেও কিছু বলল না। তার মুখটা বড়ই শীর্ণ দেখাচ্ছে। কালচে ঠোঁট দুটো শুকনো। চোখ জোড়া নিষ্প্রভ এবং ঈষৎ লালচে। জ্বরটা অবশ্য তার চেহারার সুকুমার ভাব কেড়ে নিতে পারেনি। ওর শ্রীময় মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে হৃদির মনটা ক্রমশ নরম হয়ে আসছে। দুদিন ধরে জমে থাকা বরফের মতো কঠিন রাগের চাইটা ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে। সে সামির কোঁকড়ানো চুলগুলিতে হাতের আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল,

– ‘তোর কি বেশি শরীর খারাপ লাগতেছে? চোখ এরকম লাল হয়ে আছে কেন? আলতা পরছিস নাকি চোখে?’

সামি টানা কিছুক্ষণ তার রাঙা দুটি চোখ হৃদির মুখের ওপর স্থিরভাবে তাক করে রইল। হৃদির কোমর পর্যন্ত লম্বা চুলগুলি খোলা। পরনে একটা অফ হোয়াইট সুতির সালওয়ার কামিজ। ওড়নাটা চওড়াভাবে ছড়িয়ে আছে, বুকের ওপর। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁয়া। সেই মুহূর্তে, ওর ওই নিষ্কলঙ্ক, নিখাদ মুখটা দেখে সামির হঠাৎ মনে হলো যে, মায়া জিনিসটা আসলে কী তা এই মেয়েটাকে না দেখলে জগতের কোনো মানুষ কোনোদিন পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। সে বড় একটা শ্বাস টেনে নিল। তার মনে হলো, এতক্ষণ এই ঘরে বুঝি অক্সিজেনের অভাব ছিল। হৃদি এসেছে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সিলিন্ডার নিয়ে।

সামি একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘তুই গতকাল রাতে ফোন ধরিস নাই। কেন জানতে পারি?’

হৃদি ওর গালে একটা হাত রেখে বলল, ‘এমনি।’

– ‘এমনি এমনি ফোন ধরিস নাই?’

– ‘আচ্ছা, এসব কথা পরে হবে। এখন তুই ওঠ। চট করে কিছু খেয়ে নে। ওখুধ খেতে হবে।’

– ‘ওখুধ খেতে হবে না। এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। তুই আমার প্রশ্নের জবাব দে।
’

হৃদি একটু সতর্কভাবে মেঝেতে শুয়ে থাকা আকাশের দিকে তাকালো একবার। আকাশ তখনও ঘুমোচ্ছে। গলা কয়েক পর্দা নিচে নামিয়ে হৃদি বলল, ‘তুই আকাশকে কী সব আজেবাজে কথা বললি। আমার খুব খারাপ লাগছিল।’

– ‘আকাশ আমার বন্ধু। আমি ওরে যা ইচ্ছা বলতে পারি। এটা নিয়ে তোর আপত্তি করার কিছু নাই।’

– ‘আকাশ আমারও বন্ধু। এটা ভুলে যাস না।’

দরজায় খুট করে একটা শব্দ হলো। ওদের দুজনের কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের মধ্যে রোমেলা ঢুকলেন আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে। হৃদি সচকিতভাবে উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। রোমেলা আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, ‘কী হয়েছে আমার বাচ্চাটার?’ প্রশ্নটা করে হৃদির দিকে একবার কঠিনভাবে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। হৃদি সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর তো দিলেনই না, উপরন্তু তার চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠল রাগে। হৃদি মাথা নিচু করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। আকাশের ঘুম তখন ছুটে গেছে। শোয়া থেকে উঠে বসেছে সে। রোমেলা দৌড়ে ছুটে আসলেন ছেলের কাছে। ছেলের কপালে হাত রেখে উদ্বেগের গলায় বললেন, ‘হায় আল্লাহ! আমার ছেলের তো জ্বর! হঠাৎ জ্বর আসলো কেন?’ প্রশ্নটা তিনি আকাশের দিকে চেয়ে করলেন। আকাশ ঘুম জড়ানো গলায় ভারি জিব নেড়ে অনেক কষ্টে বলল, ‘জানি না আন্টি।’

সামি মায়ের একটা হাত ধরল, নরম স্বরে বলল, ‘আমি ঠিক আছি মা।’

রোমেলা রিসিপশনে ফোন করে নাশতার অর্ডার দিলেন। সাথে নাপা এক্সট্রাও চেয়ে নিলেন একটা। সেই সাথে চাইলেন ছোট রুমাল, জলপট্টি দেবার জন্য। হৃদি ঘরের কোণায় রাখা ছোট ফ্রিজটার সামনে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রোমেলা তার দিকে ভুলেও চোখ মেলে তাকাচ্ছেন না। যেন এই মানুষটার উপস্থিতি তিনি টেরই পাচ্ছেন না। তাঁর পরনে নেভিব্লু রঙের ছাপা সুতির শাড়ি। চুলে বড়সড় একটা খোঁপা। গলায় ঝুলছে হোয়াইট গোল্ডের চেইন তার সাথে হীরের ছোট্ট একটা লকেট। হাতভর্তি স্বর্ণের চুরি। নাকে হীরের ফুল। তাঁর গা থেকে এই সাতসকালেই দামি পারফিউমের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। হৃদি চোরা চোখে দেখছিল। মহিলার গায়ের রং ফর্সা টকটকে। মাথায় ঢেউ খেলানো কোঁকড়ানো চুল। বোঝা যায় সামি মায়ের গায়ের রং আর চুল পেয়েছে জন্মগতভাবে। তার মা নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কাটা কাটা সুন্দর বলেই চেহারায় হয়তো নমনীয় ভাবটা একটু কম।

৩৩

আকাশ হাত মুখ ধুয়ে কটেজের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দু তিনটে তিতির পাখি হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দার ওপাশে। ডাকছে গলা খুলে। রুদ্র হৃদির দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। বিভা আর অভিজিৎ তখনও ঘর ছেড়ে বেরোয়নি।

আকাশ রুদ্রকে দেখতে পেয়েই জরুরি গলায় বলল, ‘এই শোন, তুই কি বসুন্ধরার ফ্ল্যাটটা ছাইড়া দেওয়ার প্ল্যান করতেছিস?’

– ‘নাতো, কেন?’

– ‘সামি তো তোর সাথে আর থাকবে না। তুই মুভ করবি না অন্য কোথাও?’

রুদ্র একটু চিন্তাযুক্ত গলায় বলল, 'শোন, আমি ভাবতেছি যে সেপ্টেম্বরে তো চলেই যাচ্ছি এব্রোড। চাকরি আছে আমার জুলাই মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে আর মুভটুভ করব না। তাছাড়া সামি বলছে এই চার পাঁচ মাস সে ফ্ল্যাটে না থাকলেও ভাড়া শেয়ার করবে। বুঝছস?'

– 'হুম। না কাহিনি হইতেছে মামা, কালকে রাত্রে খবর পাইলাম যে আমাদের বাসার ছাদের উপরে চিলেকোঠার মতো যে ঘরটা আছে, ওইটা খালি হইছে। বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়া খুঁজতেছে। তাই ভাবলাম তোরে বলি।'

– 'ও তাই নাকি? ভাড়া কী রকম?'

– 'খুব বেশি না, দশ বারো হাজার হবে।'

– 'একটাই রুম?'

– 'হ্যাঁ রুম একটা, এটাচড বাথ আর তোর ইশে··· একটা রান্নাঘর আছে।'

– 'মনীষা তো বাসা খুঁজতেছে। ওরে বলমু নাকি?'

– 'বাসা পায়নায় সে এখনো?'

– ‘না, তার অফিসের লোকেশন আবার চেঞ্জ হইছে। নতুন অফিস মনে হয় মোহাম্মদপুর থেকে কাছেই হবে।

– ‘আচ্ছা, বলে দেখতে পারিস।’

ঠিক সেই সময় অমৃতাকে দেখা গেলো কটেজের সামনে। তার কাছাকাছি দূরত্বে সামির আব্বাকেও দেখতে পেলো বন্ধুরা। অমৃতা সিঁড়ি ভেঙে কটেজের বারান্দায় উঠে এসেই দুই বন্ধুর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, ‘সামির কী হইছে?’

রুদ্র বিকারহীন গলায় বলল, ‘ঢং হইছে।’

মিনিট দুয়েকের মধ্যে হক উঠে আসলেন বারান্দায়। সাধারণত নিজ পুত্রের বন্ধুরা তাকে দেখামাত্রই সালাম দিয়ে ওঠে। একটা বিনয়ী ভাব অতর্কিতে ফুটে ওঠে এদের চেহারায়। কিন্তু আজ, কোনো এক অবিদিত কারণে দুজনের একজনও সালাম দিল না। হক ছেলেদুটোকে এক পলক দেখলেন। লক্ষ্য করলেন দুজনের মুখেই বিনয়ের পরিবর্তে একটা উদ্ধত ভাব বিরাজ করছে। রুদ্রর চোখে চোখ পড়ল তাঁর। রুদ্র চোখ সরিয়ে নিল। এই ব্যতিক্রম আচরণের কারণ তাঁর কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। কারণটা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারলেন তিনি।

হক সাহেব জায়গাটা অতিক্রম করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অমৃতাকে বলল, ‘তুই কোথায় গেছিলি?’

– ‘মর্নিং ওয়াকে।

– ‘কার সাথে?’

অমৃতা এক চোখ টিপে বলল, ‘কার সাথে আবার? আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে!’

কথাটা শুনে আকাশ আর রুদ্র একে অপরের দিকে তাকালো। রুদ্রর মুখটা একটু পাঁশুটে বর্ণ দেখাচ্ছিল। অমৃতা ওর পাঁশুটে চেহারার দিকে চেয়ে বলল, ‘তোর কী হইছে?’

–’ কিছু না।’

– ‘মুখ কালা করছস ক্যান?’ অমৃতার প্রশ্ন।

রুদ্র অমৃতার পুতুল পুতুল মুখটার দিকে কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে যান্ত্রিক গলায় বলল, ‘মেকআউট করতে ইচ্ছা করতেছে।’

অমৃতা মুখ বাঁকালো, ‘সব সময় ফালতু প্যাঁচাল।’

কথাটা বলে সে আর দাঁড়াল না। হেঁটে চলে গেলো ভেতরে। আকাশ একটু ত্যাড়া গলায় বলল, ‘তুই শালা সব সময় এই কথাটা ওরে কেন বলিস?’

রুদ্র দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, ‘কারণ আমি বিশ্বাস করি যে একদিন ও আমার এই কথায় সাড়া দিয়ে বলবে, লেটস ডু ইট!’

আকাশ বিস্মিত গলায় বলল, ‘কী বলতেছিস?’

রুদ্র হাসে, ‘ঠিকই বলতেছি।’

আকাশ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলো রুদ্রর কথাটা শুনে। ভ্রুকুটি গম্ভীর মুখ নিয়ে চেয়ে রইল সামনে। রুদ্র বলল, ‘তুই কি রাগ করলি নাকি?

আকাশ রুদ্রর দিকে ফিরে তাকিয়ে শক্ত গলায় বলল, ‘দ্যাখ রুদ্র, তুই ওকে পছন্দ করলে সরাসরি বলতে পারিস না? এইসব ফাইজলামির তো কোনো মানে হয় না।
’

রুদ্রর মুখে একটু বিরক্তি ভাব ফুটে উঠল, ‘এটা আমার স্টাইল। আমার পক্ষে সরাসরি বলা সম্ভব না। তুই বলস না ক্যান? তুই সরাসরি বললেই তো পারিস।’

আকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরস্বরে বলল, ‘আমার কথা বাদ দে।’

৩৪

সামি মায়ের হাত ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মা তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হৃদি অস্বস্তি নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরেধীরে দরজার দিকে সরে আসলো। এখানে আর তার থেকে কাজ নেই। বিশেষ করে এই মহিলার সাথে এক ঘরে বেশিক্ষণ থাকা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না। এই আত্মম্ভরী মহিলার আচার আচরণ তার ভালো লাগছে না একেবারেই। কথার ধরনেই বোঝা যায় যে কাউকে মানুষ বলে পণ্য করে না সে। হৃদি দরজার নবটা ঘুরালো হালকাভাবে।

– ‘হৃদি!’ হঠাৎ সামির গলার আওয়াজ ভেসে আসলো পেছন থেকে।

হৃদি একটু ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, ‘হুম?’

– ‘কোথায় যাচ্ছিস?’ সামির প্রশ্ন।

হৃদি টের পেলো রোমেলা তার দিকে ঝাঁঝালো চোখে তাকিয়ে আছেন। এরকম হিংস্র দৃষ্টির সামনে সে এর আগে কোনোদিন পড়েছিল কিনা তা মনে করতে পারল না এই মুহূর্তে। সে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, ‘বাইরে··· বাইরে যাচ্ছি।’

সামি কড়াভাবে হুকুম করল, ‘কোথাও যেতে হবে না। এখানেই থাক।’

রোমেলা ব্যস্ত গলায় ছেলেকে বললেন, ‘তুমি কথা বোলো না বাবা, চুপ করে শুয়ে থাকো।’

হৃদি অস্বস্তি নিয়ে দরজার কাছ থেকে ফিরে আসলো আবার। রুদ্র যে বিছানায় ঘুমিয়েছে রাতে সেই বিছানাটা বড়ই অগোছালো হয়ে আছে। আর কোনো কাজ না পেয়ে হৃদি বিছানায় পড়ে থাকা এলোমেলো কম্বলটা ভাঁজ করতে লাগল। দুমড়ে মুচড়ে থাকা চাদর ঠিক করতে লাগল।

– ‘বাবা কোথায়?’ সামি প্রশ্ন করল। একটু দুর্বল গলায়।

রোমেলা বললেন, ‘তোমার বাবা ভোরবেলা উঠেই হাঁটতে বেরিয়েছেন। ফোন করেছিলাম। এখন ফিরে আসছেন।’

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হক সাহেব উপস্থিত হলেন ঘরে। ব্যস্তভাবে ছুটে আসলেন ছেলের কাছে। নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘এখন কেমন লাগছে আব্বু?’

সামি হাসল, ‘ভালো বাবা। এখন ভালো লাগছে আমার।’

হক চোখ ঘুরিয়ে হৃদিকে দেখলেন একবার। চোখে চোখ পড়তেই হৃদি সালাম দিয়ে উঠল বিনীতভাবে। তিনি ছেলের বিছানার একপাশে বসতে বসতে হেসে সালামের উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি কেমন আছ মা?’

হৃদি হাতের কাজ ফেলে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ভালো আছি আংকেল। আপনি কেমন আছেন?’

– ‘আমি ভালো। তোমার আব্বা আম্মা ভালো আছেন তো?’

হৃদি হাসিমুখে বলল, ‘জি ভালো আছেন।’

রোমেলা স্বামীর দিকে তির্যক একটা দৃষ্টি দিলেন। মেয়েটির সাথে যেচে পড়ে কথা বলাটা তাঁর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এমনিতেই এই মেয়ে তার ছেলের শোবার ঘরে এসে বসে আছে সকাল থেকে। এসব মেয়েদের লাজ শরম বলতে কিছু নেই। চূড়ান্ত বেহায়া আজকালকার মেয়েগুলো। স্বামীর কাণ্ডজ্ঞান দেখে তিনি বিস্মিত না হয়ে

পারছেন না। এত কুশল বিনিময় করে এই বেহায়া মেয়েকে আরো মাথায় তোলার কোনো মানে আছে?

হক স্ত্রীর কঠিন দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হৃদিকে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো।'

হৃদির ভালো লাগল। সে পূর্ণ চোখ মেলে একবার তাকালো মানুষটার দিকে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে লোকটার মধ্যে বিশেষ একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। আশেপাশের সর্বস্তরের মানুষকে সম্মোহন করে রাখতে পারেন ইনি। অমৃতাও কি আর দশজন মানুষের মতো হিপনোটাইজড হয়ে গেলো? অমৃতার মতো কঠিন ব্যক্তিত্বের মেয়েও? আনমনা হয়ে ভাবছিল সে। মানুষ তার গোটা জীবনের একটিমাত্র মঞ্চে নানা সময় নানা ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে। যে মানুষকে দেখে অমৃতার মনের মধ্যে প্রেম ভাব উদয় হয়েছে, সেই একই মানুষ হৃদির কাছে শতভাগ পিতৃতুল্য!

সামির কেন যেন খুব ভালো লাগছিল। স্বস্তির এক অনুভূতি শীতের মিষ্টি রোদ্দুরের মতো আলতোভাবে এলিয়ে পড়েছিল মনের বারান্দায়। ভাগ্যিস জ্বরটা এসেছিল। জ্বর না আসলে বাবা, মা আর হৃদিকে একসাথে একইসময় পাওয়া যেত বুঝি? সে মায়ের কটমটে চেহারার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মা যে হৃদিকে একটা ফোঁটাও পছন্দ করেন না তা খুব ভালো মতোই জানা আছে তার। তার মনে বড়ই আশা যে খুব শীঘ্রই মায়ের মনোভাব পরিবর্তন হবে। হতেই হবে!

খাবার চলে আসলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। রোমেলা খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। আজ তিনি ছেলেকে নিজের হাতে খাইয়ে দেবেন। আপত্তি করল সামি। এই মুহূর্তে তার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে পেটে

কিছু পড়লেই বমি হয়ে যাবে। সে দৃঢ় গলায় মাকে বলল, 'এখন খাওয়া সম্ভব না। রেখে দাও একটু পরে খাব।'

এবার হৃদি কথা বলল, 'কিছু না খেলে তো ওষুধ খেতে পারবি না। অল্প করে হলেও কিছু খেতে হবে।'

সামি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'অসম্ভব!'

হৃদি এগিয়ে এসে একরকম জোরজার করে সামিকে শোয়া থেকে টেনে তুলল। হালকা ধমকের সুরে বলল, 'বেশি কথা বলবি না। চুপচাপ খেয়ে নে।

অগত্যা, সামিকে খেতেই হলো। তার মা খাইয়ে দিল সময় নিয়ে, যত্ন করে। খুব বেশি কিছু অবশ্য মুখে দিতে পারল না সে। সবজি দিয়ে অর্ধেক রুটি খেয়েই বাচ্চাদের গলায় বলে উঠল, 'আর খাব না। কিছুতেই আর খাব না। মরে গেলেও খাব না!'

হৃদি ওষুধ আর পানির গ্লাস হাতে নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। খাওয়া শেষ হতেই সে পানির গ্লাস আর ওষুধ এগিয়ে দিল সামির হাতে। ছেলের ওষুধ খাওয়া হয়ে গেলে, হক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি এখন একটু রেস্ট নাও আব্বু। কেমন? 'এটুকু বলে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'চল আমরা আসি।

– 'এত তাড়া কীসের? আরেকটু থাকি।'

– ‘থাকলে তো ওর সমস্যা হবে। ও একটু ঘুমাক। রেস্ট নিক।’ বললেন হক গম্ভীর গলায়।

রোমেলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বেরোনোর পর হক স্ত্রীকে বললেন, ‘মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। কী বলো?’

রোমেলা চমকে উঠলেন স্বামীর কথা শুনে, ‘কোন মেয়েটাকে? কী বলছ তুমি?’

হক হেসে বললেন, ‘কোন মেয়ে আবার। তোমার ছেলে যে মেয়েটিকে পছন্দ করে, তার কথা বলছি।’

রোমেলা ঝেঁঝে উঠে বললেন, ‘এই বাজে ফ্যামিলির মেয়েটাকে তুমি ছেলের বৌ করবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’

– ‘বাজে ফ্যামিলি বলছ কেন? ওর বাবা কি চোর ডাকাত নাকি?’

রোমেলা চাপা গর্জনের সাথে বলে উঠলেন –’চোর ডাকাত কিনা জানি না তবে আমাদের সাথে কোনোদিক দিয়েই মেলে না ওদের। তুমি জানো ওই মেয়ের বাবা কী করে? মামুলি এক চাকরিজীবী!’

হক একটু সময় গম্ভীরভাবে বললেন, ‘চাকরিজীবী হলেই খারাপ লোক, এই ধারণা তোমাকে কে দিয়েছে? আমার যতটুকু মনে পড়ে আমার শ্বশুর মশাইও চাকরিজীবি ছিলেন।’

– 'আমার বাবার সাথে তুমি এদেরকে মিলাচ্ছ? আমার বাবা কাতারে কত বড় চাকরি করতেন! আমাদের লাইফ স্ট্যান্ডার্ড কী রকম ছিল তা কি তুমি নিজের চোখে দেখোনি?'

হক হেসে বললেন, 'সামির আম্মা, তোমার মধ্যে এখনো কিছু ছেলেমানুষী রয়ে গেছে। তুমি কি তা জানো?'

রোমেলা বিরক্ত হলেন। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সর্বদা তাঁর স্বামী নিজে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ে থাকলেও একমাত্র পুত্রের ব্যাপারে তিনি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি কখনো। এবারেও এর ব্যতিক্রম হবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু আজ তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে অবাক করে দিয়ে হক বজ্রগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমার ছেলে যাকে পছন্দ করে, তার সাথেই ওর বিয়ে হবে।
'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে কটেজের বাইরে চলে এসেছিলেন। কথাটা শুনতে পেয়ে রোমেলা থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ফারিত কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব! আমার অমতে তুমি আমার ছেলের বিয়ে দিতে পারো না।'

হক স্থির গলায় বললেন, 'দেখো, তোমার মতামতকে আমি সব সময়ই গুরুত্বের সাথে দেখে এসেছি। তোমার সিদ্ধান্ত মোতাবেকই তানিশার সাথে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিজেই তো দেখলে। এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তাই এবারে আমি তোমাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি। নিজের অহংবোধ দূরে সরিয়ে রেখে ছেলেটার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাও। ও কী চায় তা বোঝার চেষ্টা করো। প্লিজ!'

৩৫

ঘরটা খালি হয়ে যাবার পর হৃদি সামির পাশে একটু ঘন হয়ে বসল। সামি বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। গলা পর্যন্ত কম্বল টানা। হৃদি ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলল, ‘শুয়ে থাক চুপ করে। ঠিক হয়ে যাবে।’

– ‘দরজাটা লক করে দিয়ে আয় তো!’ সামি হুকুম করল। হৃদি একটু লাল হয়ে বলল, ‘কেন?’

– ‘তুই আমার কথা শুনিস না কেন? প্রতিটা কথায় কাউন্টার অপিনিয়ন দিতে হয় কেন তোর?’

- ‘কাউন্টার অপিনিয়ন কোথায় দিলাম? জাস্ট জানতে চাইলাম।’

– ‘এত কিছু জানতে হবে না। যা বলব তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করবি। জানিস না স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত?’

– ‘মোটেও না। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।’

– ‘ওই একই কথা।’

হৃদি হেসে ফেলল, ‘একই কথা না? ফাজিল কোথাকার!’

– ‘ছিঃ তুই নিজের বরকে গালি দিচ্ছিস? অনেক গুনাহ হবে।’

হৃদি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। হেঁটে গিয়ে দরজাটা লক করল। ঘরের মধ্যে এখনো আবছা একটা অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। ফ্যান চলছে না। এয়ার কন্ডিশনও না। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু জানালা দিয়ে খানিক বাদে বাদে ভেসে আসছে তিতির পাখির ডাক। হৃদি দরজা লক করার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা থেকে নড়ল না। ঘুরে দাঁড়ালো, কাঠের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। চোখে মুখে ঝিলিক দিচ্ছিল চাপা একটা আনন্দ। এখানে আসবার পর থেকে যে মানসিক কষ্টটা অনবরত তাকে ভেতরে ভেতরে কুরেকুরে খাচ্ছিল, হঠাৎ করে সেই কষ্টটা যেন ফুৎকারে উড়ে গেছে। ভালো লাগার ভোমরাটা গুনগুন করে গাইছে গান। উড়ে এসে বসতে চাইছে মনের দেয়ালে। সামি ওর দিকেই চেয়ে ছিল, নিবিড় চোখে। তার উষ্কখুষ্ক চুল। চোখজোড়া লাল। মুখে ভর করেছে এক নিচ্ছিদ্র বিভোরতা।

ধীরেধীরে গায়ের কম্বলটা সরিয়ে রাখল সে। দুর্বল পা দুটো রাখল ঠান্ডা টাইলসের মেঝের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে আসলো হৃদির কাছে। কাছাকাছি পৌঁছে একটা মুহূর্তও দেরি না করে সে হৃদির ঠোঁটে একটা গহন চুমু খেলো। তার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে এখন আত্মবিলয়ের স্ফীতি। সে একটা হাত বাড়িয়ে হৃদিকে নিজের খুব কাছে টেনে এনে বলল, ‘বিভাকে সুন্দর বলছি দেখে তোর খারাপ লাগছে?’

হৃদি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। হৃৎপিণ্ড এমনভাবে ধুকপুক করছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আরেকটু হলেই বিকল হয়ে যাবে। সামির উষ্ণ মোলায়েম নিশ্বাস এসে পড়ছিল ওর গালে। সে কম্পনযুক্ত গলায় বলল, ‘তোকে কে বলছে?’

সামি ভারি সুন্দর করে হাসল, টেনে টেনে বলল, ‘আমি মেয়েদের প্রশংসা করলে তোর খুব জ্বলে?

– ‘তুই একটা ফালতু!’

সামি এই কথার প্রত্যুত্তরে আরো অনেকগুলো উত্তপ্ত চুমু খেলো হৃদির সারা মুখে। জড়ানো কণ্ঠে বলল, ‘সুন্দর মেয়েগুলোকে আমি চাই না। আমি চাই এই পেত্নীটাকে!

৩৬

– ‘এতগুলো টাকা আপনার ঠিক কী কারণে প্রয়োজন?’

আকাশ বাবাকে প্রশ্ন করল, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে। একটু আগে সে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে। ফিরেই দেখল বাবা বসে আছেন বসার ঘরে। তার পরনে লুঙ্গি। খালি গা। চোখ কোটরে ঢোকা। গাল দুটো একটু ফোলা। ভীষণ অসুখী একটা চেহারা। মা বেঁচে থাকতে কিন্তু লোকটা মোটেও এরকম ছিল না। আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক ছিল। মা চলে যাবার পরপর লোকটা রাতারাতি বদলে গেলো। দেখলে এখন বোঝা যায় না যে এককালে সে ভদ্রলোক ছিল। ঝুমকি ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল কুঁজো হয়ে। আর বাপ ব্যাটার কথোপকথন শুনছিল কান খাড়া রেখে।

মনসুর নিজের চকচকে টাক মাথাটা হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, ‘একজনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম। প্রায় বছর দেড়েক আগে। এখন সেই লোক খুবই যন্ত্রণা করছে। দুদিনের মাঝে টাকা না দিলে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।’

– ‘কেন ধার নিয়েছিলেন এতগুলো টাকা?’

– ‘বিজনেসে খাটিয়েছিলাম। লাভ হয়নি।’

আকাশ চিন্তিত গলায় বলল, ‘আমি দুদিনের ভেতর এতগুলো টাকা কী করে জোগাড় করব?’

– ‘তোমার বন্ধু বান্ধবরা তো ভালোই টাকাওয়ালা বলে জানতাম। ওদেরকে বলে একটা ব্যবস্থা করো না! নিজের বাবার জন্য এতটুকুও করতে পারবে না? এর আগে কোনোদিন মুখ ফুটে তোমার কাছে কিছু চেয়েছি কি?’

– ‘আমার কোনো বন্ধুর পক্ষে এককালীন এতগুলো নগদ টাকা ধার দেওয়া সম্ভব না।’

– ‘এম পি’ র ছেলেকে বলো। সে নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে।’ আকাশ বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘ওর বাবার কাছে আমি কিছুতেই হাত পাতব না। আপনি আপনার পাওনাদারের কাছ থেকে আরো কিছু সময় চেয়ে নিন। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।’

দুই লক্ষ টাকা দুদিনের মধ্যে জোগাড় করাটা তার জন্য সহজ কাজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা নিজের বাবাকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। নেশাখোর লোককে বিশ্বাস করা উচিত না। তার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে লোকটা মিথ্যা কথা বলে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চাইছে। অযথা টাকা উড়াবে, মদ খাবে, ফূর্তি করবে। সে একটু চিন্তা

করে নিয়ে বলল, 'এক কাজ করুন আপনার পাওনাদারের নম্বরটা আমাকে দিন। আমি কথা বলে দেখি।'

আকাশের কথাটা কানে যাওয়া মাত্র ঝুমকি ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জরুরি গলায় বলল, 'না না। তোমার কোনো প্রয়োজন নেই এসব মানুষের সাথে কথা বলার। এরা মানুষ ভালো না।'

ঝুমকির কথা শুনে মনসুর একটা ধমক দিয়ে উঠে বললেন, 'তুমি এত কথা বলো কেন? নিজের কাজ কর। আমাদের কথার মাঝে ইন্টারফেয়ার করো না।'

ধমক খেয়ে ঝুমকি একটু নিভে গেলো। আকাশ ঝুমকির ছোট হয়ে যাওয়া মুখটা এক পলক দেখে নিয়ে বাবাকে বলল, 'উনি কথা বললে সমস্যা কোথায়? আপনি এরকম করেন কেন সবসময় উনার সাথে?

মনসুর গমগম করে বললেন, 'সে কেন আমাদের মাঝখানে কথা বলবে? সে কে?'

আকাশ তীব্র চোখে তাকালো লোকটার দিকে, ঘেন্না জড়ানো গলায় বলল, 'সে কে তা আপনি জানেন না? আমার বলে দিতে হবে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে উত্তরের আশা না করেই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ডাইনিং টেবিলে তারা বসেছিল। আকাশকে দেখতেই সে বলল, 'ভাইয়া, ভাত খাবেন না?'

আকাশ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'তোমরা খেয়েছ?'

তারা চোখে লাগানো ভারি চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিয়ে বলল, ‘আমরা খেয়েছি। আপনার খাবার বেড়ে রেখেছি টেবিলে।’

– ‘আমি খেয়েছি দুপুরে।

তারা একটু লাজুক গলায় বলল, ‘ইয়ে, ভাইয়া আজকে আমি রান্না করেছিলাম।’

শুনে আকাশ একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল, ‘তাই নাকি? কী রেঁধেছ তুমি?’

– ‘ফ্রাইড রাইস আর চিকেন ফ্রাই।’

– ‘আচ্ছা, রাতের বেলা খাবো। কেমন?’

তারা হালকা মাথা নেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে।’

বান্দরবান থেকে ফিরেছে ওরা তিনদিন হলো। ফিরেই আকণ্ঠ ডুবে গেলো সবাই কর্মব্যস্ত জীবনে। দেখতে দেখতে অভিজিতের ছুটিও ফুরিয়ে এলো। আগামীকাল ভোরে বিভাকে সাথে নিয়ে সে বাংলাদেশ ছাড়ছে। আজ দুপুরে অভিজিৎ সব বন্ধুদের বাইরে খাইয়েছে। ভার্সিটিতে আকাশের দুটো মাত্র ক্লাস ছিল। তাই বারোটার মধ্যে কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। বিকেল চারটায় মনীষা আসার কথা। তাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রুদ্রর আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অফিস ছুটির আগে আর বেরোনোর উপায় নেই। দুপুরে অফিস থেকে এক ঘণ্টার ব্রেক নিয়ে বিভার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। মনীষা এসে পৌঁছুলো চারটা বাজার আরো

মিনিট দশেক সময় পরে। রিকশা থেকে নেমে সে সোজা উঠে আসলো চারতলায়, আকাশদের ফ্ল্যাটে। দরজা খুলল ঝুমকি। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটার দিকে একটু অবাক চোখে তাকালো সে। বলল,

– 'তুমি?'

মনীষা হেসে বলল, 'আকাশ আছে?'

ঝুমকি শশব্যস্ত হয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ আছে। তুমি কে? ওর বন্ধু নাকি?

– 'বন্ধু নই। বড়বোন।' বলল মনীষা। মিষ্টি স্বরে। মনীষা ভেতরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে আশপাশটা একটু চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ছোট্ট একটা ঘরে অনেক আসবাব এঁটে গেছে। এক সেট সোফা, সেন্টার টেবিল, এমন কি একটা সিঙ্গেল খাটও। ঝুমকি তখন তার দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছে। মনীষার পরনে একটা খড় রঙের সিল্ক শাড়ি। চুলগুলো ভেজা। মনে হয় একটু আগেই গোসল করেছে। ভেজা চুল ছড়িয়ে আছে পিঠময়। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। শুধু চোখের কোলে হালকা একটু কাজলের ছোঁয়া। ঝুমকির মনে হলো এত সুন্দর মেয়ে সে বহুদিন দেখেনি। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেলো! একটা অনিচ্ছাকৃত বড় শ্বাস পড়ল তার। একটা সময় সে নিজেও দেখতে খারাপ ছিল না। কতদিন হয়ে গেলো একটু যত্ন করে সাজা হয় না!

মনীষা ঝুমকিকে ওরকম ডবডবে চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'ইয়ে, আসলে আমি বাসা ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। আপনাদের চিলেকোঠার ঘরটা নাকি ভাড়া হওয়ার কথা?

– 'ও, তুমি বাসা দেখতে এসেছ? তাই বলো। বাড়িওয়ালা এখন উপস্থিত আছেন। আমিই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, চল।'

আকাশ ঘরে ঢুকল সেই মুহূর্তে। মনীষা ওকে দেখামাত্র এক গাল হেসে বলল, 'এইযে, আকাশ সাহেব। আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।' এটুকু বলে মনীষা একটু থামল, তারপর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঝুমকিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল, 'কিন্তু··· উনি··· মানে উনার পরিচয়টা জানা হলো না এখনো।

– 'আমি আকাশের···'

পুরো বাক্যটা শেষ করতে পারল না ঝুমকি। হঠাৎ থমকে গেলো। মুখ দিয়ে আর একটা কথাও উচ্চারণ না করে সিঁটিয়ে গেলো কেমন যেন। মনীষা ঝুমকির চুপসে যাওয়া মুখটা একবার ভালো মতো দেখে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালো প্রশ্নবিদ্ধ চোখে। আকাশের মধ্যে একটা অপ্রস্তুত ভাব চলে এসেছে। চোখে ধরা পড়েছে বিরক্তিসূচক অস্বস্তি। সে ঝুমকিকে আড়চোখে দেখল একবার, তারপর ব্যস্ত গলায় মনীষাকে বলল, 'চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। উনার আসা লাগবে না।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনীষা আকাশকে প্রশ্ন করল, 'উনি কে আকাশ?'

আকাশ আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'আমার বাবার স্ত্রী।'

– 'ও আচ্ছা। তাই বলো। উনি মানুষ কিন্তু খুব ভালো। আমার পছন্দ হয়েছে।'

আকাশ হাসল, 'বেশ তো, এখন ঘরটা পছন্দ হলেই হলো।'

ঘর পছন্দ না হবার কোনো কারণ নেই। মনীষা একা মানুষ। ঢাকা শহরে আপনজন বলতে আপাতত তার কেউ নেই। বাবা মা মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। একমাত্র ভাই বৌবাচ্চা নিয়ে থাকেন জাপানে। নিজের ছেলেটা দুবছরের আগে দেশে ফিরছে না। অতএব একটা ঘরে তার দিব্যি চলে যাবে। বাড়িওয়ালার পরিবারের সাথে কথা বলে মনে হলো এরা মানুষ খারাপ না। ঢাকা শহরে একা মেয়ের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে থাকা রীতিমতন অসম্ভব একটা ব্যাপার। বেশ কয়েক জায়গায় সিঙ্গেল মেয়ে বাড়ি ভাড়া দেবে না বলে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে। এখানেও বাড়িওয়ালা একটু গাঁইগুঁই করছিলেন বটে, কিন্তু আকাশের কাজিন হিসেবে পরিচয় দেবার পর আপত্তিটা আর বেশিক্ষণ টিকল না। ঠিক হলো আগামী সপ্তাহেই সে বাক্স- প্যাটরা নিয়ে এই বাসায় মুভ করবে। ঝুমকি আর তারার সাথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ জমে গেলো মনীষার। মনে হচ্ছে এ বাড়িতে আসার পর দিনগুলো তার খারাপ কাটবে না। ফিরে যাবার সময় আকাশ ওর সাথে নিচে নামল। গলির মাথা পর্যন্ত হেঁটে আসলো দুজনে একসাথে। আকাশ বলল, 'রুদ্র আসতে চেয়েছিল। অফিসের জন্য আসতে পারল না বেচারা।'

– 'কথা হয়েছে আমার সাথে। ও খুব লক্ষ্মী ছেলে। আমার ভাগ্য ভালো যে, তোমাদের মতো ছোট ভাই পেয়েছিলাম।'

‘ছোটভাই’ শব্দটা আকাশের কানে লাগল। একটু হেসে বলল, ‘ছোট ভাই?’

– ‘তা নয়তো কী?’

আকাশ হাসতে লাগল। মনীষা হাঁটা থামিয়ে ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ‘তোমার হাসিটা সুন্দর। বেশি বেশি হাসবে, কেমন?’ ‘

আকাশ একটু লাল হলো, নিচুস্বরে বলল, ‘ধন্যবাদ।’

৩৭

মাগরিবের নামাজের পর একটু পড়ার টেবিলে বসেছিল হৃদি। আগামীকাল একটা ইন্টারভিউ আছে। বাবার ব্যাংকে সার্কুলার দিয়েছিল কিছুদিন আগে। বাবার ইচ্ছেতেই অ্যাপ্লাই করে দিল। এখন মুখের সামনে গাইড বই খুলে একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক না কেন, পড়ায় কোনোমতেই মন বসছে না তার। মনের রাজ্যের আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। আগামীকাল বিভা চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মনে পড়তেই বারংবার বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠছে। এরপর আবার কবে দেখা হবে ওর সাথে কে জানে! রাগটা গিয়ে বিভার আব্বা আম্মার ওপরেই পড়ে সর্বদা। কী দরকার ছিল মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে অত দূরে পার করে দেবার? বিভাকে ছাড়া হৃদির যে কোনো আনন্দই শতভাগ পূর্ণতা লাভ করে না। কেউ জানে না, বিভা চলে যাবার পর হৃদি কী ভয়ংকর রকমের একা হয়ে হয়েছিল। অমৃতার জায়গাটাও অন্য কেউ নিতে পারবে না এ কথা সত্য। কিন্তু অমৃতা যে ক্যারিয়ারিস্ট মেয়ে। সপ্তাহের পাঁচটা দিন সে কাজের চাপে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। মনে চাইলেই যখন তখন তাকে কাছে পাওয়া যায় না। হৃদির চোখ ভিজে আসছিল একটু পর পর। খানিক আগে চায়ের টেবিলে বাবা কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছেন,

‘হয় চাকরি নয় বিয়ে এর যেকোনো একটা করে আমাদেরকে একটু উদ্ধার করা যায় কি?’

হৃদি কোনো উত্তর দিতে পারেনি। বাবার কথাবার্তার ধরন বরাবরই একটু খটোমটো। যতটা সম্ভব পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা করেই দিন পার করে হৃদি। কিন্তু আজকে বাবার বলা কথাটা তীক্ষ্ণ ফলার মতো গিয়ে বিঁধলো বুকে। বাবা কথাটা বলে শেষ করতেই মা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন হৃদির কাছে। গলায় ঝোলানো তাবিজটা ঠিকঠাক আছে কিনা তা হাত দিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, ‘এটা কিন্তু খুলিস না।’ হৃদি মায়ের দিকে একটা আগুনগরম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। নিজের ঘরে এসে সামিকে ফোন করে বাবার বিষয়টা বলতেই সে উল্টো খ্যাঁক দিয়ে উঠল, ‘তোর বাপের সমস্যা কী? একই কথা বারবার বলে কেন? মাথা খারাপ নাকি উনার? আমি তো বলছি যে আমার মায়েরে রাজি করাইতে আর কয়েকটা দিন সময় লাগবে। তুই এই কয়টা দিন একটু বাসা ম্যানেজ করতে পারতেছিস না? আজিব কারবার!

– ‘আমার বাপ ঠিকই আছে। সমস্যা তোর মায়ের। উনার আমাকে পছন্দ হয় না কেন? আমার বাবার তোদের মতো কাড়ি কাড়ি টাকা নাই দেখে? ভীষণ লোভী তোর মা!’

সামি রাশভারি গলায় বলল, ‘হৃদি দ্যাখ, আমার মাকে নিয়ে কোনো উল্টাপাল্টা কথা বলবি না। খবরদার!’

– ‘তুমিও আমার বাবাকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলবা না। মনে থাকে যেন।’ কথাটা বলে সে ফোন কেটে দিয়েছিল।

অপমান, লজ্জা আর অভিমানে টলমল করে উঠেছিল বুক। কেউই বোঝে না তাকে। না বোঝে নিজের বাবা মা, না বোঝে সামি! গাইড বই সামনে নিয়ে গলায় ঝোলানো তাবিজটা নাড়াচাড়া করছিল সে বিষণ্ণ মনে। হঠাৎ মনে হলো এর ভিতরে কী আছে একটু খুলে দেখা যাক। ছোট্ট পিতলের তৈরি গোল জিনিসটার মুখ মোম দিয়ে ঢাকা। হৃদি মোমের অংশটুকু আঙুল দিয়ে খুঁড়তে লাগল। খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় পেয়ে গেলো ভাঁজ করা ছোট্ট এক কাগজ। কাগজ খুলে দেখল সেখানে বাংলায় লেখা, 'হৃদিতার বিয়ে হয়ে যাক যাক যাক…!' ব্যাক্কল বনে গেলো সে। হা করা মুখ নিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত নয়নে চেয়ে রইল টুকরো কাগজটার দিকে। সেই সময় ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে ছোট ভাই হৃদয় উঁকি দিয়ে বলল, 'আপু, তোকে বাবা ডাকছে।'

হৃদি হাতে ধরা কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। গটগট করে হেঁটে আসলো ড্রইংরুমে। বাবা মা দুজনেই সোফায় বসে আছেন। হৃদি ঘরে এসেই সরাসরি মায়ের মুখের সামনে কাগজটা মেলে ধরে বলল, 'এইগুলা কী? এসবের মানে কী?'

মায়ের মুখটা একটু বোকা বোকা হয়ে গেলো। কাগজটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এমা, বাংলায় লিখে দিয়েছে দেখি!'

– 'তোমাকে কতবার মানা করছি এইসব হাবিজাবি জিনিস না আনতে? তুমি নিজে যে নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করো সেটাই তো যথেষ্ট মা! এইসব তাবিজ কবজ তো দরকার নাই আমার!'

মা মিনমিন করে কী যেন বললেন। স্পষ্টভাবে বোঝা গেলো না। বাবা বললেন, 'আচ্ছা এসব কথা পরে হবে। এখন তুই বোস আমার সামনে। কথা আছে।'

হৃদি কটমটে রাগি মুখ নিয়ে বসলো বাবার সামনে, উল্টোদিকের সোফায়। বাবাকে বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছে এখন। ঠোঁটের কোণে একটি প্রসন্ন হাসি। তিনি একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'তোর বন্ধুর বাবা ফোন করেছিলেন। এমপি সাহেব।'

হৃদির মুখে একটা সূক্ষ্ম ভাবান্তর ঘটে গেলো। কটমটে চোখজোড়ায় বিস্ময়ের পর্দা পড়ল। কুঁচকে থাকা কপাল নিমেষে হয়ে উঠল মসৃণ অস্ফুটে বলল, 'তাই নাকি?'

– 'হ্যাঁ, এইতো একটু আগে ফোন করেছিলেন।'

– 'কী বললেন?' দম বন্ধ করে প্রশ্ন করল হৃদি।

– 'ছেলের জন্য আমাদের মেয়েকে চাইলেন। বললেন আমরা রাজি হলে খুব শীঘ্রই তিনি বিয়ের ঝামেলাটা সেরে ফেলতে চান।'

মা ফোড়ন কেটে বললেন, 'কিন্তু ওই ছেলের মা কিন্তু সহজ বান্দা না। মহিলা ভীষণ ঝগড়াটে। আমি বলে দিলাম তোমাদের।'

বাবা হাত তুলে মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওসব ঠিক হয়ে যাবে।' হৃদির ঠোঁটে না চাইতেও একটা স্বস্তির হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। বাবা বললেন, 'এবারে উনি বড় করে অনুষ্ঠান করতে চাইছেন না। যে মেয়েটির সাথে সামির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কী যেন নাম মেয়েটির আমি ভুলে গেছি, তার পরিবার নাকি এখনো খুব ঝামেলা করছে। তাই উনি চাইছেন নিভৃতে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে। মিডিয়ার

লোকজনকেও জানাতে চাইছেন না এখন। আপাতত আকদ হয়ে যাক। কয়েকমাস পরে অনুষ্ঠান করা যাবে।

হৃদির কাছে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে। একটা জিনিস তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না যে সামির আম্মা এ সম্পর্কে এত দ্রুত রাজি হয়ে গেলো কীভাবে? আদৌ তার অনুমতি নেয়া হয়েছে কি? অনেকগুলো প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল তার মনে। সে চট করে উঠে পড়ে নিজের ঘরে দৌড়ে আসলো। ফোন করল সামিকে। সামি সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছিল। পুলসাইডের একটা টেবিলের ওপর ফোনটা রাখা ছিল। রিংটোন বাজতেই সে সাঁতার থামিয়ে পুল থেকে উঠে আসলো। ভেজা হাত দিয়েই ধরল ফোন। হৃদি হাঁপধরা গলায় বলল, ‘কীভাবে সম্ভব?’ সামির পরনে শুধু একটা হাফ প্যান্ট, আদুর গা। চুল আর শরীর বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে জল। সেইরকম ভেজা জবজবে অবস্থায়ই সে হৃদির প্রশ্ন শুনে অবাক গলায় বলল, ‘কীসের কথা বলতেছিস?’

– ‘তোর আব্বা ফোন করছিল আমার আব্বাকে। বিয়ের প্রস্তাব দিতে।’ সামি হতভম্ব গলায় বলল, ‘বলিস কী?’

– ‘তুই জানিস না?’

– ‘ঘটনা কী খুলে বল।’

হৃদি বিস্তারিত বলল সবকিছু। সামি শুনেটুনে মনের আনন্দে কয়েকটা লাফঝাঁপ দিয়ে ফেলল। ফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে হৃদি সেই লাফঝাঁপ টের পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এরকম নির্মল আনন্দ তার অনেক অনেকদিন হয়নি। স্বপ্ন তাহলে সত্য হতে

যাচ্ছে··· প্রতিদিন প্রিয় মানুষটার সাথে একই ছাদের নিচে বাস করা··· একসাথে ঘুম থেকে ওঠা··· একসাথে ঘুমোতে যাওয়া··· একসাথে খাবার খাওয়া ..যখন ইচ্ছে তখন দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরা। আহা, এত সুখ তার কপালে সইবে কি? উচ্ছ্বসিত এক হর্ষ দমকে বুক ভেসে যাচ্ছিল তার। সেই উথালপাথাল খুশির মধ্যে হঠাৎ করেই একটা মানুষের কথা খুব করে মনে পড়ল হৃদির। আজকে যা কিছু সে পেয়েছে বা পেতে যাচ্ছে এর পেছনে সেই মানুষটার হাত আছে শতকরা আশিভাগ। হ্যাঁ এই মুহূর্তে সেই মানুষটার সাথেই একটাবার কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল সে। বলল, 'সামি, একটু পরে ফোন দিচ্ছি তোকে। এখন রাখছি।'

সামি ফোন কাটল। তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল মুছতে মুছতে দ্রুত পা বাড়িয়ে নেমে এলো নিচে। পাল্টে নিল জামা কাপড়। তড়িঘড়ি করে ছুটে চলল বাবা মায়ের ঘরে। দরজা খোলা ছিল। রোমেলা বসে আছেন ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলের ওপর। মাথার চুলে চিরুনি চালাচ্ছেন ধীর গতিতে। সামিকে ঘরের দরজায় দেখতে পেয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'তোমার বাবা আমার অমতেই ওই মেয়ের পরিবারের সাথে বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেছে। এটা কি সে ঠিক করল? আমার মতামতের কি কোনো দাম নেই?'

সামি কয়েক পা এগিয়ে এসে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো। স্থির দুটি চোখ মায়ের বিক্ষুব্ধ মুখের ওপর রেখে সন্দিহান গলায় বলল, 'মা হৃদিকে তোমার অপছন্দ কেন? বিভা অন্য ধর্মের ছিল। কিন্তু হৃদি তো অন্য ধর্মের নয়। ওকে নিয়ে তাহলে আপত্তি কেন?'

রোমেলা ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'ওদের ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ড লো। আমাদের সাথে কোনোভাবেই যায় না। কোথায় তানিশা, আর কোথায়··· ইশ। ... ভাবতেই আমার

কেমন লাগছে। এই থার্ড ক্লাস মেয়েটার জন্য তুমি তানিশার মতো একটা মেয়েকে ছেড়ে দিলে? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কি জীবনেও হবে না?

সামি দৃঢ় গলায় বলল, 'মা প্লিজ। আমার সামনে আর কখনো হৃদিকে তুমি থার্ড ক্লাস বলো না। ওকে নিয়ে কেউ খারাপ কিছু বললে আমার ভালো লাগে না। তোমার চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ করো। পৃথিবী বদলে গেছে। ক্লাস বলে কিছু নেই এখন আর। সবাই সমান। আরেকটা কথা শুনে রাখো, বিভাকে হারানোর পর হৃদির জন্যেই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। হৃদিকে হারিয়ে ফেললে আমি আর বাঁচব না।'

এটুকু বলে সে আরো দু পা সামনে এগিয়ে এলো। মায়ের দুটো হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে করুণ গলায় বলল, 'লক্ষ্মী মা আমার! রাজি হয়ে যাও, প্লিজ?'

রোমেলা ছেলের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আর চোখ ভরে আসছে জলে। ওই বেহায়া বজ্জাত মেয়েটা তার ছেলেকে কী জাদু করেছে খোদা জানেন। তার একটা মাত্র ছেলে। কত শখ ছিল নিজে পছন্দ করে দেখে শুনে ছেলের জন্য বৌ আনবেন। আল্লাহ তার কপাল থেকে সেই সুখটাও কেড়ে নিলেন। তিনি কান্না চেপে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'আচ্ছা দেখা যাক। এখন যাও। ভালো লাগছে না আমার।'
সামি মায়ের হাত ছাড়ল না, আকুলিবিকুলি হয়ে বলল, 'হৃদি খুব ভালো মেয়ে মা। তোমাকে খুব ভালোবাসবে। দেখে নিও!

রোমেলা জোর করে ছেলের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, 'দেখা যাবে।'

– 'বাবা কোথায়?'

– ‘বাড়িতেই আছে। কোনদিকে আছে জানি না।’

মাস্টার বেডরুম থেকে বেরিয়ে সামি ছুটল বাবার খোঁজে। স্টাডিরুমে পাওয়া গেলো বাবাকে। দরজায় করাঘাত করল সে কয়েকবার। ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে আসলো, ‘কে?’

– ‘আমি।’

– ‘এসো, দরজা খোলা আছে।’

সামি ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতর ল্যাম্পশেডের হলদে আলো জ্বলছে। লম্বা টেবিলটায় ডাই করে রাখা রাজ্যের সব ফাইলপত্র। হক টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসে আছেন। তার মুখের সামনে ল্যাপটপ খোলা। ছেলে ঘরে ঢুকতেই তিনি ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে বললেন, ‘কী খবর?’

সামি টেবিলের উল্টো পাশে এসে বাবার মুখোমুখি দাঁড়ালো। তার চোখ মুখ থেকে খুশির আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হকের মনে হলো ছেলের এরকম আনন্দ ডোবা চেহারা তিনি বহুদিন দেখেননি। তার মনটা এক নিবিড় প্রসন্নতায় ছেয়ে গেলো। সামি দমবন্ধ করে বলল, ‘বাবা! থ্যাংক ইউ!’

হক বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে আসলেন ছেলের কাছে। ছেলের পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, ‘মাই প্লেজার। এখন তুমি বলো, ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবলে?’

সামি একটু অবাক গলায় বলল, ‘বুঝলাম না।’

– ‘বিয়ে মানে একটা দায়িত্ব। বিয়ের পর বৌকে খাওয়াবে কী? নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো, নাকি?’

সামি মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। খানিক বাদে বলল, ‘আমি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছি বেশ কয়েক জায়গায়।’

হক ছেলের মুখের দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বললেন, ‘আমার সাথে কাজ করতে তোমার এখনো আপত্তি আছে?’

সামি একটু অপ্রতিভ হলো, ‘না, আপত্তি কীসের?’

– ‘আমার যা কিছু আছে, সব তো আজ বাদে কাল তোমাকেই দেখতে হবে। তাই না?’

– ‘হুম।’ অন্যমনস্কভাবে সায় দেয় সামি।

– ‘আমি আমাদের ম্যানেজার সিরাজ সাহেবের সাথে তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট ফিক্স করে দিচ্ছি। কাল পরশু একবার তুমি উনার সাথে দেখা করো। ডিসকাস করো। ফ্যাক্টরিগুলো এক্সপ্লোর কর। এমপ্লয়ীদের সাথে কথা বলো। বুঝে দেখো কোন ফিল্ডে তুমি প্রথমে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। কেমন?’

– ‘আচ্ছা।’   মাথা নেড়ে বলল সামি।

– ‘তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ তোমার সাথে কাজ করতে আগ্রহী কিনা দেখতে পারো।’

এই প্রস্তাবটা সামির পছন্দ হলো। সে সশব্দে বলে উঠল, ‘আকাশকে বলে দেখতে পারি।’

– ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।’

৩৮

– ‘কীরে কী অবস্থা?’ ফোন কানে নিয়ে বলল অমৃতা।

হৃদি কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলল, ‘দোস্ত, থ্যাংক ইউ!’

– ‘থ্যাংকস কেন?’

– ‘তোর জন্যেই এটা সম্ভব হলো।’

– ‘কীসের কথা বলতেছিস, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারতেছি না।’

– ‘সামির বাবা ফোন করেছিলেন।’

– ‘তাই নাকি?’

–’ হ্যাঁ, বাবার সাথে কথা বলেছেন আমাদের বিয়ের ব্যাপারে।’

– ‘ওয়াও! গ্রেট নিউজ!’

হৃদি খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল, ‘হ্যাঁ গ্রেট নিউজ। তোকে থ্যাংকস দোস্ত।’

– ‘আমাকে কেন থ্যাংকস দিচ্ছিস?’

‘আমি জানি তুই উনাকে এই বিয়ের ব্যাপারে কনভিন্স করছিস। তাই না?’

অমৃতা একটু স্তিমিত কণ্ঠে বলল, ‘চেষ্টা করছিলাম। কতটুকু পারছি জানি না।’

– ‘পেরেছিস।’

এ কথার পর দুজনেই চুপ করে রইল। কয়েকটা নীরব ক্ষণ কাটার পর অমৃতা বলল, ‘যাক, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক দিন পর একটা সুসংবাদ পেলাম।’

– ‘তুই কেমন আছিস?’

– ‘এই তো।’

- ‘মন খারাপ?’

- ‘বিভার অন্য খারাপ লাগছে।’

- ‘আমারও। ভীষণ মন খারাপ ছিল জানিস? হঠাৎ বাবা ডাক দিয়ে সুখবরটা শোনালেন। তারপর মন ভালো হয়ে গেলো।’

‘ব্যাপারটা অনেক জোশ তাই না? ভালোবাসার মানুষটার সাথে সারাজীবন একসাথে থাকা! ভাবতেই অন্যরকম একটা ফিল হয়। তোরা অনেক লাকি দোস্ত। মা শা আল্লাহ।’

– ‘হুম। তোর জীবনেও এরকম দিন আসবে। চিন্তা করিস না।’

– ‘আমি এসব নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই।’

– ‘তোর গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন?

– ‘কী রকম?’

– ‘মনমরা।’

দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো হৃদি ফোনের ওপাশ থেকে। তারপর কিছুক্ষণ নীরব।

– ‘ভালো লাগে না কিছুই!’ বিষাদ বেজে ওঠে অমৃতার কণ্ঠে।

– ‘কী হইছে?’

– ‘আই মিস হিম, দোস্ত!’

– ‘ট্রাই টু কন্ট্রোল ইওরসেল্ফ।’

– ‘ট্রাই করতেছি। পারতেছি না। কী করব? মরে যাব?’

– ‘ফালতু কথা বলিস না।’

– ‘সত্যি মরে যেতে মন চায়।’

– ‘দাঁড়া তোর জন্য একটা বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করতেছি। একটু ওয়েইট কর।’

– ‘বয়ফ্রেন্ড লাগবে না আমার।’

– ‘লাগবে, লাগবে। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম ছেলেটারে ধইরা নিয়া আসব তোর জন্য।’

– ‘ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম মানুষটাকে আমি দেখে ফেলছি। এখন আর অন্য কাউকে চোখে লাগবে না।’

– ‘যত্তসব আজাইরা কথা।’

– ‘উনাকে দেখতে ইচ্ছা করে দোস্ত!’

– ‘তুই কিন্তু আমাকে প্রমিজ করছিস, তুই আর কখনো দেখা করবি না।’

– ‘প্রমিজ মনে আছে। নিজ উদ্যোগে দেখা করব না। কিন্তু দেখা হয়ে গেলে?’

– ‘দেখা হয়ে গেলে চোখ বন্ধ করে রাখবি।’

হৃদির কথা শুনে শুকনো হাসল অমৃতা। বিছানায় হাঁটু ভাঁজ করে বসে বালিশের ওপর রাখা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চেয়ে থেকে কথা বলছিল সে। ল্যাপটপের ওয়াল পেপারে একটা মানুষের ছবি দেওয়া। মানুষটির গায়ে ফুল হাতা সাদা শার্ট। গলায় সাদা কালো টাই। ঠোঁটে ধারালো হাসি। মা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করেনি অমৃতা। হঠাৎ মায়ের গলা কানে আসলো, 'এটা কার ছবি?'

একটু অপ্রস্তুতভাবে ঘুরে তাকালো সে মায়ের দিকে। হৃদির সাথে কথা শেষ করে নিয়ে একটু কৌতুকের গলায় মাকে বলল, 'সিনেমার নায়ক। সুন্দর না?'

শাহানা ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'এই নায়কের কোনো সিনেমা তো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তুই আবার নায়ক নায়িকার ছবি জমানো শুরু করলি কবে থেকে?'

অমৃতা হাসে। কিছু বলে না। শাহানা কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে মেয়ের মুখের ওপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিলেন, 'ফাইজলামি করিস তুই আমার সাথে? এই ছেলেটাকে তো আমি চিনি। কোথায় যেন দেখেছি।'

– 'ছেলে নয় মা, ভদ্রলোক বলো।'

শাহানা কড়া গলায় বললেন, 'লোকটা কে? আমি কোথায় দেখেছি লোকটাকে? চেনা চেনা লাগছে কেন?'

– 'উনাকে তুমি চেনো। আমার বন্ধু সামির বাবা।'

শাহানার মুখটা মুহূর্তে কেমন ছাইরঙা হয়ে উঠল। চোখে ঝিলিক দিল শঙ্কা।

– ‘সামির বাবার ছবি তোর কম্পিউটারে কেন?’

অমৃতা চোখ লুকিয়ে বলল, ‘উনাকে আমার ভালো লাগে।’

– ‘ভালো লাগে মানে?’

– ‘ভালো লাগে মানে ভালো লাগে।’

– ‘কী বলতে চাচ্ছিস তুই?’

– ‘ভালো··· বাসি!’

সেকেন্ড না গড়াতেই একটা চড় এসে পড়ল অমৃতার গালে। শাহানা ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, ‘কথাটা বলতে তোর লজ্জা করল না?’

৩৯

বিভাবরীর এ যাত্রায়ও বাড়ি ফেরা হলো না। বন্ধুর বিয়ে ফেলে রেখে স্বামীর সাথে উড়াল দেবে, এতটা ঘোর সংসারি সে এখন অবধি হয়ে ওঠেনি 1 বন্ধুরা অভিজিৎকেও যেতে দিতে চাইছিল না। কিন্তু এবার ওদের মন রক্ষা করতে গেলে চাকরির ক্ষেত্রে

একটা ব্যাড রেপুটেশন হতে পারে ভেবে নিজের সিদ্ধান্তেই অটল রইল অভিজিৎ। বিভা পড়েছে ভীষণ এক দোলাচলে। বিয়েটা সে কোনোভাবেই মিস করতে চাইছে না, আবার অভিজিতকেও ছাড়তে মন চাইছে না। ঠিক হলো বিয়ের পরদিনই ভোরের ফ্লাইটে পাড়ি দেবে সে ইন্ডিয়া।

বিয়ের তারিখ পড়ার সাথে সাথে বন্ধুদের দলটার মধ্যে একটা বাড়তি রকমের ফূর্তি ভাব এসে গেছে। ফুরফুরে তাজা আনন্দ বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকে। প্রায় প্রতিদিনই সকলে অফিসের পর জড়ো হচ্ছে কারো না কারো বাসায়। জোর আলোচনা চলছে বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আজকে ওরা এসেছে আকাশের বাসায়। তারার অনেকদিনের শখ ছিল আকাশের বন্ধুদের নিজের চোখে একবার অন্তত দেখার। আজ তার শখ পূরণ হলো। মোটা কাচের চশমা পরা, কোঁকড়ানো চুলের রোগা পাতলা চেহারার তারাকেও বন্ধুদের খুব পছন্দ হয়ে গেলো। তারার অনুপস্থিতিতে রুদ্র আকাশকে বলল, ‘মেয়েটা সুইট আছে। মামা তোমার আপন কাজিন না তো, তাই না?’

আকাশ ভ্রু উঁচিয়ে বলল, ‘উঁহু, এর সাথে কোনো হাংকিপাংকি চলবে না।’

– ‘কেন?’ রুদ্র প্রশ্ন করল কাতর কণ্ঠে 1

আকাশ গম্ভীর গলায় বলল, ‘কারণ মেয়েটা এখন আমার কাস্টডিতে আছে। আমি ওর একরকম গার্ডিয়ান বলতে পারিস। সো এই মেয়ের সাথে কোনোরকম ফাইজলামি আমি এলাও করব না।’

রুদ্র টিটকিরি মেরে বলল, ‘এহ, আসছে আমার গার্ডিয়ান।’

আকাশের ঘরটা আয়তনে খুব একটা বড় নয়। চারকোণা ছোট্ট ঘরটায় একটা সেমিডাবল খাট আর পড়ার টেবিল চেয়ার ছাড়া অন্যকোনো আসবাব নেই। সামি এখনো এসে পৌঁছায়নি। হৃদি, বিভা আর অমৃতা বিছানার ওপর বসেছে গোল হয়ে। রুদ্র বসেছে পড়ার টেবিলের সামনে রাখা কাঠের চেয়ারে। আর আকাশ বসেছে টেবিলের ওপর, পা ঝুলিয়ে।

হৃদি হঠাৎ একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, – ’শোন তোরা, আমার একটা জরুরি কথা আছে। তোরা কি জানিস সামি আমাকে সবসময় পেত্নী বলে ডাকে? এটার কারণ কী? তোদের কি মনে হয় যে আমার চেহারা আসলেই পেত্নীর মতো দেখতে?

শুনে বন্ধুরা একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। রুদ্র খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘পেত্নীকে পেত্নী ডাকবে না তো কী ডাকবে? পরী?

হৃদি রুদ্রর কথা শুনে রাগল না, বরং একটু দুঃখ ভারাক্রান্ত গলা নিয়ে বলল, ‘সব সময় ফাইজলামি করিস না তো। আমার বয়ফ্রেন্ড কখনো আমার রূপের প্রশংসা করে না। এটা যে আমার জন্য কতবড় একটা দুঃখের ব্যাপার তা তোরা বুঝবি না। ’

বিভা আগপিছ কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেলল, ‘কী বলতেছিস? সামি প্রশংসা করে না? আমার সাথে যখন প্রেম করত তখন দিনের মধ্যে চোদ্দ বার বলত আমি কত সুন্দর এইসব হাবিজাবি। তোরে বলে না ক্যান?’

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র বন্ধুরা সব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো বিভার দিকে। চারজোড়া চোখের মণি যখন নিশ্চলভাবে তার মুখের ওপর ঠেসে রইল টানা কয়েকটা সেকেন্ড তখন সে বুঝতে পারল যে মাত্র বলা কথাগুলোয় কিছু একটা গোলমাল ছিল। হৃদি ফোঁস করে একটা ভারি নিশ্বাস ফেলল। বড়ই বিষণ্ন দেখালো সেই সময় তার মুখটা। অমৃতা একটু বিরক্তি নিয়ে হৃদিকে বলল, 'তোর প্রব্লেম কী? খালি সারাক্ষণ টিপিক্যাল খ্যাৎ মাইয়াদের মতো ঘ্যানঘ্যান করিস কেন? তোর রূপের প্রশংসা করতে হবে কেন? সামি কি তোরে রূপের জন্য ভালোবাসছে? এইরকম মেন্টালিটি কেন তোদের? আচ্ছা বল, তুই কবে সামির রূপের প্রশংসা করেছিস?'

– 'আমি কেন ওর প্রশংসা করব?' হৃদি অবাক।

অমৃতার গলাটা বেশ চড়ে যাচ্ছিল, 'কেন করবি না? আমাদের সামি কি দেখতে কম সুন্দর? মেয়েরা কেন সবসময় ছেলেদের কাছ থেকেই এই সব কমপ্লিমেন্ট আশা করে? যে জিনিসটা তুই অন্যের কাছ থেকে আশা করতেছিস ঠিক সেই একই জিনিস অন্যকে দেবার মতো মেন্টালিটি তো তোর থাকতে হবে নাকি? নারী পুরুষের সমান অধিকার বইলা চিল্লাইলে তো খালি হবে না ব্যাপারগুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে লাইফের প্রত্যেকটা স্টেপে তাই না? প্রয়োজনের সময় শুধু লেডিস ফার্স্ট হবে আর অন্য সব ক্ষেত্রে লেডিস লাস্ট, এইটা তো ঠিক না। আমি যদি সমঅধিকার চাই তাহলে অবশ্যই সমানভাবে দায়িত্ব পালন করাটাও শিখতে হবে।'

এত শক্ত শক্ত কথা শুনে হৃদি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। মিনমিন করে বলল, 'এভাবে তো চিন্তা করি নাই।'

– 'চিন্তা কর। দয়া করে চিন্তা কর। ভালো তো সামি একা বাসে নাই। তুইও বাসছিস। নিজের ভালোলাগা নির্ভয়ে প্রকাশ করতে শেখ।'

এটুকু বলে সে বিভার দিকে ঘুরে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'তোর মাথার মধ্যে কি মগজ বলতে কিছু আছে? নাকি পুরাটাই গোবর?'

বিভা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি আবার কী করলাম?'

– 'তোর সাথে প্রেম করার সময় সামি কী বলত, কী করত এইসব কাহিনি এই গাধা মাইয়াটার সামনে তুই কেন বলতেছিস?'

রুদ্র হঠাৎ ফোড়ন কেটে বলল, 'আফসোসের বিষয় হইল যে উকিল আপা অন্যের ব্যাপারে সব বোঝে। শুধু নিজের ব্যাপারে কিছুই বোঝে না।'

অমৃতার ফর্সা মুখ আচমকা একটু লাল হয়ে গেলো এই কথা শুনে।' এটার মানে কী?' উত্তপ্ত গলায় প্রশ্ন করল সে।

রুদ্র অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'অন্যের ভুল ধরতে পারিস ষোল আনা। কিন্তু নিজে যে ভুল কাজ করে যাচ্ছিস, সেদিকে কোনো খেয়াল নাই? তোকে ইদানিং আমার প্যারাডক্স মনে হয়।'

রুদ্রর ইঙ্গিতটা বন্ধুরা সকলেই বুঝল। কেউ কিছু বলল না তাৎক্ষণিকভাবে। অমৃতা কটমটে চোখে রুদ্রর দিকে কয়েকটা ক্ষণ চেয়ে থেকে ধারালোভাবে বলল, 'কাউকে ভালোবাসাটা কোনো অপরাধ না।'

– 'ভুল মানুষকে ভালোবাসা হয়তো অপরাধ না, কিন্তু বোকামি তো বটেই।'

– 'তুই কী বলতে চাচ্ছিস? ক্লিয়ারকাট বলো।' অমৃতার গলা উঠে গেছে সপ্তমে।

রুদ্র অমৃতার চোখে চেয়ে বলল, 'বলতে চাচ্ছি, মানুষকে অত নীতিজ্ঞান না শিখায়ে নিজের দিকে নজর দাও। ওরা সবাই যা করতেছে ঠিকই করতেছে। ভুল পথে আছিস তুই। এর চেয়ে বেশি ক্লিয়ারভাবে কী করে বলা যায় আমি জানি না।'

অমৃতা বেশ অবাক হলো রুদ্রর কথা শুনে। কিছু বলতে পারল না। স্থানু হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু। এই একটা প্রসঙ্গ উঠলে আজকাল সে ভেতরে ভেতরে খুব দুর্বল বোধ করে। দমকা এক ঝড়ো বাতাস প্রবল

গতিতে তেড়ে এসে শক্ত সবল মন কুঠুরীটা নড়বড়ে করে দেয়। যুক্তি তর্ক সব উড়িয়ে নিয়ে যায় নিমেষে। অমৃতা তখন সম্পূর্ণ অন্য এক অমৃতা হয়ে যায়। সেদিন মা তার গায়ে হাত তুলেছিলেন। জীবনে প্রথমবার! বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। গালে হাত দিয়ে হা করে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে। মায়ের দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। তার বুকের ধড়ফড়ানি শুনতে পাচ্ছে অমৃতা একহাত দূর থেকে। মায়ের যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি শঙ্কিত গলায় আদেশ দিলেন, 'ডিলিট করো এই ছবি, এখুনি ডিলিট কর।

অমৃতা নিজের গাল থেকে হাত না সরিয়েই বলল, 'ল্যাপটপের ছবি তো ডিলিট করা যাবে। কিন্তু মনের ভেতরে যে ছবিটা গেঁথে গেছে সেটার কী হবে মা?'

– 'কী বলছিস তুই এসব? কী সম্পর্ক তোর ওই লোকের সাথে? বল আমাকে!'

– ‘কোনো সম্পর্ক নেই মা।’

– ‘সত্যি কথা বল। কতদূর এগিয়েছিস? ওই লোকটা কী করেছে তোর সাথে?’

– ‘কিছুই করেন নি। উনি খারাপ মানুষ নন।

মা পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘আমার মেয়ে হয়ে তুই অন্যের সংসার ভাঙতে চাস? এরকম মেয়ে পেটে ধরেছি আমি?’

– ‘আমি কখনোই অন্যের সংসার ভাঙব না মা!’

– ‘আজকের পর থেকে তুই ওই লোকের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবি না।’

–কোনো যোগাযোগ নেই।’

– ‘কথা দে আমাকে, তুই এই সম্পর্ক এখানেই শেষ করবি। তোর বাবা জানতে পারলে কী হবে, চিন্তা করতে পারছিস?’

– ‘কোনো সম্পর্কই নাই। শেষ করব কী? ‘

বলেছিল অমৃতা। কিন্তু সে জানে যে ওই মানুষটার সাথে যে সম্পর্কটা তার হয়ে গেছে মনে মনে, সকলের অগোচরে, সেই সম্পর্কের অদৃশ্য সুতোর বুনোট কোনোভাবেই আর ছিন্ন করা যাবে না। সেই সুতোটা আজীবনের জন্য নিগূঢ় এক গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে বুকের অতলান্তে। হ্যাঁ জেনে বুঝেই ভুলটা হয়ে গেছে তার! যা হওয়ার, তা হবেই! নিয়তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষ নিয়তিকে নয়!

মা গভীর রাতে তার ঘরে এসেছিলেন আরেকবার। দীপা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ভারি নিশ্বাসের শব্দে গমগম করছে পুরো ঘর। অমৃতার ঘুম আসছিল না। শুয়ে থেকে এপাশ ওপাশ করছিল সে। মা চোর পায়ে এসে বসলেন ওর মাথার কাছে। আলতো করে হাত রাখলেন কপালে। অমৃতা হাত বাড়িয়ে মায়ের হাতটা ধরল। মা চাপা গলায় বললেন, ‘তোর ওপরে আমাদের অনেক বিশ্বাস রে। অনেক আশা তোকে নিয়ে আমাদের। তুই আমাদের বিশ্বাস আর স্বপ্ন এভাবে ভেঙে দিস না মা।’ অমৃতা কোনো উত্তর দেয়নি। চুপচাপ শুয়ে থেকে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছিল শুধু। আজকে রুদ্রর দিকে চেয়ে থেকে মায়ের কথা মনে পড়ছিল। শেষমেশ তাকে বোঝার মতো করে কেউ বুঝল না। না বুঝল নিজের মা, না বুঝল বন্ধুরা।

হঠাৎ সামির আগমন ঘরের ভেতর জমে ওঠা গুমোট ভাবটা কিয়দংশে লঘু করে তুলল। হৃদি সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা আজব কাণ্ড করে বসলো। সামি ঘরে ঢুকতেই সে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে ছুটে গেলো তার কাছে। গলা জড়িয়ে ধরে টুকুশ করে ওর গালে একটা চুমু খেয়ে আহ্লাদি গলায় বলল, ‘সামি, তুই খুব সুন্দর!’ সামির হেম রঙের গাল দুখানা আরক্ত হয়ে উঠল এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসায়। সে স্ফীত হেসে নিজের গালের যে অংশে হৃদি চুমু খেয়েছিল সেই অংশটায় হাত বুলিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে কিছুটা অবিশ্বাসের গলায় বলল, ‘ওয়াও! দ্যাট ওয়াজ সুইট!’

দৃশ্যটা দেখে আকাশ সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। রুদ্র আফসোসের গলায় বলে উঠল, 'ইশ আমারে যদি কেউ এরকম কমপ্লিমেন্ট দিত! আকাশ, দোস্ত তোর কাস্টডিতে থাকা মেয়েটার সাথে আমার একটা ব্যবস্থা কইরা দে। আমি কিন্তু যাচ্ছি আমেরিকা। পিএইচডি মামা। দাম আছে কিন্তু। চিন্তা কইরা দেখ।'

.

আকাশ রুদ্রর কথা পাত্তা না দিয়ে সামিকে বলল, 'আমাদের ব্যাচেলর পার্টির প্ল্যান হবে এখন। অন্য সব ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ।'

– 'কীসের ব্যাচেলার পার্টি? এসব হবে না।' হৃদি বলল জোরালো গলায়।

– 'হবে না মানে? আলবৎ হবে। হতেই হবে!'

– 'গ্রেট, তাহলে আমরাও করব ব্যাচেলর পার্টি।' আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে ঘোষণা দিল বিভা।

– 'কী করবি তোরা ব্যাচেলর পার্টিতে? মদ আর গঞ্জিকা সেবন হবে?' রুদ্রর প্রশ্ন।

বিভা রাজকীয় চালে বলল, 'সবই হবে। সুরাপান থেকে শুরু করে সমস্ত বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।'

– ‘আমি তোদের বিনোদন দিতে পারি নেচে গেয়ে। কত টাকা দিবি বল।’ প্রস্তাব দিল রুদ্র গুরুগম্ভীর ভাবে।

বিভা নাক কুঁচকে বলল –’ইশ, শুকনা বাঁশপাতার মতো দেহ, সে দিবে আমাদের নেচে গেয়ে বিনোদন! কৃমির ওষুধ খা আগে, তারপর আসিস বিনোদন দিতে।’ সামি বিছানার ওপর বসতে বসতে বলল, ‘আকাশ, তোর সাথে একটা ব্যাপারে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম।’

আকাশ বলল, ‘কী ব্যাপারে?

– ‘তুই এখন যে চাকরিটা করতেছিস, বেতন কত পাস?’

– ‘চল্লিশ হাজার। কেন?’

– ‘বাড়িভাড়া কি তুই দিস?’

– ‘হুম। লাস্ট কয়েকমাস যাবৎ আমাকেই দিতে হচ্ছে। বাবার তো কোন ইনকাম নাই। কিন্তু হঠাৎ এসব কেন জানতে চাচ্ছিস তুই?’

সামি গম্ভীরভাবে আকাশের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ভাবল কিছু একটা। নিচের ঠোঁটে দাঁত দিয়ে চিমটি কাটল দুবার। বলল, ‘আমি মনে হয় নেক্সট উইক থেকে বাবার অফিসে কাজ করা শুরু করব। তো বাবা জিজ্ঞাসা করতেছিল যে

আমার কোনো ফ্রেন্ড আমার সাথে কাজ করতে চায় নাকি। তাই জানতে চাচ্ছি যে তোর কোনো ইন্টারেস্ট আছে কিনা।'

সামির কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগেই আকাশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখের তারায় ধক করে উঠেছিল তেজ। সে কঠিনভাবে বলল, 'যে চাকরিটা এখন করতেছি এইটাও তো তোর বাবার রেফারেন্সেই করতেছি, মনে আছে?'

– 'হুম।'

– 'আমি আর কোনো ফেভার নিতে চাচ্ছি না উনার কাছ থেকে।'

সামি একটু অবাক গলায় বলল, 'ফেভারের তো কিছু নাই। তোকে কেউ এমনি এমনি টাকা দিবে না। কাজের বিনিময়েই টাকা পাবি। তোর যোগ্যতা আছে বলেই তোকে অফার দেওয়া হচ্ছে।'

– 'না দোস্ত, স্যরি। প্রফেশনাল ডিলিংস আমাদের ফ্রেন্ডশিপের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কী দরকার?'

বিভা আর হৃদি চুপচাপ ওদের কথোপকথন শুনছিল। আকাশের পড়ার টেবিলের ওপর একটা কালো রঙের দুরবীন রাখা ছিল। রুদ্র বিরসমুখে সেই দুরবীনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল অনেকক্ষণ ধরে। একটু পর পর চোখের সামনে ধরে জানালার বাইরেটা দেখছিল।

অমৃতা বলল, 'আমার মনে হয় প্রস্তাবটা খারাপ না। আকাশ তুই আরেকটু চিন্তা করে দ্যাখ। সামিদের কোম্পানির পে স্কেল অনেক হাই।'

আকাশ একটু ঝাঁঝের সাথে বলল, 'তোর এত শখ হইলে তুই কর না ওদের চাকরি। আমারে বলতেছিস ক্যান?'

অমৃতা একটু অপ্রতিভভাবে বলল, 'আমার কথা কেন আসতেছে?'

– 'এই সামি! তোদের ল' ইয়ার লাগলে ওরে নিয়া নে।' আকাশ তাচ্ছিল্যের গলায় বলল।

– 'আমি কোম্প্যানি ল এর কিছুই জানি না। তাছাড়া আমার আপাতত চাকরির প্রয়োজন নাই।'

– 'ও আচ্ছা, তোর প্রয়োজন নাই। আর আমারতো খুব প্রয়োজন তাই না? আমি তো রাস্তার ফকির!' দাঁতে দাঁত চিবিয়ে কথাগুলো বলল আকাশ। সামি খুব ব্যথিত স্বরে বলল, 'দোস্ত এভাবে বলার কিছু নাই। আমি আসলে তোদের হেল্প চাচ্ছিলাম। তোরা আমার সাথে থাকলে আমার ভালো লাগত। দ্যাটস ইট।'

রুদ্র বলল, 'তোর বৌরে নিয়া নে। এম ডি, টেম ডি কিছু একটা বানায় দে। সেইরকম হবে।'

সামি হৃদির দিকে চেয়ে একটু নরম গলায় বলল, 'আমার বৌয়ের অত কাজ করা লাগবে না।'

অমৃতা ঝেঁঝে উঠল, 'কাজ করা লাগবে না মানে? হৃদি কি ঘরে বসে থাকবে নাকি?'

সামি নির্বিকার গলায় বলল, 'ওর তো চাকরি করার কোনো প্রয়োজন নাই!'

– 'সিরিয়াসলি? এটা তুই বলতেছিস সামি? আমার ফ্রেন্ড হয়ে তুই এভাবে চিন্তা করতে পারলি?' অমৃতার গলা দিয়ে বিস্ময় ঝরে পড়ছিল। সামিও দমল না। জোর গলায় বলল, 'এত ওভাররিয়েক্ট করার কিছু নাই। ও চাইলে অবশ্যই কাজ করতে পারে। সেটা নিতান্তই ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

হৃদি এবার একটু কেশে নিয়ে বলল, 'সামি শোন, আমার বাবা চায় আমি যেন বাবার ব্যাংকেই জয়েন করি বুঝছিস? পরীক্ষা ছিল দুইদিন আগে তুই তো জানিসই। মনে হয় পাশ করব। রিটেনে পাশ করতে পারলে বাবা ভাইভার ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারবে। চাকরিটা হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।' সামি একটু ঠেসমারা গলায় বলল, 'ব্যাংকের চাকরি মানে বুঝিস? সকাল সন্ধ্যা টানা কাজ। অনেক খাটুনি। শুধু শুধু এত কষ্ট করার কী মানে আমি বুঝলাম না।'

হৃদি মুখ খোলার আগেই অমৃতা একদম ফোঁস করে উঠল, 'হৃদি সকাল সন্ধ্যা কাজ করবে নাকি অল নাইট কাজ করবে সেটা তুই বলে দিতে পারিস না।' সামি ভ্রুকুটি করে অমৃতার দিকে তাকালো, 'এত ক্যাটক্যাট করিস কেন তুই সবকিছু নিয়া? একবারই তো বললাম যে ওর ইচ্ছা হইলে ও অবশ্যই চাকরি করবে।'

বিভা তরল গলায় হৃদিকে বলল, ‘চাকরি না করলেও পারিস। আমাকে দ্যাখ সারাদিন বাসায় থাকি। রান্নাবান্না, ঘরসংসার করি। সারাদিন একলা থাকার পর জামাই বাসায় ফিরলে বেশ একটা প্রেম প্রেম ভাব হয়। বিনদাস! আর কী লাগে?’

অমৃতা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘তোর লজ্জা করল না কথাটা বলতে? এবার ফিরে গিয়েই তুই চাকরি খুঁজবি।

বিভা নির্বিকার গলায় বলল, ‘নাহ, আপাতত কোনো চাকরিবাকরি না। তাছাড়া ওই জঙ্গলের মধ্যে আমারে কে চাকরি দিবে?

– ‘তুই একটা নাচের স্কুল খোল।’ অমৃতা বলল।

আইডিয়াটা বুঝি বিভার পছন্দ হলো। খুশিতে কলকল করে উঠে বলল, ‘এটা ভালো বলছিস!’

হঠাৎ রুদ্র ঝপ করে লাফ দিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। চোখের সামনে দুরবিনটা দুহাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, ‘মাই গড! গাইজ, আই থিংক আই জাস্ট স আ নেকেড গার্ল!’

বন্ধুরা সব চোখ বড় বড় করে চাইলো তার দিকে। সামি জমানো গলায় বলল, ‘ওয়াও! কোথায়?’

– ‘নেক্সট বিল্ডিং এ!’

আকাশ তড়াক করে নেমে গেলো টেবিল থেকে। রুদ্রর হাত থেকে দুরবিনটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, ‘কই দেখি দেখি!’ রুদ্র কিছুইতেই জিনিসটা আকাশের হাতে দেবে না। দুই বন্ধুতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। সামি হাসতে হাসতে বাকি বন্ধুদের বলল, ‘কী? দেখবি নাকি নেকেড গার্ল?’

বিভা পানসে মুখে বলল, ‘নেকেড গার্ল দেইখা আমরা কী করুম? তোরাই দ্যাখ। নেকেড ম্যান পাইলে আমাদের ডাকিস। তাও শর্ত আছে, হট হইতে হবে।’

হৃদি সামির হাসি ঝলমলে মুখের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুই এত হাসতেছিস কেন? এত কেন আনন্দ?’

সামি আগের চাইতে আরও বেশি দাঁত বের করে হেসে বলল, ‘আনন্দ হবে না? ফ্রিতে মেয়ে দেখব। আনন্দই আনন্দ।’

– ‘সেইসব দিন শ্যাষ। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এখন আর এসব আনন্দ নাই।’ অমৃতা রায় দিল।

বিভা বলল, ‘বেচারা দেখেনাই তার আগেই তোরা এত কথা বলতেছিস কেন? না দেখে একটু আনন্দ করতেছে। করতে দে না!’

হৃদি ধমকে উঠে বলল, ‘চুপ থাক। এত আনন্দের দরকার নাই!’

অমৃতা চিন্তাযুক্ত গলায় বলল, ‘কিন্তু মেয়েটা নেকেড কেন?’

– 'আজকে বেশ গরম পড়ছে। এইটা একটা কারণ হইতে পারে।' বিভা বলল গম্ভীরভাবে।

শুনে বন্ধুরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল, সমস্বরে।

৪০

বন্ধুরা বিয়ের তত্ত্ব সাজানোর কাজ করবে। ঠিক হলো দুজন কাজ করবে হৃদির বাসায়, বাকি দুজন সামির বাসায়। কে কোন পক্ষ নেবে তা নিয়ে একটা বাকবিতণ্ডা লেগে গেলো ওদের মাঝে। অনলাইনে গ্রুপকলে কথা বলছিল ওরা। গতবার সামির আম্মা বন্ধুদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন এ কথা ঠিক। কিন্তু সামি পরবর্তীতে মায়ের হয়ে বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। বন্ধুরাও ক্ষমা করে দিয়েছে। তাই সামির বাসায় যেতে এখন কারোরই তেমন কোনো আপত্তি নেই। এমনকি যে অমৃতাকে রোমেলা থাপ্পড় মেরেছিল সেই অমৃতাও একটু গাঁইগুঁই করে বলে ফেলল, 'ইশে, আমি আর রুদ্র বরপক্ষ। বিভা আর আকাশ কনেপক্ষ। সো আমি সামির বাসায় যাচ্ছি।' অমৃতার বেহায়াপনা দেখে বিভা আশ্চর্য হয়ে গেলো। কটমটে চোখে ওর দিকে ক্যামেরার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি বরপক্ষ। কোনোমতেই আমি কনেপক্ষ হব না।'

সামি হেসে ফেলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। অমৃতা আর বিভা চইলা আসিস আমার বাসায় কালকে সকালে। আকাশ আর রুদ্র কনেপক্ষ।

অমৃতা বলল, 'সকালে কোর্টে যাইতে হবে। তিনটা বাজবে তোর বাসায় যাইতে যাইতে।'

– ‘আচ্ছা সমস্যা নাই।’ বলল সামি।

গ্রুপ কল শেষ হলে বিভা অমৃতাকে ফোন করল আলাদাভাবে।

– ‘ওই ছেমড়ি, তুমি লাফায় লাফায় সামির বাসায় কেন যাইতে চাইতেছ? বুঝি না মনে করছ কিছু?’

অমৃতা ম্লান গলায় বলল, ‘এরকম করিস কেন?’

–’ তুই না আমাদের প্রমিজ করছিলি তুই আর কোনোদিন দেখা করবি না?’

– ‘দেখা করব না প্রমিজ। শুধু একটু দেখব।

– ‘ফাইজলামি করিস?’

– ‘প্লিজ দোস্ত! একটাবার দেখতে খুবই ইচ্ছা করতেছে! রাগ করিস না তোরা!’

৪১

বিয়ের কেনাকাটা নিয়ে একটা মৃদুমন্দ ঝড় বয়ে গেলো হৃদিদের ছোট্ট পরিবারটায়। বাবার যে বাজেট তাতে কোনোভাবেই খরচে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। বাবা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে তার মেয়ের বিয়ে কোনো সাধারণ পরিবারে হতে যাচ্ছে না। দেশ সেরা ধনী ব্যক্তির পুত্রবধু হতে যাচ্ছে তার কন্যা। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারের সবচেয়ে দামি জিনিসটা বিয়ের তত্ত্ব হিসেবে বরের বাড়িতে যাওয়া উচিত। হৃদি বোঝে অতটা সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুটা মানসম্মত সামগ্রী তো কেনাই যায়! বাবা এ ব্যাপারে কারো কোনো কথাই

শুনছেন না। এদিকে সামির আম্মা কী ভয়ংকর ঠোঁটকাটা মহিলা তা অন্য কেউ না জানলেও হৃদি জানে। এই মহিলা যদি অপমানজনক কোনো কথা শুনিয়ে দেয় শুরুতেই তাহলে হৃদির ভয়ংকর খারাপ লাগবে! আকদের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে হৃদির বাসায়। এ নিয়েও তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাদের পনেরোশ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটটায় অনায়াসে পঞ্চাশজন মানুষ এঁটে যায়। আকদ যেহেতু অত ঘটা করে করা হচ্ছে না তাই দু পরিবার মিলিয়ে হয়তো ষাটজনের মতো লোকসংখ্যা হবে। কিন্তু সামির পরিবারের মানুষগুলোকে হৃদি খুব ভালো করে চেনে। বিলাসিতা এবং দাম্ভিকতা এদের রক্তের মাঝে বিষের মতো ঢুকে গেছে। সামির খালা দুজনেরও প্রচণ্ড নাক উঁচু। হৃদির বাসার মধ্যবিত্ত হালচাল এরা কোনোভাবেই স্বাভাবিকভাবে নেবে না।

বাবা সবকিছু নিয়েই কার্পণ্য করছেন। সাজগোজের পয়সাও ঠিকঠাক দিতে চাচ্ছেন না। হৃদি ঠিক করেছিল নাভিন আহমেদের কাছে সাজবে। কিন্তু পয়সা মনে হচ্ছে কুলোবে না। অনুষ্ঠানের আর মাত্র দুদিন বাকি এখনো বরের ঘড়ি কেনা হয়নি, জুতো কেনা হয়নি। দুশ্চিন্তায় হৃদির ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এরকম রাঘব বোয়াল পরিবারের সাথে বিয়ে না হয়ে সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের সাথে বিয়ে হলে চাপ অনেক কম থাকত। সুখের চাইতে স্বস্তি জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সামিকে ফোন করল হৃদি, বিয়ের দুদিন আগের সন্ধ্যায়।

সামি একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ‘কী হইছে তোর?

– ‘সামি শোন। একটা কথা বলব। মন দিয়ে শুনবি।’

– ‘হুম, বল।’

হৃদি একটা লম্বা নিশ্বাস নিল। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘তুই তো জানিস যে আমার বাবার তোর বাবার মতো অত টাকা নাই। আমরা মধ্যবিত্ত। তানিশার ফ্যামিলি যেভাবে এনগেজমেন্টের প্রোগ্রাম করছে কিংবা যেরকম এক্সপেন্সিভ শপিং করছে আমাদের পক্ষে তা কোনোভাবেই সম্ভব না।’

– ‘এসব কথা কেন বলতেছিস তুই? আমি কি এরকম কিছু ডিমান্ড করছি কখনো?’

– ‘না তুই ডিমান্ড করিস নাই। কিন্তু তোর ফ্যামিলি মেম্বারদের একটা এক্সপেক্টেশন থাকতেই পারে। হয়তো তোর আম্মা ব্যাপারটা পজিটিভলি নিবেন না। তো সেক্ষেত্রে আমি চাই তুই যেন এই ব্যাপারটা দেখিস। আমাকে বা আমার পরিবারকে কেউ যেন অপমান না করে। অফেন্সিভ কথাবার্তা যেন কেউ না বলে।’

সামি প্রবল বিস্ময় নিয়ে বলল, ‘অপমান করবে কেন? মাথা খারাপ! আমার শ্বশুরবাড়ির মানুষজনকে অফেন্সিভ কথা বলবে এত সাহস আছে নাকি কারো? তুই নিশ্চিন্ত থাক।’

হৃদি কিছু বলল না। চুপ করে রইল। সামি আবার বলল, ‘শোন, শপিং নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না তোদের। তুই আংকেলকে কোনো প্রেশার দিস না। প্লিজ!’

৪২

বিভা আর অমৃতা সামিদের বাসায় এসে পৌঁছুল দুপুর তিনটায়। ওরা দুজনে আজ একই রকম জামা পরেছে। বাঙ্গি রঙের টি শার্ট। অমৃতার কনুইয়ে ঝুলছে কালো কোট। পিঠে ল্যাপটপের ব্যাগ। সামি প্যাটিওতে বসে ছিল। মায়ের সাথে। বান্ধবীদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। তাকে আজ একবার যেতে হবে জুতোর দোকানে। হৃদির বাবা ফোন দিয়ে বলেছেন উনারা শপিংমলে অপেক্ষা করছেন সামির জন্য। মাপ না পাওয়া গেলে তো জুতো কেনা যাবে না।

রোমেলা মালিকে দিয়ে বাগানের কাজ করাচ্ছেন। নতুন কয়েকটা সাদা গোলাপের চারা কিনেছেন তিনি। সেই চারা রোপনের প্রক্রিয়া চলছে। দুই বান্ধবীকে দেখতে পেয়েই সামি উঠে দাঁড়ালো। রোমেলা মেয়েদুটোকে দেখে একটু অবজ্ঞা সূচক হাসলেন শুধু একবার। মুখে কিছু বললেন না। এই বিয়ের আয়োজন নিয়ে তিনি অতটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। মাথা না ঘামানোর অন্যতম কারণ হলো বিয়ের অনুষ্ঠানে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকজন আসবেন না। হক সাহেবের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে একেবারে সাদামাটাভাবে। দেশের নামিদামি লোকেরা যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে না সেই অনুষ্ঠান নিয়ে অত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে রোমেলার মনে হয় না। অযথা আয়োজন করে কী হবে? কে দেখবে? তাঁর তো লোক দেখানোতেই আনন্দ। তবুও তিনি গত সন্ধ্যায় সামির বাবার সাথে গিয়ে কনের জন্য গয়নার অর্ডার দিয়ে এসেছেন। বোনদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ের লেহেঙ্গা কিনেছেন। আর কত? তাঁর মন মেজাজ ভালো নেই। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি কিছু বলতে পারছেন না। মনে মনে এই বিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। অশান্তিতে ভরে আছে ভেতরটা। সামি বান্ধবীদের বলল, 'চল আমার ঘরে চল।'

অমৃতা একটু মিনমিনে গলায় বলল, 'তোর ঘরে কেন? আমরা ড্রইংরুমেই বসতে পারি।'

বিভা চোর চোখে দেখল একবার অমৃতাকে। একটু ভেবে চিন্তে বলল, ‘হুম, সেটাই। ড্রইংরুমে বসি। তোর ঘরে যাওয়ার দরকার নাই।’ সামি আর কথা বাড়ালো না। সমস্ত জিনিসপত্র ড্রইংরুমের কার্পেটের ওপর এনে জড়ো করা হলো। সেই সাথে ডালা কুলা, র‍্যাপিং পেপার, টেপ, কাঁচি ইত্যাদি। বন্ধুদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে আসলো। হবু শ্বশুরের সাথে মিটিং বলে কথা। একটু নার্ভাস ফিল করছিল ভেতরে ভেতরে।

বিভা সাজানো গোছানোর কাজ ভালো পারে। মূলত সব কাজ সে একাই করছিল। অমৃতার এমনিতেও কাজে মন নেই। একটু বাদে বাদে সে সদর দরজার দিকে তাকাচ্ছে। দরজার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের বিকেল দেখছে। বাগানের ফুল দেখছে। তার চোখের তলায় অসহিষ্ণুতার গাঢ় ছাপ। নিশ্বাস বড়ই চঞ্চল। কোনো কিছুতেই যেন মন বসছে না তার। রোমেলা একটা বারও এই ঘরে আসেননি। কাজের বুয়া এসে একটু বাদে ওদের চা নাশতা দিয়ে গেলো। বিভা খুব বকবক করছিল। অমৃতা অন্যমনস্কভাবে হু হা করে যাচ্ছে শুধু। এর মধ্যে একটা ভুল করে ফেলল সে। কসমেটিকসের ডালায় অন্যমনস্কভাবে চুড়ির গোছা বসিয়ে দিল। বিভা ধমকে উঠল

– ‘কী করতেছিস তুই এসব? মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বলি মনটা থাকে কোথায়?

– ‘ওহ স্যরি!’

বিভা রাগে গজগজ করতে লাগল, ‘কাজ করতে মনে না চাইলে বইসা থাকো। দয়া করে আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি কইর না।’

অমৃতার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। বুকে টলমল করে উঠল একগুচ্ছ অভিমান। লোকটা আসছে না কেন? অমৃতা যে তার জন্য সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে বসে আছে সেই খবরটা কি কোনো এক গোপন হৃদপথ ধরে হেঁটে হেঁটে তার হৃদয় অবধি পৌঁছায়নি এখনও? অশান্তি! বড় বেশি অশান্তি সারাটা অন্তরজুড়ে! সন্ধে নামার খানিক আগে মিতসুবিশি পাজেরোটা গাড়ি বারান্দায় এসে থামল। অমৃতা দেখতে পেলো জানালা দিয়ে। চাপা উচ্ছ্বাস নিয়ে কিশোরীসুলভ চঞ্চল গলায় বলে উঠল, 'আসছে!'

বিভা হাতের কাজ না থামিয়েই একবার অবহেলায় জানালার বাইরে তাকালো। তারপর বিরস গলায় বলল, 'আসছে তো কী করব আমি? নাচব?'

কী কারণে যেন রাশেদের মেজাজ আজ সপ্তমে চড়ে ছিল। তিনি ফোন কানে নিয়ে খিটখিটে স্বরে কথা বলতে বলতে বাড়িতে ঢুকলেন। তার পরনে নেভিব্লু কালারের ফুল হাতা ইন করা শার্ট। কালো প্যান্ট। চুলগুলো কিঞ্চিৎ এলোমেলো। মুখে দু তিনদিনের অবহেলার দাড়ি। সদর দরজা পেরিয়ে বসার ঘরে পা ফেলার আগে চাকরটাকে তিনি সম্পূর্ণ বিনা কারণে একটা হাঁক দিলেন। বেচারা চাকর গ্লাসে করে ঠান্ডা শরবত নিয়ে এসেছিল তার জন্য। তিনি হুংকার দিয়ে উঠে বললেন, 'আমি কি এখন শরবত চেয়েছি?' হুংকারটা শেষ করেই তিনি সামনে তাকালেন। চারটা চোখ আটকে গেলো চুম্বকের মতো। বাতাস সুরভিত হয়ে উঠল এক অলৌকিক সুখস্পর্শে। তার রাগান্বিত মুখখানায় কী করে যেন একটা তরল ভাব চলে আসলো ম্যাজিকের মতো। তিনি ফোনে কথা বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন।

অমৃতার হৃৎপিণ্ড একবার থমকে গেলো। তারপর ট্রেনের গতিতে ছুটতে লাগল দুরন্তভাবে!

লজ্জা পেলে যে মেয়েদের কী সুমিষ্ট সুন্দর দেখায়, সেই অকাট্য সত্যটা আজ এই মুহূর্তে অমৃতাকে না দেখলে তিনি কখনোই বিশ্বাস করতেন না। ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে স্পষ্টভাবে অবলোকন করলেন যে দশ কদম দূরে বসে থাকা মেয়েটার মুখে কোত্থেকে যেন পুঞ্জিভূত একরাশ রক্তিম রং এসে ভর করল, এই মাত্র! তিনি চোখ সরালেন না। ওর দিকে চেয়ে থেকেই ফোনে কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। অমৃতা এবারে মুখ নিচু করে হাতে ধরে রাখা স্কচটেপ আর কাঁচি নাড়াচাড়া করতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। বিভা নরম স্বরে সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুসলিম বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে গুরুজনদের সালাম দেওয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। রাশেদ হাত তুলে ইশারায় বসতে বললেন ওকে। বিভা অমৃতাকে একবার আগাগোড়া দেখে নিয়ে বলল, 'আমি আসছি। বি রাইট ব্যাক।'

অমৃতা ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো। বিভা যাবার পর, ওই বিশাল বড় আলিশান ড্রইংরুমে শুধু ওরা দুজনে ছাড়া আর কেউ রইল না। বাইরে তখন বিকেল মরে এসেছে। বড় কাচের স্লাইডিং ডোর ডিঙিয়ে শেষ বিকেলের ম্লান আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। একটু বাদেই ঝুপ করে সন্ধে নামবে। কাচের ওপাশে ঝিরিঝিরি বাতাসে মাথা দুলিয়ে হালকা তালে নেচে চলেছে বাগানে ফুটে থাকা হরেক রঙের ফুল। লোকটা তখনো ফোনে কথা বলে যাচ্ছে। অমৃতা হাতের সরঞ্জামগুলি মাটিতে রেখে কার্পেটের ওপর পা ভাঁজ করে নতমুখে বসে আছে। এই মুহূর্তে বুকের ভেতর একটা অনাবিল শান্তির স্রোত বইছে। তার নিজস্ব পৃথিবীটা হাসছে মৃদু মৃদু। হঠাৎ করেই এই বিকেল শেষের আবছা আলোটাকে তার বড় বেশি কাব্যিক বলে মনে হচ্ছে। আহা! জীবন বড় সুন্দর! মানুষটা কাছে থাকুক। ভালো থাকুক। এর চেয়ে আর বেশি কিছু চাইবার নেই!

– 'কেমন আছ?' ফোনটা কান থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন তিনি। অমৃতা মুখ না তুলেই বলল,

– ‘এই তো।’

– ‘এই তো মানে?’

– ‘খুব একটা ভালো না।’

– ‘কেন?’ অমৃতা ওর পুতুল পুতুল চোখদুটো মেলে তাকালো মানুষটার দিকে।

– ‘আমার কথা বাদ দিন। আপনি কেমন আছেন?’

– ‘আমি ভালো আছি।’

অমৃতা মুচকি হাসল, ‘আপনি কিন্তু রোগা হয়ে গেছেন।’

– ‘তাই নাকি?’

– ‘হুম। দাড়ি কাটেননি কেন?

হক একটু অন্যমনস্কভাবে নিজের গালে হাত রাখলেন, ধীর স্বরে বললেন, ‘সময় পাইনি।’

– ‘ও, আমি ভাবলাম আবার কাউকে বুঝি মিস টিস করছেন! কেমন একটা বিরহ বিরহ ভাব!’

হক ভ্রু উঁচিয়ে তাকালেন দুষ্টু মেয়েটার দিকে। কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, ‘মিস করার সময় কোথায়?’

– ‘হুম, জানি। বড্ড ব্যস্ত মানুষ আপনি।’

– ‘তোমার কী হয়েছে? তুমি ভালো নেই কেন?’

দরজার বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেলো। কেউ আসছে। ওরা দুজনেই দরজার দিকে তাকালো একযোগে। হাইহিল জুতোয় ঠকঠক শব্দ তুলে একজন তিরিশ ছুঁই ছুঁই নারী এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে। কলাপাতা রঙের সিল্ক শাড়ি পরনে। মুখে ভারি সাজ। হাতে একটা ফাইল। দরজায় উঁকি দিয়ে মেয়েটি একগাল হেসে বলল, ‘আসব স্যার?’

– ‘হ্যাঁ এসো।’

মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকল। হাতের ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘স্যার এটায় আপনার সাইন দরকার। আপনার টেবিলে রাখা ছিল আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। আমাকে ম্যানেজার স্যার পাঠালেন।

হক একটু অপরাধী গলায় বললেন, 'ওহ, স্যরি। তোমার আবার কষ্ট করে আসতে হলো। এক্সট্রিমলি স্যরি। অফিসের গাড়ি নিয়ে এসেছ তো?'

– 'জি স্যার।

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল মেয়েটার দিকে। আসার আর সময় পেল না। মেয়েটি কি একটু বেশি সাজগোজ করে ফেলেছে? এত সাজগোজের কারণ কী? লোকটার এত গা ঘেঁষেই বা দাঁড়িয়েছে কেন? দূরে দাঁড়ানোটাই তো ভদ্রতা, নাকি? সমস্যা কী? নিজের অবাধ্য কূট চিন্তাসমূহ ক্রমেই তাকে ভেতরে ভেতরে বিব্রত করে তুলছিল। সে বুঝতে পারছে ভাবনাগুলো অতিমাত্রায় মেয়েলি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনকে কিছুতেই পোষ মানানো যাচ্ছে না। মেয়েটির কোনো দোষ নেই। শুধু লোকটার পাশে একটু গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বলেই এই মুহূর্তে মেয়েটিকে তার খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তার এতকালের পুরোনো শক্তপোক্ত পুরুষালি মনটার ভেতর যে এমন চিরাচরিত হিংসুটে নারীসর্বস্ব একটি মন নিভৃতে লুকিয়ে ছিল তা সে আজ এতদিনে জানতে পারল। রোমেলা উপস্থিত হলেন হঠাৎ, অসময়ের ঝড়ের মতো! মেঝেতে পা লেপটে বসে থাকা অমৃতাকে বক্র চোখে একবার দেখে নিয়ে স্বামীকে বললেন, 'তুমি কখন এলে?'

হক ফাইল থেকে চোখ না তুলেই স্তিমিত গলায় উত্তর দিলেন, 'একটু আগে।'

অফিসের মেয়েটি রোমেলাকে দেখে সালাম দিল। রোমেলা ঘাড় নেড়ে সালামের উত্তর দিয়ে উল্টোদিকের সোফায় বসলেন। ব্যস, এখানে বসে থাকার আর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অমৃতা উঠে দাঁড়ালো। হক আড়চোখে দেখলেন একবার তাকে। কিছু বললেন না। অমৃতা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। হাওয়ায় ভাসতে থাকা মনটা ঝুপ করে কাদামাটিতে আছড়ে পড়ে গেলো যেন। এ পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা

নেই যেখানে মানুষটার সামনে বসে নিশ্চিন্তে দুদণ্ড কথা বলা যায়। এতই ছোট পৃথিবীটা!

৪৩

– 'হ্যালো বিভা? কী অবস্থা তোদের?' হৃদি প্রশ্ন করল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। বিভা ডাইনিং এ এসে বসেছে। এদিকটায় আপাতত কেউ নেই। শুধু একজন কমবয়সী বালক চাকর অকারণে ঘুরঘুর করছে। গম্ভীর চোখে চারপাশে নজর বুলাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘোরাফেরা করাটাই তার একমাত্র করণীয় কাজ। এই কাজটির জন্যেই তাকে বেতন দেওয়া হয়। বিভা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটু রাশভারি গলায় বলল, 'তুমি একটু অন্যদিকে যাও তো! আমি ফোনে কথা বলছি।' ছেলেটি সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে তাকালো বিভার দিকে। যেন বিভা কোনো অসম্ভব আবদার করে ফেলেছে তার কাছে।

– 'কী হলো? কথা কানে যায় না?'

ছেলেটি না পারতে এবার বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। বিভা অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'কাজ তো এখনো অর্ধেকও হয় নাই। তার আগেই নায়ক নায়িকার দেখা হয়ে গেছে। তুই কোথায়?'

– 'আমরা যমুনা ফিউচার পার্কে আসছি। সামির জুতা কিনতে।'

– 'কেনা হইছে?'

– ‘হুম হইছে। আমরা মনে হয় রাতে একসাথে ডিনার করব। বাবা খাওয়াবে।’

– ‘ওয়াও। সাউন্ডস গুড। এখন সামি কোথায়?’

– ‘ও আছে বাবা মায়ের সাথে। একটু দূরে। সমস্যা নাই তুই বল, কাহিনী কী?

বিভা আগের চাইতেও চাপা গলায় বলল, ‘তোমার শ্বশুরের সমস্যা কী?’

– ‘ক্যান কী করছে?’

– ‘কী করছে মানে? উনার এত হ্যান্ডসাম হওয়ার কী দরকার ছিল?’

হৃদি হাসতে লাগল, ‘শালি, তুইও কি ক্রাশ খাচ্ছিস নাকি?’

– ‘দিস ইজ নট ফেয়ার। কারো বাবা কেন এত সুন্দর হবে দেখতে?’

– ‘আল্লাহ! তোমরা আমার শ্বশুরের উপর নজর দেওয়া বন্ধ করো। দোহাই লাগে।
’

– ‘আজব ব্যাপার কী জানিস, ওদের দুজনকে না অনেক মানায়। আমি আজকে খেয়াল করলাম। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?’

– ‘খুবই অদ্ভুত। অমৃতার সামনে এসব কথা ভুলেও বলবি না। প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। তুই কি বুঝতে পারতেছিস?

– ‘না বলব না। বাট আমার অমৃতার জন্য খারাপ লাগতেছে আজকে। তোর শাশুড়ির একটা ব্যবস্থা করি চল।’

– ‘কী ব্যবস্থা?’

– ‘ওখুধ খাওয়ায় পাগল বানায় দেই। তারপর পাগলাগারদে পাঠায় দিব।’ শুনে হৃদি খিলখিল করে হেসে উঠল। সামি তার হবু শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে রেমন্ডের শোরুমে ঢুকেছিল। সাথে ছোট ভাই হৃদয়ও আছে। বেরিয়ে এসে হৃদিকে ওরকম খিলখিলিয়ে হাসতে দেখে সামি অবাক গলায় বলল, ‘কীরে, কী হয়েছে তোর?

হৃদি অনেক কষ্টে হাসি চেপে বিভাকে বলল, ‘এখন রাখি। পরে কথা বলব।’

হৃদির আজ খুব বেশি ভালো লাগছিল। একটা পরিপূর্ণ, নিরবিচ্ছিন্ন তৃপ্তির আমেজে ছেয়ে গিয়েছিল মন। সামি তার পরিবারের জন্য নতুন কেউ নয়। কিন্তু এতকাল তার উপস্থিতি ছিল বন্ধু হিসেবে, ক্ষণিকের অতিথির ন্যায়। এখন সে এই পরিবারেরই একজন সদস্য। তার বাবা মায়ের সাথে এর আগে সামি কখনোই এতটা সময় একত্রে কাটায়নি। সামির মতো হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল, সাদা মনের নিরহংকারী ছেলেকে মেয়ের জামাই হিসেবে পেয়ে বাবা মাও বেশ খুশি। সত্যই, সামির মতো ছেলে হয় না। হৃদির বাবা মাকে সে খুব সহজেই আপন করে নিয়েছে। শুধু একটু আগে হৃদির মাকে আন্টি ডাকতেই প্রত্যুত্তরে তিনি যখন বললেন, ‘এখন থেকে আর আন্টি ডাকাডাকি চলবে না। আম্মা ডাকতে হবে।’ তখন সে একটু লজ্জায় লাল

হয়ে গিয়েছিল। হৃদির মা এই একটি কথা গত তিন চারদিন ধরে অনবরত বলে যাচ্ছেন। সামি এই বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার কেবলই মনে হচ্ছে শাশুড়িকে ‘আম্মা’ ডাকলে তার নিজের মা মনে মনে কষ্ট পাবে। আজকে মায়ের সাথে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। মা শুনেটুনে ঠান্ডা গলায় বলেছেন, ‘তোমার বিবেক যা বলে তাই করো। আমার কথা এই বাড়ির লোকে কখনো শোনে নাকি? আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কী?

বাবা মা বলে সম্বোধন না করলেও সামি হবু শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য করছে না। এই অনেকটাই পরিণত, সুশীল, বিনয়ী ছেলেটাকে হৃদির আরো বেশি করে ভালোবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে আজ। হঠাৎ মনে হলো, কাছের কয়েকজন মানুষ নিয়ে এইযে ছোট্ট, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন একটি পরিবার তার, এই পরিবারে যদি কখনো আচমকা তুফানের মতো কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উড়ে এসে জুড়ে বসে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? অমৃতা যদি না চাইতেও কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে? সামি কি সইতে পারবে এই অতর্কিত তুফানের বিভীষণ ঝাপটা? পরিবারটা এখন শুধু সামির একারই নয়। হৃদিও ওই পরিবারের একটি অংশ হতে যাচ্ছে। অমৃতাকে নিরস্ত করতেই হবে! যে করেই হোক!

৪৪

অফিসের মেয়েটা চলে যাবার পর রোমেলা স্বামীকে বললেন, ‘তুমি কি ঘটনা শুনেছ?’

হক বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে একটু অবাক গলায় বললেন, ‘কী ঘটনা?’

‘আমার ছেলেটাকে ওরা ডেকে নিয়ে গেছে সেই বিকেল বেলা। বিয়ের শপিং করছে। একটু আগে ছেলে ফোন দিয়ে বলল রাতে নাকি বাইরে ডিনার করবে। ওই মেয়ের ফ্যামিলির সাথে। আমার ছেলেটাকে কি কিনে ফেলল নাকি?’

হক একটু বিষণ্ণ গলায় বললেন, ‘তোমার ছেলে তার ইন ল’ জ কে সময় দিচ্ছে। এটা তো ভালো কথা। এখানে এত দুশ্চিন্তার কী আছে?’ কথাটা শেষ করে তিনি পা বাড়ালেন। রোমেলা তার পেছন পেছন আসতে আসতে বললেন, ‘বিয়ের আগেই এত অধিকার দেখাচ্ছে। বিয়ের পর কী করবে তা ধারণা করতে পারছ তুমি?’

– ‘তুমিও ওদের মেয়ের ওপর অধিকার দেখালেই তো পারো। তোমাকে কে মানা করেছে?’

–ওই মেয়ের মা আমার ছেলেকে বলেছে বিয়ের পর নাকি আমার ছেলের তাকে আম্মা বলে ডাকতে হবে। শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে!’

– ‘এটাই কি স্বাভাবিক নয়? তোমার মাকেও তো আমি মা বলেই ডাকতাম।’

– ‘তুমি আবারও এই বাজে ফ্যামিলিটার সাথে আমাদের ফ্যামিলিকে মেলাচ্ছ?’

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা দুজনে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এসেছিলেন। হক এ পর্যায়ে থেমে পড়ে রোমেলার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, ‘রোজ রোজ তোমার একই কমপ্লেইন শুনতে ভালো লাগে না। আমি প্রচণ্ড টায়ার্ড। ফর গড সেক, এখন এসব বন্ধ করো। ’

– ‘তুমি সবসময় ওই মেয়েটার সাথে আমাকে মেলাও কেন? এ তো দেখি বাঁদরের সাথে দেবতার তুলনা!’

– ‘তুমি এ বাড়ির বৌ এবং ওই মেয়েটিও দুদিন পর এ বাড়ির বৌ হতে যাচ্ছে। ’

– ‘বাহ্, এতেই আমরা এক সমান হয়ে গেলাম? এটা আমার সংসার। আমার সংসারে আমি কারো মাতব্বরি সহ্য করব না। আর ওই মেয়েটা কোনোদিক দিয়েই এ বাড়ির বৌ হওয়ার যোগ্য না। আত্মীয়স্বজনকে আমি মুখ দেখাতে পারছি না জানো? আজকে আমার সেজ মামা ফোন করে জানতে চাইছিলেন মেয়ের বাবা কী করে? কীসের বিজনেস? আমার বলতে এত লজ্জা লেগেছে যে কী বলব!’

হক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন বিষণ্ণ, মন্থর গতিতে। তাঁর কপালে একটি কুঞ্চন রেখা তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নতুন বউয়ের সাথে তাঁর স্ত্রী মোটেও ভালো ব্যবহার করবে না। কাল বাদে পরশু বিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ছেলের হবু শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে ভদ্রতাসূচক কোনো বৈঠকে বসেনি। এমন কি ফোনেও কথা বলেনি। গয়নার অর্ডার দিতে যাওয়ার ব্যাপারেও তার মধ্যে আগ্রহের কমতি ছিল। হক জোর করে নিয়ে গেছেন। মা হিসেবে যে দায়িত্বটুকু পালন করা উচিত তার কানা কড়িও সঠিকভাবে সে পালন করছে না। সমস্ত দায়িত্বের ভার ছেলের বাবার কাঁধে এসেই পড়েছে।

বেডরুমে এসে তিনি হাতঘড়ি খুলতে খুলতে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘দেখো রোমেলা, নিজের ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হলেও এখন এসব নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা থেকে বিরত থাকো। তোমার ছেলে এসব জানতে পারলে কতটা কষ্ট পাবে তা একবার ভেবে দেখেছ?’

– ‘আর আমি যে কষ্ট পাচ্ছি? সেটার কী হবে? আমার কষ্টটা কেউ দেখে না কেন?’

– ‘তুমি অহেতুক কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার ছেলে সুখী হতে যাচ্ছে। এটাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?’

রোমেলা অগ্নিদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, –’আমার ছেলের বৌ হিসেবে একটা ক্লাসি, সুন্দরী, হাই স্ট্যাটাসের মেয়ে চেয়েছিলাম আমি। মধ্যবিত্ত ঘরের ল্যাবেন্ডিশ মেয়ে না।’

হক চুপ করে গেলেন। রোমেলা বরাবরই একটু নাকউঁচু স্বভাবের মেয়ে ছিল। যৌবনে তার রূপের অহংকার ছিল আকাশচুম্বী। সে নিঃসন্দেহে এখনো সুন্দরী। কিন্তু আজকাল তার অহংকারের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। শুধু রূপের নয়, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং বিত্ত বৈভবের অহংকার এসে গেছে তার ভেতরে। তার বাবা উচ্চপদস্থ চাকরি করতেন। বাপের বাড়িতে তাদের জীবন যাত্রার মান ছিল অত্যধিক আড়ম্বরপূর্ণ। তাই অহং বোধটা হয়তো জন্মগতভাবেই পাওয়া। লোকে অবশ্য হক সাহেবকেও অহংকারী বলে থাকে কদাচিৎ। অমৃতাও বলেছিল! শাওয়ার নেবার সময় গরম জলের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর হঠাৎ করেই অমৃতার কথা মনে পড়ল। অমৃতা কেন ভালো নেই? বাচ্চা একটা মেয়ে! ওর তো এখন হেসে খেলে বেড়াবার সময়। জীবনটাকে উপভোগ করার সময়। সে কেন ভালো থাকবে না? এই মেয়েটি তাঁর প্রতি এতটা আসক্ত কেন? এটা কি ইনফ্যাচুয়েশন? নাকি সত্যিকারের ভালোবাসা? মেয়েরা তো নানা সময়ে নানাভাবে তার দরজায় কড়া নেড়ে গেছে। কখনোই সাড়া দিতে মন চায়নি। কিন্তু আজ এত কাল পরে এসে এই পুঁচকে মেয়েটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারছেন না কেন? এর কারণ কী? অজান্তেই একটা প্রলম্বিত শ্বাস পড়ল তাঁর। এ কথা ঠিক অমৃতা আর দশটা মেয়ের মতো নয়। অন্যরকম, ভীষণ অন্যরকম! অমৃতা এক বিস্ময়ের নাম! অমৃতা এক অভেদ্য রহস্যের নাম! আজকাল কি এই রহস্যের মায়াজাল

তাঁকে একটু একটু টানছে? নইলে আকণ্ঠভাবে পেশাগত এবং পারিবারিক চাপের মধ্যে ডুবে থেকেও তিনি মেয়েটির কথা কেন ভাবছেন অযথা? মেয়েটা বলছিল তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন কাউকে মিস করছেন। মিস করা কাকে বলে? এই যে হঠাৎ হঠাৎ কারণে অকারণে মেয়েটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এটাকে কি মিস করা বলে? রোমেলার বিয়ের আগে একজন প্রেমিক ছিল। সব সুন্দরী মেয়েদেরই যেমন থেকে থাকে। রোমেলার সেই প্রেম অবশ্য বেশ গভীর ছিল। বিয়ের পরেও টানা তিন বছর সেই প্রেমিকটি নানাভাবে জ্বালাতন করে গেছে। তিনি নিজেও বয়সে তখন একেবারে তরুণ। তবে সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমিক তাঁর ভেতরে কোনো যন্ত্রণা বা জ্বলুনি সৃষ্টি করেনি। সেই থেকেই তিনি খুব ভালো করে জানেন যে মন নামক জিনিসটা তাঁর বুকের ভেতরে কোনো এক আবছা কোণে বাক্সবন্দি অবস্থায়ই রয়ে গেছে। সেই বাক্স খোলার চাবিটা নিজের কাছে নেই। তাই বাক্সটা চিরদিনের জন্য বন্ধ। তিনি বাবা মায়ের বাধ্য ছেলে ছিলেন। বিয়ের পর সংসার ধর্ম পালন করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। স্ত্রীর প্রতি মায়া এবং শ্রদ্ধাবোধ ষোলো আনাই আছে। প্রেমে পড়াটা হয়তো কখনও হয়ে ওঠেনি। তাতে কী এসে যায়? সবার জীবনে সবকিছু হয় না। এরকমই নানাবিধ অহেতুক যুক্তিহীন চিন্তায় অনেকক্ষণ অবধি আত্মলীন হয়ে রইলেন তিনি। এসব চিন্তা তাঁর মাথায় সচরাচর আসে না। আজ ব্যতিক্রম। গোসল সেরে ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তিনি একটু অন্যমনস্ক গলায় স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'রোমেলা, তুমি কি কখনো কাউকে মিস করো?'

রোমেলা অদ্ভুত চোখে তাকালেন, 'আমি আবার কাকে মিস করব?' —'তোমার একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল না? কী যেন নাম?'

রোমেলা থমকে গেলেন। বিব্রতভাবে বললেন,

– ‘হঠাৎ তার কথা?’

হক হাসলেন, ‘জানতে ইচ্ছে হলো।’

রোমেলার চোখে একটা দুশ্চিন্তার গাঢ় ছায়া পড়ল। হক কখনোই তার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। তিনি অন্যরকম মানুষ। কাজের মানুষ। কাজ কর্ম, পেশাগত ব্যস্ততা এবং রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনটা ঘুরছে। আজ হঠাৎ, এত দিন পর রোমেলার প্রাক্তন প্রেমিকের প্রসঙ্গ কেন আসলো?

৪৫

সামি বাড়ি ফিরল রাত দশটায়। ততক্ষণে দুই বান্ধবীর কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে। কিছু বাকি আছে এখনো। যেগুলো কোনোভাবেই আজ রাতের ভেতর শেষ করা সম্ভব না। বিভার এর মাঝেই হাতে পায়ে ঝিম ধরে গেছে একটানা কাজ করতে গিয়ে। সামি বান্ধবীদের নিয়ে নিজের ঘরে এলো। তার বেডরুমটা বিশাল। সাধারণত ব্যাচেলার ছেলেদের ঘর যেরকম অগোছালো থাকে এই ঘরটা সেরকম নয়। সামি ঘর থেকে বেরোলেই চাকর বাকররা এসে ঘর ধুয়ে মুছে পরিপাটি করে রেখে যায়। তবে তার ঘরে খুব বেশি আসবাব নেই। এমনকি একটা ড্রেসিং টেবিল পর্যন্ত নেই। সারা ঘরের দেয়াল জুড়ে দেশি বিদেশি মিউজিক ব্যান্ড দলের পোস্টার ঠাসা। বিয়ে উপলক্ষে ঘরের আসবাব পরিবর্তন করা হবে। বিভা অনেকক্ষণ যাবৎ কী ধরনের আসবাব কেনা উচিত, কোত্থেকে কেনা উচিত তা নিয়ে সামিকে জ্ঞান দিল। তিন বন্ধু মিলে অনলাইন ঘেঁটে সিদ্ধান্ত নিল কোন ফটোগ্রাফারকে ভাড়া করা হবে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য। অনুষ্ঠানে একটি গানের দল এবং একটি নাচের দল আসবে। সেই দল নির্বাচন করার ভার দেওয়া হয়েছে রুদ্রর ওপর। ঠিক করা হলো বরপক্ষ এবং কনেপক্ষ প্রবেশের সময় আলাদা আলাদা বাজনা বাজবে। এসব নিয়ে আলোচনা

করতে গিয়ে বেশ কিছু সময় কেটে গেলো। রাত এগারোটার দিকে বিভা আলোচনায় ইতি টেনে উঠে দাঁড়ালো, 'বাসায় যাইতে হবে। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

– 'আজকে থাইকা যা।' সামি বলল।

– 'না থাকতে পারব না। কালকে খুব সকালে চেম্বারে যাইতে হবে। কাজ আছে। বাসায় গিয়ে কাজ করতে হবে।' আপত্তি জানালো অমৃতা।

– 'চল, নামায় দিয়ে আসি তোদের।'

– 'না থাক। তুই টায়ার্ড। আমরা উবার ডাকতেছি।'

– 'শিওর?'

– 'শিওর।'

দুই বান্ধবী ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় পেছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল সামি। দাঁড়ালো ওরা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সামির হাতে একটি সরু লম্বা কাগজ। বিভার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'যাবার সময় এটা বাবাকে একটু দিয়ে যাস তো। বাবা নিচেই আছে। স্টাডিরুমে মনে হয়। আমার দোস্ত টায়ার্ড লাগতেছে। নিচে নামতে ইচ্ছা করতেছে না।'

বিভা কাগজটা হাতে নিয়ে একটু অবাক গলায় বলল, 'কী এটা?'

– 'লিস্ট।'

– ‘কীসের লিস্ট?’

– ‘বাবা ইউ এস এ যাচ্ছে আমার বিয়ের পরদিন। আমার জন্য কী কী আনতে হবে তার লিস্ট। এখন না দিলে আমি পরে আবার ভুলে যাব।’

– ‘এত কিছু! হৃদির জন্য কিছু লিখিস নাই?’

– ‘ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল কিছু লাগবে না। আর আমি কী লিখব? মেয়েদের জিনিস অত চিনি নাকি?’

বিভা আর কথা বাড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কাগজটা অমৃতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘যা তুই দিয়ে আয়। আমি ওয়েট করতেছি। বেশি দেরি করিস না।’ অমৃতা একটু আড়ষ্টভাবে কাগজটা তুলে নিল হাতে। ঈষৎ মুচকি হাসল। সৃষ্টিকর্তা মাঝে মাঝে এমনি করেই মানুষের মনের চাওয়া পূরণ করে দেন। মুখ ফুটে চাইতে হয় না তার কাছে। মনের আকুতি নিজ গতিতেই পথ খুঁজে খুঁজে ছুটে যায় বিশ্ববিধাতার দরবারে।

দরজায় দুবার করাঘাত করল অমৃতা।

–’ কে?’

– ‘আমি।’

ওপাশে শব্দ নেই কোনো। বেশ খানিকক্ষণ পর শব্দটা ছুটে আসলো, ‘এসো।’

ঘরের ভেতরে ল্যাম্পশেডের মসৃণ হলুদাভ আলো জ্বলছে। এয়ার কন্ডিশনের বাতাসে ঘরটা বেশ ঠান্ডা। রাশেদ টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসে ছিলেন। অমৃতাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তাকালেন তিনি। অমৃতা হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সামি দিয়েছে।'

তিনি হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ।' অমৃতা চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বলল –'কতদিনের জন্য যাচ্ছেন?'

– 'কোথায়?' ডান কনুই টেবিলের ওপর রেখে চিবুকে হাত দিয়ে গাঢ় চোখে দেখছিলেন তিনি অমৃতাকে।

– 'ইউ এস এ?'

– 'ও, এক মাস।'

অমৃতার চোখদুটোতে হালকা অভিমান ভেসে উঠল, 'এতদিন!' রাশেদ হাসলেন, 'খুব বেশিদিন কি?'

– 'বেশিদিন নয়?'

– 'নাহ··· খুব বেশিদিন নয়। তোমার কিছু চাই?'

– 'আমার?'

– 'হুম··· কিছু লাগবে? মোবাইল, ল্যাপটপ বা অন্য যে কোনো জিনিস। কসমেটিক্স ..অবশ্য তুমি অন্য মেয়েদের মতো কসমেটিক্স ফ্রিক নও বলেই আমার ধারণা।'

অমৃতা বক্র হাসে, ‘আমিও কি লিস্ট করে দেবো?’

– ‘নিশ্চয়ই।’

কথাটা বলে রাশেদ একটি কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল অমৃতার দিকে। কিছুক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবল অমৃতা। তারপর কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে তরতর করে লিখে ফেলল অনেক কিছু। লেখা শেষ করে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ‘নিয়ে এসেন মনে করে।’

–’ শিওর!’

– ‘আর ওই মেয়েটা আপনার অত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল কেন?’ থমথমে গলায় প্রশ্ন করে অমৃতা।

রাশেদ ভীষণ অবাক!

– ‘কার কথা বলছ?’

– ‘আপনার অফিসের মেয়েটা।’

অমৃতা কথাটা শেষ করতেই তিনি হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। মনে হলো যেন অনেক অনেকদিন পর তিনি এরকম প্রাণ খুলে হাসতে পারলেন। অমৃতা হাসিটা পাত্তা না দিয়ে রাগ রাগ গলায় বলল, ‘ক্যান আই গিভ ইউ আ লিটেল পিস অব এডভাইজ? মেয়েদের অত কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। বুঝেছেন?’ রাশেদ কোনো কথা বলতে পারলেন না। হাসতেই থাকলেন। অমৃতা সেদিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে

থেকে একটা বড় শ্বাস ফেলল। এই হাসির দিকে আরও কিছুক্ষণ একটানা চেয়ে থাকলে ভালো লাগায় তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে মৃদু গলায় বলল, ‘যাই!’

অমৃতা চলে যাবার পর রাশেদ ছেলের দেওয়া লিস্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর ছেলে প্রযুক্তি ভালোবাসে। প্রতিবার বিদেশ যাত্রার সময় একগাদা ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসের তালিকা ধরিয়ে দেয় সে বাবার হাতে। রোমেলাও প্রতিবার লিস্ট বানাতে ভুলেন না। এবারেও একটি লিস্ট করে দিয়েছেন তিনি। কসমেটিকস, ব্যাগ, শ্যাম্পু, জুয়েলারি এমনই সব শৌখিন জিনিসে ঠাঁসা সেই লিস্ট। সামির দেওয়া লিস্টটা সামনে থেকে সরিয়ে তিনি অমৃতার লেখা কাগজটা মেলে ধরলেন সম্মুখে। পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো পূর্ণব্যাদিত হয়ে উঠল, মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের গাঢ় রেখা! অমৃতা লিখেছে,

লিস্ট:

১/রাশেদ

২/রাশেদ

৩/রাশেদ

৪/রাশেদ

৫/রাশেদ

৬/রাশেদ

৭/রাশেদ

৮/ রাশেদ

তালিকাভুক্ত জিনিসপাতি আমার জন্য নিয়ে আসতে ভুলবেন না কিন্তু!

৪৬

বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় খুব দ্রুত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হলো। পরিবর্তিত পরিকল্পনা দুপক্ষের সম্মতিক্রমেই নেয়া হয়েছে। তবে কনেপক্ষের জন্য এই নতুন সিদ্ধান্তটি হাসিমুখে মেনে নেয়া একটু কষ্টকর হয়ে উঠল। হক সাহেবের ফুপুর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ডাক্তার তাঁকে এক মাস সময় বেঁধে দিয়েছেন। এ কদিন তিনি ভাতিজার বাসায়ই থাকবেন। গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে ভিড় জমানো শুরু করেছে এর মাঝেই। ফুপু ভাতিজার কাছে আবদার করেছেন যে নাতবৌকে যেন এই যাত্রায়ই বাড়ি তুলে আনা হয়। তাঁর বড়ই শখ জীবনের শেষ কয়েকটা দিন তিনি নতুন বৌয়ের সঙ্গে এক ছাদের নিচে কাটাবেন। একমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী ফুপুর উপরোধে হক সাহেবকে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনতেই হলো। এদিকে হৃদির আব্বার আপাতত মেয়ে বিদায় করার কোনো প্ল্যান ছিল না। আরো কয়েকমাস পর ধুমধামের সাথে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। এর মাঝে বরযাত্রীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে। সামিদের গ্রামের বাড়ি থেকে আসা আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতি এখন আর এড়ানো যাবে না বিয়ের অনুষ্ঠানে। এত লোক হৃদিদের পনেরোশ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে কোনো মতেই আঁটবে না। নিরুপায় হয়ে বাড়ির কাছের একটা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করলেন হৃদির বাবা। ঢাকা শহরে মোটামুটি ভালো মানের কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে অনেক আগে থেকে বুকিং দিয়ে রাখতে হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো আগামী দু তিনমাসের মধ্যে কোনো শুক্রবারেই এদের কোনোটি ফাঁকা নেই। অগত্যা বাড়ির কাছের অতি সাধারণ সেন্টারটাই একমাত্র ভরসার স্থান হয়ে দাঁড়ালো। হক সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকা থেকে ফেরার পর ধুমধাম করে বউভাতের অনুষ্ঠান করবেন। রাজনৈতিক লোকজন থেকে শুরু করে দাপ্তরিক এবং মিডিয়ার লোকজন কেউই বাদ পড়বে না সেই যাত্রায়।

বিয়ের আগের রাতে হৃদির এক ফোঁটা ঘুম হলো না। একই অবস্থা হলো সামিরও। আপাতত মা তার সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। ছেলের জীবনের এমন একটি বিশেষ সময়ে মায়ের মুখ কেন যে অমন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের আকাশের মতো থমথমে

কালো হয়ে আছে সর্বক্ষণ সেই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? এই একটি প্রশ্নই সামির ভেতরের সমস্ত শিহরণ, উত্তেজনা, এবং আনন্দকে থেঁতলে একদম ভোঁতা বানিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবুও এ কথা সত্যি··· কাল থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ভোরবেলা চোখ মেলতেই সে হৃদিকে দেখতে পাবে নিজের পাশে, এই ভাবনাটা ভাবতেই শরীর মন এক স্নিগ্ধ আবেশে ডুবে যাচ্ছে, রক্তকণিকায় এসে লাগছে উষ্ণ ঝাপ্টা। কাল থেকে শুরু হবে তার ইচ্ছে জীবন। যে জীবনে ইচ্ছে হলেই ডুয়ার্সের সেই সন্ধ্যাবেলার মেয়েটিকে কাছে পাওয়া যায়। নিজের করে নেয়া যায়!

হৃদির দুশ্চিন্তা অন্যরকম। এত দ্রুত নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবার কোনো মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না। সে ধরেই নিয়েছিল আরো সাত আট মাস নিশ্চিন্তে এ বাড়িতে কাটাতে পারবে, বাবা মায়ের সাথে। তাই এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত বদলটা তাকে বেশ নাড়া দিয়ে গেছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে সে। কারণে অকারণে বুক মোচড় দিয়ে উঠছে। মায়ের দিকে তাকালে চোখ ভরে আসছে জলে। বাবার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন নিজের এতদিনের ভীষণ আপন আর পুরনো জীবনের খোলস খুলে রেখে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনে জোরপূর্বক পা রাখতে হচ্ছে তার। অথচ সে তো বিভার মতো দেশান্তরী হচ্ছে না। ঢাকা শহরেই তার শ্বশুরবাড়ি। যখন ইচ্ছে তখন বাবা মায়ের কাছে ছুটে আসতে পারবে। বন্ধুদের দেখতে পাবে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যে মানুষটা তার জীবনসঙ্গী হতে যাচ্ছে সেই মানুষটা তার কাছে একেবারেই নতুন বা অচেনা কেউ নয়। সে তার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। এর চেয়ে বড় স্বস্তির বিষয় আর কী হতে পারে? তবুও সব কিছু সজ্ঞানে উপলব্ধি করার পরেও তার বুকের ভেতরটা কোনো এক অজানা কারণে খানিক বাদে বাদে কম্পান্বিত হয়ে উঠছে। হাঁসফাঁস লাগছে। তবে এই নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ একটি সুতীব্র সুখস্পর্শ বিদ্যুতের মতো চিলিক দিয়ে যাচ্ছে মেরুদণ্ড দিয়ে। ভালোলাগার ভোমরাটা মস্তিষ্কের এবড়োখেবড়ো, উতরোল মুখর শিরা উপশিরার ফাঁক গেলে গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে আবছাভাবে। আল্লাহ তাআলার অসীম কৃপায় শেষ পর্যন্ত সে তার পছন্দের মানুষটিকে পেতে যাচ্ছে সারা জীবনের জন্য! কজনে পায়? বিভা পায়নি। অমৃতাটা তো পাগল। নিজ হাতে নিজের

সর্বনাশের ডালা সাজাচ্ছে পাগলিটা। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে হৃদি সত্যই, ভীষণ ভাগ্যবতী!

ভাবতে গিয়ে অবাক লাগে হৃদির। মানুষের জীবন আসলে বড় বেশি অদ্ভুত, অবিদিত এবং কখনো কখনো বিস্ময়কর! সামির সাথে প্রেম ছিল বিভার, বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তানিশার, কিন্তু শেষ অবধি তাকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য পেয়ে গেলো হৃদিতা। পেয়েছে কি সত্যই? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে সে। ভেতর থেকে আরেকটা হৃদি সহাস্যে বলে ওঠে, 'পেয়েছ, পেয়েছ, সে তোমার, শুধুই তোমার!'

৪৭

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ভার অনেকখানিই রুদ্র আর আকাশের ওপর পড়েছে। দুই বন্ধু বিয়ের দিন ভোর বেলা থেকে লেগে গেছে কাজে। বাসরঘর আর বরের গাড়ি সাজানোর জন্য লোক ভাড়া করে আনা হয়েছে। কাজের তদারক করছে রুদ্র। আকাশ সকালবেলা ছুটে গেছে কমিউনিটি সেন্টারে। সেখানে স্টেজের সাজসজ্জার পালা চলছে। হৃদির আব্বাও সেখানে উপস্থিত আছেন। বাবুর্চি রান্নাবান্নার প্রক্রিয়া দেখাশোনা করছেন তিনি।

বিভা আর অমৃতা হৃদির সাথে পার্লারে গেলো দুপুর দুটায়। হৃদির লেহেঙ্গাটা হালকা বেগুনি রঙের। সারা গায়ে পাথর আর সুতোর ভারি কাজ করা। দাম লক্ষ টাকার ওপরে। ওজন এত বেশি যে জিনিসটা গায়ে চাপানোর পর মনে হতে লাগল লোহা জুড়ে দেওয়া হয়েছে শরীরের সঙ্গে। নিশ্বাস নেয়া দায়! অমৃতার শাড়ি পরার কোনো ইচ্ছে ছিল না এবারে। কিন্তু হৃদির জোরাজুরিতে তাকে পরতেই হলো। কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তার নিজস্ব কোনো শাড়ির কালেকশন নেই। মায়ের শাড়ি পরা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্লাউজের মাপ নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে। শেষমেশ বিভার কাছ থেকেই একটা শাড়ি ধার করে পরল। জলপাই রঙের কাতান বালুচরি। জীবনে এই প্রথমবার পার্লারে

সাজলো সে। খুব ভয়ে ভয়ে। না জানি কোন সং এর মতো সাজিয়ে দেবে তাকে! সাজ শেষ হবার পর ভীত বক্ষ নিয়ে চোখ মেলে দেখল সে আয়নার ভেতর নিজের মুখটা। পিলে চমকে উঠল 1 আর্ত গলায় করে উঠল স্বগতোক্তি, 'আল্লাহ! কী ভয়ংকর!'

বিভা ওর পাশেই বসা ছিল। একটি পাতলা গড়নের পাহাড়ি মেয়ে যত্নের সাথে তার চোখ সাজাচ্ছিল। অমৃতার আর্তনাদ শুনে মেয়েটির হাত থেমে গেলো। বিভা তার ডাগর দুটি চোখ মেলে দেখল পাশে বসা অমৃতাকে। ওমা, কী সুন্দর লাগছে! বলে কিনা ভয়ংকর দেখাচ্ছে। ধমকে উঠল বিভা, 'খুবই সুন্দর লাগতেছে। একদম চুপ করে থাক।' অমৃতা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অসম্ভব আমি এখনই মুখ ধুয়ে আসতেছি। এই জবরজং সাজ আমি রাখবই না।'

বিভা আকুলি বিকুলি হয়ে বলল, 'দোস্ত প্লিজ।'

অমৃতা নিজের সিদ্ধান্তে অটল, 'ইম্পসিবল!'

বিভাকে দেখে মনে হলো সে এখুনি কেঁদে দেবে, 'দোস্ত পায়ে পড়ি! পায়ে পড়ি তোর!'

– 'চুপ থাক। খুব বেশি পায়ে পড়তে শিখছিস আজকাল।'

– 'আচ্ছা হৃদির কাছে যা। ওর ওপিনিয়নটা নে এটলিস্ট।'

হৃদি আছে ব্রাইডাল মেকআপ রুমে। সেই রুম বিশাল বড়। সারি বেঁধে বসেছে সব বিয়ের কনেরা। উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে ভেতরে। নানা বয়সী মেয়েদের কোলাহলে সরগরম চারপাশ। তবে হেয়ার ড্রায়ারের শো শো শব্দে অনেকটাই ঢাকা পড়েছে তাদের কণ্ঠস্বর। বাতাসে উড়ছে নানা রকম প্রসাধনের কড়া ঘ্রাণ। এতগুলো বৌয়ের মধ্যে হৃদিতাকে খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল অমৃতার। অবশেষে একদম কোণার একটি আসনে ব্লাউজ আর লেহেঙ্গা পরা হৃদিকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখা গেলো। তার দুটি হাত রাজকীয় ভঙ্গিতে দুদিকে প্রসারিত। চোখ বোজা। দুইজন মেয়ে দুই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মেহেদী পরাচ্ছে তার হাতে। তৃতীয় জন মুখ সাজাচ্ছে অখণ্ড মনোযোগের সাথে। অমৃতা ওর পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, ‘এই হৃদি!’

– ‘হুম’

– ‘চোখ খোল, এদিকে তাকা!’

সাজানোতে ব্যস্ত মেয়েটি হাত থামালো। হৃদি চোখের পাতা টেনে ধরে তাকালো অমৃতার দিকে। চকিতে এক মুগ্ধতার আবেশে ভরে উঠল তার মুখ

– ‘ও আল্লাহ! কী সুন্দর লাগতেছে তোকে!’

– ‘পুরা ভূত সাজায় দিছে আমাকে।’

– ‘মোটেও না।’

– ‘আমি ধুয়ে ফেলতেছি মুখ।’

– ‘প্লিজ দোস্ত না।’

– ‘প্লিজ প্লিজ করিস না। টাকা খরচ করে এরকম সং সাজার কোনো মানে হয় না।
’

– ‘এই বেশি কথা বলবি না। আমার বিয়ে। আজকে আমার হুকুম চলবে।’

– ধুর।’

– ‘কোনো ধুর না। তোর সাজ একদম ঠিক আছে।’

অমৃতা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। কী আর বলবে সে? আজকে মহারাণীর বিয়ে। তার হুকুম চলবে!

– ‘ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখিস। শুধু তোর জন্য আজকে ভূত সাজলাম।’

– ‘ভূত নারে, শাড়িতে তোকে অনেক হট লাগে।’ বলে এক চোখ টিপলো হৃদি। সত্যই তো, অমৃতার শরীরটা যেন শাড়ির জন্যেই যত্নে গড়া। সবচেয়ে সুন্দর তার কোমরের বাঁকখানি। এরকম নিখুঁত দেহ সৌষ্ঠব সচরাচর চোখে পড়ে না তো!

বিভা পরেছে সাদা জমিন আর রুপালি পাড়ের কাতান শাড়ি। গলায় কানে রুপোর জুয়েলারি। খোঁপায় সাদা গ্ল্যাডিওলাস ফুল। কপালে লাল টিপ, সিঁথিভর্তি সিঁদুর। তার রূপ বরাবরের মতোই চোখ ধাঁধানো, গ্ল্যামারাস। হৃদিতার সাজ শেষ হতে হতে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বেজে গেলো। পুরোদস্তুর বৌ সেজে সে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, দুই বান্ধবীর চোখ তখন ঝাপসা!

জল ভরা চকচকে চোখে হাসল বিভা,

– ‘আমাদের সামির বৌ’ টা কী সুন্দর!’

অমৃতা পায়ে পায়ে হেঁটে এসে আচমকা জড়িয়ে ধরল হৃদিকে। ওই ভারি গহনাওয়ালা জবরজং বৌ সাজের ওপর দিয়েই। আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, ‘অনেক সুন্দর লাগতেছে দোস্ত তোকে। মাশআল্লাহ!’

৪৮

সামির ঘরটা কাঁচা ফুলের সুগন্ধে ভরে আছে। খাট সাজানো হয়েছে লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ আর বেগুনি অর্কিড দিয়ে। বরের শেরওয়ানির রং অফ হোয়াইট। সারা গায়ে অফ হোয়াইট সুতোর কাজ করা। সামির ইচ্ছে ছিল কালো কেনার কিন্তু তার হবু শাশুড়ি বাধ সেধেছেন। শাশুড়ি আম্মার মতে কালো একটি অশুভ রং। বিয়ের মতো শুভকাজে অশুভ রঙের পোশাক কোনো মতেই পরা যাবে না। শেরওয়ানির গলার কাছে একটি স্বর্ণ রঙের চেইন লটকানো আছে। সামি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে চেইনটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠিক পেছনে আকাশ আর রুদ্র ইয়া বড় পাগড়ির বাক্সটা খোলার চেষ্টায় রত। দুই বন্ধুর মুখে ঝকঝকে

হাসি। মনে হচ্ছে পাগড়ি জিনিসটা এই মুহূর্তে তাদের জন্য নিষ্কলুষ আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাগড়ির মতো মজার জিনিস আর দ্বিতীয়টি নেই ভুবনে!

সামি গোল্ডেন কালারের চেইনটার দিকে চোখ রেখেই ক্যাটক্যাটে গলায়, বন্ধুদের বলল, 'এই মালাটা কি কোনোভাবে খোলা যায়? বিরক্ত লাগতেছে। আমি কি মেয়ে নাকি? আমার কাপড়ে মালা ঝুলাইছে ক্যান?'

রুদ্র বলল, 'ঠিকই আছে। এটা স্টাইল। বেশ রাজা রাজা একটা লুক আসছে।'

সামি ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর হাতে ধরা পাগড়িটার দিকে চেয়ে গোঁয়ার গলায় বলল, 'এই কিম্ভূত জিনিসটা আমি মাথায় পরব না।'

– 'তুই পরবি না? তাহলে আমি পরি দোস্ত? আমার বেশ পছন্দ হইছে জিনিসটা। ' আকাশ আবদার করল গালভর্তি হাসি নিয়ে। কথাটা বলতে বলতেই পাগড়িটা নিজের মাথায় চড়িয়ে দিয়েছিল সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নড়ে চড়ে, ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখছিল। সামি বলল, 'হ্যাঁ তুইই পর, তোরে মানাইছে।'

রুদ্র ডালা থেকে জুতো জোড়া বের করল। নৌকোর মতো লম্বা নাগ্রা। সামির এই জিনিসটাও পছন্দ না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বর সাজা একটি অত্যন্ত কঠিন এবং পীড়াজনক কাজ। রুদ্র নাগ্রা দুটো হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। হালকা চালে দুলে দুলে গাইতে লাগল গান।

এমন মজা হয়না

গায়ে সোনার গয়না

আকাশও যোগ দিল। পাগড়ি পরা অবস্থায়ই হাত পা ছুঁড়ে গানের তালে তালে নাচতে লাগল সে।

এমন মজা হয় না
গায়ে সোনার গয়না
সামিউল হকের বিয়ে হবে
বাজবে কত বাজনা!

দুই বন্ধুতে মনের সুখে গান গেয়ে গেয়ে নাচলো বেশ খানিকক্ষণ। সামি বিরক্ত মিশ্রিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল শুধু।

দরজা নাড়ছিল কেউ। রুদ্র নাচ থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দরজাটা খুলল। সামির বাবা মা দাঁড়িয়ে আছেন। রুদ্র সরে দাঁড়াতেই তারা ভেতরে ঢুকলেন। সামি বাবা মাকে দেখে ছেলেমানুষি গলায় বলল, 'পাগড়ি পরব না আমি!'

রোমেলা শেরওয়ানি পরা ছেলেকে একবার আগাগোড়া দেখে দিয়ে সহাস্যে বললেন, 'কেন? বিয়ের বর পাগড়ি পরবে না, এটা কেমন কথা?'

– 'না না খ্যাৎ লাগে।' এরপর নিজের গায়ে পরা জামার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এইসব সোনা গয়না খুলে দাও তো মা।'

হক এগিয়ে এসে ছেলের কাঁধে দু হাত রেখে নিজের দিকে ফেরালেন। ভালো মতো ছেলেকে পরখ করে নিয়ে বললেন, 'কেন, ভালো দেখাচ্ছে তো, একদম পারফেক্ট!'

– 'না ভালো দেখাচ্ছে না।' গোঁয়ার গলায় বলল সামি।

– 'আচ্ছা দেখি কী করা যায়।' বলে তিনি মনোযোগ দিয়ে ছেলের জামায় লাগানো চেইনটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আকাশের মাথায় পাগড়ি দেখে রোমেলা বিস্মিত গলায় বললেন, 'তুমি কেন পরেছ এটা?'

আকাশ নির্বিকার গলায় বলল, 'সামি পরবে না। আমাকে দিয়ে দিছে।'

রোমেলা কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বরের জিনিস বরকেই পরতে দিতে হয়।'

হক বললেন, 'পাগড়ি পরবে না কেন? বিয়ের একটা দিনেই তো এসব পরে মানুষ, তাই না?'

– 'তুমি পরেছিলে বাবা? তোমার বিয়েতে?' সামি প্রশ্ন করে।

– 'হ্যাঁ পরেছিলাম তো, তুমি ছবি দেখোনি?

– ‘মনে নেই।’

রোমেলা বাবা আর ছেলেকে স্নিগ্ধ চোখে দেখছিলেন। তাঁর ছেলেটা কত্ত বড় হয়ে গেলো! ছেলে দেখতে হয়েছে বাবার মতোই সুন্দর। তবে গায়ের রং বাবার চাইতে অনেক বেশি ফর্সা। যদিও উচ্চতায় বাবাকে ছুঁতে পারেনি সে। হক ছেলের থেকেও দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা। কী ভালো যে লাগছে দুজনকে একসাথে দেখতে! তার বুকটা এক পরিপূর্ণ তৃপ্তিময় নিশ্বাসে টলমল করে ওঠে। আজ যদি নিজের মনের সাধ মিটিয়ে পছন্দ মতো একটা বৌ আনতে পারতেন ছেলের জন্য তাহলে এ জীবনের সর্বসুখ পাওয়া হয়ে যেত। এমন সোনার টুকরো ছেলেটাকে যাদু টোনা করে হাতিয়ে নিচ্ছে এক কপর্দকশূন্য, নিম্নশ্রেণির পরিবার। এই অন্যায় তাকে চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। এসব ভেবে ক্ষণে ক্ষণে রোমেলার বুক ভার হয়ে আসছে। রাগে রিরি করছে শরীর। এদিকে মরার ওপর খরার ঘা হয়ে এসে জুটেছে ফুপু শাশুড়ি। এই বুড়িকে দেখতে প্রতিদিন গ্রাম থেকে ছুটে আসছে দূরের কাছের নানা আত্মীয়স্বজন। এই বাড়িটা যেন এক লঙ্গরখানা। বিয়েতে তিনি নিজের পরিবারের মানুষজনদের খুব একটা বলেননি। শুধু বোনরাই আসছে। কিন্তু এই দুদিনে শ্বশুরবাড়ির গ্রাম্য আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে গেছে। যাচ্ছেতাই অবস্থা একেবারে। অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন তিনি মনে মনে। এই ভীষণ রকমের অশান্তি কাটিয়ে তোলার জন্য আগামী সপ্তাহেই নিজের দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকক বেড়াতে যাচ্ছেন। আর ভালো লাগছে না এসব। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চান তিনি এবারে।

শেষমেশ শেরওয়ানির চেইনটা খোলা গেলো। সামি স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে ভারি সুন্দর হাসল, ‘থ্যাংকস বাবা! ইউ আর গ্রেট! তুমি সব পারো!’

৪৯

সাড়ে সাতটার দিকে সান্ধ্যকালীন রাস্তার ভয়াবহ জ্যাম ঠেলে বিয়ের কনেকে নিয়ে কমিউনিটি সেন্টারে প্রবেশ করল বিভা আর অমৃতা। হৃদির বাবা মা, ভাই আর আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই এর মাঝে চলে এসেছে। বরপক্ষ এসে পৌঁছয়নি। কাজী সাহেবও উপস্থিত হননি এখনো। বৌকে প্রথমেই স্টেজে বসানো হলো না। নিয়ে যাওয়া হলো ড্রেসিংরুমে। এই হলরুমটা খুব বেশি বড় নয়। সাজসজ্জাও সাধারণ। টেনেটুনে একশ মানুষ আঁটানো যায়। মঞ্চ সাজানো হয়েছে সাদা আর সোনালি রঙের আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়ে। মঞ্চের সামনে অল্প একটু জায়গা খালি রেখে চল্লিশটার মতো চেয়ার সারিবদ্ধভাবে রাখা। চেয়ারগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গোল গোল বেশ কিছু টেবিল। টেবিল ঢাকা পরিচ্ছন্ন সাদা চাদরে। প্লেট গ্লাস পরিপাটি করে সাজানো। কয়েকজন অতিথি এর মাঝেই টেবিল দখল ফেলেছে।

ড্রেসিংরুমের মাঝামাঝি জায়গায় একটা সোফা রাখা। তার পাশেই ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা কাঠের চেয়ার। কোণায় টেবিল ফ্যান। ঘুরছে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে। একটা বেসিন আছে পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে। সাথে চওড়া আয়না। হৃদি সোফায় বসে ছিল। শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছে না। দুপুরে কিছুই খেতে পারেনি সে। উত্তেজনায় গলা দিয়ে খাবার ঢুকছিল না। এখন মনে হচ্ছে একটু খিদে খিদে পেয়েছে।

– 'তোর কি শরীর খারাপ লাগতেছে?' হৃদির সিঁথি থেকে কিঞ্চিৎ সরে যাওয়া টিকলিটা ঠিক করে দিতে দিতে বিভা প্রশ্ন করল।

– 'কিছু খাওয়া যাবে এখন?'

– ‘খাওয়া যাবে না কেন? তোর খিদে পেয়েছে?’

– ‘হুম।

– ‘আচ্ছা দাঁড়া দেখতেছি।’

হৃদির কাজিন দুজনের একজন বলল, ‘আপু আপনি বসেন, আমরা কিছু নিয়ে আসি।
’

– ‘রান্না তো হয়ে গেছে। অল্প একটু পোলাও আর মাংস নিয়ে এসো যদি পারো।
’

– ‘ঠিক আছে।’

মেয়ে দুজন ছুটে গেলো খাবার যোগাড় করতে। অমৃতা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরটা একতলায়। জানালা দিয়ে সমতলে বাইরের ঝলমলে বৈদ্যুতিক আলোকময় সন্ধ্যাটা দেখা যাচ্ছে। এই বিল্ডিংটা রাস্তার একদম ধার ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পার্কিং আন্ডারগ্রাউন্ডে। গাড়ি বিল্ডিঙের সামনে আসতেই লোকজন গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। যাত্রী নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে পাতাল ঘরে। অমৃতার চোখ রাখা ছিল দূরে। একটু আনমনা ভাব কাজ করছে তার মধ্যে। বিভা হেঁটে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী দেখিস?’

– ‘দেখি না, ভাবি।’

– ‘কী ভাবিস?’

– ‘ভাবতেছি হৃদির শাশুড়িকে কীভাবে একটু টাইট দেওয়া যায়।’

বিভা ফিক করে হেসে ফেলল, ‘হঠাৎ এই ভাবনা?’

অমৃতা চাপা গলায় বলল, ‘ওই বেটি এখন পর্যন্ত হৃদির বাপ মায়ের সাথে কোনো কথা বলে নাই জানিস? আন্টি, মানে হৃদির আম্মা খুব চিন্তিত এই ব্যাপারে। আমাকে একটু আগেই বলতেছিল।’

‘কী বলতেছিল?’ হৃদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল উদ্বিগ্ন গলায়।

– ‘থাক, তোর এসব শুনতে হবে না এখন। তুই চিন্তা করিস না। তোর শাশুড়ি ঠিক হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধর শুধু।’

– ‘মনে হয় না ঠিক হবে। ডেঞ্জারাস মহিলা।’ আফসোস নিয়ে বলল হৃদি।

– ‘ঠিক হতেই হবে। ফাজলামো নাকি? সামি করে কী? নিজের মাকে দিয়ে একটা ফোন করাইতে পারে নাই শাশুড়ির কাছে?

বিভা ফোড়ন কাটল, ‘থাক, উনি ফোন না করলে কিছু হবে না। সামির আব্বা তো ঠিক আছে। উনিই আসল।’

– 'তোর মাথা। কালকে সকালেই উনি চলে যাবে আমেরিকা। তারপর ওই ডাইনি বুড়ির সাথে একা একা আমার সারাদিন থাকতে হবে। আল্লাহ! চিন্তা করেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার।' হৃদি বলল আক্ষেপের সুরে।

– 'একা কেন হবে? সামি আছে না? চিন্তা করিস না তুই।' কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলো অমৃতা। চোখ আটকে গেলো জানালার বাইরে। গেটের সামনে একটা পাজেরো গাড়ি এসে থেমেছে। গাড়িটা অমৃতার চেনা। মিনিট না গড়াতেই গাড়ি থেকে নামলেন মানুষটা। সাদা পাঞ্জাবি তার পরনে। অমৃতার গলার স্বর মুহূর্তে পাল্টে গেলো।

– 'ওয়াও, দ্যাখ না আমার উনাকে কী সুন্দর লাগতেছে!' হৃদি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল, 'কার কথা বলিস?'

উত্তরটা বিভা দিল, 'তোর শ্বশুর আসছে।'

অমৃতা তখন মুগ্ধ, বিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানরহিত!

বিভা বলল, 'থাক ওরকম হা করে তাকায় থাকিস না, গাধী!'

– 'আহ, একটু দেখতে দে! গাইজ, লুক অ্যাট হিজ জ' লাইন। হট কিন্তু!'

হৃদি ধমকে উঠল, 'এইসব ফাইজলামির কোনো মানে হয় না। লোকটা আমার শ্বশুর, সামির বাবা আর আমার শাশুড়ির হাজবেন্ড।'

অমৃতা ঘুরে তাকালো, ‘তাতে কী?’

– ‘অন্যের বরের দিকে এভাবে তাকায় থাকতে হয় না। এসব ভালো না।’

অমৃতা কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল হৃদির দিকে। তার চোখে একটু অবিশ্বাসের ছাপ

– ‘আজকে হঠাৎ এত চেতলি যে?’

– ‘চেতব না কেন? ওই বাড়ির সাথে আমার একটা সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। এখন ওটা আমারও ফ্যামিলি। আমার ফ্যামিলির ভালো মন্দতো আমাকে দেখতেই হবে।’

অমৃতা অস্ফুটে বলে, ‘ওয়াও!’

হৃদির সুন্দর সাজওয়ালা মুখটা রাগে একটু থমথম করছিল। সে গজগজ করে বলল, ‘লিমিট ক্রস করা উচিত না। সব কিছুর একটা সীমা আছে।’

– ‘শোন হৃদি, আমি জানি যে লোকটা তোর শ্বশুর, সামির বাবা এবং তোর শাশুড়ির বর। কিন্তু আমি এটাও জানি যে, এই সবকিছুর ভেতরে যে সত্যিকারের মানুষটা, সেই মানুষটা আমার। শুধুই আমার!’

কথাগুলো দাঁতে দাঁত ঘষে বলে শেষ করে, নিজের পক্ষে নিজেই রায় দিয়ে, বেরিয়ে পড়ল অমৃতা।

বিভা হৃদির কাছে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাদ দে দোস্ত। ঐটা একটা পাগল।'

– 'পাগলামির একটা সীমা আছে বিভা!'

– 'একটা জিনিস ভেবে দ্যাখ, এইযে তোর বিয়ে হচ্ছে আজ এত সুন্দর করে। এর পেছনে কিন্তু পাগলটার অনেক অবদান আছে। অন্তত এটা ভেবে আজ ওকে ক্ষমা করে দে। ভুলে যা সব। আজকে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাব। আজ শুধুই তোর দিন। '

– 'হুম!' অনেক কষ্টে রাগটাকে গিলল হৃদি।

– 'বাট হিজ জ লাইন দোস্ত! রিয়েলি শাপ!'

– 'ফাইজলামি করতে মানা করছি না?' হৃদির গলা দিয়ে আগুন ঝরল। সেই আগুন দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল বিভা।

একটু বাদে হৃদির জন্য ছোট একটি প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসা হলো। বিভা হাত ধুয়ে নিয়ে ঝোল দিয়ে মেখে কয়েক লোকমা পোলাও খাইয়ে দিল হৃদিকে। অনেক যত্ন করে সকতর্কতার সাথে সাজগোজ বাঁচিয়ে।

৫০

বরপক্ষ আসতেই ছেলেমেয়েরা হৈহৈ করে ছুটে গেলো গেট ধরতে। হৃদির ছোট ভাই হৃদয় আর অন্যান্য অল্পবয়সী কাজিনদের সাথে অমৃতা আর বিভাও যোগ দিল। আজকে তারা সামির বন্ধু নয়, শালি। গেট ধরার টাকায় তাদের ভাগ চাই ষোলো আনা। ভিডিও ক্যামেরার আলো জ্বলছে সামনে। হইচই হট্টগোলে ভরে আছে চারপাশ। হৃদির দুজন মেয়ে কাজিন একটি লম্বা লাল ফিতে বর আর বরের বন্ধুদের সামনে আড়াআড়ি ভাবে ধরে রেখেছে। ফিতের সামনে হৃদয় দাঁড়িয়ে আছে হাতে কাঁচি নিয়ে। বাচ্চাকাচ্চাদের ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতেই বরবেশে সামিকে দেখতে পেলো অমৃতা আর বিভা। ওর দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ আর রুদ্র। সামির মাথায় পাগড়ি নেই, পাগড়ি আছে আকাশের মাথায়। বিভা সামিকে দেখেই দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে 'দুলাভাই!' বলে একটা চিৎকার দিল।

অমৃতা উঁচু গলায় বলল, 'বর কোনটা? পাগড়িওয়ালাটা নাকি পাগড়ি ছাড়াটা?'

বিভা যোগ করলো, 'বর যেহেতু দুজন সেজেছে, সেহেতু আমরা গেট ধরবো দুবার। দুজনকেই টাকা দিতে হবে।'

বাচ্চাকাচ্চা বাহিনী ষাট হাজার টাকা ডিমান্ড করেছে। দরাদরি চলল অনেকক্ষণ। শেষ অবধি পঞ্চাশে গিয়ে নিষ্পত্তি হলো মামলা। চকচকে নগদ টাকার বান্ডিল তুলে দেওয়া হলো বাচ্চাদের হাতে। বর ঢুকলো ভেতরে, তার পেছন পেছন ঢুকল বেশ বড়সড় একটা দল।

আকাশ ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরেছিল একটা। তার সাথে মেরুন রঙের পাগড়িতে ভালোই মানিয়েছে ওকে। অমৃতা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোকে তো পাগড়িতে মানাইছে। তোরও একটা বিয়ে দিয়ে দেই। কী বলিস?'

আকাশ সশব্দে বলে উঠল –'আমারও মনে চাচ্ছে একটা বিয়ে করি বুঝছিস? বিয়ে করলে কত মজা, পাগড়ি পরা যায়, কত কত গিফট পাওয়া যায়! শুধু তাই না, বৌও পাওয়া যায়! জোশ না ব্যাপারটা?'

– 'অমৃতা শোন!' হঠাৎ ডাকলো রুদ্র, পেছন থেকে। ওর গায়ে বাদামি পাঞ্জাবি। চুলে ঝুঁটি বাঁধা। গালের দাড়ি কামানো। বেশ পরিপাটি একটা ভাব।

– 'হ্যাঁ বল!'

রুদ্র ভিড়ের মধ্যে তার ক্যাটস আই মণি খচিত দুটো চোখ নিয়ে অপলক অমৃতার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বলল, 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে শাড়িতে!' বলেই আবার সঙ্গেসঙ্গে চোখেমুখে এক অদ্ভুত মুদ্রা ফুটিয়ে তুলল, 'তেল মারলাম একটু, অত ফুলিস না!

– 'যা ভাগ!'

– 'হ্যাঁ ভাগতেছি। মনীষারে আনতে যাইতেছি।'

– ‘যা!’ শব্দটা উচ্চারণ করে ঘুরে দাঁড়াতেই হঠাৎ একটা লম্বা মানুষের সাথে ধাক্কা লেগে গেলো অমৃতার। নাকে সুন্দর ঘ্রাণ এসে বাড়ি খেলো। চোখের খুব কাছে সে আবিষ্কার করল একটা সাদা পাঞ্জাবি আর একটা প্রিয় মুখ! ধক করে উঠল বুক। মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক চ– কারান্ত শব্দ উচ্চারণ করে উঠলেন তিনি। অমৃতা কাঁপা হৃৎপিণ্ড নিয়ে দেখল লোকটার সাদা পাঞ্জাবির হাতায় তার ঠোঁটের লাল রং লেগে গেছে, দুর্ঘটনা বশত। রাগে লোকটার কপালের রগ ফুলে গেছে। কটমটে চোখে একবার তাকালেন তিনি অমৃতার দিকে। দুরুদুরু বুক নিয়ে অমৃতা বলল, ‘স্যরি!’ লিপস্টিকের রং লোকটাকে বড়ই বিব্রত করে তুলেছে। তিনি তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন ড্রেসিংরুমের দিকে। অমৃতাও ছুটল তার পেছন পেছন।

স্টেজে হৃদি বসে আছে বৌ সেজে। তার পরনে হালকা বেগুনি লেহেঙ্গা। গলায় বাবার দেওয়া স্বর্ণের অলংকার। শ্বশুরের দেওয়া হীরের সেট। মাথায় টিকলি আর ঝাপ্টা। নাকে হীরের নাকফুল, ইয়া বড় একটা নথ। হাত ভর্তি সোনার চুরি। তাকে দেখাচ্ছে পরির মতো সুন্দর। সামি ধীরে ধীরে স্টেজে উঠে আসলো। বসলো হৃদির পাশে। চারদিকে চেনা অচেনা মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন কোলাহল। তার কেমন ঘোর ঘোর লাগছে! স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে! সে আড়চোখে পাশে বসা হৃদিকে একবার দেখল। আজকালকার মেয়েরা সাধারণত বিয়ের দিন লজ্জা টজ্জা পায় না। কিন্তু হৃদিকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জা পাচ্ছে। তার মুখ অবনত। চোখ ভাসা ভাসা। সামি বুকের মাঝে একটা অদ্ভুত শিহরণ টের পাচ্ছে। ভালো লাগছে তার। এত বেশি ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ! দীর্ঘ

হৃদিকে স্টেজে বউ সেজে বসে থাকতে দেখে আকাশ আর রুদ্র ‘ভাবি ইইইই!’ বলে ছুটে আসলো নাচতে নাচতে।

৫১

ড্রেসিংরুমটা দৈবক্রমে খালি ছিল। তিন চারটা টিউব লাইট জ্বলছে চারপাশ আলোকিত করে। রাশেদ ঘরে ঢুকেই কালবিলম্ব না করে বেসিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবির হাতায় লালচে রঙের ছোপ। কী বিচ্ছিরি অবস্থা! অমৃতা পায়ে পায়ে প্রবেশ করল ঘরে। দরজা লক করল সন্তর্পণে।

– 'আরে করছেন কী? এভাবে হবে নাতো! পুরো পাঞ্জাবি ভিজে যাবে আপনার।' মুরুব্বিয়ানা গলায় বলল অমৃতা

তিনি গম্ভীর একটা দৃষ্টি অমৃতার দিকে তাক করে সরোষে গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি? তুমি এখানে এসেছ কেন?'

– 'আপনার হেল্প করতে আসলাম।'

– 'হেল্প লাগবে না আমার। তুমি যাও।' বলে তিনি বেসিনের কল ছেড়ে দুহাতের অঞ্জলি ভরে পানি নিতে লাগলেন। তারপর সেই পানি ছিটিয়ে দিতে গেলেন পাঞ্জাবির হাতে। অমৃতা ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসলো, ইশ রাশেদ! পানি দিয়েন না, বলছি তো আপনার পুরো জামা ভিজে যাবে। লেট মি হ্যান্ডেল ইট।'

রাশেদ তাকালেন একবার অমৃতার দিকে। আঁজলা ভর্তি পানি ছেড়ে দিলেন ধীরে ধীরে বেসিনে। জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঝুলিতে থাকলেও কাপড় থেকে দাগ তোলা সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর আজ অবধি হয়ে ওঠেনি। এসব বাড়ির কাজের লোকেরাই তো করে! মা বেঁচে থাকতে মা করতেন। রোমেলার তো এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেই হয় না।

অমৃতা চট করে কয়েকটা টিস্যু তুলে নিল টিস্যু বক্স থেকে। বেসিনে লিকুইড হ্যান্ড সোপ রাখা ছিল। একটু সাবান মাখিয়ে নিল সে টিস্যুতে। ভিজিয়ে নিল জলে, হালকাভাবে। মৃদু গলায় বলল, 'দেখি!'

তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন একটু অস্বস্তি নিয়ে। মুখখানা এক অটল গাম্ভীর্যে ভরপুর। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত। অমৃতা কাছে এগিয়ে গেলো। নাকে এসে লাগল সুন্দর একটা ঘ্রাণ। আফটার শেভের হবে হয়তো। হাত কাঁপছিল আলতো। কাঁপা হাতেই টিস্যু দিয়ে পাঞ্জাবির রং লাগা জায়গাটা মুছে দিতে লাগল সে। লোকটার উষ্ণ নিশ্বাস এসে পড়ছিল ওর কপালে। একটা নেশাড়ু ভালোলাগায় ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছিল হাওয়া। বুকের খাঁচায় বড্ড দাপাদাপি! আচ্ছা, এই মানুষটার সাথে কি তার আগে··· বহু আগে··· কোনো রকমের চেনা জানা ছিল? অন্য কোনো জন্মে? বা অন্য কোনো পৃথিবীতে? কেন মনে হয় মানুষটা তার অনেক আপন··· অনেক কাছের···আর অনেক বেশি ভরসার?

– 'আমি ইচ্ছে করে করিনি। বিশ্বাস করুন!' চোখ নিচের দিকে নামিয়ে রেখেই বলল সে।

– 'হুম।' বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। নজর রাখলেন খুব কাছে দাঁড়ানো মেয়েটির অবনত মুখের ওপর। ওর চোখে বেশ রংচং মাখা। ভ্রুযুগলের মাঝখানে একটা কালো টিপ। টেবিল ফ্যানের বাতাসে উড়ছে কপালের কাছে পড়ে থাকা ছোট ছোট কয়েকটা চুল। হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো মেয়েটা। চোখে চোখ পড়তেই হৃদয়ের আনাচে কানাচে জ্বলে উঠল যেন একশ ভোল্টের আলো। লম্বাটে ছাঁচের মুখ, কাজল কালো দুটি চোখ, টিকলো নাক··· পাতলা জোড়া ঠোঁট! মনে হলো··· এই মুখটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে পবিত্র! এরকম মনে হতে নেই··· বড্ড অসময় এখন!

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। তার কপালের ভাঁজটা ফিরে আসলো আবার।

– ‘কাল আপনার ফ্লাইট কখন?’

– ‘দুপুর বারোটা।’ মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেই উত্তর দিলেন তিনি। অমৃতা তাঁর ধারালো চোয়ালটার ওপর দৃষ্টি ফেলে বলল, –’শেভ করেছেন?’ তিনি উত্তর দিলেন না। ভ্রু কুঁচকে নিজের পাঞ্জাবির হাতার দিকে তাকালেন একবার। দাগ অনেকখানি গেছে। কিন্তু পুরোপুরি নয়। অমৃতা আবার নতুন করে টিস্যু নিল, ভিজিয়ে নিল। এগিয়ে আসলো।

– ‘একমাস থাকবেন?’ দাগ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করল অমৃতা।

– ‘হুম।’

– ‘সময়টা একটু কমানো যায় না?’

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন তিনি, ‘এসব কথা কেন বলছ?’

প্রশ্নের ধরনে একটু কেঁপে ওঠে অমৃতা। অভিমানও হয় হালকা। তবুও গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলে, ‘কেন বলছি আপনি বোঝেন না?

– ‘না বুঝি না।’

– ‘যাবার আগে, আরেকবার দেখা হবে?’

– ‘জানি না!’

– ‘আমার লিস্টটা পড়ে দেখেছিলেন?’

লোকটার গলার স্বর আগের চাইতেও কঠোর হয়ে গেলো, ‘দেখেছি। এসব কী লিখেছ তুমি?’

অমৃতা ফিক করে হেসে দিল। দাগ উঠে গেছে তখন। একটু ভিজে গেছে জায়গাটা।

– ‘আপনিই তো বলেছিলেন আমি যা চাই তা লিখে দিতে।’

– ‘সব কিছু নিয়ে ফাজলামো করা ভালো না অমৃতা।’

সেই সময় পাঞ্জাবির পকেটে ফোনটা বেজে উঠল। তিনি ফোন ধরে কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন, ‘হ্যাঁ আসছি।’ ফোন বন্ধ করে ‘চল যাই’ ‘বলে পা বাড়ালেন তিনি। অমৃতা ফট করে পেছন থেকে তাঁর একটা হাত ধরে ফেলে একগুঁয়ে গলায় বলল, ‘ফাজলামো বললেন কেন? আপনার কাছে ফাজলামো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা?’

তিনি হাত ছাড়িয়ে নিলেন, 'হ্যাঁ মনে হচ্ছে।' অমৃতার চোখে বিষণ্ণতা ভর করল, 'সত্যি?'

– 'কেন এরকম করছ?'

– 'আপনি কেন এরকম করছেন? খুব ভালো মতোই জানেন আমি কতটা সিরিয়াসলি লিস্টটা করেছি। জেনেও কেন ফাইজলামি বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন বিষয়টাকে?'

তিনি চুপ করে রইলেন।

– 'আপনার তো কোনো অভাব নেই। কত্ত টাকা! দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন। তবুও আমি যা চাই তা আপনি আমাকে দিতে পারবেন না? সেই ক্ষমতাই আপনার নেই, তাই না? দেখলেন তো, টাকা দিয়ে সব কেনা যায় না!'

রাশেদ একটু দ্বিধা নিয়ে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। তাঁর ভাবনার খাতায় এই মাত্র একটি পৃষ্ঠা বদল হলো। সত্যই তো, সারাটা জীবন ভর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি বিত্তশালী হওয়ার জন্য, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। ক্ষমতার পেছনে ছুটেছেন নাওয়া খাওয়া ভুলে। অথচ আজকে এই মেয়েটা যা চায় তা দেবার মতো কোন সামর্থ্যই তাঁর নেই! আশ্চর্য! আজ তাঁর সব আছে, তবুও যেন কী একটা শূন্যতা! কোথায় যেন কীসের একটা অপূর্ণতা! সেই অপূর্ণতাটুকুকে পূর্ণ করার সাহস, শক্তি বা যোগ্যতা কোনোটাই তাঁর ঘটে নেই।

– ‘আপনি আমাকে একটুও মিস করবেন না?

– ‘অমৃতা, দুষ্টুমি করো না।’

– ‘করবেন না?’ কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমৃতা

– না!’

- ‘সত্যি?’

– ‘সত্যি।’

– ‘মিথ্যে কথা। আই নো, ইউ উইল মিস মি।’

– ‘আই ও’ ন্ট।’

বলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন।

– ‘রাশেদ! আমি মিস করব আপনাকে! সব সময় করি!’

তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাকালেন এক ঝলক। গভীর দুটি চোখে গাঢ় এক বিষণ্নতা ভর করল ক্ষণিকের জন্য। কী যেন একটা বলতে গিয়ে মুখ খুললেন। থেমে গেলেন আবার। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন।

৫২

কাজী সাহেবের গালে মেহেদী রাঙানো লাল দাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। তার গা থেকে ভুরভুর করে উড়ে আসছে আতরের ঘ্রাণ। তাকে ঘিরে বসেছেন বর কনের বাবা মা এবং দুপক্ষের মুরুব্বিরা। বরের মাথায় সাদা টুপি। কনের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। আলাদা একটা ওড়না দিয়ে তার মুখে লম্বা ঘোমটা টানা হয়েছে। উপস্থিত অন্যান্য পুরুষদের মাথায়ও টুপি। মেয়েদের মাথায় শাড়ির আঁচল অথবা ওড়না। বন্ধুরা স্টেজের সামনে দাঁড়িয়েছে। ফটোগ্রাফার এবং ভিডিও ক্যামেরা ম্যানের দাপটে অবশ্য এই স্থানটিতে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। ভিড় লেগে গেছে। উকিল বাপ হয়েছেন হৃদির মেজো চাচা। তিনি কাবিন নামার শর্ত সমূহ জোরে জোরে একবার পড়লেন সবার সামনে। দেন মোহর নব্বই লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর মাঝে গয়নাগাটি বাবদ উশুল পঞ্চাশ লক্ষ।

প্রথমে কনের সম্মতি নেয়া হলো। বন্ধুদের খুব শখ ছিল ‘কবুল ‘বলাটা নিজের কানে শুনবে। কিন্তু এত লোকজন আর হই হট্টগোলের মাঝে হৃদির বেড়ালের মতো মিউমিউ স্বরে ‘কবুল’ উচ্চারণ করাটা শুধু মাত্র কাজী সাহেব ব্যতীত অন্য কেউ ঠিকঠাক শুনতে পেল না একটিবারের জন্যেও। হৃদি খুব কাঁদছিল। কান্নার কারণ সম্পর্কে সে শতভাগ সুনিশ্চিত নয়। এই অশ্রু সুখের নাকি দুঃখের, তা কে জানে! জীবন নামের নকশায় সূচনা এবং সমাপ্তি, এই দুই ভিন্ন রেখা আজ এই শুভলগ্নে একটি মাত্র বিন্দুতে মিলিত হতে যাচ্ছে। সমাপ্তি ঘটছে তার বাবা মায়ের ছায়া সুনিবিড় আশ্রয় তলে গড়ে ওঠা শৈশবের কৈশোরের তারুণ্যের একান্ত নিজের স্বাধীন ছোট্ট আমি ময় জীবনটার। বিপরীত প্রান্তে সূচনা হচ্ছে দায়িত্ব কর্তব্য এবং বাস্তবতায়

জড়ানো সাংসারিক জীবনের এক পরিণত অধ্যায়। গত হওয়া ঝামেলাবিহীন, চিন্তামুক্ত ঝরঝরে দিনগুলি ফেলে আসার দুঃখ আর অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের অনিশ্চয়তার উদ্বেগ, এই দুইয়ে মিলেমিশে তার সমস্ত সত্তা এক অদম্য, মাত্রাহীন অভিশংকায় থরথর করে কাঁপছে!

পাশের চেয়ারে বসে থাকা হৃদিতার কান্না মিশ্রিত মুখখানা টের পেয়ে সামি ভেতরে ভেতরে একটা চাপ অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে প্রকৃত অর্থে কোনো গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছে। যে মেয়েটিকে সে সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রেখে সারা জীবনের জন্য নিজের করে নিতে চলেছে, সেই মেয়েটির সমস্ত দায়ভার আজ থেকে শুধু তার ওপরেই বর্তাবে। এই দায়ভার সে কোনোভাবেই অন্য কারো ওপর অর্পণ করতে পারবে না, বাবার ওপরে নয়, মায়ের ওপরেও নয়। আজকের পর থেকে তাকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল, পরিণত পুরুষ হতে হবে!

কনের সম্মতি নেবার পর কাজী সাহেব বরের সম্মতি নিলেন। বিয়ের পাত্রপাত্রী কাবিন নামায় দস্তখত করল। দস্তখত করল দুই পক্ষের সাক্ষীরা। বিয়ে সম্পন্ন হবার পর উপস্থিত অতিথিদেরকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো বরকে। সামিকে এ সময় একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তার কানের ডগা লাল। কপালে ভাঁজ। মনে হচ্ছে বিয়ে করে সে মস্ত কাজ সেরে ফেলেছে। বেশ ভারিক্কি ভাব তার চোখের চাউনিতে। কাজী সাহেব সালামের আদেশ দেওয়ার পর মিনিট দুয়েক সময় সে চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল। যেন কাজী সাহেবের কথা তার কানেই যায়নি। ছেলেকে নড়তে চড়তে না দেখে হক একটু উঁচু গলায় বললেন, ‘আব্বু! উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দাও সবাইকে!’ বাবার কথাটা তার কানে ঢুকল। বিচলিতভাবে উঠে দাঁড়ালো সে। চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে তাক করে হাত তুলে একটা লম্বা সালাম দিল সবাইকে। ওদিকে বরের সালাম দেওয়ার ধরন দেখে বন্ধুরা সব হেসে গড়িয়ে পড়ছে তখন। বন্ধুদের হাসি দেখে বরের ফর্সা গাল টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করল।

এরপর মোনাজাতের পালা। কাজী সাহেব উপস্থিত সবাইকে দরূদ শরীফ, সুরা ফাতিহা এবং চার কুল পড়তে বললেন। সকলেই পড়ল। সেই সময়টায় কিছুক্ষণের জন্য লোকজনের ফিসফাস কথা আর গুনগুন গুঞ্জন উধাও হয়ে ঝুপ করে পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছিল। বিভা মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল চারপাশটা। কলমা পড়ে কবুল বলতে পারেনি বলেই সামির সাথে তার বিয়েটা হয়নি। এ সমাজের কাছে মনের মিল গৌণ, সংস্কারের মিলটাই মুখ্য! মোনাজাতের পর বর কনের সামনে টেবিল পেতে বিভিন্ন মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হলো। দলে দলে আত্মীয়স্বজনরা স্টেজে উঠতে লাগল। বিয়ের পাত্র পাত্রীকে মিষ্টিমুখ করাতে লাগল। ছবি তুলতে লাগল। বন্ধুরা স্টেজের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মনীষা আসতে পারেনি। আজ সকাল থেকেই তার একটু জ্বর জ্বর ভাব। মুখে রুচি নেই। আসতে পারবে না বলে রুদ্রর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে সে। বন্ধুদের ঠিক পেছনেই রোমেলা তার বোনদের নিয়ে বসে আছেন। চারপাশে অনেক শব্দ, অনেক কোলাহল। এত হৈ-হুল্লোড়ের মাঝেও স্পষ্ট ভাবে কিছু কথা কানে এসে লাগল ওদের। কোনো এক নারীকণ্ঠ বলছে, 'জীবনেও ভাবি নাই বুবু, আমাদের সামির বিয়ে এরকম সিম্পলভাবে হবে। এই হলটার ডেকোরেশন এত বাজে! ছিঃ–

রোমেলাকে বলতে শোনা গেলো, 'এই ফ্যামিলির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করাই তো বোকামি। আমি জানতাম এরকম কিছুই হবে। কী আর করা, সবই আমার কপাল!'

বন্ধুরা কথাগুলো শুনল। একজন আরেকজনের দিকে তাকালো সতর্কভাবে। চুপ করে রইল। কিন্তু হজম করতে পারল না খুব সহজে। বুকের মধ্যে কাঁটার মতো কথাগুলো বিঁধে রইল অনেকক্ষণ। আধা ঘণ্টা পরে বন্ধুদল অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলেঠুলে উপনীত হলো মঞ্চে। আকাশ, রুদ্র গিয়ে বসলো বরের পাশে, বিভা আর অমৃতা বসলো কনের পাশে। দুই তিনজন ফটোগ্রাফার স্টেজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যামেরায় ক্লিক করে যাচ্ছে একের পর এক। হৃদি মুখে জোরপূর্বক একটি হাসি ঝুলিয়ে রেখে,

ক্যামেরার দিকে চেয়ে থেকে অনেকটা ফিসফিস করে বলল, ‘হাসতে হাসতে আমার গাল ব্যথা হয়ে গেছে। আর কত ছবি তুলব? আর কত হাসব?’

বিভা ক্যামেরাম্যানদের দিকে মুখ তাক করে রেখেই বলল, ‘আরো অনেকক্ষণ। আজকের দিনের মডেল হইলা তুমি। তোমাকে ননস্টপ পোজ দিতে হবে।’

ওদিকে সামি রুদ্রর কানে কানে বলছে, ‘কাহিনি কী? অনেকেই দেখি খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিছে। আমাদের খাওয়া দিবে না?

– ‘বর সবার লাস্টে খায়।’

– ‘কেন? আমার তো খিদা লাগছে।’

– ‘কিছু করার নাই। আগে গেস্টরা খাবে তারপর তোরা।’

– ‘কেন ভাই? বিয়া কইরা কি দোষ কইরা ফেললাম? কেন এই অবিচার?

সুযোগ বুঝে অমৃতা সামির চেয়ারের সামনে উবু-হাঁটু হয়ে বসল।

‘দুলাভাইইইই, দেখি তো!’ বলে ভারি যত্নের সাথে সে বরের পা থেকে জুতো দুটো খুলে নিল সন্তর্পণে। চুরিটা সবার প্রথমে আবিষ্কার করল আকাশ, ‘আরে আরে! জুতা নিয়ে যাচ্ছে তো! ধর ধর!’

অমৃতা ততক্ষণে জুতো হস্তান্তর করে দিয়েছে হৃদয়ের কাছে। হৃদয় জুতোজোড়া হাতে নিয়েই দিয়েছে ভোঁ দৌড়। রুদ্র আর আকাশ পড়িমরি করে ছুট লাগালো জুতোচোরের পেছনে। অমৃতা আর বিভা গালভর্তি হাসি নিয়ে হাত তুলে হাইফাইভ দিল একজন আরেকজনকে। বিভা তৃপ্তির সাথে বলল, 'মিশন কমপ্লিট। আয় এখন একটু শান্তিমতো ফটোসেশন করি।'

সামি উৎকণ্ঠা নিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, 'আমার জুতা নিয়ে কোথায় গেলো?'

– 'পালাইছে। এখন টাকা না দিলে তুই জুতা ফেরৎ পাবি না।' বিভার উত্তর।

ক্যামেরাম্যানরা খুব বিরক্ত করছে। একজন চেঁচিয়ে উঠে সামিকে বলল, 'ভাইয়া এদিকে একটু তাকান!'

সামি স্টেজে বসে থেকেই খ্যাঁক দিয়ে উঠল, 'চুপ করেন ভাই! দেখছেন না আমার জুতা চুরি হয়ে গেছে? সিরিয়াস একটা ব্যাপার। জুতা ছাড়া আমি বাসায় যাব কীভাবে?'

অতিথিরা খাবার টেবিলের দিকে ভিড় জমাচ্ছে ধীরে ধীরে। স্টেজের সামনে এখন তেমন মানুষ নেই। দুজন ফটোগ্রাফার এবং একজন ভিডিও ক্যামেরাম্যান দাঁড়ানো। ফটোগ্রাফার দুজন এতক্ষণে বুঝে গেছে যে ছবি তোলায় বর কনের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ছবিটবি তোলার চাইতে নিজেদের মাঝে কথা বলাটাই এদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফটোগ্রাফাররা তাই এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারাও নিজেদের মাঝে কথা বলছে। কাজ করতে হচ্ছে না। বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা যাচ্ছে। এইতো ভালো।

একটু বাদে রুদ্র আর আকাশ হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসলো। বিপন্ন গলায় বলল, ‘জুতো তো পাওয়া গেলো না।’

– ‘এখন কী হবে?’ সামিকে দেখে মনে হলো তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

অমৃতা আর বিভা সমস্বরে বলে উঠল, ‘টাকা দিতে হবে!

সামি কিছু বলে ওঠার আগেই আকাশ আর রুদ্র একদম লাফ দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, ‘অসম্ভব! গেট দিয়া ঢুকার সময় একবার জ্বালাইছস। কতগুলা টাকা দিছি। এখন মরে গেলেও আর দিব না!’

অমৃতা তারিয়ে তারিয়ে বলল, ‘তাহলে বরকে খালি পায়ে বাড়ি ফিরতে হবে।’

– ‘বরকে প্রয়োজনে কোলে করে বাড়ি নিয়ে যাব তাও তোদের একটা পয়সা দিব না।’ বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা দিল আকাশ।

– ‘তাহলে আমরাও ভাবির জুতা চুরি করব। আমাদেরও পয়সা দিতে হবে।’ রুদ্রর কথা শুনে বিভা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। কোমর বেঁধে লেগে গেলো ঝগড়ায়, ‘তোরা কে এসব বলার? হু দ্যা হেল আর ইউ? আমাদের দুলাভাই আমাদের টাকা দিবে!’

রুদ্র সামির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, ‘ওই তোর শালিরা কী বলে এইসব?’

সামির মুখে এখন একটু একটু দুষ্টু হাসি। বোঝা যাচ্ছে দুই পক্ষের ঝগড়াটা বেশ উপভোগ করছে সে। তাকে হাসতে দেখে আকাশ তারস্বরে বলল, 'হাসলে তো হবে না। শালিদের দিতে হবে গালি··· তবেই পড়বে মুখে চুনকালি!

– 'তুই চুপ করে আছিস কেন? তুই কি চাস না আমরা কয়টা টাকা পাই? জুতাজোড়া চুরি করতে কত কষ্ট হইছে আমাদের জানিস?' ফুঁসে উঠে বলল বিভা, হৃদিকে।

হৃদি মুখ টিপে হাসতে লাগল। গোটা মঞ্চ এখন দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। মেয়েপক্ষ ভিড় করেছে বৌয়ের চেয়ারের পাশে, আর ছেলেপক্ষ জামাইয়ের চেয়ারের পাশে। সব মিলিয়ে দশ বারোজন ছেলেমেয়ে হবে। বর কনে বাদে বাকিরা সব দাঁড়িয়েই আছে।

অমৃতা কোমরে হাত রেখে একদম ওকালতির গলায় আকাশকে বলল, 'শালি জাতিকে অপমান করে এইমাত্র তুই কী বললি? আবার বল তো?'

আকাশ বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'শালিদের দিতে হবে গালি, তবেই পড়বে মুখে চুনকালি!'

এই কথা শুনে বরপক্ষের ছোটখাটো দলটা খুশিতে আটখানা হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। রুদ্র দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে উঁচু গলায় সুর করে চ্যাঁচাল, 'শা —-লি, খায় গা-লিইইইইইই!'

রুদ্রর দেখাদেখি বরপক্ষের বাকি ছেলেমেয়েরাও চিৎকার করে বলতে লাগল তালে তালে সুরে সুরে –’শালি, খায় গালি!’

অমৃতা হাত তুলে থামালো সবকটাকে, ‘থামো থামো, এবার আমাদের বলতে দাও। ’ একটু থেমে একটা শ্বাস নিল সে। তারপর রুদ্রর সুর নকল করেই ছড়াগানের মতো বলল, ‘দেবর, খায় থাপ্পড়।’

ব্যস, এবার কনেপক্ষর ছেলেমেয়েরা গলা ফাটিয়ে গাইতে লাগল, ‘দে ...বর খায় থাপ্পড়!’

বিভা এর সাথে যোগ করল, ‘দে – ব – র··· হয় বান্দর!’

জামাই বৌ দুজনে খুব হাসছিল। এর মাঝেই সামি সাহসের সাথে টুপ করে ধরে ফেলেছে হৃদির হাত। দুজনের চোখে মুখে এখন নিখাদ আনন্দের প্রতিফলন। আহা আজকের দিনটা যেন সত্য নয়, এ যেন আকাশ থেকে খসে পড়া ঝিলিক দেওয়া তারার মতো এক জ্বলজ্যান্ত স্বপ্ন!

– ‘আরে থামো থামো!’ আকাশ আদেশ দিল ছেলেমেয়েদের। সঙ্গে সঙ্গে থামল না অবশ্য কেউ। চেঁচামেচি একটু কমে আসার পর আকাশ বলল, ‘এভাবে হবে না। একটা কম্পিটিশন করা হোক। যে পক্ষ জিতবে, জুতা তার।’

বিভার গলা চড়ল সপ্তমে, ‘জুতা তো অলরেডি আমাদের! এখন তোরা টাকা দিলেই ঝামেলা শেষ।’

সামি গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, ‘কত টাকা চাস?’

বিভা এই প্রশ্ন শুনে অমৃতার কানে কানে কিছু একটা বলল। অমৃতা, হৃদয়সহ বাকি ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে দলবদ্ধভাবে আলোচনা করল মিনিট দুয়েক সময়। তারপর বেশ ভারিক্কি চালে রায় দিল, ‘পঞ্চাশ হাজার!’

– ‘কী??? এতওওওওওও টাকা!’

আকাশ আর রুদ্র পারলে জীবন্ত চিবিয়ে খায় অমৃতাকে। মনে হচ্ছে রাগে ওরা দুজন অন্ধ হয়ে যাবে। বরপক্ষের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তারাও কী যেন শলাপরামর্শ করল গোল হয়ে। এদিকে হৃদয় অমৃতা আর বিভাকে আশ্বস্ত করল, জুতো সে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যে চিরুনি অভিযান চালালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

– ‘আমরা একটা গেইম খেলব। সেই গেইমে যদি তোমরা জিতো, তাহলেই তোমরা টাকা পাবা। হেরে গেলে জুতা বিনা পয়সায় ফেরত দিবা। ডিল!’ সমস্ত আলোচনার রাশ টানলো রুদ্র।

অমৃতা প্রতিবাদ করে উঠল, ‘কী আজব আমরা কষ্ট করে খেলতে যাব কেন? জুতা তো অলরেডি আমাদের হেফাজতে আছে। তোমরা টাকা দিয়ে ছাড়ায় নাও, নাইলে বরকে ন্যাংটা পায়ে হাঁটাও। আমাদের কী? আমরা কেন খেলতে যাব?’

– ‘ভীতুর ডিম!’ বরপক্ষর ভিড় থেকে কে যেন ছুঁড়ে দিল কথাটা।

--'হেরে যাবার ভয়ে খেলছে না।' আরেকজন বলল।

বিভা মুখ ঝামটা মেরে হৃদিকে বলল, 'এই তোর দেবরগুলার সমস্যা কী? টাকা দিবে তোর বর, কিন্তু টাকার দুঃখে মরে যাচ্ছে দে-বর, কাহিনি কী মামা?'

রুদ্র এক অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করল, 'ওই সামির বাচ্চা, তোর শালিগুলা এত ভীতু কেন? হারার ভয়ে খেলতে চায় না কেন?'

– 'আমরা মোটেও ভীতু না। এসহোল!' দাঁতে দাঁত চিবিয়ে গাল দিল অমৃতা।

হঠাৎ বিভা বলল, 'ওকে ফাইন। কী খেলবি বল।'

– 'কুইজ কম্পিটিশন হবে।' রুদ্র বলল।

– 'ফালতু... এটা কি আমরা স্টাডি ট্যুরে আসছি নাকি? বাচ্চাদের মতো কুইজ করব কেন?' বিভা আপত্তি জানালো।

অমৃতাও সায় দিল, 'ঠিকই তো স্টাডি ট্যুর না এইটা, বিয়েবাড়ি। আর কোনো আইডিয়া নাই? ক্লীশে যত্তসব।'

– 'তাই না? তাহলে তোমরাই বল কী খেলা যায়? ক্রিকেট খেলতে চাও? শাড়ি পইরা ক্রিকেট খেলতে মনে চাইতেছে খুব?'

অমৃতা কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে আকাশপাতাল ভেবে নিয়ে বলল, ‘গানের কলি খেলা যায়।’

– ‘বাহ কুইজ কম্পিটিশন ক্লীশে আর গানের কলি কী? খ্যাৎ কতগুলা।’ বলল রুদ্র, কিন্তু দেখা গেলো উভয় পক্ষের ছেলেমেয়েদের কুইজের চাইতে গানে বেশি আগ্রহ। ততক্ষণে অনুষ্ঠানে গানের দল চলে এসেছে। এরা রুদ্রর বন্ধু। বুয়েটে পড়াকালীন সময়ে এই ব্যান্ডের সাথে রুদ্র বেশ কিছুদিন ভোকাল হিসেবে কাজ করেছে। ঠিক হলো গানের কলিই খেলা হবে। তবে যে গান গাইবে তাকে গানের দলের সাথে দাঁড়িয়ে ইন্সট্রুমেন্টের সাথে গাইতে হবে। বাংলা গান ছাড়া অন্য কোনো ভাষার গান চলবে না এবং অবশ্যই গানের প্রথম প্যারাটা সম্পূর্ণ গাইতে হবে।

কোন পক্ষ আগে গান গাইবে তা নিয়ে অবশ্যম্ভাবী বিবাদটা প্রাথমিক পর্যায়েই নিষ্পত্তি লাভ করল। রুদ্র ঘোষণা দিল, প্রথমে সে নিজেই শুরু করবে। অর্থাৎ বরপক্ষর দান প্রথমে। স্টেজের সম্মুখ ভাগ থেকে মিষ্টান্ন পরিবেশনের টেবিলটা সরানো হয়েছে। জামাই বৌয়ের রাজকীয় চেয়ারের পাশে বেশ কিছু সাধারণ চেয়ার জায়গা করে নিয়েছে। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে ছেলেমেয়েরা। প্রতি দলে আছে ছয়জন সদস্য। হৃদির পাশে অমৃতা আর বিভা বসেছে দল নিয়ে। আর সামির পাশে আকাশ এবং দল। রুদ্র গান গাইবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অনবরত ‘হ্যালো হ্যালো’ বলে মাইক পরীক্ষা করছে। স্টেজের পাশেই গান বাজনার সব ইনস্ট্রুমেন্ট সেট করা হয়েছে। গানের দলের সদস্য পাঁচজন। একজন ড্রামার, একজন কীবোর্ডিস্ট, দুজন গিটারিস্ট এবং একজন ভোকাল।

অতিথিদের খাওয়া দাওয়ার পালা চলছে এখনো। প্রথম ব্যাচ শেষ হবার পর দ্বিতীয় ব্যাচ চলছে। হৃদির আব্বা আম্মা অতিথি আপ্যায়নে মহা ব্যস্ত। এদিকটায় তারা আসতেই পারছেন না, সময়ের অভাবে। অবশ্য হৃদির বন্ধুরা উপস্থিত আছে বলে

আপাতত মঞ্চের এই দিকটা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথাও নেই। মেয়ের বন্ধুরাই এসব ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে যথার্থ পারদর্শী, এটা তারা জানেন।

মঞ্চের সম্মুখের চেয়ারগুলো একটাও খালি নেই। সাজগোজ করা, নানা বয়সী নারী পুরুষ বসে আছে। সকলের চোখ এখন গানের দলের দিকে। এর মাঝেই ভিডিও ক্যামেরাম্যান লাইট আর ক্যামেরা নিয়ে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিডিও করছে। আলো ফেলছে। কেউ কেউ বিরক্ত হচ্ছে আবার কেউ কেউ ক্যামেরা সামনে এলে আগ্রহের সাথে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছে।

রুদ্রর চুল গুলো ঘাড়ের ওপর এলো করে খোলা। গান গাওয়ার আগে তার চোখে মুখে একটা আচ্ছন্ন ভাব চলে আসে। সেই মুহূর্তে তাকে দেখায় ধ্যানমগ্ন কোনো ঋষির মতো। বাজনা বাজতে শুরু করেছে। চোখ বন্ধ করে মিউজিকের তালে তালে ডান হাতের পাঁচ আঙুল নাচাচ্ছে সে মাইক্রোফোনের শরীরে।

অমৃতা ফিসফিস করে হৃদয় অর্থাৎ হৃদির ছোট ভাইয়ের কানে কানে বলল, 'আমাদের গ্রুপে ভালো গান গাইতে পারে কে?'

হৃদয় ঠোঁট উল্টে আমতা আমতা করে বলল, 'কেউই তেমন ভালো গাইতে পারে না।
'

– 'ইশ, কী মুশকিল হলো। ওদের দলে তো রুদ্র আছে। ও একাই একশ।'

– 'রুদ্র ভাইয়া ছাড়াও আরো একজন গায়িকা আছে। ঐযে সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটা। সামি ভাইয়ার খালাতো বোন। ওই মেয়েটা খুব ভালো গান করে। ইনস্টাগ্রামে দেখেছি

আমি।’ জ্ঞানী জ্ঞানী গলায় তথ্যটা দিয়ে হৃদয় সবুজ শাড়ি পরিহিতা মেয়েটির দিকে পলক তুলে তাকালো। মেয়েটি বসে আছে আকাশের পাশে। বয়স উনিশ কি বিশ হবে। গোলগাল ফর্সা মুখ। খুঁতনিতে একটা ডিম্পল আছে।

– ‘ইনস্টাগ্রামে তুই ওকে ফলো করিস নাকি?’

রোগা লম্বা শরীরে ঢলঢলে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা, সদ্য গোঁফ ওঠা হৃদয় বুঝি একটু লজ্জা পেলো কথাটা শুনে।

– ‘হ্যাঁ করি।’

– ‘ফেমাস নাকি?’

– ‘হুম। আমাদের কলেজেই পড়ত। গত বছর পাশ করে গেছে।

অমৃতা চিন্তিত গলায় বলল, ‘এখন কী হবে? ওই গ্রুপে দুই দুইটা গাতক। আর আমরা গাতক শূন্য!

– ‘তুমি গাইতে পারো না?

– ‘পারি। কিন্তু সুর হয় নাতো!’

– ‘সুর লাগবে না। গাইলেই হবে। সুরের ওপর কোনো নম্বর নাই। -’বলছে তোরে।
’

– ‘হ্যাঁ সত্যি।’

রুদ্র গাইছে আর্টসেলের ‘পথ চলা–। ড্রাম, গিটার, আর কীবোর্ডের বাজনার পিঠে চড়ে গানের সুর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেলো মুহূর্তের মাঝে। ঢাকা পড়ে গেলো বাদ বাকি আনুষাঙ্গিক কোলাহল আর নরনারীর মৌখিক ফিসফাস। হৃদি আর সামি পরস্পরের হাত ধরে বসে আছে চুপচাপ। গান শুনছে মন দিয়ে। দুজনের চোখ মুখ এক আশ্চর্য খুশিতে উজালা!

গানের শেষ হলো দন্তন্য দিয়ে। কনেপক্ষর সদস্যদের একটু নার্ভাস দেখাচ্ছিল। ওদের দলে কোনো অভিজ্ঞ গাতক নেই এ সত্য উপলব্ধি করার পর আত্মবিশ্বাস একদম শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে বরপক্ষের ছেলেমেয়েরা তখন চিৎকার করে কাউন্ট ডাউন শুরু করে দিয়েছে। দশ থেকে শূন্য পর্যন্ত গোণা হবে। এর মাঝে নির্দিষ্ট অক্ষর দিয়ে গান গাইতে না পারলে অপর পক্ষ পেয়ে যাবে এক পয়েন্ট। সবশেষে যে দলের পয়েন্ট বেশি হবে সেই দলই বিজয়ী হবে।

কনেপক্ষের ছেলেমেয়েরা সব উঠে দাঁড়িয়ে দলবদ্ধভাবে আলোচনা করছে। ওদিকে তখন সাত পর্যন্ত গোণা হয়ে গেছে। বেঁটেখাটো দেখতে একটি কমলা শাড়ি পরা মেয়ে হাত তুলল, ‘থামো থামো। গান পেয়ে গেছি আমরা। এখুনি গাইছি।’

বরপক্ষ ওর কথা খুব একটা পাত্তা দিলো না। আকাশ আর রুদ্রসহ দলের প্রত্যেকে সশব্দে গলা ফাটিয়ে কাউন্ট ডাউন করে যেতে লাগল। দর্শক সারিতে বসে থাকা

কয়েকজন অতিথিও মহা উৎসাহে চ্যাঁচাচ্ছে। কমলা শাড়ির মেয়েটি ত্রস্ত পায়ে নেমে এলো মঞ্চ থেকে। কাউন্ট ডাউন থামল। চুপ করল জনতা।

মেয়েটি মাইক হাতে নিয়ে গেয়ে উঠল, 'নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে…' গানের সুরের সাথে বাজতে থাকল বাজনা। মেয়েটি কিন্তু খারাপ গাইছে না। সুর, তাল সব ঠিক আছে। একদম পারফেক্ট যাকে বলে। বিভা আনন্দে নাচ শুরু করল। তার দেখাদেখি দলের অন্য ছেলেমেয়েরাও। বরপক্ষ তখন উচ্চস্বরে বুলি ছাড়তে শুরু করেছে, 'ভুয়া! ভুয়া!'

ভুয়া বলতে শুনে অমৃতারা নাচের পাশাপাশি গানও গাইতে লাগল। গলা ছেড়ে, যেন গানের আওয়াজে 'ভুয়া' শব্দটা ঢাকা পড়ে যায়। অমৃতা হাত ছুঁড়ে, কোমর বাঁকিয়ে, হেলেদুলে নেচে যাচ্ছিল, মনের আনন্দে।

'ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও, মাঝ দইরা দিয়া চলুক, মাঝ দইরা দিয়া।'

হঠাৎ চোখ আটকে গেলো নিচ্ছিদ্র গভীরতায়। এত মানুষের মিশমিশে কালো চুলো মাথার ভিড়ে, অসংখ্য উৎসুক জ্বলজ্বলে দৃষ্টির মাঝে, আচানক তার নজর গিয়ে পড়ল একজোড়া প্রগাঢ় চোখের তারায়!

দ্বিতীয় সারিতে বসে আছেন লোকটা। চেয়ারের হাতলে কনুই ঠেস দিয়ে, চিবুকে হাত রেখে নির্নিমিখ চেয়ে আছেন তার দিকে। সারা দুনিয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেও অমৃতার কিচ্ছু যায় আসে না। অডিয়েন্স তার কাছে নতুন কিছুই নয়। নাচ গান খুব কম করেছে এ কথা ঠিক কিন্তু স্কুল জীবনে নিয়মিত বিতর্ক করত সে। টিভিতেও গেছে কয়েকবার। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে করেছে মুটকোর্ট। আন্তর্জাতিক

পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে ছিনিয়ে এনেছে পুরস্কার। কোর্টপাড়ায় পাকাপোক্ত, সাহসী বক্তা হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। ঠোঁটকাটা হিসেবে দুর্নামের ঝুলিটাও অত হালকা নয়। অথচ আজ ওই লোকটাকে ওরকম অনিমেষ চেয়ে থাকতে দেখে সেই সাহসী মেয়েটা হঠাৎ কেমন কুঁকড়ে গেলো নিজের অজান্তেই। দৃষ্টিটা কলিজায় এসে লাগল যেন। মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নিল সে। পা হয়ে গেলো নিশ্চল। এক অপ্রতিরোধ্য লজ্জায় ছেয়ে গেলো মুখ। ইশ! মানুষটা তাকে নাচতে দেখে ফেলল। না জানি কেমন সং এর মতো দেখাচ্ছিল তাকে!

অমৃতার মুখের আকস্মিক লালিমাটুকু বুঝি তিনি লক্ষ্য করলেন। তার ঠোঁটের প্রান্তিক কোণে ঝিলিক দিল একটি চোখা হাসি। বেচারী মেয়েটাকে আর বিব্রত না করে চোখ সরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। নিলেই কী? অমৃতার পা আর তখন মাটিতে নেই। পাখনা ছাড়াই উড়ে গেছে সে আকাশে। রাশি রাশি শিউলি ফুলের শুভ্র ঘ্রাণে সয়লাব হয়ে গেছে স্থল, জল আর অন্তরীক্ষ! লোকটা তাকেই দেখছিল কি? হ্যাঁ দেখছিল তো! কী অখণ্ড মনোযোগে দেখছিল!

গান শেষ হয়েছে। অপর দলকে গাইতে হবে 'আ' দিয়ে। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে সবাই 'নয়, আট, সাত!'

আকাশ নেমে এলো মঞ্চ থেকে। বিভা খোঁচা মারতে ভুলল না, 'আকাশ গাইবে গান? গান হবে নাকি কবিতা?'

হৃদি চাপা ধমক দিয়ে উঠল, 'আহ, চুপ কর। বেচারা সাহস করে গাইতে চাচ্ছে, এটাই তো বেশি।'

হৃদয় সতর্ক গলায় দলের লোকদের বলল, ‘এই মনে রেখো, আমরাও কিন্তু ভুয়া বলে চেঁচাবো।’

বিভা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে বলল, ‘অবশ্যই!’ ওদের ভাব দেখে মনে হলো আকাশ গান শুরু করার আগেই ভুয়া বলে চেঁচানো শুরু করবে। আকাশ জীবনে কখনই গানটান করেনি। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে এত লোকের সামনে এই প্রথম তার গান গাওয়া। ভ্রু কুঁচকে সামনে বসে থাকা অতিথিদের একবার দেখল সে। অনেকগুলো মুখ একত্রে মিশে হিজিবিজি হয়ে আছে। কে কোনজন তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। বোঝার প্রয়োজনও বোধ করল না সে। চোখ বন্ধ করে গাওয়া শুরু করল,

‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।’

খিলখিল করে টিটকিরির হাসি শুরু করল কনেপক্ষর ছেলেমেয়েরা।

– ‘আর গান খুঁজে পেলো না? জাতীয় সংগীত? বিয়েতে কেউ সোনার বাংলা গায়? সিরিয়াসলি? এই অবস্থা?’ অল্প বয়সী দুজন ছেলে বলে উঠল, আগপিছ কিছু চিন্তা না করেই।

অমৃতা দেখল তার পছন্দের মানুষটা হাস্যরত ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একটি কঠোর দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। দাঁড়ানোর কারণটা বুঝি অমৃতা ছাড়া অন্য কেউই ধরতে পারল না। সবাই যার যার মতো ব্যস্ত।

– 'এই উঠে দাঁড়া। জাতীয় সংগীত হচ্ছে।' অমৃতা বলল বরকনেকে উদ্দেশ্য করে।

সামি এতক্ষণে খেয়াল করল, দর্শক সারিতে ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা। জাতীয় সংগীত গাওয়া হচ্ছে অথচ সে এখনো উঠে দাঁড়ায়নি বলে বাবা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব রাগ করছেন। বুঝতে পেরে চট করে উঠে দাঁড়ালো সে। সাথে হৃদিও। বিয়ের পাত্র পাত্রীকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বুঝি সবার মাথায় ঢুকল ব্যাপারখানা। কিছুক্ষণের মাঝেই বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো হল সুদ্ধ সমস্ত লোক।

আকাশের সাথে গলা মিলিয়ে ধীরে ধীরে সকলেই গাওয়া শুরু করল।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

আহা, চারপাশটা কেমন মাটি মাটি গন্ধে আর মায়া মায়া পরশে নিমেষে আন্দোলিত হয়ে উঠল। মাটি আর মায়া এই দুইয়ে যেন জনম জনমের ভালোবাসা। একটির সাথে আরেকটির রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক!

গানের শেষ হলো 'স' অক্ষরে এসে। এবার কনেপক্ষের হয়ে হৃদির ছোটভাই গাইলো, 'সোহাগ চাঁদ বদনি ধ্বনি নাচতো দেখি।'

গানের তালে তালে নাচতে লাগল ছেলেমেয়েরা। দর্শক সারিতে বসে থাকা বেশ কিছু লোকজনও উঠে গেলো নাচতে। শুধু অমৃতা আর নাচলো না। হৃদির পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্বরে আ অক্ষরটি ঘুরেফিরে বেশ কয়েকবার পড়ল। দ্বিতীয় বার বরপক্ষ গাইল, 'আরে টিকাটুলির মোড়ে একটা অভিসার সিনেমা হল রয়েছে, হলে নাকি এয়ার কন্ডিশন রয়েছে।' এই গানের সাথে নাচটাও জমে একদম ক্ষীর হয়ে গেলো।

তৃতীয় বার স্বরে আ নিয়ে কনেপক্ষ বিপদে পড়ে গেলো। বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষার গান তো গাওয়া যাবে না। বিভার এই মুহূর্তে আ দিয়ে সব ইংরেজি আর হিন্দি গান মাথায় আসছে। রুদ্র আর আকাশের দল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সংখ্যা গুণে চলেছে। এদিকে কারো মাথায় কিচ্ছু আসছে না। মগজ যেন ঝিম ধরে গেছে।

হঠাৎ অমৃতা হাত তুলল, 'আমি গাইব!'

গণনা বন্ধ করে আকাশ ভ্রু নাচিয়ে বলল, 'তুই গাইবি? গান? ইজ ইট ফর রিয়েল?

অমৃতা চোখ বন্ধ করে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল যেন, 'হ্যাঁ গাইবো, গিভ মি আ সেক!'

– 'সেক্স?' ফাজলামো করার সুযোগ হাতছাড়া করল না রুদ্র। আগুন চোখে তাকালো অমৃতা, 'সেক… মানে সেকেন্ড!'

রুদ্র ফিচেল হেসে নিচুস্বরে বলল, ‘তাই বল, আমি ভাবলাম··· তুই আবার আমার কাছে এইসব কী চাইতেছিস? তওবা তওবা! মানে সবার সামনে? ক্যামনে কী? ‘

রুদ্রর দিকে কঠোর দৃষ্টিটা তাক করে রেখেই অমৃতা মঞ্চ থেকে নেমে আসলো। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে গাওয়া শুরু করল গান। তার সুরে বেশ কমতি আছে কিন্তু আত্মবিশ্বাসের ঝিলিক সেই অল্পবিস্তর ত্রুটির ওপর অনায়াসে প্রলেপ এঁকে দিচ্ছে।

‘আমারও পরানও যাহা চায়

তুমি তাই, তুমি তাই গো

আমি তোমারে পেয়েছি

হৃদয়মাঝে

আর কিছু নাহি চাই গো

আমি তোমার বিরহে রহিব

বিলীন

তোমাতে করিব বাস

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনি,

দীর্ঘ বরষ-মাস”

আবারও ‘স’ তে এসেই থামল। বরপক্ষ গেলো ফেঁসে। এবার আর ‘স’ দিয়ে গান কারো মাথায় আসে না! বিভা আর অমৃতা নাচতে নাচতে কাউন্ট ডাউন করতে লাগল।

‘পাঁচ··· তা ধিন তা ধিন··· চার··· তা ধিন তা ধিন··· তিন’

রুদ্রর মুখ শুকিয়ে গেছে। আকাশ চোখ বন্ধ করে নিবিষ্ট মনে গান স্মরণ করার চেষ্টা করছে। কনেপক্ষের ছেলেমেয়েরা এর মাঝেই হইচই শুরু করে দিয়েছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন জিতেই গেছে তারা। আট পর্যন্ত গোণা হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় বরপক্ষের দুজন ছেলে ধুপধাপ শব্দ তুলে উঠে আসলো মঞ্চে

– ‘পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি! জুতা পেয়ে গেছি! আর গেইম খেলতে হবে না।’ উচ্চস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে উপস্থিত জনতাকে তথ্যটা জানালো তারা।

‘হবে না, হবে না! এটাতো চিটিং!’

প্রতিবাদ করে উঠল কনেপক্ষ। রুদ্র আর আকাশ তড়িঘড়ি করে জুতোজোড়া হাতে তুলে নিল। এখন তাদের মুখে বিশ্বজয়ের হাসি! দুই বান্ধবী অগ্নিময়ী রূপ ধারণ করে তেড়ে গেলো ওদের দিকে।

- ‘চিটারের বাচ্চা চিটার!’ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল বিভা।

আকাশ তখন বরের পায়ে জুতো জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে যত্ন সহকারে। অমৃতা ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলো। এক ঝটকায় টেনে নিতে গেলো জুতোর পাটি আকাশের হাত থেকে। আকাশও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই জুতোজোড়া হাতছাড়া করবে না সে। অতএব একটা টানাহ্যাঁচড়া পড়ে গেলো দুজনের মধ্যে। হৃদি আর সামি এইসব দৃশ্য

দেখে কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল। খুব মজা পাচ্ছে তারা। একেবারে নিখাদ বিনোদন যাকে বলে।

বিভা ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, 'এত বড় বেঈমানী! হ্যাঁ? এত বড় বেঈমানী?'

'এরকম বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো ডায়লগ দিচ্ছিস ক্যান? প্রব্লেম কী?' রুদ্রর উদাস প্রশ্ন।

বিভা কোমরে হাত রেখে ঝেঁঝে উঠে বলল, 'চুপ থাক! চোরের মার বড় গলা।'

– 'চোর তো তোরা। চুরি তো তোরা করছিস। আমরা শুধু উদ্ধার করছি!'

বিভা আরো দু পা এগিয়ে আসলো, আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'তাহলে আমাদের দিয়ে গান গাওয়াইছিস ক্যান? ওই লুনুষের বাচ্চা লুনুষ! আমাদের গান কি এত সস্তা?'

– 'আহা যা গান! এত দামি গান! আল্লাহ! কত কুটি টাকা তোমাদের গানের দাম? শুনি?'

রুদ্রর বহু মুদ্রা ধারী কার্টুন মুখটার দিকে চেয়ে থেকে বিভার রাগ আরো সপ্তমে চড়ল। সে ওর বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে সীমাহীন অধৈর্য গলায় বলল, 'জুতার টাকা দে কুত্তার বাচ্চা!'

– ‘কিছুতেই দিব না! মরে গেলেও দিব না!’

– ‘দে বলতেছি!’

– ‘দিব না! দিব না! এক আনাও দিব না!’

মঞ্চের ওপর ভালোই হাঙ্গামা বেঁধে গেলো। দুইপক্ষের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সাথে লিপ্ত হয়ে গেলো ঝগড়ায়। সকলে গলা তুলে চ্যাঁচাচ্ছে। একে অন্যকে গাল দিচ্ছে। বর বৌ দাঁড়িয়ে গেছে তখন। ঝগড়ার নিষ্পত্তি করার জন্য তারা ব্যাকুল। কিন্তু লাভ কিছুই হচ্ছে না। হৃদির মেজোমামা আর ছোট চাচা উঠে এসেছেন মঞ্চে। বাচ্চাদের সামলাতে গিয়ে তারাও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। মঞ্চটা বেশ বড়সড় হওয়াতে এতগুলো মানুষ অনায়াসে এঁটে গেছে।

ওদিকে অমৃতা তখন রাগের চোটে আকাশের টুটি চেপে ধরেছে। আকাশও কম যায় না। অমৃতার চুল ধরে সমানে টানতে লাগল সে। রুদ্রর হাতে চলে গেছে তখন জুতোর দখল। হক সাহেব স্টেজের সামনে এসে দৃশ্যটা দেখে একেবারে থ বনে গেলেন।

– ‘কী হচ্ছে এসব?’

বাঁজখাই স্বরের প্রশ্নটা একরোখা, উদ্ধত, ঝগড়ারত ছেলেমেয়েগুলোকে মুহূর্তের জন্য স্থিরচিত্রে রূপান্তরিত করল। সবাই এক নজর তাকালেন তাঁর দিকে। সামির পরিবারের সবাই এই লোকটাকে যমের মতো ভয় পায়। অতএব এঁর উপস্থিতিতে

বরপক্ষের সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ধীরস্থির ভাব নেমে এলো। বরপক্ষকে থেমে যেতে দেখে কনেপক্ষও একটু শিথিল হয়ে আসলো। হইচই কমে গেলো অনেকখানি। অমৃতার হাত আকাশের গলা থেকে উঠে এসেছে তখন। আকাশ অমৃতার কাঁধে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'যা ভাগ! আমার সাথে লাগতে আসিস না!'

হক সাহেব হিমায়িত চোখে দেখলেন ঘটনাটা। নিদারুণ কঠোর গলায় বললেন, 'একটা মেয়েকে তুমি এভাবে আঘাত করতে পারো না।'

আকাশের শ্যামলা গায়ের রঙে হঠাৎ একটা আগুন রঙের আঁচ এসে উপস্থিত হলো। চোখে ধক করে উঠল তেজ। তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি কী করব না করব সেটা নিয়ে কথা বলার আপনি কেউ না!'

লোকটার গাম্ভীর্যে অটল মুখখানা অপমানে থমথম করে উঠল ছেলেটির স্পর্ধা দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না তিনি। এরকম উদ্ধত ভঙ্গিতে আজকাল তার সাথে কেউ কথা বলে না। মন থেকে পছন্দ না করলেও মুখে হুজুর হুজুর করে। সামি আকাশের কথা বলার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করছিল। এতটা রেগে যাবার মতো কোনো ঘটনা কি ঘটেছে? বাড়ির বড়রা তো এসব উপদেশ দিয়েই থাকে সচরাচর। তার বাবার জায়গায় অন্য কারো বাবা হলেও একই কাজই করতেন। আকাশের কি এটা বোঝা উচিত না?'

– 'আমার সামনে যদি কোনো অন্যায় ঘটে থাকে, তবে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।'

আকাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'লিসেন, অমৃতা আমার ফ্রেন্ড! আমি ওর সাথে যা ইচ্ছা করতে পারি। কারো কিছু বলার নাই এখানে!

– 'না, তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পার না।' বলিষ্ঠ কণ্ঠে দৃঢ় মতামত জানালেন তিনি।

– 'আপনি কে বলার?'

অমৃতা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। স্তব্ধ হয়ে শুনছিল সে দুজনের কথোপকথন। অন্যরা সবাই নীরব দর্শক। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ করেই পরিবেশটা একটু থমথমে হয়ে উঠেছে। বাতাস হয়ে গেছে গুমোট। রুদ্র জুতোজোড়া হাতে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হক আকাশের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। রুদ্রর হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সমস্যা কী হয়েছে?'

ততক্ষণে রোমেলাও হাজির হয়েছেন দৃশ্যপটে।

– 'এখানে কী হচ্ছে? জামাই বৌয়ের স্টেজে এত ভিড় কেন? যাও যাও সবাই নামো এখান থেকে।' এমনই সব ভারি ভারি উপদেশবাণী ছাড়তে লাগলেন তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্র। ছেলেমেয়েরা গুটিগুটি পায়ে স্টেজ থেকে নামতে লাগল।

ঘটনা খুলে বলল রুদ্র। শুনেটুনে হক গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত সামান্য বিষয় নিয়ে এমন হাঙ্গামা করা কি ঠিক হলো? তোমাদের কোনো কমন সেন্স নেই? ডিসেন্সি বলে

তো একটা ব্যাপার আছে নাকি? এখানে এত এত গুরুজনরা উপস্থিত রয়েছেন। এদের সামনে এই চরম অভদ্রতাটা তোমরা করতে পারলে?'

আকাশ তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল তাকে। তিনি টের পাচ্ছিলেন। টের পেয়েও ওর তীক্ষ্ণ নজরটা হজম করে রুদ্রকে বললেন, 'জুতো ফেরত দিয়ে দাও। আমার ছেলে কি খালি পায়ে বাড়ি ফিরবে নাকি?'

রুদ্র তাৎক্ষণিকভাবে জুতোজোড়া সামির পায়ে পরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। হক সাহেব বিভাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কত টাকা চাও?' বিভা জিজ্ঞাসু নেত্রে অমৃতার দিকে চাইলো। অমৃতা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে প্রশ্নটা তো তাকে করা হয়নি। সে কেন উত্তর দেবে? বাহ্, তার সাথে কথা বলা যেন নিষিদ্ধ। তা বিভাকে যেহেতু প্রশ্নটা করা হলো, বিভাই উত্তর দিক!

কথা বলল হৃদয়, 'আংকেল, পঞ্চাশ হাজার!'

– 'ঠিক আছে। টাকা তোমরা পেয়ে যাবে। ডোন্ট ওরি।'

বলা শেষ করে তিনি অমৃতার দিকে একবার তাকালেন। আকাশ ওর চুল টেনেটুনে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। শাড়ির আঁচলও গেছে কুঁচকে। অমৃতা তার ওই দৃষ্টি দেখে নিজের ভূতগ্রস্ত অবস্থাটা একটু উপলব্ধি করতে পারল বোধহয়। বিব্রতভাবে হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে লাগল। তিনি চোখ সরিয়ে নিয়ে জায়গাটা থেকে সরে পড়লেন। রুদ্র পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তড়িঘড়ি করে একটা গান ধরল। কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই একটু আগের বিরোধটা ভুলে যেতে সক্ষম হলো। বিয়েবাড়ি আবার মেতে উঠল গানে, সুরে আর নৃত্যে।

আকাশ দর্শক সারিতে গিয়ে বসেছিল। শেষের দিকের একটা চেয়ারে। অমৃতা পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ওর পাশে। কাঁধে হাত রেখে বলল,

– ‘দোস্ত, তুই ঠিক আছিস?’

– ‘ঠিক আছি।’

– ‘মন খারাপ?’

–’ না।’

অমৃতা পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ‘তাহলে মুখটাকে এরকম করে রাখছিস কেন?’

আকাশ ঘুরে তাকালো, ‘তোর জন্য তো অনেক দরদ দেখলাম।’

– ‘কার কথা বলছিস?’

– ‘কার কথা আবার? তোর হিরোর কথা বলতেছি।’

অমৃতা হাসে, 'আরে নাহ, দরদটরদ কিচ্ছু না। আমার জায়গায় বিভা কিংবা হৃদি হলেও উনি একই কাজই করতেন। তুই হঠাৎ এত রেগে গেলি কেন?'

– 'ওয়েল, আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কী করব, তাকে মারব, কাটব নাকি খুন করব এটা নিয়ে কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

অমৃতা আকাশের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা থাক দোস্ত। রাগ করিস না। বড়রা একটু এরকম বলেই। ভুলে যা! কেমন?'

৫৩

ঢাকা শহরের কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে খুব রাত অবধি থাকা যায় না আজকাল। একটু তাড়াতাড়িই অনুষ্ঠানের ইতি টানতে হয়। এই বিয়েতে ও শেষতক একটু তাড়াহুড়া করা লাগল। বর-কনের খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বেজে গেলো সাড়ে এগারোটা। বারোটা বাজার আগেই ক্লাব ছাড়তে হবে। অতএব এবার বিদায় ঘণ্টা না বাজালেই নয়।

ভিড় নেই খুব একটা। অতিথিরা অনেকেই এর মাঝে প্রস্থান করেছেন। এখন যারা আছেন তারা দুই পক্ষের একেবারেই নিকট আত্মীয়। মঞ্চে উঠে বসেছেন পাত্রপাত্রীর বাবা, মা, এবং কয়েকজন বয়স্ক স্বজন। গানের দল টানা দু ঘণ্টা গান গেয়েছে। নাচানাচিও হয়েছে ঢের। এখন শিল্পী এবং বাদ্য বাদকের দল খেতে বসেছে। অনেকক্ষণ যাবৎ লাগাতার হইচইয়ের পর চারপাশ এখন অনেকটা শান্ত। এরকম শান্ত পরিবেশেই সম্পন্ন হলো রুসমতের পালা। লম্বা চওড়া লাল রঙের ওড়না দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো জামাই বউয়ের মুখ। কালো কাঠের ফ্রেম বাঁধানো গোল ঝকঝকে,

স্বচ্ছ আয়নায় শুভদৃষ্টি বিনিময় হলো নব দম্পতির। সবাই উৎসাহী হয়ে বরকে প্রশ্ন করলো, ‘কী দেখলে আয়নায়? চাঁদ দেখতে পেলে কি?’

সামি আয়নার কাচে পড়ে থাকা হৃদির মায়াবী মুখের প্রতিবিম্বটার দিকে কিছুক্ষণ নিগূঢ় চোখে চেয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বলল, ‘চাঁদ নয় চাঁদের চাইতেও সুন্দর একটা মুখ দেখতে পেলাম! পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখ!’

হৃদি চমকে উঠে আয়নার ভেতর দিয়ে সামির চোখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখল। ও কি সত্য বলছে? কে জানে! সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন, কথাটা শুনতে পেয়ে এক অনির্বচনীয়, আশ্চর্য ভালো লাগায় রমরম করে উঠল সারাটা মন। খুশির ঝংকারে আপনাআপনি প্রসারিত হয়ে উঠল ঠোঁটের দুই প্রান্ত। ততক্ষণে সামির স্তুতিবাক্য শুনে বন্ধুরা সব হইচই আরম্ভ করে দিয়েছে। সামির খালা পাশ থেকে আংটির ছোট্ট একটি বাক্স এগিয়ে দিয়েছে তার দিকে। সামি বাক্স খুলে আংটি বের করল। ধীরস্থিরভাবে পরিয়ে দিল হৃদির আঙুলে। হৃদি হাতে পরা আংটিটা চোখের সামনে তুলে ধরে ভালো মতো দেখল একবার। এই সেই আংটি, যেটা সামি ডুয়ার্সের সন্ধ্যাবেলায় বিভাকে পরাতে গিয়ে ভুল করে হৃদির আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সেদিন আংটিটা নিজের আঙুল থেকে খুলতে পেরেছিল সে। কে জানত সেই জিনিস দুদিন পর ঘুরে ফিরে প্রকৃত মালিকের কাছে পুনরায় এসে ভিড়বে!

রুসমতের পর কন্যা সম্প্রদানের পালা। এবার বন্ধুরা নিচে নেমে আসলো। দাঁড়ালো মঞ্চের সামনে দল বেঁধে। এতক্ষণ ধরে আতশবাজির মতো জ্বলতে থাকা আনন্দের জোয়ারে হঠাৎ একটু ভাটার টান লাগল তখন, যখন হৃদির আম্মা স্টেজে বসে থেকে মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন আচমকা। হৃদি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিল না নিজের অন্তর্দেশের হালচাল। কেমন একটা অবশ অবশ অনুভূতি হচ্ছিল তার। হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ এই সমস্ত স্থূল অনুভূতিকে পাশ কাটিয়ে দিয়ে

সমস্ত বুক ভরে আছে এক গুমোট গাম্ভীর্যে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত পা কাঁপছে প্রবলভাবে। অবাক ব্যাপার হলো মায়ের কান্না দেখে ছিঁচকাঁদুনে হৃদির আজ মোটেও কান্না পাচ্ছে না, বরং একটা কেমন গা ছমছমে ভয় হচ্ছে। ভয়?... হ্যাঁ, এই মাত্র, এই এত লোকের মাঝে নতমুখে, আড়ষ্ট ভাবে জবুথবু হয়ে বসে থেকে, সে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে সম্যকরূপে উপলব্ধি করল, যে অনুভূতিটি এই মুহূর্তে তার সমস্ত চেতনাকে বিলুপ্তপ্রায় করে দিচ্ছে সে অনুভূতিটির নাম আসলে ভয়! অথচ আজ কি তার ভয় পাবার দিন? না তো! তপ্ত গ্রীষ্মের খর রোদ্দুর ডিঙিয়ে আজ অনেক দিন পর এক ঝলক ফাগুন হাওয়া এসে উঁকি দেবার কথা ছিল তার ছাব্বিশ বছরের ঘটনাবিহীন, নিস্তরঙ্গ জীবনটায়। আজ তার সমৃদ্ধির দিন, প্রাপ্তির দিন, স্বপ্ন পূরণের দিন! আরো সোজা করে বলতে গেলে মিলনের দিন। মনের মানুষের সাথে মিলন! সে কি যার তার ভাগ্যে জোটে? চোখের সামনে আলোর জোয়ার। ভিডিও ক্যামেরা তার দিকেই তাক করা। ঝিকিমিকি আলোর সরল অথচ প্রবল আঘাতে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না সে। আশেপাশে হরেক মানুষের চাপা ফিসফাস, গুঞ্জন··· শব্দ··· এত শব্দ যে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। সামির পাশে তার বাবা মা বসে আছেন। ক্যামেরার লাইটটা সীমাহীন বিরক্তির উদ্রেক করছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধুদের দল। কিছু একটা নিয়ে হো হো করে ডাকাতের মতো হাসছে চারমূর্তি। হৃদির আম্মা উচ্চস্বরে কান্না করছেন। সত্য বলতে কী, সামির বেশ নার্ভাস লাগছিল সেই মুহূর্তে। তার তো কোনো বোন নেই, তাই মেয়ে বিয়ে দেবার কষ্টের স্বরূপ সম্পর্কে সে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞাত। অজ্ঞাত হলেও হৃদির আম্মার কান্না দেখে তার কেমন কষ্ট কষ্ট লাগছে। হৃদিও নিশ্চয়ই কাঁদছে এখন। বাবা মা আর এত লোকের সামনে মাত্র বিয়ে করা বৌয়ের মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না লজ্জায়। কিন্তু একটা বার খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজের বৌটাকে। হৃ··· দি··· তা! এত দিনের পুরোনো বন্ধুটা আজ থেকে তার সহধর্মিণী। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষটা তার। শুধুই তার! প্রিয় মানুষকে নিজের করে পাবার মতো অলৌকিক সুন্দর অনুভূতি বুঝি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

হৃদির বাবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। এই শেষ মুহূর্তে এসে বারেবারে মনে হচ্ছে তাড়াহুড়া হয়ে গেলো। বড্ড তাড়াহুড়া! আর কটা দিন পরে মেয়েটাকে বিয়ে দিলে কী হতো? কেন যে সমাজের আর দশজন মানুষের কথা শুনে তিনি উঠেপড়ে লাগলেন মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য! মেয়েটার কোনো শখ আহ্লাদ ঠিকমতো মেটাতে পারেননি। কৃচ্ছতা সাধন করেই তার দিন গেছে। এখন স্বামীর ঘরে মেয়েটা পর্যাপ্ত আদর যত্ন পেলেই হয়। কিন্তু এই বিষয়ে তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে আছে কয়েকদিন ধরে। হৃদির শ্বশুর শাশুড়ির কোনো কন্যা সন্তান নেই। যে বাড়িতে কন্যা নেই, সেই বাড়ির লোকেরা কন্যা সন্তানের যথাযথ মূল্য দিতে পারবে কি? কন্যা সম্প্রদানের সময় চলে আসলো। জামাইয়ের হাতে নিজ কন্যার হাত তুলে দিয়ে কন্যাদায় মুক্ত হলেন ভীত, চিন্তিত, আবেগমথিত কন্যার পিতা। ঠিক সেই মুহূর্তে হৃদির বুকে এতক্ষণ ধরে থমকে থাকা হিমায়িত কান্নার ডেলাটায় প্রখর অগ্নি উত্তাপের হলকা লাগল যেন! জমে থাকা বরফ শীতল অশ্রু পুঞ্জে উত্তাপ লাগামাত্র ঊর্ধ্বমুখি হয়ে প্লাবনের মতো উপচে পড়ল জল চোখের কার্ণিশে।

তার নিজের··· ভীষণ নিজের··· কৃপণ, আলাভোলা, বদরাগি, প্রাচীনপন্থী বাবাটা! আহা সাইকেল চালাতে পারতো না হৃদি··· বাবা হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। বয়স কত তখন? নয় কি দশ! অংকে কী ভীষণ কাঁচা! বাবাই জীবনের প্রথম শিক্ষক! অংকের হাতে খড়ি বাবার কাছেই। একটা অংক পারলেই একটা লজেন্স। হ্যাঁ কৃপণ বাবাটাও তখন লজেন্স দিত সঠিক অংকের বিনিময়ে! একবার স্টাডি ট্যুরে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি বলে বাবার ওপর রাগ করে সারাদিন সারারাত কিচ্ছু খেলো না হৃদি। পরদিন মায়ের কাছ থেকে জানতে পারল বাবাও এই একটা দিন না খেয়েই ছিলেন। আরো কত কত কত স্মৃতি! কয়টা মনে করবে হৃদি এই মুহূর্তে? তার সেই নিজের আপন বাবাটা আজকে অন্যের হাতে তাকে হাত তুলে দিয়ে দায় মুক্ত হয়ে গেলো। কত্ত সহজে! এভাবেই যদি পর করে দিতে হয়, তবে জন্মটাই বা দেবার কী দরকার ছিল? মা আজ থেকে সঙ্গীহীন হয়ে যাবে। আজকের পর থেকে গভীর রাতে মন খারাপ হলে হৃদি দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচলের তলায় লুকোতে পারবে না। মুখ গোমড়া দেখলে মায়ের মতো কেউ কানের কাছে এসে সর্বক্ষণ মাছির মতো, কী

হয়েছে? কী হয়েছে বলে ভনভন করবে না। আজকের পর থেকে বাবা মায়ের বাড়িতে সে অতিথি হয়ে যাবে। যে আবাসস্থলটিকে নিজের বাড়ি বলে জানত এতদিন, সেই স্থানটি হঠাৎ এক আশ্চর্য জাদুবলে হয়ে যাবে বাবার বাড়ি। আজকের পর থেকে কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না। আজকের পর থেকে হৃদির দুটা বাড়ি থাকবে। একটা বাবার বাড়ি, আরেকটা শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু তার নিজের কোনো বাড়ি থাকবে না। এবার তার কান্না বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল। মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল সে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। কাঁদছে তার মা, বাবা, ছোট ভাই এবং খালাত, চাচাতো বোনেরা। সামির চোখ দুটোও হালকা লালচে দেখাচ্ছে। ভীষণ বিব্রত সে।

রুদ্রর মুখ কাঁদো কাঁদো। তার নিজের বড় বোনের বিয়ের দিনটার কথা মনে পড়ছে। অনেক কষ্টে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ক্যাটস আই চোখ দুটোর পর্দা বরাবর অশ্রুজল আটকে রেখেছে সে। কোনোমতেই এই জলকে সীমানা অতিক্রম করতে দেওয়া যাবে না। বন্ধুদের সামনে হাসির পাত্র হতে চায় না সে। বিভা কাঁদতে কাঁদতে অমৃতার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেলো একবার। অমৃতা হাত নেড়ে বলে উঠল, ‘প্লিজ, এইসব ঢং করবি না আমার সাথে। আরে বিয়েই তো হচ্ছে। মরে যাচ্ছে না তো! প্রতিদিন একবার করে বাবার বাড়ি আসতে পারবে।’

বিভা অমৃতার প্রত্যাখ্যান মুখ বুজে সহ্য করে আকাশের কাছে গেলো। আকাশ চোখা গলায় বলল, ‘ঢং বন্ধ কর। তোর বিয়া নাকি? তুই কাদঁতেছিস ক্যান?’ রুদ্র এগিয়ে এসে বিভার কাঁধে একটা হাত রাখল। বিভা এতক্ষণে আস্থার জায়গা পেলো যেন। রুদ্রর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল উচ্চস্বরে। মনে হলো যেন এইমাত্র তার অতি আপনজন গত হয়েছে।

আকাশ চকচকে চোখ নিয়ে হৃদির ভাইকে দেখছিল। স্টেজের সিঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হৃদয় হাউমাউ করে ‘আপুনি! আপুনি!’ বলে কাঁদছে। যেন আপুনিকে কোন গুণ্ডা কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। ওর দিকে চেয়ে থেকে আকাশের ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল থেকে থেকে। আর না পেরে অমৃতাকে বলেই ফেলল সে, ‘দ্যাখ না, সিনেমাটা দ্যাখ।’

– ‘ঐদিকে দ্যাখ। আসল সিনেমা ওইখানে!’ অনেক কষ্টে হাসি সামলে বলল অমৃতা। আকাশ দেখল হৃদির এক খালাতো বোন মেঝেতে বসে পড়ে বিলাপ করছে। মনে হচ্ছে এখুনি সে হুঁশ হারাবে।

– ‘আরে আমাদের জামাই বাবাজিই তো মনে হচ্ছে কাইন্দা দিবে আরেকটু হইলেই। দ্যাখ না, লাল হয়ে গেছে চোখ।’ বলল আকাশ, সামিকে ইঙ্গিত করে। তারপর হঠাৎ সুর পাল্টে বলল, ‘তোর বিয়ের সময় তুই কাদবি?

অমৃতা গলায় একগাদা তাচ্ছিল্য টেনে আনলো, ‘ধুর, আমার বিয়াই হবে না কখনো। ’

– ‘যদি হয়? ধর হয়ে গেলো একদিন হুট করে। সেদিন তুই কাদঁবি?’

অমৃতা চোখ সরু করে ভাবলো খানিকক্ষণ। ঠোঁট উল্টে বলল, ‘না কাঁদব না। বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করার মাঝে তফাৎ আছে জানিস তো?’

আকাশ চুপ করে গেলো। অমৃতা এবার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর গলায় বলল, ‘বিয়েশাদি আমার ভাগ্যে নাই। সবাই হৃদির মতো লাকি না।’

– 'হৃদি তো প্রথমে রবিনকে ভালোবেসেছিল। এরপর সামিকে। তুই কি পারবি না দ্বিতীয়বার ভালোবাসতে?' খুব সাবধানে প্রশ্ন করে আকাশ।

– 'হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় নারে। বিভা আর হৃদি যা পারছে, আমি তা কোনোদিনই পারব না। এ জন্যেই বললাম, আমার ভাগ্যটা ওদের মতো ভালো না। '

আকাশ আড়চোখে তাকায় অমৃতার দিকে। এমন অসাধারণ সুন্দর একটা মেয়ের ভাগ্য কেন খারাপ হবে? বিধাতা কখনোই এতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন না। একটা বড় নিশ্বাস পিছলে পড়ল ওর বুক চিরে। ভাগ্য ভালো হোক আর খারাপ, অমৃতাকে তো ভালো থাকতেই হবে। আকাশ নিজের শরীরের সব রক্ত বিক্রি করে হলেও, পৃথিবীর সব সুখ কিনে এনে দেবে এই মেয়েটির পায়ের নিচে!

হৃদি শ্বশুর শাশুড়ি এবং নিজের বাবা মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সামিও পা ছুঁয়ে সালাম করল বাবা, মা, শ্বশুর শাশুড়িকে। এরপর কান্নারত হৃদিকে অনেক কষ্টে ধরে ধরে কমিউনিটি সেন্টারের বাইরে নিয়ে আসা হলো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাতাস ক্ষ্যাপা। বৃষ্টি নামবে যে কোনো মুহূর্তে। গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল লাল আর সাদা রঙের কাঁচা গোলাপ দিয়ে সজ্জিত সামির লাল মার্সিডিজ বেঞ্চ। সামি নিজেই গাড়ি চালাবে। বর বৌ উঠে বসার পর চার বন্ধু উঠল পেছনের সিটে। তারপর মধ্যরাতের ছিমছাম রাজপথে সামির লাল মার্সিডিজ বেঞ্চ যাত্রা শুরু করল বাড়ির পথে, নতুন বৌ সঙ্গে নিয়ে। রাত সাড়ে বারোটায় সামিদের উত্তরার প্রাসাদতুল্য বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুলো গাড়িটা। তিন চার রকমের লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ির গেট, বিল্ডিং, গাছগাছালির মাথা। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ।

৫৪

দেখা হয়ে গেলো দৈবাৎ। রাশেদ বেডরুম থেকে বেরোচ্ছেন। অমৃতা যাচ্ছিল সামির ঘরে, ওর মোবাইলের চার্জার আনতে। সব লোকজন জড়ো হয়েছে নিচতলার ড্রয়িংরুমে। নতুন বৌকে মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করা হচ্ছে। নাচ, গান হচ্ছে। নতুন বৌয়ের আগমনের আনন্দে ঝুমঝুম করছে পুরো বাড়ি। দোতলায় এখন দু তিনজন চাকর ছাড়া অন্য কেউ নেই বললেই চলে। করিডোরে হলদে রঙের ফকফকা আলো জ্বলছিল। মুখোমুখি পড়তেই তিনি বুঝি একটু বিব্রতবোধ করলেন আজ। হাতে ধরা সেলফোন শক্ত চোয়াল। গভীর চোখের তারায় স্পষ্ট হয়ে ভেসে আছে মৃদু আড়ষ্টতা। কয়েকটা অস্বস্তির মুহূর্ত কাটলো।

—'আপনার সাথে বারবার দেখা হয়ে যাচ্ছে!' চপল গলায় বলল অমৃতা।

তার শাড়ির আঁচল লুটাচ্ছিল মেঝেতে। সেইদিকে একটা নজর দিয়ে তিনি বললেন, 'হুম। তাইতো দেখছি। কেন এসেছ এখানে?'

– 'সামির মোবাইলের চার্জার নিতে। আমাকে শাড়িতে কেমন লাগছে?'

– 'ভালোই!' কিছুটা উদাস গলায় বললেন রাশেদ।

অমৃতা ফিচেল হাসি হেসে বলল, 'বয়ফ্রেন্ড বুঝি গার্লফ্রেন্ডকে এভাবে কমপ্লিমেন্ট দেয়? আপনি একদমই রোমান্টিক না! এতদিন বিয়ে টিকে আছে কী করে আপনার?'

রাশেদের মুখের রং পাল্টে গেলো। চোখ হয়ে উঠল ক্ষুব্ধ। অত্যন্ত কড়া ভাবে তিনি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন।

– ‘এসব আজেবাজে কথা বলতে নিষেধ করেছি না?’

অমৃতা একটু থমকে গেলো। রাশেদ আগের চাইতেও কঠিন গলায় বললেন,

– ‘পাগলামির একটা সীমা আছে অমৃতা! কেন তুমি বুঝতে পারছ না যে তোমার প্রতি আমি মোটেও আগ্রহী নই। আর কীভাবে বোঝাতে হবে?’

শেষের কথাটা অমৃতার হৃৎপিণ্ডে শেলের মতো গিয়ে বিঁধল। চিলিক দিয়ে উঠল অসহ্য ব্যথা!

– ‘কেন মিথ্যে বলছেন?’

রাশেদ চোখ সরিয়ে নিলেন,--’মিথ্যে বলছি না। এটা ভীষণ সত্য যে তুমি আমাকে বিরক্ত করে যাচ্ছ অনবরত। প্লিজ এসব বন্ধ কর!’

অমৃতার চোখে সহসা মুক্তোদানার মতো অশ্রুবিন্দু এসে ভিড় জমাতে লাগল। অপমানে তার সুন্দর পাতলা ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল থরথর করে। ইচ্ছে করল এই মুহূর্তে মাটির নিচে লুকিয়ে পড়ে বা বাতাসে মিলিয়ে যায়,

পৃথিবীকে সে আর এই পোড়া মুখ দেখাতে চায় না। ঠিক সেই সময় বেডরুমের দরজা খুলে রোমেলা বেরিয়ে আসলেন করিডোরে। তার হাতে দুটি লাল রঙের লম্বাটে গয়নার বাক্স। দুটিই তার শাশুড়ির দেওয়া। নতুন বৌকে গয়নাগুলো আজ রাতেই পরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হক সাহেব। রোমেলার অবশ্য অত তাড়াহুড়ার ইচ্ছে ছিল না। মাত্র এসেছে মেয়েটা। যাক কয়েকটা দিন। তারপর শাশুড়ির গয়না সময়মতো বুঝিয়ে দিতেন তিনি। কিন্তু তার স্বামীর সব কিছুতেই তাড়াহুড়া। আজ রাতেই তিনি পুত্রবধূর কাছে নিজের মায়ের দেওয়া গয়না হস্তান্তর করতে চান

স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখে রোমেলা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কী ব্যাপার?' প্রশ্নটা করতে করতেই তার চোখ অমৃতার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। হক বিব্রতভাবে বললেন, 'কিছু না। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

অমৃতা তখন মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, স্থানু হয়ে। ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে চোখের জল। ঠোঁট টিপে কান্না চাপার চেষ্টা করছে প্রাণপনে। একটু আগে আকাশকে বলেছিল নিজের বিয়ের দিন সে কিছুতেই কাঁদবে না। আকাশ যদি এখন এই কাঁদুনে অমৃতাকে দেখতে পেতো! ভাগ্যিস দেখেনি! অমৃতা চায় না এই মুখ কেউ দেখুক। চায় না! চায় না! চায় না!

– 'এই মেয়ের কী হয়েছে?' রোমেলা স্তব্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন।

অমৃতার দিকে গম্ভীর দৃষ্টি তাক করে রেখে স্ত্রীর কাঁধে একটা হাত রাখলেন রাশেদ, 'জানি না। চলো!' বললেন তিনি ঠিকই, কিন্তু অমৃতার অশ্রুবৎ চোখ দুটোর ওপর থেকে কোনোভাবেই দৃষ্টি সরাতে পারছিলেন না। জরাগ্রস্ত শরীরটা নিয়ে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশাপাশি হেঁটে গেলেন। হঠাৎ করে তিনি দুর্বল বোধ করছেন। কী আশ্চর্য! এই মেয়েটা কাঁদলে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় কেন?

রোমেলা বললেন, 'এই মেয়েটাকে আমার একেবারেই পছন্দ না। খুবই বেয়াদব একটা মেয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক করছিল কেন? কী ব্যাপার?

হক অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'হুম? জানি না। বাদ দাও।'

সামির ঘরে এসে অমৃতা অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল। বুকের খাঁচায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুন। আগুন পোড়া গন্ধ সে নিশ্বাসের সাথে টের পাচ্ছিল। এরকম কেন হলো তার সাথে? কেন পৃথিবীতে এত এত মানুষ থাকতে অন্যের স্বামীকে, অন্যের বাবাকেই সে ভালোবাসতে গেলো? আর দশজনের মতো তারও তো একটা সাধারণ জীবন হতে পারত! নিজের ওপর এক তীব্র ঘেন্নায় গা গুলিয়ে আসতে লাগল তার।

৫৫

ড্রইংরুমের সোফায় হৃদি আর সামি পাশাপাশি বসে আছে। দুজনেই ক্লান্ত। মিষ্টিমুখ করার ইচ্ছে, উদ্যম, সামর্থ এর কোনোটিই তাদের মধ্যে উপস্থিত নেই এখন। তবুও যন্ত্রের মতো মুখে মিষ্টি পুরতে হচ্ছে। বিশাল বড় কক্ষটির এক কোণায় বাজনার যন্ত্র নিয়ে বসেছে গানের দল। এখন অবশ্য বাজনা বলতে শুধু কীবোর্ড আর গিটার। দলের ভোকাল গান গাইছে। গানের তালে তালে মহা উৎসাহে নেচে যাচ্ছে সামির অল্পবয়সী কয়েকজন কাজিন। ফটোগ্রাফার তখনও ছবি তুলে যাচ্ছে অক্লান্ত ভাবে।

রোমেলা নতুন বৌয়ের গলায় শাশুড়ির দেওয়া হার পরিয়ে দিলেন। এবার পারিবারিক ছবি তোলার পালা। ছেলে আর ছেলের বৌয়ের পাশে গিয়ে বাবা মাকে বসতে হবে। হক সাহেবের ছবি তোলার প্রতি বরাবরই অরুচি এবং অনাগ্রহ। কিন্তু আজ একটি বিশেষ দিন। আজকে ছবি না তোলার কোনো বাহানাই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া

তিনি নিজেও চান স্মৃতির অ্যালবামে আজকের দিনটি ছবি সহকারেই লিপিবদ্ধ করা হোক। পরিবারের চারজন বসল একটি সোফায়। সামি, হৃদি, রোমেলা, হক। ক্যামেরার ক্লিক পড়তে থাকল। লোকে বলবে, কী চমৎকার পরিবার! নিটোল, নির্মল, সুখী জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন। একদম হিংসে করার মতো! হিংসে হচ্ছেও অনেকের। কেউ কেউ আবার সেই জ্বলন্ত হিংসের স্ফুলিঙ্গে ঠান্ডা জলের ছিটে দিচ্ছে এই ভেবে যে এত চেষ্টা করেও সামির মা মনের মতো বৌ আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বৌ হয়ে আসলো অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ে। দারুণ কিন্তু ব্যাপারটা! তবে কাল থেকে শুরু হবে আসল মজা! ছেলের বৌয়ের সাথে রোমেলার মতো ঠোঁটকাটা, দাম্ভিক মহিলার যে কোনোভাবেই বনিবনা হবে না তা পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, এমনকি অফিশিয়াল লোকজন পর্যন্ত সবাই জানে। অনেকেই অপেক্ষায় আছে মজা দেখবে বলে।

হক সাহেবের চোখ খানিক বাদে বাদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের মূল দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। মেয়েটা কোথায়? এখনো ফিরছে না কেন? চার্জার খুঁজে পেতে তো এত সময় লাগার কথা না। চোখের সামনে বারংবার মেয়েটির অশ্রুমাখা মুখটা ভেসে উঠছিল। ধমক দেওয়া আর খিটখিটে আচরণ করা তাঁর স্বভাব। দেশ সুদ্ধ লোকে জানে, তিনি এমনই। এর আগে, কোনোদিন কাউকে ধমক দেওয়ার পর এতটা অনুশোচনা হয়নি তার। আজ একটা গ্লানি বোধে অন্তর ছেয়ে গেছে। ইশ অত কড়াভাবে কথাটা না বললেই হতো! তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। ছবি তোলার পালা শেষ হলে একটু আড়াল হয়ে অমৃতার নম্বরে ডায়াল করলেন। তিন চারটা রিং পড়তেই ওপাশ থেকে কেটে দেওয়া হলো ফোন। তিনি দ্বিতীয়বার ফোন করলেন। পরিণতি একই হলো। তাঁর শ্যামবর্ণ মুখে একটু রক্তের ঝলক উঠে আসলো। তাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ফোন কেটে দেয়, এমন মানুষ এ দেশে বিরল। প্রত্যাখ্যাত হওয়া একেবারেই অভ্যেসে নেই। এমন কি নিজের স্ত্রীও এই ফোন কেটে দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক কাজটা কখনও করেছেন বলে মনে পড়ে না। স্ত্রীর সাথে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হলেও ঝগড়া হয় না বললেই চলে। তাদের

সম্পর্কটা শান্ত, স্থির, নিস্তরঙ্গ নদীর মতো। আজকে কিনা একটা বাচ্চা মেয়ে তাঁর ফোন কেটে দিচ্ছে বারে বারে। এত বড় স্পর্ধা!

আরো মিনিট দশেক বাদে অমৃতা নিচে নামল। ওর চোখ মুখ থেকে মেকআপ উঠে গেছে। মুখ ধুয়ে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। চোখের নিচে একটু কাজলের কালো দাগ। চেহারা থমথমে। সে আসা মাত্র সামির কাছে চার্জার হস্তান্তর করল। হক কোণার একটা সোফায় বসে ছিলেন। তাঁর ফুপু আম্মা তখন নতুন বৌকে উপহারস্বরূপ স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে কীবোর্ড বাজিয়ে এলভিস প্রিসলির একটা বিখ্যাত গান গাইছে রুদ্রর বন্ধু। কার্পেটের ওপর কয়েকজন ছেলে মেয়ে হালকা তালে নেচে যাচ্ছিল গানের সাথে সাথে। রুদ্র অমৃতাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'নাচবি?'

– 'ধুর না!' বলতে বলতে চোখ পড়ল লোকটার ওপর। এক ঝলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল অমৃতা। এখানে বসে বসে খুব ফোন করা হচ্ছে! না, ফোন অমৃতা ধরবেই না! এতও সস্তা না সে। হঠাৎ কী মনে করে যেন অমৃতা মত পরিবর্তন করল। রুদ্রকে ডেকে বলল, 'চল, নাচি।'

লোকটার দিকে চোখা চোখে তাকালো সে আবার। তাকিয়ে থেকেই রুদ্রর হাত ধরল। তারপর গানের তালে তালে ধীরে ধীরে নাচতে লাগল।

Wise men say only fools rush in

But I can't help falling in love with you

shall I stay, would it be a sin

if I can't help falling in love with you?

রুদ্রর মুখে একটা আচ্ছন্নতা ভর করেছিল। যে আচ্ছন্নতাটুকু অমৃতা টের না পেলেও খানিক দূরে বসে থাকা আকাশ ঠিকই টের পাচ্ছিল। কিন্তু অমৃতার মনোরথের সওয়ারি তখন রুদ্র নয়, অন্য কেউ। নাচতে নাচতে তার পুতুল দুটি চোখ বারে বারে পিছলে গিয়ে পড়ছে খানিক দূরে বসে থাকা ধারালো মুখের সুদর্শন ব্যক্তিটির ওপর। চোখ দিয়ে বলতে চাইছে সে, হ্যাঁ তোমাকে ছাড়াও অমৃতা ভালো থাকবে। এই দেখো অমৃতা নাচছে, গাইছে! অমৃতার কেউ না থাকলেও আছে বন্ধুরা। আজ তোমাকে ভালোবাসলো বলেই অমৃতা ঠুনকো হয়ে গেলো। খুব বিরক্ত তুমি অমৃতার ওপরে, তাই না? বেশ তো আজ থেকে অমৃতা আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করবে না। থাকো তুমি তোমার মিথ্যে অহংকার নিয়ে। ভাবছিল ঠিকই এসব খটোমটো কথাবার্তা। কিন্তু ওই গভীর চোখের ওপর থেকে কিছুতেই দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! কত দিন দেখতে পাবে না ওই মুখ! কাল তো চলেই যাচ্ছে! কত্ত দূরে!

রাশেদ ঠোঁট টিপে গম্ভীরভাবে চেয়ে ছিলেন। লম্বা চুলো ছেলেটার একটা হাত রাখা অমৃতার কোমরে, অপর হাত কাঁধে। ছেলেটা হঠাৎ হাত উঁচু করে ঘুরিয়ে দিল ওকে। ওর সুন্দর শরীরটা চরকির মতো ঘুরলো কয়েক বার গানের তালে। স্প্রিং এর মতো বাঁকা হয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে এসে পড়ল ছেলেটার ডান বাহুর ওপর। রাশেদ উঠে পড়লেন। দৃশ্যটা কেন যেন তাঁর আর দেখতে ইচ্ছে করছিল না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসলেন তিনি। মাথা হেঁট করে বিষণ্ন মন নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে লাগলেন লাইব্রেরি ঘরের দিকে। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে আকাশে। মগজের ভেতরে কোনো এক বিচিত্র কারণে গানের লাইনগুলো গেঁথে গিয়েছিল। মাতাল বাতাসে কানের কাছে পাখির মতো কিচিরমিচির করে উড়ে বেড়াচ্ছিল গানটা।

Wise men say only fools rush in

But I can’t help falling in love with you

like a river flows, surely to the sea

Darling, so it goes, some things are meant to be ...

ঝড়ো বাতাস বইছে। এলোমেলোভাবে উড়ছে ধুলো। আকাশে হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে নীল বিদ্যুৎ। হাঁটতে হাঁটতে মনের অজান্তেই তিনি একবার বিকারগ্রস্থের মতো স্বগোতক্তি করলেন,

Shall I stay, would it be a sin

if I can't help falling in love with you?

Darling, so it goes, some things are meant to be

৫৬

রাত প্রায় একটার দিকে বর বৌকে দোতলায় নিয়ে আসা হলো। কিন্তু বন্ধুদের ঘাড় ধাক্কা দিয়েও ঘর থেকে বের করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সামি না পারতে বলেই ফেলল, 'মানে কী? তোরা বাইর হস না ক্যান? আমাদের সাথে সারা রাত থাকবি? আজকে আমাদের বাসর রাত! ব্যাপারটা বুঝতেছিস?'

রুদ্র, বিভা আর আকাশ গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানো বিছানায় পা তুলে বসে ছিল, নতুন বৌয়ের পাশে। সামি বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝ বরাবর। রুদ্র হাই তুলতে তুলতে উদাস গলায় বলল, 'সারা রাত থাকার আইডিয়াটা খারাপ না। ভালোই! বেশ ফুলটুল দিয়ে সাজানো ঘর! আমিও একটা বাসর বাসর ফ্লেভার পাচ্ছি!'

শুনে হৃদি খিলখিল করে হেসে উঠল। বিছানার ওপর পা ভাঁজ করে বসেছে সে। একটু আগ পর্যন্তও সামির কাজিনরা তার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল অবিরত। একজন মুরুব্বি গোছের আত্মীয়া মহিলা ধমক দিয়ে তাদের ঘর থেকে বের করেছে। তাতে লাভটা কী হলো? আসল বিচ্ছুগুলোকে তো কোনোমতেই বিদায় করা যাচ্ছে না।

সামি নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, ‘বাসর বাসর ফ্লেভার পাচ্ছিস? শালা আজকে তোর বাসর নাকি আমার?

–’ বিয়া তো কইরাই ফেলছস, এখন প্রতিদিনই বাসর রাত। আজকে বরং বন্ধু রাত কর। এইটা ইউনিক।’ রুদ্রর ভাবলেশহীন উত্তর।

বিভা ঘোষণা দেবার ভঙ্গিতে উঁচু গলায় বলল ‘আরে আমরা এখন কোথাও যাব না। এখন নতুন দুলাভাইয়ের জন্য একটা স্পেশাল পারফরমেন্স হবে।’ এটুকু বলে সে অমৃতার দিকে চেয়ে বলল, ‘রেডি?’

অমৃতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, সে রেডি। তারপর আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে দুই বান্ধবী সামিকে দুপাশ থেকে ঘিরে ধরল। গান গেয়ে উঠে শুরু করল নাচ।

‘দুলাভাই দুলাভাই ও আমার দুলাভাই

চলো না সিনেমা দেখিতে আজ যাই

সিনেমার নাম নাকি তোমাকে চাই, দুলাভাই!

সিনেমার নাম নাকি তোমাকে চাই!’

দুই বান্ধবীর রং ঢং দেখে সামির মুখখানা রাগে পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলো। ওদিকে হৃদি হেসে যাচ্ছে খিলখিল করে। আকাশ আর রুদ্র সিটি বাজাচ্ছে গানের সাথে সাথে। সামি অমৃতার কানের ডগা খামচে ধরে দাঁত কিড়মিড় করে বলল 'বাইর হবি নাকি সিকিউরিটি ডাকব আমি এখন?'

– 'একী অবস্থা? বিয়ে করার সাথে সাথে বন্ধুরা পর হয়ে গেলো? হ্যাঁ? বৌয়ের জন্য এখন বন্ধুর গায়ে হাত তোলা হচ্ছে?' মুখ বাঁকালো অমৃতা

রুদ্র বলল, 'যাইতে পারি এক শর্তে।'

সামি রাগে ফেটে পড়ে বলল, 'তোর শর্তের আমি গুষ্টি কিলাই।'

–' ট্যাকা দে কিসু। নিজের শালা শালিদের কে তো ট্যাকা দিয়া বড়লোক বানায় ফালাইছস। এখন বন্ধুদেরকে ট্যাকা দে।' হাত পাতলো রুদ্র। বিভা এবার এগিয়ে এসে জোর করে বসা থেকে টেনে তুলল রুদ্রকে। তুলল আকাশকেও। দু হাত দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দুই মূর্তিকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। রুদ্র কিছুতেই যাবে না। সে নাছোড় গলায় চিৎকার করতে লাগল, 'যাব না! টাকা না দিলে যাব না।'

এবার অমৃতাও রণে ভঙ্গ দিল। পা বাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে যাচ্ছি। তার আগে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি। তোদের বিয়ের উপহার রাখা আছে খাটের তলায়। দেখে নিস।'

সামি বাঁকা হাসল, ‘উপহার? বিয়েতে যে উপহার দিতে হয় সেটা মাথায় আছে তোদের?’

হৃদি ফোড়ন কাটল, ‘উপহার দিবি ভালো কথা, হাতে হাতে না দিয়ে খাটের তলায় রাখার মানে কী? সব কিছুতেই একটা কেমন চোর চোর ভাব তোদের।’

– ‘রাখলাম আর কি, মনে হইল খাটের তলটাই সেইফ।’ বিভা দরজার ওপাশে পা ফেলার ঠিক আগ মুহূর্তে হৃদি ওকে পেছন থেকে ডাকল একবার।

– ‘বিভা শোন! থ্যাংক ইউ দোস্ত!’

– ‘আমাকে থ্যাংকস কেন? পাগল নাকি?’ থমকে দাঁড়াল বিভা।

হঠাৎ যেন সামির কিছু একটা মনে পড়ল, ব্যস্ত গলায় বলল, ‘অ্যাকচুয়েলি, আমার কাছ থেকেও একটা থ্যাংকস পাওনা আছে তোর, বিভা! ‘

– ‘হচ্ছে কী এসব? আমাদের মধ্যে আবার থ্যাংকস, স্যরি এসব ফর্মালিটিস কবে থেকে আসলো?’

– ‘ফর্মালিটিস না, দিস ইজ জেনুইন। থ্যাংক ইউ বিভা। তুই আমাকে ডাম্প না করলে হৃদিকে আমি কখনই পাইনাম না! সেদিন তোকে হঠাৎ রাগের মাথায় বলে ফেলছিলাম যে, সব দোষ তোর। কথাটা আমি ভুল বলছিলাম। আসলে তোর কোনো দোষ নাই। বরং সব ক্রেডিট তোর।’

বিভার ডাগর দুটি চোখের তারায় বিস্ময় রেখা চমক দিয়ে উঠেছিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কেমন একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। পরমুহূর্তেই চট করে বিভ্রান্তিটা লুকিয়ে নিয়ে সে বলল, 'ভুল হচ্ছে সামি, আই হ্যাভ নেভার ডাম্পড ইউ। ইউ ডিড।'

– 'মানে কী? আমি আবার কবে কী করলাম?' সামি অবাক।

– 'আমি তোর জন্য অভিজিৎকে ছাড়তেও রাজি ছিলাম। কিন্তু তুই··· তুই আমার সাথে রিলেশন থাকা অবস্থায় হৃদিকে কিস করছিলি। ভুলে যাস না।'

সামি অস্থির হয়ে বলল, 'বাট দ্যাট ওয়াজ আ মিস্টেক!'

বাকি বন্ধুদের মধ্যে অস্বস্তি দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে। অমৃতা চ্যাঁচাল, 'এসব কথা আজকেই বলতে হবে? আজিব কারবার!'

বিভার গলাটা উঁচুতে উঠে গেলো, 'হ্যাঁ অমৃতা, আজকেই বলতে হবে। সামিকে বুঝতে হবে যে আমার সাথে ব্রেকআপটা ওকে হৃদির কাছে নিয়ে যায় নাই। বরং ও হৃদির কাছাকাছি ছিল বলেই আমি ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেছি। তাছাড়া ডুয়ার্সের ঘটনাটা কোনো মিস্টেক ছিল না। দ্যাট ওয়াজ ইওর ডেসটিনি সামি! ভুল নয়, ওটা ছিল আশীর্বাদ!'

সামি হতচকিত ভাবে তাকালো বিভার দিকে। ভেতরটা এক অস্ফুট আলোড়নে মেতে উঠল হঠাৎ। সম্মুখে যেন একটি পর্দার উন্মোচন হলো। আঁখি দর্পণে ভেসে উঠল

অজানা, অচেনা, দুর্বোধ্য এক সত্য। বিভার বলা কথাটাই বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করল তার। সেই ঘটনাটা কোনো ভুল ছিল না। ছিল আশীর্বাদ!

—'হৃদি শোন, সামি কখনোই আমার ছিল না। তোর ছিল, তোর আছে, তোরই থাকবে।' এটুকু বলে একটা বড় শ্বাস ফেলল সে। অন্য বন্ধুরা ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। বিভাও আর দাঁড়াল না।

– 'বিভা! উই লাভ ইউ দোস্ত! আমরা তোকে ভালোবাসি!' পেছন থেকে ভেসে আসলো হৃদির কণ্ঠ।

সামিও যোগ করল একটু অন্যমনস্ক গলায়, 'হ্যাঁ বিভা, আমরা তোকে ভালোবাসি। মনে রাখিস!

– 'আমিও তোদের ভালোবাসি।' বলে বিভা ভারি সুন্দর হাসে। ডাগর চোখে চিকচিক করে কয়েক বিন্দু জল।

বিভা চলে যাবার পর সামি ঘরের দরজাটা ভালো মতো বন্ধ করল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল সাদা টিউবলাইটের নিচে বৌ সেজে বসে থাকা হৃদিতাকে। হৃদিতা ওর দিকেই চেয়ে ছিল তখন অনিমেষ চোখে। দমকা বাতাস জানালা গেলে ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। দস্যি ছেলের মতো ফুলের পাঁপড়িগুলো উড়িয়ে দিচ্ছিল এদিক সেদিক। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল। তারপর শুরু হলো মুষলধার বৃষ্টি!

৫৭

সাধারণত লাইব্রেরি রুমে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন আপনাআপনিই একটা সময় শান্ত হয়ে আসে। মাথার জটগুলো ধীরে ধীরে খুলে যায়। কাজে মন বসে। কিন্তু আজ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে লাইব্রেরি রুমে হক সাহেবের মন টিকল না। আগামীকাল সকাল এগারোটায় রিপোর্টিং। প্লেন টেক অফ করবে সাড়ে বারোটায়। গোছগাছ মোটামুটি হয়ে গেছে। তেমন কোনো কাজ বাকি নেই। তবে রাতের মধ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ইমেইল করতে হবে। এখন বাজে রাত দেড়টা। মাথা ভার হয়ে আছে। শরীর ক্লান্ত। তাঁর উচিত খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিতে চলে যাওয়া। কিন্তু মাথার নার্ভগুলো বিশ্রাম নিতে চাইছে না, দপদপ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যাচ্ছে অবিরত।

লাইব্রেরি থেকে তিনি আধাঘণ্টা পর ফিরলেন বাড়িতে। দোতলায় নিজের শোবার ঘরে এসে দেখলেন রোমেলা নেই। ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। কিন্তু টি এস এ লক লাগানো হয়নি এখনো। লাগেজে টি এস এ অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন লক না থাকলে ইউ এস কাস্টমসে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি আলমারির ড্রয়ার থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু পেলেন না। একটু তিরিক্ষি হয়ে উঠল মেজাজ। চাপা রাগে গজগজ করতে করতে স্ত্রীর খোঁজে বের হলেন ঘর থেকে। বের হওয়া মাত্র করিডোরে ছেলের বন্ধুদের মুখোমুখি পড়ে গেলেন। ছেলের রুম করিডোরের শেষ মাথায়। নিজের রুম থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। ছোট্ট দলটার মধ্যে তিনি মেয়েটাকে দেখলেন। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা নজর সরিয়ে নিল। হেঁটে হেঁটে ছেলেমেয়েরা সামনে আসলো। দলের একটি মেয়ে তাঁকে সালাম দিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট মেয়েটি আর একবারের জন্যও চোখ তুলে তাকাল না। এটা এমন কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। কিন্তু তাঁর অস্থিরমতি মনটা হঠাৎ বিনা কারণেই আরো যেন বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। গনগনে রাগের আঁচটা চেহারায় টের পাওয়া যাচ্ছিল। সেই ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি নিয়েই তিনি করিডোরে পায়চারি রত এক চাকরের কাছে

স্ত্রীর খোঁজ করলেন। জানা গেলো রোমেলা আছেন নিচতলায় ডাইনিং রুমে। তিনি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলেন। রোমেলা ডাইনিং এর উঁচু গদির চেয়ারে রাণীর মতো বসে আছেন। ঘরময় গিজগিজ করছে জনা দশেক নারী পুরুষ। এরা সবাই হক সাহেবের শ্বশুরবাড়ির লোক। তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজনেরা রোমেলার আশেপাশে খুব একটা ঘেঁষে না। নতুন বৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে বিয়েবাড়ির খাবার পাঠানো হয়েছে। সাথে নানা রকম পিঠা এবং মিষ্টি। রোমেলা কাজের লোকের মাধ্যমে সেইসব খাদ্যদ্রব্য আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছেন। বাক্সে বাক্সে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে খাবার। মেঝেতে পান আর মিষ্টির ডালা খুলে বসেছে এক বয়স্কা আত্মীয়া। অল্প বয়সী এক মেয়ে, খুব সম্ভবত তাঁর ছোট শালির কন্যা, রোমেলার হাতে যত্ন সহকারে মেহেদী পরিয়ে দিচ্ছে। বেশ উৎসব উৎসব একটা ভাব চারপাশে। হক সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরিবেশটা পর্যবেক্ষণ করলেন ভ্রু কুঁচকে। একটু দরাজ গলায় স্ত্রীকে বললেন, 'এই শোনো, আমার টি এস এ লক খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় আছে জানো তুমি?'

ঘরে উপস্থিত লোকজন হক সাহেবকে দেখে হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেলো। তাঁকে প্রত্যেকেই একটু ভয় পায়। তিনি টের পান তাঁর উপস্থিতি কাছের আত্মীয়দের মধ্যে একটা অস্বস্তির উদ্রেক করে আজকাল। খুব প্রয়োজন ছাড়া এরা কেউ তাঁর সাথে কথা বলে না। তিনিও চান না এদের কাউকে বিরক্ত করতে। রোমেলা দায়সারা গলায় বললেন, 'গত বছর আমেরিকা থেকে ফেরার পর আমি তো চাবিগুলো আর চোখেও দেখিনি। তুমিই জানো কোথায় রেখেছ।' কথাটা বলে শেষ করে তিনি আবার নিজস্ব জগতে মগ্ন হয়ে গেলেন। উপস্থিত লোকজনের ভেতর থেকেও জড়তা কেটে গেলো। তারা আলাপে মশগুল হয়ে গেলো মুহূর্তের মাঝে। হক কিছুক্ষণ দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকে রোমেলাকে দেখলেন। রোমেলা এসব সামাজিকতা করতে বরাবরই খুব ভালোবাসে। এদিকে সারাক্ষণ কানের কাছে ছেলের বৌ পছন্দ হয়নি বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করে যাচ্ছে, অথচ এখন আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বসে হাসিমুখে বৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে পাঠানো খাবার বিলি করছে। একটু আগেই সে স্বামীর কানে কানে ফিসফিস করে বলেছে, 'বিয়ের খাবার এত বাজে ছিল! ছিঃ কোন কুখ্যাত

বাবুর্চিকে দিয়ে রান্না করিয়েছে আল্লাহ জানে!’ তার চরিত্রের এই দ্বিমুখিতার কারণ কী? মানুষটাকে আজও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলেন না হক। কাল সকালে তিনি দূরের পথে যাত্রা করবেন। এ মুহূর্তে কি রোমেলার উচিত নয় অন্যান্য সব কাজ ফেলে রেখে স্বামীকে সঙ্গ দেওয়া? এতটুকু আশা করা কি অন্যায়?

দরজার গোড়ায় তাঁকে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোমেলা এবার মিহি স্বরে বললেন, ‘কী গো? কিছু বলবে? আচ্ছা আমি মহসিনকে পাঠাচ্ছি। ও তোমার চাবি খুঁজে দেবে।’

– ‘থাক লাগবে না। আমিই খুঁজে নেবো।’ কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। দোতলায় নিজের শোবার ঘরে পুনরায় ফিরে এলেন। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলেন চাবি। পাওয়া গেলো না। খুব সকালে লোক পাঠিয়ে চাবি কিনিয়ে আনতে হবে। এত সকালে মার্কেট খুলবে কি? বিষণ্ণ মনটায় নতুন দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। খানিক বাদে তিনি পায়ে পায়ে নিচে নেমে আসলেন। ফিরে গেলেন লাইব্রেরি ঘরে। ইমেইলগুলো পাঠিয়ে দিলেই আপাতত কাজ শেষ। ভাবলেন একরকম, কিন্তু করলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম। লাইব্রেরিতে এসে ভীষণ অন্যমনস্কভাবে সেলফোনটা হাতে নিলেন তিনি। ডায়াল করলেন অমৃতার নম্বরে। ফোন কেটে দেওয়া হলো ওপাশ থেকে। মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। অনেক দিন পর ভয়ংকর এক করাল রাগ তাঁকে অন্ধপ্রায় করে তুলল। অস্থিরমতি মন নিয়ে দ্বিতীয় ফোনটি তিনি সুলেমানের নম্বরে করলেন।

নিচতলার দুটি ঘরে বন্ধুদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। সবাই ক্লান্ত। অমৃতা মাত্র গোসল সেরে এসেছে। সে বেরোতেই বিভা ঢুকল বাথরুমে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে। লেবু রঙের একটা ঢোলা টি শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরেছিল অমৃতা। গোসলের পর ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে শরীরের মরা, ক্লান্ত কোষগুলো সব ঠান্ডা জল পড়তেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের বাতি নেভানো। সে দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। লোকটা কেন

বারবার ফোন করছে কে জানে। আজ সে নিজের সাথে নিজে ওয়াদা করছে। কোনোভাবেই ফোন ধরবে না! কাজটা খুব কঠিন হয়ে গেছে তার জন্য। হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে সব রাগ ভুলে গিয়ে ফোন ধরে ফেলে। কাল সকালেই তো চলে যাচ্ছে। আবার কতদিন দেখা হবে না! কে জানে হয়তো এর পরের বার ফোন করলে অমৃতা ধরেই ফেলবে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আজকাল জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। কেউ একজন করাঘাত করে যাচ্ছে অনবরত। অমৃতা সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেলো। সে নিশ্চিত এই আগন্তুক রুদ্র অথবা আকাশ নয়। দরজা নাড়ার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। দরজা খুলে মাথা বের করল সে। ওপাশে জ্বলতে থাকা ফকফকে আলোয় পরিষ্কার দেখল একটা মোটাসোটা বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে অমৃতা চেনে। এ বাড়ির কর্মচারী সুলেমান।

– ‘কী ব্যাপার?’

– ‘ম্যাডাম আপনাকে একটু আসতে হবে।’ চাপা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলল সুলেমান।

– ‘মানে? কোথায় আসতে হবে?’

সুলেমান একটু আশপাশটা ভালো মতো দেখে নিয়ে গলা খাদে নামিয়ে বলল, ‘স্যার ডাকছেন।’

চমকে উঠল অমৃতা। চমকটা শুধু ওকে বিস্ময়ই নয়, সেই সাথে একটুকরো উড়ো ভালোলাগাও উপহার দিয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, ‘কিন্তু কেন?’

সুলেমান তার ভাবলেশহীন মুখটা শক্ত করে বলল, ‘সেটা আমি বলতে পারছি না। তবে আপনাকে একবার যেতে হবে।’

কেউ একজন আসছিল উল্টো দিকের ছোট্ট করিডোরটা দিয়ে। শব্দ শুনতে পেয়ে সুলেমান তাড়া দিয়ে উঠে বলল, ‘স্যার লাইব্রেরি ঘরে আছেন। এখুনি আসুন আপনি।’

কথাটা বলেই সে ঘুরে দাঁড়ালো। বিভা তখন গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। অমৃতার হতভম্ব চেহারাটা দেখে সে অবাক গলায় বলল, ‘কী হয়েছে তোর?’

অমৃতা কিছুক্ষণ স্থবিরভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল। চাইলো ঠিকই কিন্তু ভাবলো অন্য কিছু। ভীষণ আনমনাভাবে বলল, ‘বিভা, তুই থাক। আমি আসছি একটু।’

– ‘যাচ্ছিস কোথায়?’

– ‘উনি ডাকছেন।’

– ‘অমৃতা! এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। প্লিজ কোথাও যাস না। ‘ অমৃতা পায়ে স্যান্ডেল দিতে দিতে বলল, ‘যেতে হবে দোস্ত!’

৫৮

সুলেমান অনেক আগেই চলে এসেছে লাইব্রেরিতে। দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে নিষ্প্রাণ পাথরের ন্যায়। ঘরের ভেতরে একটা নিষ্প্রভ আলো জ্বলছে। ঝড়ো বাতাসে উড়ছে জানালার পর্দা। উড়ন্ত পর্দার ফাঁক গেলে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা এক নজর দেখল অমৃতা। স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা গেলো না কিন্তু মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিরশিরানি ভাব বিদ্যুতের মতো চিলিক দিয়ে গেলো। ঘরটা যেন অলৌকিক এক রহস্যময়তা গায়ে জড়িয়ে রেখে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভয়, আনন্দ এবং কৌতূহল এই তিনটি অনুভূতি একত্রে মিলেমিশে তাকে অবশ করে দিচ্ছে। দরজা ভেজানো ছিল। অমৃতা কম্পনযুক্ত হাতে একটা আলতো ধাক্কা দিয়ে খুলল দরজাটা। ল্যাম্পশেডের মরা আলোয় দেখতে পেল মানুষটা বসে আছেন চেয়ারে, টেবিলের সামনে। অমৃতা অনেক কষ্টে বরফের মতো জমে যাওয়া পা দুটোকে সামনে এগিয়ে দিল।

– 'তুমি ফোন ধরছিলে না কেন?' সেকেন্ড না গড়াতেই তিনি ভয়ংকর শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। গভীর চোখদুটো দিয়ে তখন ঠিকরে বেরোচ্ছে আগুন। আকস্মিক, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নটা অমৃতাকে প্রথমে একটু থমকে দিল। পরমুহূর্তেই একটা অভিমানের ঢোক এসে গলার কাছে বিঁধল তার। পাতলা ঠোঁটদুটি কিঞ্চিৎ বেঁকে গেলো অতর্কিতে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'কথা বলি না আমি আপনার সাথে!'

– 'কী বললে?' গর্জনটা একদম বুকে গিয়ে লাগল। বাব্বাহ এত রাগ! অমৃতা যেন তার কেনা গোলাম। ফোন করলেই ধরতে হবে। আর তিনি দিব্যি অন্য লোকের সামনে অমৃতাকে যখন তখন অপমান করে বসবেন। চমৎকার!

অমৃতা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে একটু আলগাভাবে বলল, 'বললাম তো, কথা বলি না।'

– ‘ঠিক আছে। কোনো কথা বলতে হবে না। চুপচাপ বসে থাকো এখানে।’ বজ্রগম্ভীর গলায় আদেশ দিলেন তিনি।

– ‘হ্যাঁ?’ অমৃতা অবাক।

– ‘বসে থাকো চুপচাপ!

– ‘বসে থাকব? এমনি এমনি? কেউ চলে আসলে?’

লোকটার মুখের রং হঠাৎ পাল্টে গেলো। তীব্র হয়ে উঠল চোখের চাউনি।

– ‘কেউ আসলেই কী? ভয় কীসের? তোমার কি আমাকে ভীতু মনে হয়?

একটা উষ্ণ তৃপ্তির ঢেউ এসে অমৃতার মন ভিজিয়ে দিয়ে গেলো আচমকা। এই কথাটিই যেন শুনতে চাইছিল সে মনে মনে, অনেক দিন ধরে! ভয় কীসের?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, ‘তুমি কি ভয় পাচ্ছ?’

অমৃতা শ্রাগ করে বলল, ‘নাহ! আমার ভয় কীসের? আপনি আছেন তো! কথাটা বলে শেষ করে সে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলল,’এখন আমার কী করতে হবে? চুপচাপ বসে থাকতে হবে?’

– হুম।’

– ‘আর আপনি কী করবেন?’

– ‘আমার কাজ আছে। আমি কাজ করব।’ ভ্রু কুঁচকে টেবিলের ওপর রাখা ল্যাপটপ চালু করলেন তিনি।

– ‘বেশ।’

বাইরে মেঘ ডাকছিল গুমগুম শব্দ তুলে। দমকা বাতাসে ফুলে ফেঁপে উঠছিল জানালায় ঝোলানো সাদা পর্দা। সাপের লিকলিকে জিহবার মতো নীল বিদ্যুতের শিখা থেকে থেকে চমকে উঠছিল অন্ধকার আকাশে। লোকটা ফাইলের বস্তা নিয়ে বসেছেন। একটা ফাইল খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন কিছু সময়। তারপর ল্যাপটপে টাইপ করতে লাগলেন মনোযোগ সহকারে।

অমৃতা কনুই টেবিলের ওপর রেখে গালে হাত দিয়ে দেখছিল কর্মরত মানুষটাকে। গম্ভীর মুখ, উষ্কখুষ্ক চুল, ধারালো চোয়াল, ভাঁজযুক্ত কপাল··· বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়া··· অতল গভীর! ওই মুখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটায় কেমন বিষণ্ন সুন্দর এক শঙ্খ বেজে ওঠে অজান্তেই! মনে হচ্ছিল এভাবে চুপ করে ওই দিকে চেয়ে থাকার মতো চিত্তরঞ্জন কাজ বুঝি আর নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। হঠাৎ তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

– ‘কাজটাজ কিছু করো! কথা বলা নিষেধ, কাজ করা নিষেধ নয় তো! অমৃতা গাল থেকে হাত সরিয়ে বলল, ‘করছি তো!’

– ‘কী করছ?’ খটমটে প্রশ্ন লোকটার।

অমৃতা মিষ্টি হেসে বলল, ‘আপনাকে দেখছি!’

– ‘আমাকে দেখতে হবে না। অনেক বই আছে এ ঘরে। একটা বই নিয়ে এসে পড় বসে বসে।’ সুন্দর করে বললেন তিনি, স্পষ্ট গলায়। অগত্যা অমৃতাকে উঠতেই হলো। খুব একটা সময় নষ্ট করল না সে। শেল্ফের প্রথম সারি থেকেই একটা বই তুলে নিল। আলেক্সান্দার রাস্কিনের ‘বাবা যখন ছোট।’ বইটা নিয়ে টেবিলে ফেরত আসতেই সে লক্ষ্য করল আজ এই ঘরে আগরবাতি জ্বলছে না। ঘরের পশ্চিম কোণে অগ্নিবিহীন অবস্থায় নিষ্প্রাণ পড়ে আছে আগরবাতির স্ট্যান্ড। সে বইটা টেবিলের ওপর রেখে পকেট থেকে লাইটার বের করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসে জ্বালিয়ে দিল চারটা আগরবাতি।

রাশেদ আড়চোখে দেখলেন দৃশ্যটা। কী আশ্চর্য! আজকে তিনি আগরবাতি জ্বালাতেও ভুলে গিয়েছিলেন। অমৃতাকে বলতে হয়নি। নিজ উদ্যোগেই কাজটা করেছে সে। কেন যেন ভালো লাগল ব্যাপারটা। অমৃতা এসে বসল চেয়ারে। তিনি কাজে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন। অমৃতা বইটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। বইতে তার মন বসছিল না। তবে বই না পড়লেও সে ভান করল যেন বইয়ের ভেতর একেবারে ডুবে গেছে। মানুষটাকে কোনোভাবেই আর বিরক্ত করতে চায় না সে। মনে হচ্ছে একটু নড়লেই লোকটার ধ্যান ছুটে যাবে। কাল সকালেই তাঁর ফ্লাইট। কত লম্বা যাত্রা। একটু বিশ্রামও তো নিতে হবে নাকি? সারা দিন ছেলের বিয়ে নিয়ে কী একটা ধকল গেছে বেচারার ওপর দিয়ে। ভাবতে ভাবতে অমৃতা একদম কাঠ হয়ে বসে রইল। খুব তেষ্টা পাচ্ছিল জলের। তবুও সে উঠল না।

রাশেদ একবার চোখ তুলে দেখলেন মেয়েটাকে। মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। ল্যাম্পশেডের নরম হলদে আলো এসে পড়েছে ওর আদুরে ফর্সা মুখে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল তার। অবাক ব্যাপার হলো এতক্ষণ ধরে অনবরত উত্যক্ত করা অস্বস্তিটা হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে। বুক থেকে নেমে গেছে পাথর। মাথা ঝরঝরে লাগছে। মগজের জমে যাওয়া কোষগুলো সচল হয়ে উঠেছে পুনরায়। তিনি এখন ভাবতে পারছেন, কাজ গুছিয়ে নিতে পারছেন। একটা নিশ্চয়তায় ভরে গেছে মন। মনে পড়ছে অনেক দিন আগের এমনই এক শ্রাবণ মেঘে ঢাকা মাঝ রাত্তিরের কথা। তখন মা বেঁচে ছিলেন। এইচ এস সি পরীক্ষা চলছে। কী উপলক্ষে যেন গ্রাম থেকে একগাদা আত্মীয়স্বজন এসে ভিড় করেছে তাদের বাড়িতে। পরদিন কেমিস্ট্রি প্রথম পত্র পরীক্ষা। বাড়িতে এত লোকের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে কোনোমতেই পড়ায় মন বসছিল না। তখন বাড়িটি ছিল একতলা। সামনে লম্বা বারান্দা আর ভেতরে বড় বড় চারটি রুম। সে রাতে ছোট বাড়িটার কোথাও এক রত্তি জায়গা ছিল না, যেখানে নিরিবিলিতে পড়াশোনা করা যায়। এই লাইব্রেরি ঘর তখন বাবার দখলে। বাবা তার দুরবস্থা আঁচ করতে পারলেন। আড়ালে ডেকে নিয়ে এই ঘরের চাবি ধরিয়ে দিলেন হাতে। তিনি বইপত্র নিয়ে লাইব্রেরি ঘরে চলে আসলেন। সেদিনও বৃষ্টি ছিল, এমনই। আকাশে বিদ্যুতের পসরা, ঘরভর্তি দুরন্ত হাওয়া!

হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলো। মা দৌড়ে আসলেন মোমবাতি নিয়ে। টেবিলের ওপর রেখে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। তিনি মাকে যেতে দিলেন না। মনে হচ্ছিল মা চলে গেলেই তার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। হলও তাই। ভেতর বাড়ি থেকে কোন এক চাচি যেন ডাক দিলেন মাকে। মা আধাঘণ্টার জন্য অনুপস্থিত হলেন। সেই আধাঘণ্টায় তার কিছু মাত্র পড়া এগুলো না। আধঘণ্টা পর মা যখন ফিরে আসলেন, তখন তার লেখাপড়ার মনোযোগী মনটাও ফিরে আসলো আপনাআপনি। অনেক রাত অবধি জেগে বসেছিলেন মা তার সাথে। চুপচাপ কাঠের চেয়ারে বসে উল বুনেছেন একাগ্র চিত্তে। আজ বহুদিন পর সেই দিনটার কথা খুব করে মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে সামনে বসা এই মেয়েটি এখান থেকে উঠে চলে গেলে, তিনি আর কাজে মন দিতে পারবেন না। তার কাজগুলো ঠিকঠাকমতো সম্পন্ন হওয়ার জন্য মেয়েটির উপস্থিতি অতীব

জরুরি! অথচ এই মেয়েটি তার মা নয়, মেয়েও নয়। এমন কি মেয়েটি যা দাবি করে, ‘গার্লফ্রেন্ড!’ সেই গার্লফ্রেন্ডও নয়! তবুও মেয়েটির উপস্থিতি তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনের ভেতরের মনটা চাইছে, মেয়েটি এভাবেই চুপটি করে বসে থাকুক তার সামনে, অনন্তকাল ধরে! হঠাৎ মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি সব সম্পর্কের নাম হয় না। সমাজের তৈরি বাঁধাধরা সম্পর্কগুলোর বাইরেও আরো অনেক রকম সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কগুলোকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, সব সময় বোঝাও যায় না! শুধু হঠাৎ হঠাৎ মন গভীরে ভীষণভাবে অনুভব করা যায়!

৫৯

অভিজিতের সাথে ফোনে কথা বলা শেষ করে বিভা তোয়ালে দিয়ে চুলে ঝাড়ন দিতে দিতে পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। কয়েকবার টোকা দিতেই খুলে গেলো দরজাটা। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর অন্ধকার। করিডোরের আলোয় দেখা গেলো রুদ্রর পরনে ছাই রঙের গেঞ্জি, ঢলঢলে হাফ প্যান্ট। চুল এলো করে খোলা ঘাড়ের ওপর। বিভাকে দেখামাত্র সে দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় বলল, ‘আমার চুল আঁচড়ায় দিবে কে? হৃদির তো বিয়ে হয়ে গেলো।’

আকাশ মেঝেতে বসে আছে পা দুটো ছড়িয়ে। তার সামনে দু তিনটা কোকের ক্যান।

– ‘লাইট জ্বালাস না কেন?’ একটু বিরক্ত বিভা

– ‘লাইট থাক। অন্ধকারই ভালো লাগতেছে।’ আকাশ বলল।

রুদ্র দরজা আটকে দেবার পর করিডোরের বাতি অদৃশ্য হয়ে গেলো। অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে বিভা বসল আকাশের পাশে। তোয়ালে দিয়ে চুল ঘষতে ঘষতে রুদ্রকে বলল, ‘আমাকে দে চিরুনি। আমি আঁচড়ে দিচ্ছি।’

– ‘শালি তুইও তো কালকে চলে যাচ্ছিস। তারপর কী করব?’

– ‘হুম, চিন্তার বিষয়। কী আর করা দোস্ত! মা, বোন, বন্ধু, এরা চিরকাল সাথে থাকে না। তুই বরং একটা বিয়া কর এইবার।’ বিভা সিদ্ধান্ত দিল। ঘরটা বেশি বড় নয়। একটা ডাবল খাট আর ড্রেসিং টেবিল ছাড়া তেমন কোনো আসবাব নেই। খাটটা উত্তর দিকের জানালার পাশে রাখা। কাচ তোলা জানালা দিয়ে ক্রমাগত বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বিছানার চাদর।

– ‘অমৃতা কই?’ আকাশের প্রশ্ন।

– ‘আর বলিস না। দেখা করতে গেছে।’

– ‘মানে কী?’ চমক লাগা কণ্ঠ রুদ্রর। বিভা ঘটনা খুলে বলল। শুনে দুই বন্ধুই কেমন গুমোট হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। রুদ্র দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘ওই বদ লোক এত রাতে ওরে ডাকছে কেন? ব্যাটারে তো খুব একটা সুবিধার মনে হইতেছে না আমার।’

– ‘আসলেই। ফ্রেন্ডের বাপ দেইখা কিছু বলতেছি না। নইলে…’ আকাশ যোগ করল।

– ‘এসব বলিস না। উনি মোটেও খারাপ লোক না। উনি অনেক জোশ!’

বিভার কথা শুনে দুই বন্ধুর আক্কেল-গুড়ুম হওয়ার অবস্থা। অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে চাইল তারা বান্ধবীর দিকে।

– ‘তোর আবার কী হইল হঠাৎ?’ বলে আকাশ কোকের ক্যানে চুমুক দিল।

– ‘তুই হঠাৎ ওই লোকের এত প্রশংসা করতেছিস ক্যান?’

– ‘ওমা, যা সত্য তা বলব না? তুই উনারে দেখছিস? আগে তো দোস্ত ঐভাবে খেয়াল করি নাই। কিন্তু যখন ভালো মতো নোটিস করলাম! কী বলব!’ এটুকু বলে একটু থেমে বিভা আবার যুক্ত করল,’তোরা স্ট্রেইট না হইলে ফিদা হয়ে যাইতি।’

– ‘ফালতু!’ আকাশ মুখ বাঁকা করল।

– ‘ফালতুর কিছু নাই। কারো প্রশংসা করা তো খারাপ কিছু না। আজব! সামির মাও তো অনেক সুন্দরী। শুধু বয়স একটু বেশি মনে হয় আজকাল। উনার পাশে আংকেলরে ইয়াং লাগে।’

– ‘অমৃতা যে এত রাতে উনার জামাইয়ের সাথে মিট করতে গেছে, এটা উনি জানলে কী হবে ভাবতে পারতেছিস?’ আকাশ বলল সতর্ক গলায়।

– ‘খুন করে ফেলবে।’   রুদ্রর উপলব্ধি।

বিভা চমকে উঠল, ‘কাকে? কাকে খুন করবে?’

– ‘অমৃতাকে।’

– ‘কী বলিস?’

– ‘ঠিকই বলতেছি। অমৃতাকে সাবধান হইতে বল। সামির আম্মা কিন্তু রগচটা মহিলা। একবার এক কাজের মেয়েকে উনি ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফালায় দিছিল। সেই মেয়ের হাত ভেঙে গেছিল পড়ে গিয়ে। পাওয়ারফুল মানুষের বৌ বইলা পুলিশটুলিসের ঝামেলা হয় নাই। নইলে খবর ছিল।’

– ‘যাহ!’

– ‘সত্যি! সামিকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস।’

কথাটা শুনে বিভা হঠাৎ একটু চুপচাপ হয়ে গেলো। তার চুল মোছা তখন শেষ। ভেজা তোয়ালেটা নিয়ে কী করবে তাইই ভাবছিল বসে বসে। রুদ্র হঠাৎ বলল,’এই তোদের সাদমানের কথা মনে আছে? আমাদের কলেজে পড়ত।’

আকাশ মনে করার চেষ্টা করল, ‘মোটকা সাদমান?’

– 'আরে না, বাইট্টা সাদমান।' রুদ্রর কথার জের ধরে বিভা বলল, 'হ আমার মনে আছে, এক নম্বরের ফাজিল ছিল পোলাটা।'

– 'ফাজিল তো ছিলই। ব্যাটা বিয়া করছে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেখলাম।'

– 'কই দেখি, দেখি!' বলে বিভা ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিল রুদ্রর ফোনের ওপর।

'বাহ বৌটাতো ভালোই আছে দেখতে। সাদমানও তো আগের চেয়ে একটু ভালো হইছে মনে হয়। আগে দেখতে খবিশের মতো ছিল। বাইট্টা, শুকনা, গালের ভিতর গাল ঢুকা, মনে আছে তোদের?

– 'ইশ মানুষকে নিয়ে এভাবে বলতে হয় না।' আপত্তি করল রুদ্র।

--'ওই শালা একবার আমার চটপটির প্লেটে থুতু মাইরা দিছিল।'

- 'ক্যান?' আকাশের কথা শুনে বিভা না হেসে পারল না।

– 'আরে হালায় একটা বদমাইশ ছিল। হুদাই পা মাড়ায় ঝগড়া করত।' বিভা উঠে দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা ড্রেসিং টেবিলের টুলের ওপর মেলে রাখল, বলল, 'আমার সাথে একবার কী করছিল জানিস? আমি ব্রেক টাইমে ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বইসা নুডলস খাইতেছিলাম। মা টিফিন দিছিল। আমার পাশে অমৃতাও ছিল। তো আমরা কথা বলতেছিলাম আর নুডলস খাচ্ছিলাম। সাদমানের বাচ্চা হঠাৎ আইসা আমারে কয় কী, ম্যাডাম আপনি খান-কী? মাগি নুডলস?'

কথাটা পুরোপুরি শেষ হতে না হতেই ঘরে হাসির রোল পড়ে গেলো। -'তোরা হাসতেছিস? কত বড় কুত্তার বাচ্চা। একটা মেয়েরে কেউ এমন অফেন্সিভ কথা বলে? আমি তো পুরা থাম্বু খায়ে গেছি। ভাগ্যিস পাশে অমৃতা ছিল। সে সঙ্গেসঙ্গে পানির বোতল ছুইড়া মারছিল সাদমানের দিকে বোতলের মুখ ছিল খোলা। ব্যাটার শার্ট প্যান্ট সব গেলো ভিজে। ঠিক সেই সময় রঞ্জন স্যার ক্লাসে ঢুকছে। স্যার কী হইছে জিজ্ঞাসা করতেই সাদমান কয়, আমরা নাকি তার সাথে পানি পানি খেলতেছিলাম ব্রেক টাইমে।'

– 'পানি পানি খেলাটা কী?' আকাশের প্রশ্ন।

– 'কী জানি! শোন না, অমৃতা স্যারকে গিয়ে বলল যে স্যার ও মিথ্যা বলছে আপনাকে। আসলে সে আমাদের খুব স্ল্যাং একটা কথা বলছে। তাই রাগ করে আমি ওর দিকে বোতল ছুঁড়ে মারছি। স্যার জানতে চাইল যে কী স্ল্যাং বলছে সাদমান আমাদের। বোঝ অবস্থা স্যাররে কি এইসব কথা বলা যায়? আমি তো চুপ কইরা আছি। কিন্তু অমৃতা তো চুপ থাকার বান্দি না। সে বইলা দিছে, স্যার ও আমাদের বলছে আপনি খানকি মাগি নুডলস? ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল স্যারের। সাদমান বলে স্যার এটায় খারাপ কী আছে আমি তো বুঝলাম না, আমি সম্মান করে জিজ্ঞাসা করছি আপনি ম্যাগি নুডলস খাচ্ছেন কিনা? কিন্তু স্যার তো বুঝছে ফাইজলামিটা। পরে সেইদিন পুরা পিরিয়ড বুঝছস, হারামজাদারে ক্লাসের সামনে নিলডাউন করায় রাখছিল স্যার। বুঝিস কিন্তু কলেজে পড়া দামড়া ছেলে নিলডাউন কইরা আছে। দুনিয়ার সব মাইয়াদের সামনে। উফ কী শান্তিটা যে হইছিল সেদিন।

আকাশ বলল, 'ওর নম্বর আছে তো আমার কাছে। চল ফোন দিয়া প্যারা দেই।'

এই কথায় বাকি দুই বন্ধুকে খুব আনন্দিত হয়ে উঠতে দেখা গেলো। বিভা হাততালি দিয়ে বলল, 'গ্রেট আইডিয়া। মজা হবে!'

– 'কিন্তু আমার নম্বর তো ও চেনে।' বলল আকাশ।

বিভা নিজের ফোনটা এস্তে এগিয়ে দিল, 'আমারটা থেকে কর।'

আকাশ বিভার ফোন হাতে নিয়ে সাদমানের নম্বর ডায়াল করে লাউড স্পিকার অন করল। তিন চারটা রিং পড়ার সাথে সাথেই ওপাশ থেকে ফোন ধরল একটা পুরুষ কণ্ঠ। আকাশ গলাটা মেয়েদের মতো মিহি করে বলল, 'হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। বাইট্টা সাদমান বলছেন?'

পাশে বসা বিভা মুখে ওড়না চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল কেঁপে কেঁপে। রুদ্রও অনেক কষ্টে হাসি চাপালো।

ওপাশের কণ্ঠটা হাঁক দিয়ে উঠল, 'কী?'

– 'জি বলছিলাম যে, আপনি কি বাইট্টা সাদমান বলছেন?'

– 'বাইট্টা সাদমান মানে?'

– ‘মানে আমাদের কলেজে একজন হাফম্যান টাইরন ল্যানিস্টার পড়ত তো। তার নাম ছিল সাদমান।’ আকাশের গলা মিহি থেকে মিহিতর হয়ে যাচ্ছে।

– ‘ফাইজলামির আর জায়গা পাও না, না?’

– ‘ফাইজলামি কেন হবে ভাইয়া। আপনি বেটে হলেও খুব কিউট ছিলেন। টাইরন ল্যানিস্টার তো আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার। আমার আপনাকে যা ভালো লাগত। আপনি ছিলেন আমার সিক্রেট ক্রাশ।

এই কথায় রাগান্বিত গলাটা বুঝি একটু নরম হলো, ‘তুমি··· তুমি কে? তোমার নাম কী?’

– ‘আমার নাম চটপটি বেগম।’

– ‘কী? এটা আবার কারো নাম হয় নাকি?’

– ‘হবে না কেন ভাইয়া? আমি চটপটি খেতে খুব ভালোবাসি তো, তাই আমার নাম চটপটি বেগম।’

ওপাশ থেকে একটা নারী কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেলো। সাদমান জরুরি গলায় বলল, ‘আমি রাখছি।’

আকাশ একদম আকুলিবিকুলি হয়ে গেলো, ‘না না ভাইয়া প্লিজ প্লিজ! ফোনটা রাখবেন না আপনি।’

– ‘আরে··· রাখতে হবে।’

– ‘না ভাইয়া, প্লিজ। চলেন আমরা পানি পানি খেলি।’

- ‘হ্যাঁ? কী খেলা?’

– ‘পানি পানি খেলা!’

সাদমান একটু থমকানো গলায় বলল, ‘তুমি আসলে কে? তোমাকে কি আমি চিনি?’

– ‘আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। সব জানি আমি। আপনি একবার সি সেকশনের একটা ছেলের বেঞ্চের ওপর পিন রেখে দিছিলেন সেটাও জানি। তাছাড়া আপনি যে মাঝে মাঝে আপুদের সাথে পানি পানি খেলতেন, এই বিষয়টাও আমার অজানা না।’

নারী কণ্ঠটা ওদিক থেকে আবার তাড়া দিল, ‘এই, কার সাথে কথা বলো?’

সাদমান এবার আর কোনো কথা না বলে টুপ করে লাইনটা কেটে দিল।

৬০

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি!... ঝমঝম··· ঝমঝম··· ঝমঝম! অমৃতার কোলের ওপর বই। মাথা নত। বুকের ভেতর? শিরশির··· শিরশির··· শিরশির! সুন্দর, বড়ই সুন্দর এই সমস্ত কিছু। সুন্দর এই অঝোর শ্রাবণধারা, এই মেঘমেদুর হাওয়া! সুন্দর এই জানালা দিয়ে এলোমেলো মুখে এসে পড়া জলের ছিটা··· সুন্দর ভেজা গাছের গুঁড়ির ঘ্রাণ, আগরবাতির পবিত্রতা, গুরুগুরু মেঘের ডাক, আর এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম যে জন··· সে সম্মুখেই মূর্তিমান! হ্যাঁ সবার হয়তো এমনটা হয় না। কিন্তু অমৃতার হয়ে গেছে। ভাগ্যিস হয়েছিল, নইলে শক্তপোক্ত মনের মুখরা আইনজীবী মেয়েটা, কোনোও দিনও জানত না যে চুপচাপ কারো সামনে ঝিম ধরে বসে থাকার মাঝেও এমন আশ্চর্য সুখানুভূতি লুকিয়ে থাকতে পারে। জানত না কোনও প্রকার মাদকদ্রব্যর নেশা না করেও মাঝে মাঝে চোখে, মনে আর রক্তে অদম্য নেশা লেগে যায়। জানা হতো না একটা মানুষের এত কাছাকাছি থাকবার পরেও আরো একটু বেশি কাছে যাবার জন্য মন পাখিটা তৃষ্ণার্তের মতো এমন নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছটফট করতে পারে। এই ছটফটানিটাও ভীষণ ভালো লাগার! এ যেন 'সব ভালো লাগার দেশ!' কপাল জোরে মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তার এই জন্মে, নইলে এই 'সব ভালো লাগার দেশটা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যেত আজীবন!

রাশেদ হঠাৎ একটু নড়ে উঠতেই অমৃতা মুখ তুলে বলল, 'চা খাবেন?'

– 'কী করে বুঝলে? চায়ের কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

অমৃতা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বুঝলাম। কারণ আপনি মুখ ফুটে কিছু না বললেও আমি অনেক কিছু শুনে ফেলি।'

– 'তাই নাকি?' একটা ভ্রু উঁচিয়ে গলায় কিঞ্চিৎ ঠাট্টার ভাব আনার চেষ্টা করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

– 'সুলেমানকে বললেই হবে।' একটু থেমে আবার বললেন, আলগা ভাবে। গোল বারান্দায় অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে ছিল সুলেমান। ঠান্ডা বাতাসে তার শরীর একটু কুঁকড়ে গেছে। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই পেছন ফিরে তাকালো সে। অমৃতা দরজার ফাঁকে একটা মাত্র চোখ রেখে খুব নিম্নস্বরে বলল --'সুলেমান ভাই, একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায়?'

সুলেমান রোবটের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'জি ম্যাডাম, অবশ্যই।'

অমৃতা এক চোখ দিয়েই দেখল সুলেমান কথাটা বলে চুল পরিমাণও নড়ল না। পকেট থেকে সেলফোন বের করে ব্যস্তভাবে কোন একটা নম্বরে যেন ডায়াল করল। নিশ্চয়ই ভেতর বাড়ির কোনো কর্মচারীকে চা বানানোর অর্ডার দিচ্ছে। সামনের উঠোন বৃষ্টিতে সাদা হয়ে আছে। বারান্দা ভিজে থৈথৈ হয়ে গেছে জলে। বেচারার এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে না জানি কত কষ্ট হচ্ছে! দরজা বন্ধ করে সে বলল, 'আপনি কী বলুন তো? বৃষ্টির মধ্যে সুলেমানকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ঠান্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছে।'

রাশেদ ল্যাপটপের পর্দা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'ঠান্ডায় জমে যাবে কেন? এমন কোনো শীত তো পড়ছে না!'

– 'কোল্ড ওয়েভ বাইরে। শুধু শুধু কেন উনাকে আটকে রেখেছেন? -'প্রয়োজন আছে তাই।'

– ‘আপনার মনের মধ্যে একদম মায়া দয়া নেই।’

– ‘মায়া দিয়ে কি দুনিয়া চলে? যার যেটা দায়িত্ব তাকে সেটা পালন করতেই হবে। সবার আগে কাজ।’

– ‘কিন্তু উনার কাজটা কী এখানে? দাঁড়িয়ে থাকা?’

– ‘আপাতত ওর কাজ হলো, কেউ আমার খোঁজ করতে আসলে বলে দেওয়া যে আমি ব্যস্ত আছি। আমাকে যেন কেউ ডিস্টার্ব না করে।’ একটু থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন,’তা আমিও তো কাজ করছি রাত জেগে। আমার জন্য তো কারো মায়া হচ্ছে না!’

অমৃতা বাচ্চা মেয়ের মতো ফিক করে হেসে দিল, ‘হচ্ছে না?’

– ‘হচ্ছে নাকি?’ কপালে ভাঁজ ফেলে এক ভ্রু উঁচিয়ে তিনি জানতে চাইলেন।

অমৃতা চোখ নামালো বইয়ের পাতায়। একটা অপ্রতিরোধ্য হাসির ভারে তার ঠোঁট বেঁকে গেছে তখন। সেই রাতের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। সেই যে তানিশার সাথে সামির এনগেজমেন্টের রাতটা! অমৃতার উপস্থিতি পাছে কেউ টের পেয়ে যায় সেই ভয়ে একদম কাঁটা হয়ে ছিল লোকটা। অথচ আজ… আজ মনে হচ্ছে কেউ টের পেলেও যেন কিচ্ছু এসে যায় না। তিনি রাত জেগে কাজ করবেন আর অমৃতা তার সামনে চুপটি করে বসে থাকবে, এটা যেন খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এমনটাই যেন হবার কথা ছিল। ভাবতে ভাবতে অমৃতার মুখে লটকে থাকা হাসিটা আরো

একটু প্রসারিত হলো। তিনি কাজ থামিয়ে অমৃতার ওই অর্ধনিমীলিত মুখখানি দেখছিলেন। লম্বাটে মুখ, পুতুল চোখ, ছোট চোখা নাক, লাল লিপস্টিক মুছে যাওয়া ঈষৎ রক্তাভ ঠোঁট। লেবু রঙের ঢিলাঢালা একটা গেঞ্জি। কী যেন আছে… চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না! কী আছে? যা এই পৃথিবীর অন্য কোনো মুখে নেই? তীক্ষ্ণ গভীর পর্যবেক্ষণের সামনে পড়ে অমৃতা ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। পারলে সে বইয়ের ভেতর ঢুকে যায়। মুখ লজ্জায় টুকটুকে লাল। একবার পলক তুলে তাকালো সে সামনে। তাকাতেই বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। দুই জোড়া চোখের খাঁচায় বন্দি হয়ে গেলো এক জোড়া মন!

কতক্ষণ কাটল কে জানে! হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। রাশেদ উঠে দাঁড়ালেন। দরজা খুলে সুলেমানের হাত থেকে চায়ের কাপের ট্রে নিলেন। কাঠের কারুকার্য করা কালো রঙের ট্রের ওপর চমৎকার ডিজাইনের সাদা আর নীল সিরামিকের একটি কেটলি। সাথে একই ডিজাইনের দুটি কাপ পিরিচ। দুধ চিনির ছোট দুটি গোল পাত্র। দুটা চায়ের চামচ, সাদা রঙের ন্যাপকিন আর তার পাশে ছোট্ট একটি নীল ফুলদানিতে রাখা প্লাস্টিকের তিনটি গোলাপ ফুল। টেবিলের ওপর ট্রে টা নামিয়ে রাখলেন তিনি। এরপর ল্যাম্পশেডের হলুদ বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে, সুইচ টিপে নীল রঙের একটি ডিমডিম বাতি জ্বালালেন ঘরে। হাত দিয়ে টেনে জানালার পর্দা দিলেন সরিয়ে। চেয়ার টেনে নিয়ে এসে রাখলেন জানালার পাশে। টেবিলের কাছে পুনরায় ফিরে এসে ড্রয়ার খুলে হাতড়ে বের করলেন সিগারেটের বাক্স। টেবিল থেকে তুলে নিলেন গোল মার্বেল পাথরের ছোট্ট ছাইদানি। হেঁটে এসে জানালার পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে পায়ের ওপর পা তুলে। ছাইদানি রাখলেন জানালার কার্নিশে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে লাইটার বের করে সিগারেটে ধরালেন আগুন। বাইরে তখনও ঝুম বৃষ্টি!

অমৃতা ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি গিলে খেল। সিগারেটের জন্য মন আইটাই করছে তার। কিন্তু করলেই কী? সিগারেট তো চাওয়া যাবে না উনার কাছে।

ধূমপানের তেষ্টাটাকে গলা টিপে হত্যা করে সে কেটলি থেকে গরম লিকার ঢেলে নিল কাপে। বাদামি রঙের তরল পদার্থ থেকে সফেদ ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সাথে চায়ের লিকারের সুন্দর একটা ঘ্রাণ। বৃষ্টি ভেজা ঠান্ডা রাতে এই ধোঁয়া ওঠা চায়ের এরোমা মোলায়েম একটা উষ্ণ ছোঁয়া এনে দিল মুহূর্তের মধ্যে।

– ‘চিনি ক চামচ?’

– ‘দেড় চামচ।’

- ‘দুধ?’

– ‘রঙ চা দিও।’

চামচ দিয়ে চিনি নেড়ে নিয়ে পিরিচসহ চায়ের কাপটি এগিয়ে দিল অমৃতা উনার হাতে। তিনি পিরিচের ওপর থেকে চায়ের কাপটা শুধু তুলে নিলেন, ‘থ্যাংক ইউ।’

অমৃতা জবাবে হাসল। খালি পিরিচটা নিয়ে ফিরে আসলো টেবিলের কাছে। তারপর তিন চামচ চিনি আর দু চামচ গুঁড়াদুধ দিয়ে নিজের জন্য চা বানালো এক কাপ। বানানো হয়ে গেলে চায়ের কাপটা নিয়ে তার কোথায়, কোনদিকে বসা উচিত সেই বিষয়ে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। নিত্যদিনকার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সে বড়ই বিচক্ষণ, সপ্রতিভ এবং স্মার্ট একটি মেয়ে। কিন্তু এই লোকের সামনে এসে দাঁড়ালে সেই স্মার্টনেস তাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লেজ

গুটিয়ে পালিয়ে যায়। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে সে টেবিলের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

রাশেদ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দৃশ্যটা দেখলেন স্থির চোখে। কয়েক সেকেন্ডের মাথায় বললেন, 'বসো। দাঁড়িয়ে কেন?'

অমৃতা বসল চেয়ারে, লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত আড়াইটা, মধ্যরাত! হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে আসলো তার। অলীক জগৎ থেকে অবতরণ করলেন বাস্তবে। বাড়িতে তার স্ত্রী হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা জেগে থেকে গল্পে মশগুল হয়ে আছে নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে। আজকে তার ছেলেটার বিয়ে হলো। বাড়িতে প্রবেশ করল নতুন বৌ। জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। সংসারের এই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে, মধ্যরাতে একটি অর্ধপরিচিতা অল্পবয়সী মেয়ের সাথে তিনি একলা ঘরে বন্দি হয়ে বসে আছেন। ঘটনাটি তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তিসত্তার বিপরীত। কী হচ্ছে তার সাথে এসব? তিনি কি পথভ্রষ্ট হচ্ছেন জীবন সায়াহ্নে এসে? যা হয়নি কখনো এই এত বছরের নিয়মবদ্ধ, দায়িত্ব ঘেরা, কর্মময় জীবনে, তাইই কি হয়ে যাচ্ছে শেষমেশ? এই মেয়েটি তার কে? কেউ নয়তো!

চিন্তারাজ্যে ডুবে থেকেই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি।

– 'ইউ এস এ কেন যাচ্ছেন? বিজনেস নাকি পলিটিক্স?'

– 'দুটোই।'

– ‘কোথায় থাকবেন?’

– ‘ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্ক।’

– ‘আচ্ছা।’ চুপ করে গেলো অমৃতা। এরপর কী বলা যায়? বোবা বোবা একটা ভাব হচ্ছে তার। তাজ্জব ব্যাপার!

– ‘আমাকে কেন ডেকেছিলেন?’ কথা খুঁজে পেল অমৃতা।

– ‘তুমি কাঁদছিলে কেন?’ তার গলার স্বর গম্ভীর, থমথমে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে একটু। তবুও বাতাস উতলা।

একটু অপ্রস্তুত হলো অমৃতা, ‘কষ্ট পেয়েছিলাম।’

চোখের ওপর চোখ রাখলেন তিনি, ‘কেন?’

– ‘আপনি··· আপনি কেন বললেন আমার প্রতি আপনার কোনো আগ্রহ নেই?’

– ‘এমন বললেই তুমি কাঁদবে?’

– ‘হ্যাঁ কাঁদব।’

– ‘তুমি কি খুব ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে?’

– ‘একেবারেই না। আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি কখনো কাঁদি না। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যে আমাকে কাঁদায়।’

– ‘তাই?’

– ‘ঠিক তাই। আপনিই প্রথম এবং শেষ মানুষ যার কাছে আমি এতটা সস্তা হয়ে গেলাম। আমার এই ছাব্বিশ বছরের জীবনে আমি এর আগে কখনো কোনো মানুষের কাছে এতটা ছোট হইনি।’

দমকা বাতাসে সিগারেটের আগুন হঠাৎ নিভে গেলো। রাশেদের তখন দুটি হাতই বন্ধ। এক হাতে সিগারেট অন্য হাতে চায়ের কাপ। অতএব সিগারেটে পুনরায় আগুন ধরানোর কোনো উপায় নেই। অমৃতা উঠে দাঁড়ালো। নিজের প্যান্টের পকেট থেকে বের করে নিল লাইটার। এগিয়ে গেলো কয়েক পা। চেয়ারের কাছাকাছি এসে ডান হাতে লাইটার চেপে ধরে, চেয়ারে বসে থাকা মানুষটার সামনে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো সে। লাইটারের আগুন যখন জ্বলল তখন ওরা দুজন খুব মুখোমুখি, খুব কাছাকাছি! জীবনে এই প্রথমবার রাশেদ সম্পূর্ণ বিনা কারণে থমকে গেলেন, একটু কেমন উন্মনা দেখালো তাঁকে ক্ষণিকের জন্য। হাওয়ার তোড়ে নাচতে থাকা জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটা অমৃতার মুখের ওপর কমলা রঙের একটা আঁচ ফেলেছিল। চিকচিক করছিল মোমের মতো ফর্সা ত্বক। গভীর চোখজোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওর বেড়ালের মতো আদুরে গালে, রক্তাভ ঠোঁটে। একজন আরেকজনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল পরিষ্কার। হাওয়ার দাপটে দস্যি আগুন নিভে গেলো। জ্বলল আবার। একটা আচ্ছন্নতা ক্রমেই ডুবিয়ে দিচ্ছিল অমৃতাকে। সামনের মানুষটা তাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করছে। চেতন অবচেতনের মধ্যে উন্মত্ত এক ভাব দ্রুত মিশে যাচ্ছে। খুব ইচ্ছে··· থাক, সব

ইচ্ছেকে অত প্রশ্রয় দিতে নেই। কয়েকটা দুর্বোধ্য মুহূর্তের পর তিনি একটু নড়ে উঠে হাতে ধরা সিগারেটটা এগিয়ে দিলেন লাইটারের সামনে। সিগারেটে আগুন ধরল। একটা বড় শ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো অমৃতা। ফিরে আসলো টেবিলের কাছে। বুক ধড়ফড় করছে তার। গলা তেষ্টায় চৌচির। গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে গলায় ঢালল সে।

– 'অমৃতা শোনো, একটা জরুরি কথা বলি তোমাকে।' গলার স্বর··· ভীষণ ভরাট! রাতের নিস্তব্ধতা নিজেই যেন চমকে যায়। চমকায় অমৃতাও। ফিরে তাকায়, একটু বিপন্নভাবে বলে, 'জি বলুন!'

রাশেদ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। আঙুল ঝাঁকিয়ে এশট্রেতে ফেললেন ছাই। চোখ জানালার বাইরে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'লিসেন, আমি তোমার অনুভূতিকে সম্মান করি। আই রেস্পেক্ট ইওর ফিলিংস।'

– 'সত্যি?' অমৃতার কণ্ঠ তরঙ্গময় প্রতিধ্বনির মতো শোনালো।

– 'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু তুমি হয়তো এখনও বুঝতে পারছ না··· এই অনুভূতিটা সঠিক নয়। তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে। আশা করছি খুব দ্রুতই এই ভুলটাকে শুধরে নেবে। তোমার সামনে ব্রাইট ফিউচার। কাজে মন দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

– 'ভুলে যাব?' অবিশ্বাস ঠিকরে বের হয় অমৃতার চোখ দিয়ে।

– ‘হ্যাঁ যাবে। একমাস আমি থাকছি না। এই এক মাস তুমি খুব মন দিয়ে কাজ করবে এবং চেষ্টা করবে সবকিছু ভুলে যাওয়ার।’

– ‘এত সোজা?’ চোখের সামনের পর্দাটা ঘোলা হয়ে আসছিল অমৃতার।

– ‘খুব সোজা। একবার চেষ্টা করেই দেখো না।’

– ‘আপনার সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় থাকবে না এই এক মাস?’

– ‘না। উপায় থাকলেও তুমি যোগাযোগ করবে না।’

– ‘মনে পড়লে?’

– ‘মনে পড়লেও মনে করবে না।’ এটুকু বলে তিনি জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন। অমৃতার চোখে চেয়ে গভীর গলায় বললেন, ‘ক্যান ইউ ডু দ্যাট ফর মি?’

অমৃতা কান্নার একটা ঢোক গিলল, ‘আই ক্যান ডু এনিথিং ফর ইউ!’

কথাটা মস্তিষ্কে নয়, মগজে নয়, বুকের এমন জায়গায় গিয়ে লাগল যে জায়গাটা এতগুলো বছর ধরে একদম ফাঁকা পড়ে ছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন, তালাবন্ধ বাক্সটা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জীবনের এই ঘোর অসময়ে! কী আশ্চর্য!

– 'গুড! আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়ে গেছে অমৃতা, তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললেন তিনি।

– 'এটা তাহলে ফেয়ারওয়েল ছিল?'

– 'কাইন্ড অব।'

– 'আপনি আমাকে এত কষ্ট দেন কেন?'

– 'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না! আর চাই না বলেই ভীষণভাবে চাইছি তুমি যেন সবকিছু ভুলে যাও।'

– 'ভুলে যাওয়া যায় এমন কোনো ওষুধ আছে? থাকলে দিন।'

তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, 'ওষুধটা তোমার নিজের ভেতরেই আছে। ট্রাই টু ফিগার ইট আউট। অন্য কিছুতে মন দাও।'

অমৃতা একথার পিঠে কিছু বলল না। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল শুধু। —'এবার তুমি এসো।'

– 'চলে যাব?'

– ‘হুম।’

কয়েক মুহূর্ত নীরব বিষণ্নতা, আর অস্বস্তি। একটা সময় অমৃতা নিশ্বাস বন্ধ করে করল,’চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আপনার হাতটা একটু ধরতে পারি?

– ‘না।’

– ‘কেন নয়?’

– ‘আমি বলেছি তাই।’

– ‘তাহলে আপনি আমাকে একটু আদর করে দিন। আর কিচ্ছু চাইব না কোনোদিন।’

রাশেদ ভীষণ চমকে উঠলেন।

- ‘তোমার মাথা ঠিক নেই।

– ‘হাও এবাউট আ গুডনাইট কিস? দেবেন?’ ঝাপসা চোখে আবছা গলায় বলল অমৃতা।

– ‘নো ওয়ে!’

একটা চাপা শ্বাস পড়ল অমৃতার –’আপনার পায়ের কাছে একটু বসে থাকতে দেবেন?’

– ‘কেন?’

– ‘এমনিই। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয় আপনার পায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকি।

তিনি কোনো কথা বললেন না। নীল রঙের ডিমডিম আলোয় অমৃতা তাঁর শ্যামবর্ণের মুখখানায় একটু লালচে আভাস দেখতে পেল। সিগারেটের শেষ ছাইটুকু এশট্রেতে ফেললেন তিনি। অমৃতা এগিয়ে এসে চেয়ারের সামনে সিমেন্টের মেঝেতে তাঁর পায়ের কাছে বসল। হাঁটু ভাঁজ করে। কিছু মুহূর্ত নীরবে কাটল। একটা সময় অমৃতা খুব সন্তর্পণে তাঁর ডান হাঁটুর ওপর নিজের মাথাটা রাখল, ঘাড় কাৎ করে। বিড়বিড় করে বলল, ‘রাশেদ! খুব ভালো হতো, আপনি যদি সামির বাবা না হতেন!

রাশেদ ধীরে ধীরে একটা হাত অমৃতার মাথার ওপর রাখলেন। কোনো কথা বললেন না। ওর সিল্কের মতো নরম ছোট ছোট চুলগুলো আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দিতে লাগলেন শুধু। একটা গাঢ় অদ্ভুত বিষণ্ণতা একটু একটু করে ফোঁটা ফোঁটা তরলের মতো তাঁর মনের ভেতর দ্রবীভূত হচ্ছিল। কেন যেন মনে হচ্ছে, আজকের পর থেকে এই মেয়েটিকে ছাড়া বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে! বৃষ্টি তখন সম্পূর্ণ থেমে গেছে। সোঁদা মাটির ঘ্রাণে ভরে আছে ভেজা বাতাস। ঠান্ডা শান্তি শান্তি ভাব চারপাশে। কাছাকাছি কোথাও একটা পেঁচা ডাকছে থেকে থেকে, হুহু করে। আগরবাতিরা জ্বলে জ্বলে খুশবু

ছড়াচ্ছে ক্রমাগত। রাত বাড়ছিল। শ্রাবণ মেঘের তমসাময় রাত। অমৃতা আদুরে পোষা বেড়ালের মতো গুটিশুটি হয়ে বসে ছিল রাশেদের পায়ের কাছে। কোলের ওপর মাথা রেখে। নিচ্ছিদ্র পবিত্রতায় দুজনের শরীর এবং মন ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল।

কিছু সময় পর আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। শোনা গেলো সুলেমানের গলা এবং একটি পরিচিত নারী কণ্ঠ! জানালার পর্দা সরানো ছিল বলে নির্দ্বিধায় গোল বারান্দার দৃশ্যটা এক ঝলকে দেখে নিলেন রাশেদ। দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু আড়ালে সরে আসলেন। ঘরের ভেতর ডিম লাইট জ্বলার কারণে বাইরে থেকে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবার কথা নয়। কিন্তু ভেতর থেকে স্পষ্ট ঠাওর করা যাচ্ছে যে অন্ধকারে দুটি নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একজন রোমেলা। দ্বিতীয় জন কে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। শালিদের মধ্যে কেউ হবে হয়তো। মধ্যরাতে হঠাৎ বোনকে সঙ্গে নিয়ে রোমেলার এই ঘরে আগমনের পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা ঠিক বোধগম্য হলো না।

অমৃতা তখনও মেঝেতে লেপ্টে বসে ছিল, উৎকর্ণ হয়ে। তার চোখ বিস্ফারিত, মুখ রক্তশূন্য। হৃৎপিণ্ড ছুটছে ট্রেনের গতিতে। রাশেদকে বিচলিত দেখাচ্ছে না খুব একটা। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যটা আরো দ্বিগুণ রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। চোয়াল শক্ত, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সাবধানী।

– 'ভেতরে যাওয়া যাবে না বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? লাইট তো নেভানো। তোমার স্যার করছেন কী?' রোমেলার কর্কশ গলার স্বর ভেসে আসলো জানালা দিয়ে। দম বন্ধ করে ঘরবন্দি দুটি মানুষ শুনতে লাগল সেই কথোপকথন।

সুলেমান কুণ্ঠিতভাবে বলল, ‘তা আমি জানি না ম্যাডাম। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হইছে কেউ আসলে যেন ভেতরে যাইতে দেওয়া না হয়। স্যার ব্যস্ত আছেন। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি।’

রোমেলা গর্জে উঠে বললেন, ‘আরে আশ্চর্য! অন্য কারো সাথে আমাকে মিলাচ্ছ কেন তুমি? বেয়াদবি করার আর জায়গা পাও না? দেখি সরো!’ কথাগুলো বলা শেষ করেই রোমেলা ঘরের দরজার দিকে পা বাড়ালেন সদর্পে। সুলেমান অসীম সাহসিকতার একটা কাজ করে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে। রোমেলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বাধা দিয়ে বলল, ‘স্যরি ম্যাডাম, আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না এখন। স্যারের নিষেধ আছে।
’

অমৃতার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল। জীবনে এর আগে কোনোদিন এতটা ভয় পায়নি সে। নিজেকে যথেষ্ট সাহসী বলেই জেনে এসেছে বাল্যকাল থেকে। কিন্তু আজ ওই মহিলার কণ্ঠস্বর তার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে এক অদম্য ভীতির সঞ্চার করছে। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ক্রিয়া বন্ধ করে জড়পদার্থে রূপান্তরিত হবে এখুনি!

– ‘এত বড় সাহস তোমার! আমার পথ আটকে দাঁড়িয়েছ? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো আমি তোমাকে! দেখব তুমি কীভাবে চাকরি করো!’

রাশেদ সেই মুহূর্তে হঠাৎ নড়ে উঠলেন। স্থিরচিত্র থেকে যেন আচমকা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হলো অমৃতার চোখের সামনের দৃশ্যপট। সে দেখল মানুষটা খুব দৃঢ় ভঙ্গিতে কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে দরজা খুললেন। পা রাখলেন চৌকাঠের বাইরে।

– ‘কী ব্যাপার?’ হিমায়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাশেদ। অটল এবং দৃঢ়চিত্তে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই মুহূর্তে তাঁর ভেতর বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ কাজ করছে না। এক অনির্বচনীয় নির্লিপ্ততায় ছেয়ে আছে সারা মন। তিনি কি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্ছেন? নৈতিকতা, শিষ্টতা, শ্লীলতা এই সমস্ত সামাজিক এবং মানবিক গুণাবলি কি তাঁর ভেতর থেকে লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে? না ঠিক তা নয়। আসলে তাঁর তো কাউকে ভয় পাবার নেই। তিনি আর যাই হোন না কেন, ভীতু এবং দুর্বল চিত্তের অধিকারী নন। স্ত্রীর ভয়ে সিঁটিয়ে যাবার মতো পুরুষ মানুষ তিনি কোনোকালেই ছিলেন না।

– ‘কী ব্যাপার মানে? তোমার এই দারোয়ান আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না! আমার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কী সাহস!’

– ‘এখানে ওর তো কোনো দোষ নেই। ও শুধু আমার আদেশ পালন করছে।’ কথা বলতে বলতে হক রোমেলার পাশে দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখলেন একবার। না একে তিনি চেনেন না। নতুন মুখ।

রোমেলা স্বামীর গম্ভীর মুখের কঠিন কথা শুনতে পেয়ে একটু থমকে গেলেন ক্ষণিকের জন্য। বন্ধ দরজার দিকে তেরছা এবং তীব্র চোখে তাকালেন একবার। সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, ‘তুমি কী করছিলে?’

– ‘কাজ।’

– ‘ভেতরে যাওয়া নিষেধ কেন?’

– ‘সেই কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে? তুমি কেন এসেছ? কী দরকার?’

- ‘এভাবে কথা বলছ কেন?’

– ‘একটু আগে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল। তখন তো তুমি আসোনি। হাতে মেহেদী দিচ্ছিলে। এখন কেন এসেছ?’

রোমেলা এ কথা শুনে একটু বিব্রত বোধ করলেন পাশে দাঁড়ানো মহিলাটির সামনে। আমতা আমতা করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, –’আমার চাচাতো বোন, রুমা। চিনেছ ওকে?’

– ‘না উনার সাথে আমার পরিচয় নেই। ‘

– ‘আছে। তুমি ভুলে গেছ।’

– ‘হতে পারে।’ দায়সারা শোনালো রাশেদের কণ্ঠ।

- ‘ও তো লাইব্রেরি ঘরটা কখনো দেখেনি। তাই দেখাতে নিয়ে আসলাম।’

রাশেদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘ এবং মন্থর নিশ্বাস। লোক দেখানোতেই এই মানবীটির পার্থিব জীবনের চরম সুখ নিহিত। কী আশ্চর্য!

– ‘রাত কটা বাজে দেখেছ?’ কেটে কেটে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

সেই সময় পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি কথা বলে উঠল প্রথমবারের মতো, ‘থাক আপা, দুলাভাইকে ডিস্টার্ব করো না। চল ফিরে যাই।’ কথাটি বলে শেষ করে সে ঘুরে দাঁড়ালো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হেঁটে হেঁটে দূরে সরে গিয়ে অদৃশ্য হলো অন্ধকারে।

রোমেলা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, ‘তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে?’

– ‘অপমানের কিছু নেই এখানে। না বলে কয়ে হুট করে অপরিচিত লোক সঙ্গে নিয়ে আসাটা উচিত হয়নি তোমার।’

– ‘তোমার ঘরে আসতে হলে আমার পারমিশন নিয়ে আসতে হবে?’

– ‘তুমি তো আমার কাছে আসোনি, এসেছ অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।’

– ‘অন্য উদ্দেশ্য মানে?’

আবারও দীর্ঘ নিশ্বাস, ‘তুমি বুঝবে না।’

– ‘বুঝিয়ে বললেই বুঝব!

– ‘থাক বাদ দাও।’

রোমেলা আর কোনো কথা না বলে হঠাৎ পা বাড়ালেন সামনে। এই প্রথমবারের মতো রাশেদের আত্মায় একটু কাঁপন ধরল। রোমেলা যদি জোরজবরদস্তি করে এখন ভেতরে ঢুকে যায়··· তাহলে কী হবে?

– ‘পথ আটকাচ্ছ কেন?’

– ‘বাড়ি যাও।’

– ‘বাড়িতেই আছি।’

– ‘বেশ তো নিজের ঘরে যাও।’

– ‘এটা কি আমার ঘর নয়?’

– ‘রোমেলা, কথা বাড়িও না। বলছি ফিরে যাও!’ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা কাঁপিয়ে দিল চারপাশ। সুলেমান একটু দূরে সরে গিয়েছিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে সে।

– ‘ভেতরে কি কেউ আছে?’ রোমেলার কণ্ঠে এখন সন্দেহের স্পষ্ট সুর বাজছে ঝনঝন করে। এ ঘরে তাঁর খুব একটা আসা হয় না। স্বামী রাত জেগে কাজ করেন। বেশির ভাগ সময় একলাই থাকেন। কাজের কথা শুনতে রোমেলার কখনওই ভালো

লাগে না। তিনি রাজনীতি এবং ব্যবসা এর কোনোটাই ঠিকমতো বোঝেন না। তাই স্বামীকে একাগ্রচিত্তে নির্বিঘ্নে কাজ করার সুযোগ দেন। কাজের সময় এসে অকারণে হানা দেন না। কিন্তু এর মানে তো এই না যে তাঁর গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। এত বড় অপমান তিনি কোনো মতেই সহ্য করবেন না।

– 'আমি ভেতরে যেতে চাই!'

– 'ভেতরে এখন যাওয়া যাবে না।'

কয়েকটা মুহূর্ত রোমেলা জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হিম শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,'তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছ?'

– 'ফিরে যাও!'

– 'ভেতরে কে আছে?'

– 'ফিরে যেতে বলেছি!'

এর পরের কয়েকটা সেকেন্ড থমথমে নীরবতায় কাটলো। রোমেলা আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ঘুরে দাঁড়ালেন। তখন আবারও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। হক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে স্ত্রীর চলে যাওয়া দেখলেন। খানিক বাদে দূরে লাইট দিয়ে সুসজ্জিত দালানের সামনে রোমেলার নিস্তেজ শরীরটা দেখা গেলো। ধীরেধীরে মিলিয়ে গেলো শরীরটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির পেটের মধ্যে।

– 'সুলেমান!'

– 'জি স্যার!' অন্ধকারে হঠাৎ ভেসে উঠল সুলেমানের হৃষ্টপুষ্ট কায়াখানি।

– 'ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি ভয় পেও না। তোমার চাকরি যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। '

সুলেমান খুব ভালো মতোই জানে তার চাকরি যাবার সম্ভাবনা নেই। এই বাড়িতে কাজ করছে সে বহু দিন হয়ে গেলো। সে রাশেদুল হকের বাবার আমলের লোক। গেলো মাসে তার দুটি যমজ নাতনির বিবাহ সম্পন্ন হলো। হক সাহেব নিজেই বিয়ের সমস্ত খরচ দিয়েছেন। এমন কি তার ছোট নাতিটির প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচটাও হক সাহেব বহন করছেন। এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা। দেবতুল্য মানুষটির কিন্তু কখনোই মেয়েমানুষের দোষ ছিল না। হঠাৎ এই ভীমরতি কেন ধরল সুলেমান জানে না। মালকিন মহিলাটিকে সে খুব একটা পছন্দ করে না অহংকারী এবং ঠোঁটকাটা স্বভাবের জন্য। হক সাহেবের মতো উদার মনের মানুষের পাশে অমন সংকীর্ণমনা, খটোমটো মেয়েছেলে মানায় না এ কথা সত্য, কিন্তু সংসারটার জন্য তার বড় মায়া হচ্ছে। আহা এত বছরের পুরনো সংসার! বয়কাট চুলের মেয়েটাকে বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। জেনেশুনে সাজানো গোছানো সংসার ভাঙতে এসেছে। মেয়েটার বয়সও অল্প। ছোট সাহেবের বন্ধু। শেষ পর্যন্ত কিনা ছেলের বন্ধুর সাথে! ইশ সুলেমান আর ভাবতে পারে না। তার মনটা বিষাদে ছেয়ে যায়। কিন্তু চাকর হয়ে তো তার কিছু বলা সাজে না। চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। সে বিনয়ের সাথে উত্তর দিল, 'জি স্যার!'

অমৃতা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গুটিশুটি হয়ে বসে ছিল। তার মাথা নিচু, কপাল ঠেকানো হাঁটুতে। দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে সে সম্মুখে চোখ মেলে তাকালো। তার

ঠোঁট কাঁপছে মৃদু। চোখের কোলে টলমল করছে রুপো রঙের জলবিন্দু। বড় বড় শ্বাস পড়ছে এলোমেলোভাবে।

– 'তুমি ঠিক আছ?' খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

অমৃতা কোনো শব্দ খুঁজে পেলো না, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে চেয়ে রইল শুধু। রাশেদ চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন অমৃতার সামনে। একটু ঝুঁকে অমৃতার মুখটা ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'ভয় পেয়েছ?'

– 'আমি খুব খারাপ! তাই না?'

– 'তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

– 'স্যরি! আমার জন্য আপনার ওয়াইফের সাথে মনোমালিন্য হয়ে গেলো।'

– 'তুমি স্যরি বলছ কেন? তোমাকে তো আমি ডেকে এনেছি। দোষ হলে আমার হয়েছে, তোমার নয়।'

– 'আমার দোষ। সব আমার দোষ!'

রাশেদ স্থির চোখে ওর দিকে খানিক সময় তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'দোষ কিংবা ভুল যাই বলো না কেন, তা শুধরে নেবার সময় এখনো আছে। চিন্তা করো না।'

অমৃতা উঠে দাঁড়ালো। দুহাত দিয়ে কচলে কচলে মুছল চোখের পানি।

– 'যাই!'

– 'হুম এসো।' রাশেদ উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। অমৃতা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার ঘুরে তাকালো পেছনে। ভেজা ভেজা পুতুল দুটি চোখ মেলে ধরল মানুষটার মুখের ওপর। কয়েক সেকেন্ড কাটলো বিনা বাক্যব্যয়ে। একটা সময় তিনি বললেন, 'কী হলো?'

– 'দেখে নিচ্ছি একটু। আবার কখনো দেখা হয় কিনা!'

তিনি কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর চেহারা থেকে এতক্ষণের কাঠিন্যটা মুছে গিয়ে একটা কোমলভাবের উদয় হয়েছে। জীবনের সংজ্ঞাটা পাল্টে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভুল, সঠিক, পাপ, পূণ্যর মতো সমস্ত জাগতিক নৈতিকতা এই মুহূর্তটির কাছে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির দিকে এরকম নিশ্চুপ চেয়ে থাকতে ভালো লাগছে তার। এইসব অহেতুক ভালোলাগারা এমন তুলকালাম ভাবে তাড়া করেনি এর আগে কখনো। এখন এই ধাবমান অনুভূতির হাত থেকে তিনি পালাবেন কী করে? তিনি তো কখনোই ভীতু, পলায়নবাদী, কাপুরুষ ছিলেন না। দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন আজীবন, পিতা মাতা এবং স্ত্রী, পুত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন সুনিপুণভাবে। পরিবারের কথা চিন্তা করে অষ্টপ্রহর যন্ত্রচালিতের

মতো খেটে চলেছেন নাওয়া খাওয়া ভুলে। এবার কি তবে সময় এসেছে একদণ্ড নিজের কথা ভাববার? সময় এসেছে কি একটু স্বার্থপর হবার? কিন্তু তাঁর যে একটা সন্তান আছে! তিনি যদি আজ কোনো গর্হিত কাজ করে বসেন আবেগের বশে, তবে সেই ভুলের রেশ একমাত্র পুত্রকে বইতে হবে সারাটি জীবন। তাঁর একটি মাত্র সন্তান! নাহ, কোনো ভাবেই এই জায়গাটাতে আপোষ চলবে না!

– 'গুডনাইট অমৃতা। ভালো থেকো।' কথাটা বলে তিনি এবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

অমৃতা কাঠের দরজাটার নব ধরে কিছুক্ষণ থম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কী যেন একটা বলবার জন্য মুখ খুলল, আবার ঢোক গিলে ফেলল। মিনিট দুয়েক পর পায়ে পায়ে হেঁটে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসলো। কাঁপা হাতে একটা ছোট কাগজ আর কলম তুলে নিয়ে তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল,

'রাশেদ, আপনাকে ভালোবাসি নিশ্বাসের মতো। নিশ্বাস নিতে যেদিন ভুলে যাব সেদিন আশা করি আপনাকেও ভুলতে পারব। আমি কাউকে ভয় পাই না। আপনার স্ত্রী যদি কিছু জানতে পারে তাহলে বলবেন সব দোষ অমৃতা নামের বাজে মেয়েটার। এরপর আপনারা যে শাস্তিই আমাকে দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব।'

কাগজটা পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে অমৃতা প্রস্থান করল। তিনি খানিক বাদে কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে পড়লেন। পড়েই হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেললেন। ট্র্যাশ করতে যাবার আগ মুহূর্তে আবার কী মনে করে যেন থমকে গেলেন। মোচড়ানো কাগজটা টেনেটুনে সোজা করলেন। তারপর সযত্নে তুলে রাখলেন টেবিল সংলগ্ন ড্রয়ারে।

বাড়িতে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন রোমেলা বাতি নিভিয়ে বসে আছে বিছানায়, মূর্তির মতো। তিনতলা দালানের সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকা মরিচ বাতির আগুন আগুন ছাপ জানলা গেলে এসে পড়ছে তার এলো করে খোলা চুলের ঢেউয়ের খাঁজে। হক ঘরে ঢুকতেই তিনি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে অনেকটা চাপা গলায় বললেন, 'তোমার জীবনে কি অন্য কেউ আছে?'

হক থমকে গেলেন। স্থবির হয়ে গেলেন। হতচকিত ভাবে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন বহু বছরের পুরোনো স্ত্রীর দিকে।

– 'উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

হক তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কথা বললেন না। ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা আটকালেন ধীরে সুস্থে। কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝামাঝি অবস্থানে এসে রোমেলার দিকে ঘুরে তাকিয়ে স্থির কণ্ঠে বললেন, 'আমার জীবনে এখন অবধি তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। কিন্তু তুমি যদি জীবনের কথা জানতে না চেয়ে মনের কথা জানতে চাইতে, তাহলে হয়তো উত্তরটা অন্যরকম হতো।'

রোমেলা দম বন্ধ করে বললেন, 'উত্তরটা জানতে চাই।'

– 'শূন্যস্থান পূরণ হওয়া দোষের কিছু নয়। '

রোমেলা অদ্ভুত হাসলেন, 'তাহলে তুমি স্বীকার করেই নিলে যে তোমার মনে আমার জন্য কখনো কোনো জায়গা ছিল না?'

– 'জায়গা করে নেবার কোনো চেষ্টা তো তুমি করোনি। কতগুলো বছর কেটে গেলো!'

– 'তাই না? তুমি কী চেষ্টা করেছ, শুনি?' রোমেলার গলা চড়ে যাচ্ছিল।

--'আমার চেষ্টা কখনোই ফলপ্রসূ হয়নি। তোমার মনে তো জীবনের শুরু থেকে অন্য কেউ ছিল। আজকে যদি আমার জীবনে প্রাচুর্য না থাকত রোমেলা, তাহলে হয়তো তুমি আমাকে ছেড়ে অনেক আগেই তোমার প্রেমিকের কাছে ফিরে যেতে। এ কথা কি সত্য নয়? তুমি কি অস্বীকার করতে পারো?'

রোমেলা অবিশ্বাস ভরা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,'তুমি কি এখন তার প্রতিশোধ নিতে চাইছ? এত বছর পরে এসে?'

হক চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ একটু দুর্বোধ্য হেসে বললেন, 'প্রতিশোধ নেবার যথাযথ ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে প্রকৃতির আছে। মানুষের হয়ে যদি কখনো প্রকৃতিই প্রতিশোধ নিয়ে থাকে, তবে সেই প্রতিশোধের দায়ভার মানুষের ওপরে বর্তায় না।'

– 'মেয়েটা কে?' হঠাৎ এক তীব্র চিৎকার ঘরময় ফেটে পড়ল বোমার শব্দের মতো।

– 'চিৎকার করো না। ঘরে নতুন বৌ এসেছে।'

রোমেলা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, 'আমি জানতে চাই মেয়েটা কে?'

– 'জানার সময় এখনো আসেনি।' কথাটা বলে হক তোয়ালে কাঁধে নিয়ে গোসলখানায় ঢুকে পড়লেন। রোমেলা অন্ধকারে একলা বসে সর্পিনীর মতো ফুঁসতে লাগলেন। হাত পা কাঁপছে তাঁর। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে ঝলসে উঠছে ধ্বংসাত্মক লেলিহান তেজ। সব সংসারে মনের মিল থাকে না। মতের মিল দিয়েই জীবন কাটাতে হয়। মনের দাবি ভুলে থেকে সংসার, আপনজন এবং সমাজের সাথে বেঁধেছেদে মানুষ জোড়াতালি দিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দেয়। দিতে হয়। জীবনটা রূপকথা নয়। হ্যাঁ, রূপকথার মতো সুন্দর প্রেম এসেছিল একবার তাঁর জীবনে। কিন্তু সেই রূপকথার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল সমাজ এবং পরিবার। সেই প্রেম পূর্ণতা পায়নি। একটা অন্ধ বিভীষণ রাগ তাঁর চেতনা লুপ্ত করে দিচ্ছিল। মহিলাটা কে তা জানতেই হবে। সুলেমানের কাছ থেকে যে করেই হোক কথা বের করতে হবে। সেই মহিলা কি লাইব্রেরি ঘরের ভেতরেই ছিল এতক্ষণ? কী সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক! তাঁর স্বামীর এর আগে কখনো চরিত্রগত দুর্বলতা ছিল না। দেশ বিদেশের ডানাকাটা সুন্দরী মেয়েরা কাজের খাতিরে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে সর্বক্ষণ। নানাভাবে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি সাড়া দেন নি। আজ এতকাল পরে এসে এ কোন ডাইনি এসে জুটল তাঁর কপালে? কে এই মায়াবিনী কুহকিনী? যে এত বছরের পুরনো সংসার ভেঙে ছারখার করে দিতে চাইছে? ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। যে রোমেলার এত বড় সর্বনাশ করল, সেই রাক্ষুসী কালনাগিনীর জীবনে ধ্বংস অনিবার্য!

৬১

আজ প্রথম সকাল! আলোর ঝলকানিতে ঘুম ভাঙলো সামির। ভারি চোখের পাতা দুটো অনেক কষ্টে মেলে ধরে দেখল চৈত্র প্রাতের হেম রঙা রোদে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর। হৃদি শুয়ে আছে পাশে। বালিশের ওপর এলোমেলো ছড়িয়ে আছে তার লম্বা

ঘন কালো চুল। কপালের ওপর অবহেলায় পড়ে আছে একটি বাসি গোলাপের কালো পাঁপড়ি। চৈত্রের সোনা রোদ ধুয়ে দিচ্ছে ওর মায়াবী সুন্দর কোমল মুখখানি। আজকের পর থেকে প্রতিটি সকাল এরকম মধুর হয়েই অবতরণ করবে ধরণীতে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে প্রিয়মুখ দর্শন! আহা, ইচ্ছে জীবন বুঝি একেই বলে!

সামি খুব যত্নের সাথে হৃদির কপাল থেকে ফুলের পাঁপড়িটা তুলে নিল। তারপর ওর কপালের চুলগুলো সরিয়ে এঁকে দিল একটি গাঢ় চুম্বন। ঘুম ভেঙে গেলো হৃদির। ভাঙতেই চোখের সামনে সামির মুখটা দেখতে পেয়ে সে ভারি সুন্দর একটা তৃপ্তির হাসি হাসল। সামি আদুরে গলায় বলল,'উঠে যা, আজকে বাবা ইউ এস এ যাচ্ছে। বিভাও চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়া।'

– 'হুম।' আলসে গলায় বলল হৃদি। আরও কয়েকটা মিনিট বিছানায় গড়াগড়ি করে নিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। সামি ওয়াশরুমের দিকে গেছে। ঘড়িতে বাজে সাতটা। বিভা আটটার দিকেই বেরিয়ে পড়বে। ওদের বাসায় যাবে প্রথমে, বাবা মায়ের সাথে দেখা করবে। তারপর সুটকেস নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। বিভা চলে যাবে এটা মনে পড়তেই হৃদির মনটা খারাপ হয়ে গেলো। খারাপ হওয়া মন নিয়ে চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখল সে। বিয়ের আগে এই ঘরে বহুবার এসেছে। তখন সামির সাথে প্রেম ছিল না, ছিল শুধুই বন্ধুত্ব। কখনো ভুলেও ভাবেনি যে এ ঘরটা একদিন তার নিজের হবে। নিজের! সত্যই কি আজ থেকে এই ঘর, এই বাড়ি, এই বাড়ির মানুষগুলো সব তার নিজের হয়ে গেছে? একটা দিনের তফাতে কি জীবন এতটা বদলে যায়? হৃদি একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিল। তার বাবার বাড়ির বেডরুমের তুলনায় এই বেডরুম তিন গুণ বড়। বাড়িটিও যেন রাজপ্রাসাদ। রাজপুত্রের মতোই রূপবান তার স্বামী। চারপাশে সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করছে অগণিত দাসদাসি। এ বাড়ির লোকেরা জগ থেকে গ্লাসে পানি পর্যন্ত ঢেলে খায় না। এমনটা কি চেয়েছিল সে কখনো? কী আশ্চর্য, মানুষ চায় এক, আর হয় আরেক। তার স্বপ্ন ছিল একটা ছোট্ট দখিনমুখি ফ্ল্যাট। দুই বেডরুম, একটা ডাইনিং, ছোট একটা রান্নাঘর

আর এক চিলতে ঝুল বারান্দা। নিজের সংসার ইচ্ছেমতো সাজাবে সে, মন খুলে রান্না করবে, ছুটির দিনে বারান্দায় বসে নিজ হাতে ফুলের বাগান করবে। শুধু সামি, আর সে আর তাদের ছোট্ট ছিমছাম সংসার। সেইসব কিছুই হলো না, হলো এক রূপকথার কারবার। রাজপ্রাসাদের রাজবধূ হয়ে নতুন জীবন শুরু হলো তার। অথচ রাজনন্দিনী সে হতে চায়নি, হতে চেয়েছিল সাধারণ এক মধ্যবিত্ত গৃহবধু। আজ বিকেলে গুলশানের অভিজাত ফার্নিচারের দোকানে যাবে তারা স্বামী স্ত্রী ফার্নিচার অর্ডার করতে। যে ফার্নিচারগুলো সামি অনলাইনে দেখে রেখেছে সেগুলোর দাম কোটি ছাড়িয়ে যাবে। শ্বশুরমশাই ব্যাপক ক্ষমতাধর লোক। এই অল্প সময়েই হৃদি বুঝে গেছে যে আশেপাশের লোকজনের কাছে শ্বশুরমশাই দেবতা বৈ অন্য কিছু নন। প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক কর্মচারী থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজনরা প্রত্যেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত। তাঁর সম্মোহনের জাল সর্বত্র বিরাজমান। এমন লোকের পুত্রবধূ হিসেবে হৃদির দাম আকাশচুম্বী। আত্মীয়স্বজনদের কারো কারো চোখে সে নিজের জন্যে হিংসা দেখেছে, আবার কারো চোখে দেখেছে অতিরিক্ত বিনয়। তোষামোদ করার লোকেরও অভাব নেই এ সংসারে। প্রভাবশালী, যশধর পিতার ছেলেরা সবসময় পিতার দাপটের কাছে ম্লান হয়ে থাকে। জন সাধারণ তাদের খুব একটা হিসাবে ধরে না। হৃদি জানে, লোকে তাকে চিনবে রাশেদুল হকের পুত্রবধূ হিসেবে, সামিউল হকের স্ত্রী হিসেবে নয়। সামির প্রতিভা, গুণ, মেধা এই সমস্ত কিছু আজীবন ঢাকা পড়ে থাকবে তার পিতার সাফল্যের আলোকবর্তিকার পেছনে। সামি কি কখনো এভাবে চিন্তা করে দেখেছে? নিশ্চয়ই না। সে তার বাবাকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। তার সাথে এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে যাওয়াটা চরম বোকামি হবে।

সামি ওয়াশরুম থেকে বেরোতেই হৃদির চিন্তায় ছেদ পড়ল।

‘এই খাটের তলায় নাকি ওরা কী গিফট রাখছে? চল দেখি।’

- ‘ও হ্যাঁ, ভুলেই তো গেছিলাম।’ বলতে বলতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো হৃদি। তার পরনে সাদা রঙের সিল্ক কাপড়ের লেসওয়ালা স্লিভলেস নাইটি। খোলা চুলগুলো দুহাত দিয়ে জড়ো করে একটা হাত খোঁপা করে নিল সে। তারপর উবু হয়ে খাটের তল থেকে মাঝারি সাইজের বাক্সটা বের করে নিল। রাখলো বিছানার ওপর। উল্টেপাল্টে দেখল। কিছু লেখা নেই ওপরে। ওজনও খুব একটা কম নয়। সামি এগিয়ে এসে বসল হৃদির মুখোমুখি।

– ‘কী থাকতে পারে ভেতরে?’ সামির প্রশ্ন।

– ‘বুঝতেছি না। বোমাটোমা না তো?’

– ‘অসম্ভব কিছু না, হইতে পারে।’ সামি হাসে। -’দাঁড়া খুলে দেখি।’

ছুরি নিয়ে এসে বাক্সের ধার ঘেঁষা স্কচটেপ কাটল হৃদি। খুলে দেখা গেলো বাক্সের ভেতরে আরেকটা বাক্স।

– ‘আমি জানতাম এই ধরনের কিছু একটা ফাইজলামিই করবে শয়তানগুলা।’ হৃদি খুব বিরক্ত।

– ‘বাক্সের ভিতর বাক্স? এই হইল গিফট?’ বলতে বলতে সামি দ্বিতীয় বাক্সটা খুলল। এভাবে পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। ষষ্ঠ বাক্সটির মুখ উন্মোচন করতেই ভেতরে কিছু একটা কিলবিল করে নড়ে উঠল। হৃদি ‘ওরে বাবারে!’ বলে চিৎকার দিয়ে ছিটকে সরে পড়ল একদিকে। সামি ভয় পেলো না। মুখ বাড়িয়ে ভালো মতো

দেখল বাক্সের ভেতরটা। চার পাঁচটা বড় বড় তেলাপোকা মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। হৃদি তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে, 'এত বড় কুত্তা এইগুলা। গিফট হইল এইটা কোনো? সকালটাই মাটি করে দিল আমার!'

সামি বাক্সটা উপুড় করে মেঝেতে তেলাপোকাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। তাই দেখে হৃদির নাচন কুদন গেলো আরো বেড়ে। ভয়ের চোটে পারলে সে এবার মূর্ছা যায়।

– 'কী করতেছিস তুই? আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! আমার ঘরের মধ্যে কেন ঐগুলাকে ছেড়ে দিচ্ছিস? এখন কী হবে? তেলাপোকার সাথে বাস করতে হবে আমার? রাতের বেলা যদি আমার গায়ে উঠে পড়ে?' বলতে বলতে সে ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগল।

সামি একটা রাম ধমক দিয়ে উঠে বলল, 'আরে থাম! মারতে হবে তো এগুলোকে। স্যান্ডেল দে একটা।' হৃদি স্যান্ডেলট্যান্ডেল এগিয়ে দেওয়ার ধার না ধরে ওয়াশরুমে ছুটে পালালো। ততক্ষণে দুটি তেলাপোকা তুরতুর করে দৌড়ে খাটের তলায় পালিয়ে গেছে। একটা স্যান্ডেল নিয়ে এসে সামি বাকি তিনটাকে মারল বাড়ি দিয়ে। তার বন্ধুরা এইসব ফাজলামো ছাড়া অন্য কিছু করতে পারবে না এটা তার জানা ছিল। প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল যে এ ধরনের কিছুই ঘটবে। হঠাৎ মেঝেতে পড়ে থাকা একটা ছোট্ট জিনিসের ওপর চোখ পড়ল। হাত থেকে স্যান্ডেল নামিয়ে রেখে জিনিসটা তুলে নিল সামি। ছোট একটা আয়তাকার আকাশি মলাটের এলবাম। আকাশি মলাটের ওপরে একটি হার্ট শেপের সাদা কাগজ আটকানো। তার ওপরে বাংলায় গাঢ় নীল রং দিয়ে লেখা 'বৃষ্টিমহল' । কেন জানে না সামি, ছোট্ট জিনিসটা দেখামাত্র তার হৃদস্পন্দন একটিবারের জন্য থমকে গেলো। হাত কেঁপে গেলো কিঞ্চিৎ। হৃদি তখন বাথরুমের দরজা আলতো ফাঁক করে উঁকি দিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলছে, 'মারছিস তেলাপোকার বাচ্চাগুলাকে?'

সামির মুখে একটা স্ফীত হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাত নেড়ে হৃদিকে কাছে ডাকল, ‘এদিকে আয়! দেখে যা।’

– ‘তেলাপোকারা কোথায়?’ হৃদি আশেপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে ফিসফিস করে বলল, যেন তেলাপোকারা তার কথা শুনে ফেললে মহাবিপদের সম্ভাবনা আছে।

– ‘তেলাপোকা নাই। তুই এদিকে আয়।’

পা টিপে টিপে এগিয়ে আসলো হৃদি। বসলো সাদা টাইলসের মেঝেতে। সামির হাতে ধরা ছোট্ট আকাশি মলাটের জিনিসটার দিকে চেয়ে অবাক গলায় বলল, ‘এটা কী?’

– ‘বৃষ্টিমহল!’ প্রতিধ্বনির মতো শোনালো সামির কণ্ঠস্বর।

– ‘মানে কী? তেলাপোকাময় বৃষ্টিমহল?’

– ‘হ্যাঁ, তেলাপোকাময় বৃষ্টিমহল।’ সামি হাসে।

অ্যালবাম খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের পিকনিকের ছবি। ওরা ছয়জন দাঁড়িয়ে আছে কুয়াকাটার সাগরপারে। পেছনে অস্তমিত সূর্য। আকাশের মাথায় ক্যাপ, হাফ প্যান্ট। কী কারণে যেন সে রুদ্রর কান খামচে ধরে আছে এক হাত দিয়ে। রুদ্রর মুখের ভঙ্গি কিম্ভূত। বিভার পরনে একটা লাল স্কার্ট, সাদা টপ। কোমরে হাত দিয়ে সুন্দর পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ব্লু টি শার্ট পরা হৃদির চোখ দুটি বন্ধ। মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। অমৃতার হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

পরনে লাল সাদা চেকের ঢোলা শার্ট। সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও সামি বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে নেই, অন্যদিকে। ছবিটির ওপরে ক্যাপশন লেখা 'ফার্স্ট ফানিমুন!'

তখন কে জানত একদিন সামি, হৃদির বিয়ে হবে। বন্ধুদের উপহার হিসেবে এই টুকরো স্মৃতিটুকু এসে জমা হবে তাদের নবীন সংসারের প্রথম দিনে! কেউ জানে না কিচ্ছু! এমন হরেক রকম অজানা দিয়ে ঘেরা বলেই বোধহয় মানবজন্ম পরম চিত্তহারী!

পরের পৃষ্ঠায় যেতেই চোখে পড়ল সেকেন্ড ফানিমুনের ছবি। তারপর থার্ড, ফোর্থ, ফিফ্‌থ··· সর্বশেষ ছবিটা গতবছর ডিসেম্বরে বিভার বাসার আঙিনায় তোলা। ডুয়ার্সে। এই ছবিতে অভিজিৎও আছে। দেখতে দেখতে ওদের চোখ ভিজে আসছিল। বুকের মাঝে কোনো তরঙ্গ নেই, শুধু কী রকম একটা মায়ার বুদবুদ, একটা গভীর মিষ্টি অনুভূতি! ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলির স্মৃতির মাঝে যেন দূর বনের মহুয়া ফুলের আবছা সৌরভ লেগে আছে। কী স্নিগ্ধ! কী বিশুদ্ধ! সপ্তম পৃষ্ঠাতে কোনো ছবি নেই, ফাঁকা জায়গা। ছবির পরিবর্তে দুটো লম্বাটে কাগজ আবিষ্কার করল ওরা। বালি যাবার এয়ার টিকেট। ক্যাপশনে এবার লেখা 'ফার্স্ট হানিমুন!'

৬২

বিভাকে সি অফ করতে সব বন্ধুরা এয়ারপোর্টে গেলো। হক সাহেবও একই সময়েই দেশ ছাড়ছেন। তবে তিনি আছেন ভি আই পি লাউঞ্জে। সামি আর হৃদি এক ফাঁকে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে আসলো। সামির আম্মা এয়ারপোর্টে আসেননি। আজ সকাল থেকে তাঁর মুখ অত্যধিক ভার। অন্যান্যবার এয়ারপোর্টে সামি না আসলেও মা আসেন বাবাকে সি অফ করতে। এবার বাবা বাড়ি ছাড়ার সময়ও মা বাবাকে বিদায় দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরোননি। সামি ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কিন্তু প্রশ্ন

করেনি কোনো। তার মনে হচ্ছে বাবা মায়ের মধ্যে কোনো ঝামেলা হয়েছে। এই জিনিসটা নতুন। সে তার বাবা মায়ের পরিপাটি সম্পর্ক দেখে এসেছে সর্বদা। তাদের ভেতর কথা কাটাকাটি হচ্ছে বা ঝগড়া হচ্ছে এরকম দৃশ্য তার স্মৃতিতে বিরল।

হৃদি আর বিভা দুজনেই খুব কাঁদছিল। অন্য বন্ধুরাও কাঁদছিল ভেতরে ভেতরে। সবাই কি আর প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন দিতে পারে? বিভা চলে যাচ্ছে তার নিজের ছোট্ট ভুবনটায়। চাইলেই আর বন্ধুদের সাথে যখন তখন দেখা করতে পারবে না। এখানে সব কিছুই আগের মতো রবে। শুধু বিভার স্থানটি হয়ে যাবে শূন্য। লোকে বলে শূন্যস্থান বেশিদিন শূন্য থাকে না। কে জানে, হয়তো বিভার স্থানটিও বেশিদিন খালি পড়ে থাকবে না। কেন এমন হয়? কেন একটা সময়ে এসে সব্বাইকে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যেতে হয়? একটা মাত্র জীবন! কী হয় একটা ছোট্ট জীবন সবাই মিলেমিশে হেসেখেলে কাটিয়ে দিলে? কেন এই নিরন্তর আসা যাওয়ার খেলা? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? মানুষের জন্মই যে হয় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার এক এবং অভিন্ন শর্তে! একবার আসলে··· যেতে হবেই! প্লেন উড়ল আকাশে। বিভার চোখের নিচে সাদা মেঘের পরতে পরতে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসলো ছেলেবেলার শহর, প্রাণের শহর, বন্ধুত্বের শহর, ‘ঢাকা!’

বন্ধুরা বিষণ্ন মন নিয়ে যার যার বাড়ি ফিরে গেলো, চৈত্রের তপ্ত দুপুরে। সামি, হৃদির সারাটা দিনভর ঝুমঝুম ব্যস্ততা। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা নতুন বৌয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। রাতে সামির দাওয়াত শ্বশুরবাড়িতে। এত ব্যস্ততার মধ্যে, নতুন জীবনের উত্তাল উচ্ছ্বাসে তাই খুব বেশিক্ষণ তারা আর মন খারাপ করে থাকতে পারল না। তাদের এখন ঠিক মন খারাপ করার সময় না। সময়টা আনন্দের, উপভোগের।

আকাশ বাড়ি ফিরে দেখল বসার ঘরে ঝুমকি আর তারার সাথে মনীষা বসে আছে। দুদিন হলো মনীষা এই বাড়িতে মুভ করেছে। ঝুমকি আকাশকে দেখামাত্র খাবারের

ব্যবস্থা করতে ছুটে গেলো। তারা এক দৌড়ে গিয়ে গ্লাসভর্তি ঠান্ডা পানি নিয়ে আসলো, মুখে বলল, 'ভাইয়া পানি খান। বাইরে যা গরম!' মনীষা একটা জাম রঙের সুতির শাড়ি পরে ছিল। কোনো সাজগোজ নেই, তবুও কী সুন্দর দেখতে মেয়েটা! আকাশকে দেখে মিষ্টি হেসে বলল, 'এইযে আকাশ সাহেব, আপনার অপেক্ষাই করছিলাম আমরা। আজকে আমাদের ভর্তা ডে। পাঁচ রকমের ভর্তা বানানো হয়েছে।'

বাড়ি ফেরার পর আকাশের মনটা কেমন শান্ত হয়ে উঠল। বাড়ি তো তাকেই বলে যেখানে আপনজনেরা অপেক্ষারত অবস্থায় পথ চেয়ে বসে থাকে। যাক, অবশেষে তার একটা বাড়ির মতো বাড়ি হলো বোধহয়।

রুদ্র ফিরল বসুন্ধরার একলা ফ্ল্যাটে। এখানে সামিকে নিয়ে তার অনেক অনেক স্মৃতি। আজ থেকে এই চোদ্দশ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে একলা থাকবে সে। এখন যেদিকে তাকাচ্ছে, সেদিকে সামিকে দেখতে পাচ্ছে। সামির জন্যেই হয়তো প্রায় বিকেলে হৃদি চলে আসতো হুটহাট। বসে থাকত, গল্প করত, রান্না করত এটা সেটা। এখন কে আসবে রুদ্রর কাছে? সব্বাই যার যার মতো ব্যস্ত। ফ্রিজ খুলে দেখল খাবার মতো কিছু নেই। তিনদিন আগের বাসি খিচুড়ি আছে। সে নিজেই রান্না করেছিল। খেতে ইচ্ছে হলো না। খালি পেটেই ভর দুপুর বেলায় শুয়ে পড়ল বিছানায়। বুকের ভেতর কেমন একটা হুহু ভাব। চার পাঁচ মাস পর সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। নতুন দেশ, নতুন জীবন, নতুন অধ্যায় ... কোথায় হারিয়ে যাবে এইসব দিন··· কোথায় হারাবে বন্ধুরা··· কোথায় হারাবে মনীষা! আর অমৃতা? অমৃতাকে না দেখে সে বিদেশ বিভূঁইয়ে টিকবে কী করে দিনের পর দিন? মনীষাকে ছাড়া দিব্যি বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু অমৃতাকে ছাড়া··· কে জানে!

একলা লাগে··· কী ভীষণ একলা লাগে! যার জীবনে চমৎকার কিছু মনের মতো বন্ধু আছে, তাকেও বুঝি কখনো এমন অহেতুক একলা লাগার রোগে পায়? হ্যাঁ পায় তো!

খুব পায়। কারণ দিন শেষে বন্ধুপাগল মানুষটিও আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো একলা হয়েই বাড়ি ফেরে!

অমৃতা ফিরল বিধ্বস্ত অবস্থায়। শূন্যতায় ছেয়ে আছে ভেতরটা। বিভা চলে গেছে দূরে। দূরে চলে গেছে তার প্রিয় মানুষটা। বিভার সাথে নাহয় যোগাযোগ হবে যে কোন উপায়ে। কিন্তু সেই মানুষটার তো কোনো হদিশ পাওয়াই দুষ্কর হয়ে যাবে। এক মাস? নাকি এক যুগ? কী করে থাকবে অমৃতা? মরেটরে যাবে না তো?

৬৩

'ফেলো গো বসন ফেলো, ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানবভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা-শুভ্র বিবসনে।'

বিভার রেশমি সুগন্ধি এলোচুলে নাক ডুবিয়ে রবি ঠাকুরের কবিতাটা আবৃত্তি করছিল অভিজিৎ। ওদের গা ঢাকা একটা নীল রঙের নকশি কাঁথায়। সেই কাঁথার ওপর আদুরে বেড়ালের মতো নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে চৈত্র সকালের মিহি রোদ্দুর। মাঝে মাঝে অভিজিৎকে কবিতায় পায়। সেদিন কারণে অকারণে, কথায় কথায় কবিতার পতি

চলে আসে তার মুখে। এমন একটা কবিতা পড়া আঁতেল লোককে যে বিভা ভালোবাসে, এই ব্যাপারটা নিজের কাছেই কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তার আজকাল। বন্ধুরা অভিজিতের এসব কবিতা শুনলে কী ঠাট্টাটাই না করত। ভাগ্যিস বন্ধুদের সামনে লোকটাকে কখনো কবিতা টবিতায় পায়নি।

বীমের খাঁজে খাঁজে চতুর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পোষা পায়রাগুলো। একটা কোকিল ডাকছিল মনকাড়া সুরে, পাশের জঙ্গলে। জলঢাকা নদীর ঝিরিঝিরি জলের শব্দ এসে লাগছিল কানে। বাতাসে আমের মুকুল আর পাকা কুলের কী সুন্দর ঘ্রাণ! দূর্গা আজ খুব সকালে উঠে মন্দিরে গেছে। এখনো ফেরেনি। হয়তো ফিরতে দেরি হবে। নাশতাটা হয়তো বিভাকে বানাতে হবে। কিন্তু অভিজিতের ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিভাকে আজ সে সারাদিন বাহুবন্দিই করে রাখবে। ছাড়বে না কিছুতেই

– ‘বিভাবরী!’

– ‘হুম

– ‘একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?’ –’কী প্রশ্ন?’

– ‘সঠিক উত্তর চাই কিন্তু।’

বিভা একটু নড়ে উঠে পাশ ফিরে শুলো। অভিজিতের মুখোমুখি।

– ‘বলো, কী জানতে চাও?’

অভিজিৎ বিভার গালের ওপর একটা হাত রেখে চশমাবিহীন ফোলা চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল, ‘সামির বিয়ের সময় তোমার মন খারাপ লেগেছিল?’

বিভার মুখের রং পাল্টালো। হালকা অস্বস্তি এসে ভিড় করল ডাগর চোখের পাতায়।

– ‘এটা কেমন প্রশ্ন?’

অভিজিৎ একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, ‘জানো? এই ঘটনার পর তোমার প্রতি আমার সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেছে। সত্য বলছি বিভা, তোমার মতো মেয়ে হয় না।’

বিভা অপ্রস্তুত গলায় বলল, ‘আমি আবার কী করলাম?’

অভিজিৎ হাসল, ‘নিজের প্রাক্তন প্রেমিককে নিজেরই বান্ধবীর হাতে তুলে দিতে কয়টা মেয়ে পারে? তুমি এই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছ। তাই ভাবছিলাম তোমার নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে পুরো ঘটনাটার সাক্ষী হতে গিয়ে।’

বিভা কেমন একটু অন্য গলায় বলল, –’আসলে কী জানো? সামি আমার প্রেমিক কম, বন্ধু বেশি ছিল। কষ্ট যে হয়নি তা না, কিন্তু সেই কষ্টটা সহনীয় ছিল। আমার একটাবারেরও জন্যেও মনে হয়নি যে আমার কাছ থেকে কেউ কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল যার যার পাওনা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনো ঋণ বাকি নেই আর। সব শোধ বোধ হয়ে গেলো। এমনটাই যেন হবার ছিল!’

– ‘তাই?’

– ‘হ্যাঁ তাই। সত্যি বলছি আমার কোনো কষ্ট নেই আর। হয়তো সামি আর হৃদি দুজনেই আমার বন্ধু বলে এটা সম্ভব হয়েছে। বুঝলেন অভিজিৎ বাবু, আমাদের বন্ধুত্বের অনেক শক্তি!’

– ‘তোমার বান্ধবী হৃদিকে আমার একটা ধন্যবাদ দেওয়ার ছিল।’

--‘কেন?’

– ‘কেন আবার? এমপির ছেলেকে সে বড়শি দিয়ে না আটকালে, শ্রীমতি বিভাবরী দেবিকে আমি পেতাম কী করে?’

বিভা হাসে, ‘এমপির ছেলেকে হৃদিতা বড়শি দিয়ে আটকানোর অনেক আগেই এক আঁতেল বই পড়া বোকামানবের বড়শিতে বিভাবরী দেবি নিজেই আটকে গেছে। অতএব সব ক্রেডিট বোকামানবের।’

এ কথা শুনে অভিজিৎ বিভার আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলল, ‘সত্যি করে বল তো বিভা, ঠিক কবে থেকে আমাকে ভালোবাসছ?’

বিভার যেন উত্তরটা তৈরিই ছিল। একটুও সময় নষ্ট না করে বলল, ‘কলকাতায় সল্টলেকের বাড়িতে একবার আমার খুব জ্বর হয়েছিল মনে আছে? পূজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলে তুমি। সারারাত আমার পাশে জেগে বসেছিলে। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তুমি আমার কপালে একটা হাত রেখে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছ,

ঘাড় কাৎ করে। চোখ থেকে চশমাটা পর্যন্ত খুলতে ভুলে গেছ। খুব মায়া হয়েছিল সেদিন জানো? মনে হয় সেই মায়া থেকেই ভালোবাসার সূত্রপাত। সেদিনই টের পেয়েছিলাম, তোমাকে ছেড়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুব সহজ কাজ হবে না।' একটু থেমে বিভা আবার বলল, 'আর তুমি?'

– 'বাংলাদেশে যেদিন প্রথম তোমার নাচ দেখেছিলাম, সেদিন থেকে।'

বিভার মুখে একটা স্ফীত হাসি ফুটে উঠল, 'বাব্বাহ! বুঝতে পারিনি যে একদম!'

– 'বুঝতে চাওনি বলেই বুঝতে পারোনি বিভা! যখন চেয়েছ, তখন ঠিক ঠিক বুঝে গেছ।'

দূর্গা বোধহয় চলে এসেছে। বিভা উঠল বিছানা ছেড়ে। আজ ছুটির দিন। অভিজিৎ সারা বেলা বাড়িতেই থাকবে। বিকেলের দিকে নদীর ধারে বেড়াতে যাবে দুজনে। বিভা নিজের হাতে রান্না করবে অনেক দিন পর। আগামীকাল বাবা মা আর ছোট মাসিমা আসছেন ঢাকা থেকে। থাকবেন সপ্তাহখানেক। বাজার সদাই করতে হবে। নাশতা সেরেই বিভা বাজারের ফর্দ করতে বসে যাবে। বাজারের কাজটা রোজ দূর্গা করলেও শ্বশুরশাশুড়ির আগমন উপলক্ষে অভিজিৎ নিজেই বাজারে যাবে। বাজারের বড় মাছটা দেখেশুনে কিনে আনবে। তার শ্বশুরের পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। পান, ভালো মানের জর্দা এসব টুকিটাকি জিনিসও কিনে রাখতে হবে। বন্ধুদের মিস করছে বিভা এটা ঠিক, কিন্তু নিজের সংসারে ফিরে এসে ভালোও লাগছে তার। ঢাকা শহরের যান্ত্রিকতায় যেমন দুকূল ছাপানো মায়া, তেমনি এই বন পাহাড়ের গ্রামটাতেও একটু একটু করে মায়ার পরশ লাগছে যেন। বিভা হয়তো বদলে যাচ্ছে। বদলাবেই তো, মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়। মুনির চৌধুরী বলেছিলেন!

৬৪

সন্ধের পর বালিশে একটু মাথা রাখতেই কেমন আলসেমিতে পেয়ে বসল আকাশকে। ক্লান্ত শরীরটাকে ছেঁকে ধরল রাজ্যের ঘুম। কাল যে করেই হোক বি সেকশনের মিড টার্মের সবগুলো খাতার নম্বর জমা দিতে হবে অফিসে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই ঘুমিয়েছিল সে। নিজের মস্তিষ্ককে বলে রেখেছিল খানিক বাদেই যেন জাগিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক কথা শুনেছে। আধা ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল তার পুরোপুরি আলোহীন এক পৃথিবীতে। বিদ্যুৎ চলে গেছে। চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই এপার্টমেন্টে কোনো জেনারেটর নেই। মোমবাতি আর চার্জলাইটই একমাত্র ভরসা। দরজায় কেউ একজন কড়া নাড়ছিল। আকাশ ঘুমো চোখ নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘুরালো। তারা দাঁড়িয়ে আছে হাতে মোমবাতি নিয়ে।

– ‘ভাইয়া ছাদে চলেন। মনীষাপু ডাকছেন ‘

– ‘আমাকে ডাকছেন?’

– ‘হ্যাঁ আমাদের সবাইকেই যেতে বলেছেন। চায়ের দাওয়াত।’ তারার কথার ভঙ্গি দেখে মনে হলো চায়ের দাওয়াত পেয়ে সে সীমাহীন খুশি।

– ‘আচ্ছা। আসছি আমি। তুমি যাও।’

মিনিট দশেক পর ওপরে উঠে দেখা গেলো তারা আর মনীষা পাটি বিছিয়ে ছাদের মধ্যিখানে বসেছে অন্ধকারে। পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় আশেপাশে এখন কোনো কৃত্রিম আলো নেই। গলির মুখের মুদির দোকানে আড্ডায় মেতে থাকা এক দল যুবকের হাসি ঠাট্টার আওয়াজ ভেসে আসছে শুধু। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই

কোথাও। আকাশ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো ওদের কাছে। পাটির ওপর হাঁটু মুড়ে বসতে বসতে বলল, 'উনি কোথায়?'

তারা অবাক, 'উনিটা কে?'

– 'তোমার খালা।'

বোঝা গেলো আকাশ ঝুমকির কথা জানতে চাইছে।

– 'ও, খালামণির শরীরটা একটু খারাপ।'

– 'কেন? কী হয়েছে?' আকাশের কণ্ঠের উদ্বেগটা চাপা থাকল না।

--'কী হয়েছে কে জানে! পেট ব্যথা করছে বলছিল বিকেল বেলা।'

--'ও' অস্ফুটে বলল আকাশ।

– 'তোমরা তাহলে বসো। আমি চা করে আনছি।' বলল মনীষা।

– 'এখন বসুন। কারেন্ট আসুক।'

– 'কারেন্ট কখন আসবে তার ঠিক নেই। ট্রান্সফরমার জ্বলে গেছে। সারাতে সময় লাগবে। আমি মোমবাতি দিয়েই কাজ চালাতে পারব।' কথাগুলো বলে শেষ করে মনীষা উঠে দাঁড়ালো। কয়েক কদম হেঁটে ছাদের কোণ ঘেঁষা ঘরটার দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। অসংখ্য নীল নীল নক্ষত্রে ছেয়ে আছে অন্তরীক্ষ। সাথে একটা ভাঙা চাঁদ। হালকা ফুরফুরে বাতাস বইছে ছাদজুড়ে। অন্ধকারে তারার চশমা পরা শুকনো মুখখানার দিকে একবার তাকালো আকাশ। তারা ঘাড় উঁচু করে আকাশের অগণিত নক্ষত্র দেখছিল। ভাঙা চাঁদের সূক্ষ্ম একটা নীল আলো লেগে আছে ওর কপালে আর নাকে, ধূলোর মতো। যেন হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই আলোটুকু হাওয়া হয়ে যাবে। আকাশ পানে মুখ উঁচিয়ে রেখেই তারা বাচ্চাদের মতো আহ্লাদী গলায় হঠাৎ বলল, 'আজকে আকাশ ভরা তারা! কী সুন্দর!'

– 'আকাশ ভরা তারা!' কথাটা একবার উচ্চারণ করল আকাশ। টেনে টেনে।

তারা মুখ নামিয়ে তাকালো আকাশের দিকে। একটু কেমন দ্বিধা নিয়ে বলল, 'ভুল কিছু বললাম কি?'

– 'না ভুল হবে কেন? আকাশেই তো তারা থাকে!

এবার তারা কী মনে করে যেন ফিক করে হেসে ফেলল।

– 'হাসলে কেন?'

– এমনি।'

– ‘হাসার মতো কিছু বলেছি কি?’

– ‘না বলেন নি। তবুও হেসে ফেললাম। দুঃখিত।’

মনীষার চা নিয়ে আসতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগল না। অন্ধকার একটু একটু সয়ে এসেছে চোখে। তার পরনে একটা সুতির সালওয়ার কামিজ। অন্ধকারে কামিজের রং বোঝা যাচ্ছে না। চুলগুলো ছড়ানো পিঠের ওপর। কীসের যেন একটা মিষ্টি সৌরভ ভেসে আসছে ওর গা থেকে। চায়ের ট্রে পাটির ওপর নামিয়ে রাখলো মনীষা। শুধু চা নয়, চায়ের সাথে আছে গরম গরম পেঁয়াজু ভাজা।

তারা পেঁয়াজু দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল। মুঠো ভর্তি করে তিন চারটা তুলে নিতে গেলো। কিন্তু এত গরম যে একটাও শেষ পর্যন্ত আঙুলের ফাঁকে টিকিয়ে রাখতে পারল না।

– ‘তোমার বন্ধুরা কেমন আছে?’ মনীষার প্রশ্ন, আকাশকে।

– ‘ভালো আছে।’ ছোট করে উত্তর দিল আকাশ, গরম পেঁয়াজুতে আলতো করে একটা কামড় বসিয়ে দিয়ে।

– ‘নিউলি ম্যারিড কাপল? ভালো আছে তো না?’

– ‘ভীষণ ভালো!’ পেঁয়াজু চিবোতে চিবোতে বলল আকাশ।

– ‘রুদ্র?’ ছোট করে নামটা একবার উচ্চারণ করে মনীষা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিল।

আকাশের ঠোঁটে একটা অনিচ্ছাকৃত হাসি ভেসে উঠল। রুদ্রর কথাই কি তবে জানতে চাইছিল মনীষা এতক্ষণ ধরে? অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হলো বেচারিকে। আচ্ছা মনীষা কি রুদ্রকে … ..? চিন্তাটা মাথায় রেখেই উত্তর দিল আকাশ,

– ‘বেচারা একটু লোনলি ফিল করছে। সামি মুভ করল তো।’

– ‘হুম ..ও চাকরিটা ছাড়বে কবে? সেপ্টেম্বরে তো চলেই যাচ্ছে ইউ এস এ। আমার মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই কটা দিন বাবা মায়ের সাথে চিটাগাং গিয়ে থাকা উচিত।’

– ‘ছেড়ে দেবে। খুব বেশি হলে দুমাস। এরপর ছেড়ে দেবে। রাইয়ান কেমন আছে?’

– ‘এখন একটু স্টেবল হয়েছে আমার ছেলেটা। প্রথমে তো থাকতেই চাইছিল না একলা একলা অত দূরে।’

তারা কুড়মুড় করে পেঁয়াজু চিবোচ্ছিল আর ফোন টেপাটেপি করছিল মনোযোগ দিয়ে। এই দুজন মানুষ কী বলল, কী করল তাতে যেন তার কিছুই এসে যায় না।

– 'স্বাভাবিক। ছোট মানুষ। আপনাকে ছাড়া নিশ্চয়ই আগে কখনো থাকেনি কোথাও। '

'কিন্তু ওর বাবা…' একটু থামল মনীষা। তারপর গাঢ়ভাবে বলল, 'ওর বাবা খুব সমস্যা করছে।'

আকাশ একটু চোখের কোণ দিয়ে দেখল মনীষাকে। কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা তার অভ্যাসে নেই। অনেকবার জানতে ইচ্ছে হয়েছে মনীষার অতীত জীবনের কথা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু প্রশ্ন করাটা অভদ্রতার লক্ষণ বলে চুপ করে ছিল। আজকে যেহেতু প্রসঙ্গটা উঠেই গেলো, এই সুযোগে সে একটু সাবধানে বলল, 'উনি কোথায় থাকেন?'

– 'থাকে ঢাকাতেই। কাজীপাড়া।'

– 'ও আচ্ছা। আপনার সাথে তো কোনো যোগাযোগ নেই এখন তাই না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনীষা বলল--'যোগাযোগ আমি রাখতে চা ইনা। কিন্তু সে আমার পিছুই ছাড়ছে না। খুব ভয়ে আছি এই বাসার ঠিকানাটাও না কোন সময় জোগাড় করে ফেলে।'

আকাশ রহস্যের গন্ধ পেলো হাওয়ায়। উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'পিছু ছাড়ছে না বলতে? আপনাদের ডিভোর্স হয়নি?'

‘ডিভোর্স পেপারে সে এখন অবধি সাইন করেনি।’

– ‘কেন?’

– ‘কী আর বলব ভাই তোমাকে? লোকটা নেশাখোর। বিয়ে করেছিলাম অতি অল্প বয়সে। তখন বাবা মা দুজনেই বেঁচে ছিলেন। সে ছিল পাড়ার মাস্তান। দেখতে সুদর্শন ছিল। চেহারা দেখেই পটে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র ষোলো। পালিয়ে বিয়ে করে ফেললাম। বিয়ের পর মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই হলো না আমাদের। সে নতুন বৌ তুলল তার এক দুঃসম্পর্কের মামার বাসায়। এদিকে আমার বাবা মা পালিয়ে যাবার ঘটনা জানতে পারার পর আমাকে মনে মনে ত্যাজ্য কন্যা করলেন। কয়েক মাসের মাথায়ই জানতে পারলাম ছেলেটা মাদকাসক্ত। ততদিনে রাইয়ান আমার পেটে চলে এসেছে। ওর মামার বাসায় কদিন থাকব আশ্রিত হয়ে? সেই মামার আবার ছিল চরিত্র খারাপ। আমার জীবনের স্ট্রাগলটা সেই তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তার চাকরিবাকরীর কোনো চেষ্টা নেই। দিনরাত নেশা করে। আমি হাজার চেষ্টা করেও ফেরাতে পারলাম না তাকে। শেষমেশ আমার বড় ভাইকে সব খুলে বললাম। ভাইয়া একদিন ওর মামার বাসায় আসলো আমাকে নিয়ে যেতে। বাবা মায়ের কাছে ফিরে যাবার পর শুরু হলো অন্যরকম অশান্তি। আমার বাবা মা এই সন্তান চান না কিছুতেই। এবর্শনের জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন দিনরাত। আমি কিছুতেই মানলাম না তাদের কথা। কী ভয়াবহ কষ্টের দিন ছিল! মনে পড়লে এখনো আমার…’ মনীষার গলা কাঁপছিল। শুনতে শুনতে মনটা ভারি বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল আকাশের। মনীষার মতো এমন চমৎকার একটা মেয়ের জীবন কেন এতো অগোছালো হবে?

তারা মোবাইল থেকে মুখ তুলে আচমকা বলল, ‘আকাশ ভাইয়া, মনীষাপু কিন্তু খুব সুন্দর গান গায়। এসব দুঃখের আলাপ বাদ দিয়ে এখন বরং একটা গান হোক।’

– ‘হ্যাঁ আপনার গানের প্রশংসা আমি রুদ্রর কাছেও শুনেছি। একটা গান করেন আজ।’

মনীষা হাসল, ‘গানের গলা এখন আর আগের মতো নেই।’

– ‘ইশ যা আছে তাতেই খুব চলবে!’ ভরসা দিয়ে বলল তারা।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা খালি করল মনীষা। গলা খাঁকারি দিল কয়েকবার। তারপর শুরু করল গান।

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ॥

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগণ মাঝে,

বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে

করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥

৬৫

গ্রামের আত্মীয়রা আজ বিকেলে ঢাকা ছাড়ল। এখন অতিথিদের মধ্যে আছেন সামির ছোট খালা এবং হক সাহেবের ফুপু অর্থাৎ হৃদির দাদি শাশুড়ি। পুরো বাড়িতে শুধু এই একজন মানুষকেই হৃদির একটু আপন আপন লেগেছে। মানুষটা এত অসুস্থ, তবুও মুখে হাসি লেগে আছে সারাক্ষণ। এদিকে শাশুড়ি এবং খালা শাশুড়ি চোখে চোখ পড়ে গেলেই মুখ শক্ত বানিয়ে ফেলছে, এড়িয়ে যাচ্ছে। বিয়ের আজ তিনদিন

হয়ে গেলো। এই তিন দিনে শাশুড়ি মা একটি বারের জন্যেও তার সাথে হেসে কথা বলেননি। খাবার টেবিলে মুখ গোঁজ করে খাবার খেয়েছেন। নিজের ছেলের পাতে এটা সেটা তুলে দিয়েছেন বারংবার, কিন্তু হৃদির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাননি পর্যন্ত। ওই খাবার টেবিলেই হৃদির নিজের বাবা মায়ের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। বাবার বাড়িতে সব সময় মুরগির বুকের অংশটুকু তার জন্য বরাদ্দ ছিল। আর হৃদয়ের জন্য রানের অংশ। সেই ছোট্ট বেলা থেকে তাদের বাড়িতে এটাই নিয়ম। একবার হৃদয় দুষ্টুমি করে মুরগির ব্রেস্টপিস খেয়ে ফেলেছিল বলে কী ভীষণ রেগে গিয়েছিল হৃদি। এমনকি মাও হৃদয়কে চার পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এখানে কেউ একটা বার প্রশ্নও করল না যে হৃদির ঠিক কী ধরনের খাবার পছন্দ। তাছাড়া এই বাবুর্চির রান্নাও হৃদির পছন্দ হচ্ছে না। সে তার মায়ের রান্না ভীষণভাবে মিস করছে। খাবার টেবিলে বসলেই তার কান্না পায়। কান্নার জন্য ঠিকমতো খেতেও পারেনি আজ দুপুরে। সামিকে এ কথা বলতেই সে চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘কী আজিব! খাইতে বসলে কান্না আসবে কেন? আমাদের বাসার খাবার কি তোর মজা লাগতেছে না? এই শেফ তো খুব ভালো রান্না করে।’

সামির প্রশ্নটা শুনে হৃদি চুপ করে গেলো। আচ্ছা বন্ধু থেকে স্বামী হয়ে যাবার পরে কি ছেলেদের বুদ্ধি একটু কমে যায়? কেন যেন বিয়ের পর দিন থেকেই সামিকে হৃদির কেমন একটু অন্যরকম লাগছে। এতদিনের চেনা বন্ধুটি যেন হঠাৎ করে স্বামী নামক এক ঢালের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। আসলেই কি তাই? নাকি পুরো ব্যাপারটাই হৃদির মানসিক? কে জানে!

আজ ডিনারের একটু আগে হৃদি একবার রান্নাঘরে গেলো। ডাইনিং পেরিয়ে একটি ছোট্ট করিডোর, তারপর তিন ধাপ চওড়া সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয় কিচেনে। এর আগে কখনো আসা হয়নি এদিকটায়। এইই প্রথম। দেখা গেলো মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ বাবুর্চি মাথায় টুপি আর এপ্রন পরে রান্নার কাজ করছে। তাকে সাহায্য করছে আরো জনাচারেক কমবয়সী ছেলেমেয়ে। হৃদিকে দেখামাত্র এরা সবাই তটস্থ হয়ে গেলো।

এ বাড়ির মালকিন রান্নাঘরে পা দেন কদাচিৎ। সপ্তাহে এক কি দুদিন তিনি রান্নাঘরে নেমে আসেন টহল দিতে। ওই ঝটিকা সফরেই চাকরবাকরদের নানা রকম তদবির শোনেন, ঝগড়া মেটান, কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। আজকাল ঢাকা শহরে কাজের লোকদের ডিমান্ড অনেক। তবে এই বাড়িতে মাসোহারা অত্যধিক বেশি হওয়ায় লোক টিকে যায়। বেতন বেশি ছাড়াও এখানে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে। পরিবারের সদস্য কম হওয়ায় ফরমায়েশ দেওয়ার মতো লোক কম। বেগম সাহেবা সারাক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সর্বক্ষণ চাকরবাকরদের পেছনে লেগে থাকার অভ্যাস তার নেই। বাড়ির ভেতর ইন্টারকম টেলিফোন আছে। খুব জরুরি দরকার পড়লে তিনি ওপর তলা থেকে ফোন করেন কিচেনে। তবে এ কথা সত্য মেজাজ খারাপ হলে মহিলা তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। একবার রাগের মাথায় এক কাজের মেয়েকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। পড়ে গিয়ে সেই বেচারির হাত ভেঙে গিয়েছিল। তাই রসুই ঘরের অনেক ঝামেলাযুক্ত খবর রগচটা বেগম সাহেবের কান পর্যন্ত যাবার আগেই হেড বাবুর্চি নিজ উদ্যোগে মিটিয়ে ফেলেন। এই বাড়িতে ইচ্ছেমতো টিভি দেখা যায়। প্রেম করারও অবাধ সুযোগ সুবিধা। সকিনা নামের একটি সতের বছরের মেয়ে বেশ কিছু দিন যাবৎ আকবর নামের ত্রিশোর্ধ এক ড্রাইভারের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছে। অবশ্য বাড়ির মালিক ইলেকশনে জেতার পর থেকে সভা সমিতির কারণে একটু কাজ বেড়ে গেছে চাকরবাকরদের। মিটিং চলাকালীন দফায় দফায় চা নাশতা সার্ভ করতে হয়। পার্টির লোকেরা মাঝে মাঝে রাতের খানাও খেয়ে যায়। মিটিং না থাকলে অবশ্য অন্যান্য দিনগুলোতে কাজের তেমন প্রেশার থাকে না।

লম্বা আকারের বিশাল রান্নাঘরে মোট আটটি চুলা। এসি, ফ্যান, ওভেন, ফ্রিজ সমস্তই আছে এখানে। এমন কি দেওয়ালে একটি বত্রিশ ইঞ্চি এল ই ডি টিভিও লাগানো আছে। হৃদি যখন ঘরে প্রবেশ করেছে তখন টিভিতে হিন্দি নাচ চলছিল। হৃদিকে দেখামাত্র কিশোরী একটি মেয়ে চট করে রিমোট উঁচিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। তারপর দৌড়ে ছুটে গিয়ে চেয়ার জোগাড় করে এনে বিনীত গলায় বলল, 'ভাবি, বসেন!' ভাবি ডাকটায় আন্তরিকতা ছিল। ভালো লাগল হৃদির। তাকে দেখতে এখন

নতুন বৌয়ের মতোই লাগছে। পরনে একটা হালকা গোলাপি রঙের জামদানি শাড়ি। হাতভর্তি স্বর্ণের ওপর হীরের পাথরখচিত চুড়ি। গলায় সোনার চেইন সমেত হীরের লকেট। চুলে খোঁপা। বিয়ের পর থেকে এই তিনদিন যাবৎ সে শাড়িই পরছে। এই বাড়িটা এত বড় আর সুন্দর যে সেজেগুজে পুরো বাড়িতে একলা একলা ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও একটা আলাদা রকমের মজা আছে। তবে বড় বাড়ি তার পছন্দ ছিল না কখনোই। এখনো পছন্দ নয়। বেড়ানোর জন্য ঠিক আছে। কিন্তু সবসময় থাকবার জন্য ছোট্ট ছিমছাম বাসাই তার পছন্দ।

চেয়ারে পা তুলে বসে সে বাবুর্চির কাজ দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। এই ফাঁকে কর্মরত ছেলেমেয়ে গুলোর নাম জেনে নেয়ার কাজটাও সেরে নিল। ছেলে মেয়েগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তাকে। নিজেকে তার তেমন একটা সুন্দরী কখনোই মনে হয়নি। অন্তত বাংলাদেশের মতো জায়গায় যেখানে সুন্দরী বলতেই লোকে টকটকে ধবল ফর্সা মেয়ে বোঝে, সেখানে হৃদির মতো শ্যামলা গায়ের রঙের মেয়ে তো কোনো মতেই সুন্দরী বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজের মেয়েগুলোর চোখে সে চরম মুগ্ধতা লক্ষ্য করছে। বড় বড় চোখে তারা তার গায়ের শাড়ি দেখছে, দেখছে হাতের চুড়ি, আংটি, জুতো সবকিছু। একটু পরেই ওদের মুগ্ধ হবার কারণটা ধরতে পারল হৃদি। রূপ নয়, আসলে ওরা দেখছে ঐশ্বর্য। বলতে নেই, হৃদি এখন বিরাট বড়লোকের বৌ! বড়োলোকের বৌদের দিকে সাধারণ লোকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকবে, মুগ্ধ হবে, ঈর্ষা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ওদেরও কি হিংসা হচ্ছে? এই দু তিনদিনে হৃদি অনেকের চোখে হিংসার পাত্রী বনে গেছে। কী আশ্চর্য! লোকে তাদের স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাকে হিংসে করে না, হিংসে করে সামাজিক মর্যাদাকে, বিলাসব্যসন আর চাকচিক্যকে!

ডিনার তৈরি হয়ে গেছে। সাদা ভাত, তিন রকমের সামুদ্রিক মাছ, দুই পদের মুরগি, একটা গরুর মাংসের তরকারি, দু রকমের সবজি, এবং দু রকমের ভর্তা। হৃদি বুঝতে পারছে না এ বাড়িতে কি রোজ এত পদের রান্না হয় নাকি বিয়ে উপলক্ষ্যে

অতিথিদের জন্য এই বিশেষ আয়োজন। ঠিক সেই সময় ভারি একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটল। সামি তার বৌকে খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো। অনেক দিন হয়ে গেলো সে বাড়ির রসুই ঘরে পদার্পণ করেনি। প্রয়োজন হয়নি। আজ তার উপস্থিতি চাকরবাকরদের মধ্যে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। একটু জড়োসড়ো ভাব চলে আসলো সবার মাঝে। কয়েকজনের মুখে একটু মিটমিটে হাসিও ফুটে উঠল। অল্প বয়সী একটি মেয়ে অপর একটি মেয়ের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দ্যাখ না, নতুন বৌরে থুইয়া থাকতারে না, ইকটু সুময়। বৌরে খুঁজতে চইলা আইছে।'

– 'তুই এখানে। আমি তোকে সারা বাড়ি খুঁজতেছি।'

– 'আমি তো তোকে বলেই আসলাম, যে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

– 'কী জানি! খেয়াল করি নাই। তুই এখানে কী করিস?' বলে সামি আশপাশটা একটু দেখল। এ জায়গায় তার আসা হয় না বহুদিন। শেষবার কবে এসেছিল ভুলেও গেছে। সবকিছু কেমন নতুন আর অন্যরকম লাগছে।

– 'উনাদের কাজ দেখছি।'

– 'শোন, তুই তাহলে থাক। আমি এক দৌড়ে গিয়া রুদ্ররে নিয়া আসি।'

– 'ফিরবি কতক্ষণে? ডিনার তো সার্ভ করে দিচ্ছে।'

– 'এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। রাস্তায় জ্যাম না থাকলে আরো তাড়াতাড়িই চলে আসব।'

হৃদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বাবুর্চিকে বলল, 'খাবারটা তাহলে একটু পরেই সার্ভ করুন। আপনার ভাইয়া ফিরে আসুক। কেমন?'

– 'জি ভাবি। ঠিক আছে।'

হৃদি সামির পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'শোন, রুদ্রকে বলিস কয়েকদিন থাকার মতো কাপড় চোপড় নিয়ে আসে যেন। এখান থেকেই অফিস করতে পারবে। কী দরকার একলা একলা ওই ফ্ল্যাটে পড়ে থাকার?'

– 'হুম দেখি বলব।'

– 'দেখি টেখি না, জোর করিস। দুদিন ধরে আমার ওর জন্য খুব খারাপ লাগতেছে। এমনিতেই কিছু দিন পর বিদেশ চলে যাবে। এই সময়টা একটু আমাদের সাথে থাকুক।'

ডাইনিং এ রোমেলা বসে ছিলেন গালে হাত দিয়ে। সাথে তাঁর ছোট বোন, ছোট বোনের মেয়ে। ছেলে এবং ছেলের বৌকে দেখে তিনি একটু নড়ে উঠে গাল থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। কোনো কথা বললেন না। হৃদি শাশুড়িকে দেখলেই আড়ষ্ট হয়ে যায়। বিব্রত হয়ে যায়। এখনো হলো। তার কেন যেন মনে হচ্ছে শাশুড়ির সাথে এই দূরত্ব কোনো কালেই ঘুচবে না। তবে আধুনিক শাশুড়িদের একটা ভালো দিক

হলো এরা ছেলের বৌয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। হৃদি এই তিনদিনে একটু একটু বুঝে গেছে যে এ বাড়িতে তার স্বাধীনতার কোনো অভাব হবে না। সে যখন ইচ্ছে তখন বেরোতে পারবে, ঘুমোতে পারবে, ফুল ভলিউমে গান ছেড়ে নাচতে পারবে, গলা ছেড়ে গাইতে পারবে। কেউ কিচ্ছু বলতে আসবে না। কিন্তু স্বাধীনতাই কি সব? এই মহিলাটি যে তার স্বামীর মা। তার ভালোবাসার মানুষটির ভীষণ ভীষণ ভালোবাসার একজন। এই বিশেষ মানুষটি তাকে বিনা কারণে অপছন্দ করলে, এড়িয়ে গেলে অফুরন্ত স্বাধীনতাও যে তাকে শান্তি দিতে পারবে না!

– 'মা তোমার কি শরীর খারাপ?' সামি প্রশ্ন করল মায়ের শুকনো মুখখানার দিকে চেয়ে।

– 'না আমি ঠিক আছি।'

সামি একবার বৌয়ের দিকে তাকালো। হৃদি গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের হাতল ধরে। মায়ের সাথে নিজের স্ত্রীর এই তির্যক সম্পর্কটা সামিকে পীড়া দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে। তার মনে হচ্ছে হৃদির দিক থেকে চেষ্টার কমতি আছে। হৃদি চাইলেই মায়ের সাথে সম্পর্কটা একটু সহজ করে তুলতে পারে। বাইরে থেকে দেখতে শক্ত হলেও সামি জানে তার মায়ের মনটা একদম তুলোর মতো নরম। সে অনেকটা হুকুম দেওয়ার স্বরে হৃদিকে বলল, 'তুই দাঁড়ায় আছিস কেন? বয়। কথা বল উনাদের সাথে।'

ঠিক সেই সময় সদর দরজা দিয়ে সুলেমান প্রবেশ করল। রোমেলা সুলেমানকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। ব্যস্ত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসলেন ডাইনিং থেকে। উঁচু গলায় বললেন, 'সুলেমান, উপরে আসো। একটু কথা আছে তোমার সাথে।'

সামির হুকুমটা হৃদির গায়ে একটা অসহনীয় জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেলো। ঠোঁট দুটো আপনাআপনি দু পাশে প্রসারিত হয়ে যাওয়ায়, অন্তরের জ্বলুনিটা ক্ষণিকের জন্য দৃশ্যমান হয়ে উঠল তার মুখে। এই মহিলা তো তার চোখে চোখ পড়ামাত্র মুখে খিটখিটে ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। হৃদি গায়ে পড়ে কীভাবে কথা বলবে এই দাম্ভিক, অহংকারী মহিলার সাথে? যদি মুখের ওপর অপমানজনক কিছু বলে বসেন? আজিব কারবার! আসলে এই ছেলে মা ছাড়া কিছুই বোঝে না। হৃদি যে নিজের বাবা মা ফেলে এসে সম্পূর্ণ নতুন একটা জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এটা কোনো বড় ব্যাপার না। তার মা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে যাবে আর হৃদিকে সব সহ্য করে তোষামোদ করতে হবে? রাগে, অপমানে তার চোখে জল চলে আসার উপক্রম হলো। হৃদির তিক্ততা কিছুটা টের পেল সামি। টের পাবার পরেও খালার সামনে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সে ডাইনিং ছেড়ে বেরিয়ে আসলো। তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। বাবাকে মিস করছে সে। মনে হচ্ছে বাবা থাকলে পরিস্থিতি অনেকটাই সামলে নিতেন তিনি। ইশ বাবা কেন যে বিয়ের একদম পর দিনই দেশ ছেড়ে চলে গেলেন!

সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ দরজার সামনে। তার মোটাসোটা দেহখানা একটু একটু কাঁপছে। একটা ফুলহাতা ক্রিম কালারের শার্ট তার গায়ে। কালো কাপড়ের ঢোলা প্যান্ট। এসি রুমের ভেতরেও দরদর করে তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বুকে কিঞ্চিৎ ব্যথা বোধ হচ্ছে।

– 'সুলেমান, তোমাকে এখন যে প্রশ্নটা করব তার সঠিক উত্তর দেবে। নইলে তোমার চাকরিতো থাকবেই না, উপরন্তু তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও চাকরি চলে যাবে। তোমাদের না খেয়ে মরতে হবে।'

সুলেমান কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রোমেলা নিজের বিছানার পাশে রাখা ইজি চেয়ারটায় বসলেন। তারপর খুব ঠান্ডা স্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘গত দুদিন তুমি কাজে আসোনি কেন?

– ‘শরীর ভালো ছিল না ম্যাডাম।’

– ‘কী হয়েছিল?’

– ‘বয়স হয়েছে। এখন কত রকমের সমস্যা! বাতের ব্যথা ছিল প্রচণ্ড।’

– ‘আজকে কেমন লাগছে?’

– ‘উত্তম।’

– ‘বেশ। শোনো, সেই রাতে লাইব্রেরি ঘরে তোমার স্যারের সাথে কি অন্য কেউ ছিল?’

সুলেমান নিজের চিবুকটা বুকের সাথে মিশিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, ‘জি না।’

– ‘সত্যি কথা বল!’

– ‘সত্যিই বলছি ম্যাডাম।’

রোমেলা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ একটা অনুসন্ধানী দৃষ্টি সুলেমানের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে হিম শীতল গলায় বললেন, ‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি কথা লুকোচ্ছ। শোনো সুলেমান, তুমি যদি আমাকে তথ্যটা দাও, তাহলে এরপর থেকে তোমার আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করে দেবো যে কাজকর্ম না করেও তোমার কয়েক জেনারেশন দিব্যি খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে।’

সুলেমান কোনো কথা বলতে পারল না। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল তার কপাল বেয়ে। লোকটার এই নাজেহাল অবস্থাই রোমেলাকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করল যে, লোকটা নিশ্চয়ই কিছু একটা গোপন করছে। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ‘সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, আঙুল বাঁকা করতেই হয়। কথা কী করে বের করতে হয় তা আমার জানা আছে!’

৬৬

ভিড়ের মধ্যে প্রিয়দর্শন মানুষটি বসে আছেন। কী যেন একটা উৎসব চলছে। গাঢ় নীল জলের বিস্তৃত সাগর পারে হরেক রকম লোকজন। রুপালি বালি চিকচিক করছে হলুদ বসন্তময় রোদে। সিল্ক কাপড়ের মতো ফুরফুরে হৃদয় জুড়ানো বাতাস। একটা সুমধুর বাজনা বাজছে ধারে কাছে কোথাও। সেই বাজনার তালে তালে নানা বয়সি নর নারী মনের আনন্দে নেচে চলেছে। চারপাশে এক সুতীব্র সুখের নিকষিত শিহরণ! অমৃতা নির্ভয়ে এগিয়ে গেলো মানুষটার দিকে। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভীষণ স্মার্ট গলায় বলল, ‘উড ইউ লাইক টু ড্যান্স উইদ ইওর ওয়াইফ মিস্টার হক?’

– ‘শিওর! মিসেস হক!’ চিত্তপ্রসাদ হাসিটা হেসে তিনি অমৃতার হাতখানি ধরলেন।

মানুষটা সাদা শার্টের ওপর সাদা কোট এবং কালো টাই পরে আছেন। অমৃতার গায়ে লাল রঙের হাতাকাটা, ঘেরওয়ালা জামা। সূর্যের বিশুদ্ধ আলোয় ঝকঝক করছে তার সুডৌল ফর্সা দুই বাহু। তার পায়ে কোনো জুতো নেই। আতপ্ত বালির ওপর পা ফেলে সে মানুষটার হাত ধরে নাচের জায়গায় আসলো। ছয় ফিটেরও বেশি লম্বা দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ পুরুষটি আচমকা হাত বাড়িয়ে তাকে খুব কাছে টেনে নিল। যেন অমৃতা তার নিজস্ব নারী একটা স্বর্গীয় তরঙ্গ ছুটে চলল অমৃতার বুকে। অতীন্দ্রিয় এক অনুভূতি তোলপাড় করে দিল ভেতরটা। বাঁধছেড়া সম্মোহনে ডুবে গিয়ে সে মানুষটার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে লাগল দ্বিধাহীনভাবে।

সেই সময় হঠাৎ সুমধুর বাজনাটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠল। বাজনার বদলে দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল কর্কশ একটা শব্দ। স্বর্গীয় দৃশ্যপট ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। নিমেষে অদৃশ্য হলো সম্মুখের রঙিন পর্দা।

সেলফোনটা বাজছিল। দ্যুলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ করল অমৃতা। অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো মেললো খানিকটা। হাত বাড়িয়ে কাটল ফোন। অচেনা নম্বর। নিশ্চয়ই কোনো ক্লায়েন্ট হবে। এই মুহূর্তে কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। একটা বিষাদময় দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসলো তার বুক চিরে। ইশ! স্বপ্নটা যদি কখনো শেষ না হতো!

ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। অনেক দিন পর দুপুরে ভাত খাবার পর ঘুম এসে গিয়েছিল। আজ ছুটির দিন। ছটার সময় তার ইয়োগা সেন্টারে যাবার কথা, যোগব্যায়ামের উদ্দেশ্যে। গত পাঁচটা দিন যন্ত্রের মতো কাজ করে গেছে সে। রোজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেছে সন্ধ্যা। গোসল সেরে, এক কাপ চা খেয়ে, ট্রাউজার টি শার্ট আর কেডস পরে নিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে নিচে নেমে গেছে। তারপর, মোহাম্মদপুরের ঘিঞ্জি গলির ভেতর দিয়ে, লোকজন গিজগিজ করা ব্যস্ত ফুটপাতের

ওপর হেঁটে হেঁটে, আবার কখনো দৌড়ে পৌঁছে গেছে ইয়োগা সেন্টারে। হেঁটে গেলে চল্লিশ মিনিটের দূরত্ব। অমৃতা যেহেতু মাঝে মাঝে দৌড়োয় তাই সময় আরেকটু কমে আসে। এক ঘণ্টার ইয়োগা ক্লাস শেষ করে হেঁটেই বাড়ি ফেরে সে। ন' টা বেজে যায় ততক্ষণে। চনমন করে খিদে পায়। হাতমুখ ধুয়েই খাবার টেবিলে বসে পড়ে। খেয়ে উঠে বইপত্র মেলে ধরে সামনে। সুপ্রিমকোর্টের এনরোলমেন্ট পরীক্ষা কাছে এগিয়ে এসেছে। পড়াশোনার অবস্থা ভালো না। মনে হচ্ছে এক চান্সে সনদটা হবে না। বন্ধুরা গ্রুপ কল দেয় প্রায় রাতে। অমৃতা বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। এক একেকদিন কানে ফোন আর মুখের সামনে বই নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই নিজেকে ক্লান্ত করে তোলার এক অভেদ্য লক্ষ্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছে সে। একটা মুহূর্তও বিনা কাজে ব্যয় করছে না। কিন্তু হাজার চেষ্টার পরেও কোনো কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। একটি মামলায় তার ক্লায়েন্টের নামে চার্জশিট এসে গেছে গতকাল। এই ক্লায়েন্ট অবশ্য বিশেষ সুবিধার লোক নয়। কেস নেবার আগে বলেছে সে খুন করেনি। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর এক মিটিং এ মাতাল অবস্থায় স্বীকার করে ফেলেছে খুনটা আসলে সেই করেছে। অমৃতা ক্রিমিনালের ফরে কেস লড়তে চায় না। তার বিবেকে বাধে। এই কেসটায় সে নির্ঘাৎ হারবে। লাস্ট উইকে কোর্ট থেকে মাঝে মাঝেই চলে গেছে এনজিওর অফিসে। আগামীকাল শনিবারে প্রজেক্ট ম্যানেজারের সাথে যাবে ফিল্ডে। তার যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সে ল' অফিসার, ফিল্ড অফিসার না। তবুও যেচে পড়েই কাজটা ঘাড়ে নিয়েছে অমৃতা। সবই নিজেকে ব্যস্ত রাখার ধান্ধা। সে জানে, মন দিয়ে নয় বিবেক বুদ্ধি আর মগজ খাটিয়েই বাকি জীবনটা তার কাটাতে হবে। ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

কিন্তু কী কাণ্ড! জাগরণে আশকারা না পাওয়া ভাবনারা ঠিক ঠিক ঘুমঘোরে অনধিকার প্রবেশ করে হানা দেয়। আজকের স্বপ্নটা সেই অনধিকার প্রবেশেরই একটি ধাপ। হৃদয়ের সবকটা কপাট বন্ধ করে দেবার পরেও নির্লজ্জ্ব অভিলাষ সিঁধ কেটে চোরের মতো ঢুকে পড়ে মনের ঘরে। স্বপ্ন দেখায়! আজকের স্বপ্নটা অনেকক্ষণ অবধি তার মনের সাথে সুগন্ধি আতরের মতো লেগে রইল। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই সে কেঁপে কেঁপে উঠছে, লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে, একটা শিরশিরানি বয়ে যাচ্ছে মেরুদণ্ড দিয়ে।

স্বপ্নে লোকটা তাকে মিসেস হক সম্বোধন করেছিলেন। এর মানে··· ধ্যাৎ এসব অর্থহীন চিন্তা করতে নেই!

৬৭

সামি ঠিক করেছিল হানিমুন করতে যাবে বুলগেরিয়া। কিন্তু বন্ধুরা উপহার দিয়েছে বালির এয়ার টিকেট। অতএব বুলগেরিয়াকে সেকেন্ড হানিমুনের লিস্টেই রাখতে হলো তার। দুদিন পরেই বালি যাবার ফ্লাইট। চারদিনের ট্যুর। সামি ছাদের ওপর সুইমিং পুলের পাশে বসে অনলাইনে এই মাত্র হোটেল বুক করল। ফাইভস্টার হোটেল। হৃদির ভীষণ পছন্দ হয়েছে। খুশিতে ঝুমঝুম করছে তার চোখ মুখ। মনে হচ্ছে বেড়াতে যাবার উত্তেজনা কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাকে সাংসারিক জটিলতা ভুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিকেলের আকাশে মেঘ করেছে। সুইমিং পুলের নীল জলের ওপর গম্ভীর ভ্রুকুটিবক্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়া পড়েছে। সেই জলে হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে রুদ্র।

গতকাল সামি তার বাবার অফিসে জয়েন করেছে এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে। বেরিয়ে গেছে খুব সকালে। তারপর হৃদি সারাদিন বাসায় একলা। ব্যাংকের চাকরিটার কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না এখন অবধি। বাবা বলেছেন কয়েকদিনের মধ্যেই একটা খবর পাওয়া যাবে। রুদ্র অফিসে। বাড়িতে শুধু হৃদি, তার শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি এবং দাদি শাশুড়ি।

হৃদির ঘরে নতুন ফার্নিচার এসেছে। চমৎকার অভিজাত নকশার নতুন খাট, ড্রেসিং টেবিল, কার্পেট, জানালার পর্দা। সব কিছু চকচকে, ঝকঝকে এবং ফিটফাট। বেডরুমটা সে নিজের হাতেই গোছায়। কাজের লোকের সাহায্য ব্যতীত। কিন্তু গোছাতে আর কতক্ষণ লাগে? গতকাল বেলা বারোটার মধ্যেই তার গোছগাছ করা শেষ। এরপর ফেসবুকিং করে, ফোনে বিভার সাথে কথা বলে, স্ন্যাপচ্যাটে ছবি

আপলোড করে সময় কাটালো। দাদি শাশুড়ির ঘরে গিয়ে গল্প করল খানিকক্ষণ। লাঞ্চের ডাক পড়ল যথাসময়ে। দুরুদুরু বুক নিয়ে নামল নিচে। নিজের শাশুড়ির চেয়ে খালা শাশুড়িকে তার বেশি বিরক্ত লাগে আজকাল। এই মহিলার হাজবেন্ড গেছে সিঙ্গাপুরে অফিশিয়াল কাজে। এই কটা দিন তিনি বোনের বাড়িতেই থাকছেন কন্যাসমেত। তার কন্যাটির নাম লিজা। মানারাত স্কুলে ও লেভেলে পড়ে। এই বয়সেই বেজায় পাকনা। নিচে নেমে দেখল দুই শাশুড়ি খাবার টেবিলের দুই প্রান্তে বসে আছেন। দাদি শাশুড়ির খাবার চলে যাবে তার ঘরে। তিনি অসুস্থ মানুষ। তার দেখাশোনা করার জন্য বাঁধা নার্স আছে। লিজা স্কুল থেকে ফেরেনি এখনো। ফিরতে ফিরতে তার বিকেল হবে।

হৃদি দুই শাশুড়িকে একটা দায়সারা সালাম দিয়েই চেয়ার টেনে বসে পড়ল। চাকরবাকররা খাবারের ডিশ এনে সাজিয়ে রাখছে টেবিলের ওপর। একটি মেয়ে জগ থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছে কাচের গ্লাসে। হৃদি অস্বস্তিতে গাঁট হয়ে বসে রইল। এ কদিন খাবার টেবিলে তার সাথে সামি ছিল। সে কথাবার্তা বলে পরিবেশটাকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করেছে অনবরত। আজ সামিকে ছাড়া হৃদি বাস্তবিক অর্থেই অসহায় বোধ করতে লাগল। রোমেলা কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠলেন, ‘তোমার বাবা ফোন করেছিলেন একটু আগে।’

হৃদি চমকে তাকালো শাশুড়ির দিকে।

– ‘জি?’ অস্ফুটে বলল সে।

– ‘তোমার বাবা ফোন করেছিলেন। বলছিলেন আজ বিকেলে আমাদের বাড়ি আসবেন। তো আমি বলে দিয়েছি যে আজ আমার সময় হবে না। আমি একটু বাইরে যাব। কাজ আছে।’

হৃদির মুখে একটা গাঢ় রঙের ছায়া আচমকা দৃশ্যমান হয়ে উঠল বুকটা কেমন টনটন করে উঠল ব্যথায়। বাবার মুখের ওপর সরাসরি আসতে মানা করে দেওয়ার কী দরকার ছিল? একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যেত না বুঝি কথাটা?

হৃদির মুখের পরিবর্তনটা রোমেলা পাত্তা দিলেন না। নিজের প্লেটে ভাত বেড়ে নিয়ে বললেন, 'গুলশান ক্লাবে একটা পার্টি আছে। যেতেই হবে আমাকে। সো তোমার আব্বাকে বলো, পরের উইকেন্ডে আসতে। আমি বলেছি, তবে মনে হলো তিনি একটু মাইন্ড করেছেন।' এটুকু বলে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল তাঁর, 'ওহ, স্যরি পরের উইকেন্ডে আমি ব্যাংকক যাচ্ছি। হবে না।'

অপমানে হৃদির চোখে জল চলে আসার উপক্রম হলো। ইশ! বাবা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছেন!

সে কোনো কথা না বলে চুপচাপ খাবার বেড়ে নিল প্লেটে। হঠাৎ ল্যান্ড ফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন শব্দ করে। হৃদি খাবার রেখে উঠে পড়ল। ঘরের কোণের দিকের একটা শো কেসের ওপর টেলিফোনটা রাখা। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে একটা ভরাট কণ্ঠ বলল, 'কে বলছ?'

হৃদি অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'জি, আমি হৃদি!'

– 'ও! কেমন আছ বৌমা?' আন্তরিক প্রশ্নটা হৃদিকে কিঞ্চিৎ নাড়া দিয়ে গেলো। তার শ্বশুর ফোন করেছেন। আমেরিকা থেকে।

– ‘ভালো। আপনি কেমন আছেন?’

– ‘আমি ঠিক আছি। তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?’

– ‘জি না।’

– ‘বাবা মায়ের জন্য নিশ্চয়ই মন খারাপ লাগছে?’

হৃদির চোখ জোড়া হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসলো। উত্তরে কিছু বলতে পারল না সে। তিনি বললেন,

– ‘তোমাদের বাসা তো খুব দূরে না। তুমি রোজ একবার দেখা করে আসতে পারো উনাদের সাথে।’

– ‘জি।’

– ‘কিংবা উনারাও চাইলে তোমাকে এসে দেখে যেতে পারেন।’

- ‘জি।’

– ‘আর সব খবর ভালো তো?’

সামি বলেছিল হৃদি যদি তার শ্বশুর শাশুড়িকে, আব্বা আম্মা বলে ডাকতে পারে, তাহলে সামিও তার শ্বশুর শাশুড়িকে বাবা মা সম্বোধন করবে। শাশুড়িকে মা ডাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হৃদির নেই। কিন্তু কেন জানে না, এই মানুষটাকে তার এই মুহূর্তে একবার বাবা বলে ডাকতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ডাকতে পারল না লজ্জায়। ঘাড় কাত করে বাচ্চা মেয়েদের মতো চাপা গলায় বলল, 'জি সব খবর ভালো।'

– 'গাধাটা তো অফিসে জয়েন করেছে শুনলাম।' হৃদি হেসে ফেলল এ পর্যায়ে। কষ্টে হাসি চেপে বলল,

– 'জয়েন করেছে।'

– 'কিছু বলল তোমাকে? কেমন লাগছে ওর?'

– 'প্রথম দিনের এক্সপেরিয়েন্স বেশ ভালো। তবে সে বলেছে অফিসের সবাই একটু বেশি কিউরিয়াস তার ব্যাপারে। প্রত্যেক এমপ্লয়ি ওকে বসের ছেলে হিসেবে ট্রিট করছে। এই স্পেশাল ট্রিটমেন্টটা তার পছন্দ হচ্ছে না।'

– 'পছন্দ না হওয়ার কী হলো? স্পেশাল ট্রিটমেন্টটা এনজয় করলেই তো হয়। যাই হোক। তুমি মা ওকে একটু কাজে মন দিতে বলো। আমার ছেলেটার মাথা ভালো। কিন্তু কাজে কর্মে একেবারেই সিনসিয়ার না।'

– 'আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক থাকবে ইনশা আল্লাহ।'

– ‘তোমার শাশুড়ি কোথায়?’

– ‘আছেন এখানেই। ফোন দেবো?’

– ‘হ্যাঁ দাও। তুমি ভালো থেকো।’

– ‘জি। আপনিও ভালো থাকবেন।’

রোমেলা খাবার খেতে খেতে হৃদির কথা শুনছিলেন। হৃদি কিছু বলার আগেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হৃদি তাঁর হাতে ফোনের রিসিভার হস্তান্তর করে দিয়ে টেবিলে ফিরে গেলো।

রোমেলা ফোন ধরে ‘হ্যালো’ বললেন।

– ‘কেমন আছ?’

– ‘ভালো। তোমার কী খবর?’ অনেকটা ফিসফিস করে, ফোনের স্পিকারের সামনে মুখ নামিয়ে বললেন রোমেলা। যাতে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এই কথোপকথন শুনতে না পায়।

– ‘তুমি সুলেমানকে বিরক্ত করছ কেন অযথা?’ কোনো ভূমিকা ছাড়াই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন হক

রোমেলা শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, ‘ও এই খবরও তোমার কাছে চলে গেছে?’

– ‘প্রশ্নের উত্তর দাও।’

– ‘সুলেমানকে আমি বিরক্ত করিনি। জাস্ট একটা ইনফরমেশন জানতে চেয়েছি।’

ওপাশের কণ্ঠটা আগের চাইতেও আরো বেশি মজবুত শোনালো এবার, ‘সুলেমানকে আমি ছুটি দিয়েছি এক মাসের জন্য। তুমি এর মধ্যে ওকে আর বিরক্ত করবে না।’

– ‘তোমার আদেশ মানতে আমি বাধ্য নই।’

– ‘বাড়াবাড়ি করো না!

– ‘একশবার বাড়াবাড়ি করব। তুমি নিজেই শুধু বাড়াবাড়ি করে যাবে আর আমি চুপ করে সব সহ্য করে যাব, এটাতো হতে পারে না।’

– ‘সুলেমান কিছুই জানে না। তার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। মিথ্যে কথাটা জোর দিয়েই বলতে পারলেন তিনি।

রোমেলা কথাটা শুনে একটু সময় থমকে গেলেন। ভ্রু কুঁচকে কিছু একটা চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আমাকে কি তোমার এতটাই বোকা মনে হয়? তাছাড়া তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার গোপন প্রেমিকাটিকে আমি শুধু একটু চিনে নিতে চাই। একটা বার দেখতে চাই। তার কোনো ক্ষতি আমি করব না।'

– 'আমার কোনো প্রেমিকা নেই।'

রোমেলা অদ্ভুত হাসলেন, 'তাই না? প্রেমিকা নয়? তাহলে কি ঘটনা আরো এগিয়ে গেছে? বিয়ে থা করে রাখোনি তো আবার লুকিয়ে?'

হক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন, 'ফোন রাখছি। সুলেমানকে বিরক্ত করো না। খবরদার।'

৬৮

ইয়োগা সেন্টারে কয়েকজন টিনেজ মেয়ে আছে, যারা অমৃতার একেবারে ডাইহার্ড ফ্যান। অমৃতা কোনো সেলিব্রিটি না, খুব ফ্যাশনেবল বা গ্ল্যামারাসও নয়। তবুও কী করে যেন কয়েকজন অল্পবয়সি মেয়ের চোখে সে রীতিমতন আইডল বনে গেছে। কলেজপড়ুয়া মেয়েগুলো অমৃতার চুলের ধরন থেকে শুরু করে, কথাবার্তা, হাঁটাচলা সমস্ত কিছু অনুসরণ করার চেষ্টা করে। আজ ক্লাস শেষে সুরাইয়া নামের একটি মেয়ে খুব গদগদ হয়ে বলল, 'আপু, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে?'

অমৃতা ইয়োগা ম্যাট ভাঁজ করতে করতে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

মেয়েটি খুব একটা লম্বা নয়। বয়স বেশি হলে ষোলো কি সতেরো হবে। ছিপছিপে দেহ। শ্যামলা লম্বাটে মুখে ডাগর দুটি চোখ। সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে, আপু আমি অনেক দিন ধরেই চাইছি আপনার মতো করে চুল কাটব। কিন্তু আমার মা কিছুতেই পারমিশন দিচ্ছে না। আপনি কি একটু আম্মুর সাথে কথা বলবেন? আম্মু নিচেই আছে। ওয়েট করছে আমার জন্য।'

অমৃতা বিস্ময় নিয়ে বলল, 'আমি কী কথা বলব?'

– 'না মানে, আপনি যদি আম্মুকে গিয়ে একটু বলতেন যে ছোট চুলের উপকারিতা কী, তাহলে আমি শিওর আম্মু আপনার কথা শুনে তার মত পরিবর্তন করে ফেলবে।
'

অমৃতা হেসে উঠল খিলখিলিয়ে, 'ছোট চুলের কোনো উপকারিতা নেই। বিশ্বাস করো। স্টাইল করা যায় না, শাড়িটারি পরলে বাজে দেখায়। তোমার চুল এখনই ঠিক আছে। খুব সুন্দর '

মেয়েটির মুখ দেখে বোঝা গেলো কথাটা তার খুব বেশি মনঃপূত হয়নি। একটু মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'আমার তো আপনার চুলটাই বেশি ভাল লাগে।'

– 'তাহলে তুমিই তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো। আমার বিশ্বাস তিনি তোমার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেবেন।' কথা বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছিল। সরু সিঁড়িঘরটায় এখন বেজায় লোকের ভিড়।

– ‘আমার খুব আপনার মতো হতে ইচ্ছে করে। আমি ঠিক করেছি আমিও ল পড়ব। শুধু আমি না, আমাদের কলেজের অনেকেই আপনাকে ফলো করে।’

– ‘তোমাদের কলেজ মানে? তোমরা আমার সম্পর্কে এত কিছু জানো কী করে?’

– ‘আপনি ডিবেট ওয়ার্কশপে এসেছিলেন কয়েকবার। স্পিচ দিয়েছিলেন। সেই থেকে আপনার ফ্যান হয়ে গেছি আমরা।’

– ‘কোন কলেজ বলোতো?’

মেয়েটি কলেজের নাম বলল। মনে পড়ল অমৃতার। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাব থেকে বেশ কয়েকবার এই কলেজে যাওয়া হয়েছে। ওরা নিচে নেমে বিল্ডিংয়ের ধার ঘেঁষে ফুটপাতের ওপর দাঁড়ালো। পাশেই একটা টঙের চায়ের দোকান। নানাবয়সী লোক ভিড় করে আছে দোকানের সামনে। বাদামি চাদর গায়ে দিয়ে বিষণ্ণ এক মেঘলা সন্ধ্যা নেমে এসেছে তখন নগরীর বুকে। মেয়েটি রাস্তার ধারে পার্ক করা একটি কালো রঙের টয়োটা গাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘ঐযে আমার আম্মু, গাড়িতে বসে আছেন। কথা বলবেন?’

– ‘আরে, টিংকু রাণী সর্দার! কেমন আছেন?’ হঠাৎ ছুটে আসা বাক্যটা চমকে দিল অমৃতাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে সন্ধ্যার আবছা আলোয় দেখল একজন লম্বা ফর্সা যুবক তার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে। অমৃতা মেয়েটিকে বলল, ‘আরেক দিন কথা বলব আপু। আজ থাক, কেমন?’

মেয়েটি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো। ফর্সা যুবকটি তখনও অমৃতার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার পরনে নীল রঙের টি শার্ট। হাতে ঝোলানো সাদা অ্যাপ্রোন। অমৃতার চিনতে অসুবিধে হলো না। এই হলো হৃদি, বিভার সুন্দর ডাক্তার। টিংকু রাণী সর্দার নামটাও ভোলেনি ছেলেটা। আকাশে মেঘের দাপট বেড়েছে। ঝড়ো বাতাস ছুটছে এদিক সেদিক। আসন্ন বৃষ্টির কারণে ফুটপাতে মানুষজনের ভিড় কিছুটা কমেছে। রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের কমতি নেই। আছে গাড়ির হর্ন, কালো ধোঁয়া, অহেতুক হইচই!

– 'ডাক্তার সাহেব!' শব্দ দুটো উচ্চারণ করে দু পা এগিয়ে এলো অমৃতা।

– 'কেমন আছেন?' আগের প্রসন্ন হাসিটা মুখে বজায় রেখেই প্রশ্ন করল ডাক্তার।

অমৃতা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ভালো। আপনার খবর কী?'

ডাক্তার অমৃতার অফ হোয়াইট গেঞ্জি আর কালো ট্রাউজার চোখ দিয়ে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, 'আমি ভালোই আছি। দেখুন কী কাণ্ড। আবার দেখা হয়ে গেলো আপনার সাথে!'

– 'হুম দেখা তো হয়েই গেলো।'

টঙের দোকানটার দিকে ইঙ্গিত করে ডাক্তার বলল, 'চা চলবে?'

– 'শিওর, কেন নয়?'

ওরা দুজনে চায়ের দোকানের সামনের দুটো বেঞ্চিতে বসল। পাশাপাশি নয়, মুখোমুখি। অমৃতা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। বাতাসের জোর খুব। সন্ধ্যার ফিকে ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। মেঘের কারণে খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার।

– 'আপনার বান্ধবীরা কেমন আছেন?' ডাক্তারের প্রশ্ন।

অমৃতা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।'

ডাক্তার হাসল, 'আপনার নিশ্চয়ই হয়নি এখনো?'

– 'এত খুশি হচ্ছেন কেন?' চোখা গলায় বলল অমৃতা।

– 'খুশি হব না? টিংকু রাণী সর্দারকে একদিন ঢাকার রাস্তায় হুট করে পেয়ে যাব এ তো কল্পনাতীত ব্যাপার। কী দারুণ ভাগ্য আমার!' ডাক্তার কিন্তু বেশ সপ্রতিভ।

– 'হুম।' ছোট করে বলে অমৃতা। তীক্ষ্ণ চোখে দেখে অল্পবয়সী ডাক্তারকে। হৃদি বিভার সুন্দর ডাক্তার দেখতে বেশ সুন্দর এ কথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এর সৌন্দর্যে কেমন একটা কোমল আর অপরিণত ভাব আছে। এই কোমল অপরিণত ভাবটা অমৃতাকে কখনোই টানে না। যে মানুষটিকে সে ভালোবাসে, সেই মানুষটির চিত্তাকর্ষক পৌরুষের ধারে কাছেও এই সুন্দর ডাক্তার যেতে পারবে না। বৃষ্টির ঘ্রাণযুক্ত উতলা বাতাসের আবছা সন্ধ্যাটায়, সুদর্শন এক যুবকের সামনে বসে থেকে অমৃতার হঠাৎ অনভিপ্রেতভাবে সেই বিশেষ মানুষটিকে মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই

গভীর চোখের দুর্বোধ্য চাউনি··· দীর্ঘ দেহ সৌষ্ঠব, ভরাট কণ্ঠস্বর··· সেই ধারালো পৌরুষ! দমে টান পড়ল তার। বুকের মধ্যে কেমন এক চিনচিনে ব্যথা!

আধ খাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে কেডসের সম্মুখভাগ দিয়ে আগুনটা মাড়িয়ে দিল অমৃতা। তারপর ঝপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা কাজ মনে পড়ে গেছে। অন্যদিন খাবো চা। আজ যাই। স্যরি।'

কথাটা শেষ করে সে আর দাঁড়াল না। ডাক্তার সাহেব হাউকাউ করে বলে উঠল, 'আরে কোথায় যাচ্ছেন? ফোন নম্বরটা অ্যাটলিস্ট দিয়ে যান। টিংকু রাণী! শুনুন, প্লিজ!'

অমৃতা তখন শুরু করেছে দৌড়। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। এলোমেলো বাতাস নিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে। মনের ভেতর দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। অসহ্য যন্ত্রণা!

সেই সময়, পৃথিবী নামক গোলকটির ঠিক উল্টো দিকে, আটলান্টিকের ওপারে, আরো একজন মানুষ এমনই এক নিগূঢ় অর্থহীন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে একলা হাঁটছিলেন। সেখানে তখন দিনের সূচনা হচ্ছে। পাখিদের কলকাকলিতে মুখর চারপাশ। তিনি হাঁটছেন পটোম্যাক নদীর ধার ঘেঁষে। চারপাশে নানা রঙের মানুষের ভিড়। সাদা, কালো, বাদামি! কেউ হাঁটছে, কেউ দৌড়োচ্ছে, কেউ বা আবার সাইকেল চালাচ্ছে।

পৃথিবীর এক পিঠে দৌড়োচ্ছে অমৃতা। তার আকাশে সন্ধ্যা। অন্য পিঠে হাঁটছে এক বিষণ্ণ মানুষ। তার আকাশে সকাল! মাঝখানে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর দূরত্ব। প্রায় তেরো হাজার দুইশ উনিশ কিলোমিটার! এত দূরত্বের পরেও দুটি মানুষের মধ্যে কোথায় যেন কী একটা গভীর মিল আছে। তাইতো অমৃতা যখন ঝুম বৃষ্টির সন্ধ্যাটায়

দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপ ধরা গলায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতো নিজের মনে ডেকে উঠল, ‘রাশেদ!

ঠিক তখন সকালের পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক আশ্চর্য কারণে সেই বিষণ্ন মানুষটারও মন কেমন করে উঠল বিরহের মতো একটা সুতীব্র ব্যথা বেজে উঠল বুকে। হঠাৎ করে এক সীমাহীন একাকিত্ব বোধ তাকে ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে।

৬৯

টানা তিন সপ্তাহ পর বন্ধুদের সাথে দেখা হবে। পায়ে চপ্পল লাগিয়ে তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আকাশ। ঝুমকি ডাকল পেছন থেকে।

– ‘কোথায় যাচ্ছ? চা করলাম। খেয়ে যাও।’

আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো পেছনে। দুটো চা ভর্তি কাপ পিরিচ সমেত ট্রে ডাইনিং টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ঝুমকি। সাথে এক প্লেট নোনতা বিস্কুট। ডাইনিং এর চেয়ারে আকাশের বাবা বসে আছেন। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত ওঠা লুঙ্গি। ঠিক উল্টো দিকে বসে আছে তারা। ডান হাতের আঙুলে পুরু করে তেঁতুলের আচার লাগানো। মহা আনন্দে জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে আচার খাচ্ছে সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসলো আকাশ। বসল চেয়ারে। মুখ গোমড়া করে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল চায়ের কাপ। পিতৃদেবকে দেখলে বিনা কারণে আজকাল তার মুখ গোমড়া হয়ে যায়। একটা অস্বস্তি হতে থাকে মনে। সেই দুই লক্ষ টাকা আর জোগাড় করা হয়ে ওঠেনি। সামিকে বললে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু চক্ষু লজ্জার দরুণ মুখ ফুটে চাইতে পারেনি। সামির নিজের টাকা হলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু সামির যে নিজের

কিছুই নেই। যা আছে সব তার বাবার। আর ওই অহংকারী লোকটার কাছে কোনোভাবেই হাত পাততে রাজি নয় আকাশ। তাছাড়া পিতৃদেবের ওপর তার পর্যাপ্ত বিশ্বাস নেই। কেন যেন মনে হয়েছে টাকা পাওয়ার পরেও লোকটা পাওনাদারকে সেই টাকা বুঝিয়ে দেবে না। নিজের ইচ্ছেমতো ওড়াবে।

– 'তোমার কাছে যে একটা ফেভার চেয়েছিলাম, সেইটার কী হলো, হ্যাঁ?' কোটরে ঢোকা চোখের মণিদুটো এদিক সেদিক নাড়িয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল লোকটা।

আকাশ ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে মুখ নামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি তো চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এতগুলো টাকা। কে দেবে আমাকে?'

– 'কে দেবে মানে? প্রয়োজনে কাজে না আসলে এসব বন্ধু বান্ধব দিয়ে হবে কী? পাওনাদার যদি আমাকে টাকার জন্য মেরে ফেলে, তখন কি তুমি খুব খুশি হবে? হ্যাঁ? এটাই কি চাও তুমি? মেরে ফেলতে চাও আমাকে?'

– 'আমি তো বলেছিলাম আপনার পাওনাদারের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা দিন আমাকে। আমি তার সাথে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করব।'

– 'তার ফোন নম্বর দিয়ে তুমি কী করবে? আমাকে কি বিশ্বাস হয় না তোমার? আমি কি মিথ্যা কথা বলছি?' বাবার গলা চড়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। আকাশ কোনো দিকে না তাকিয়ে চায়ের কাপে মনোযোগ দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। থমথমে রাগ নিয়ে বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে চাপা গর্জন তুলে কী সব যেন বলতে লাগলেন ক্রমাগত। আকাশ কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল, স্পষ্ট বোঝা গেলো না একটা শব্দও। কী বলছে লোকটা? অভিশাপ দিচ্ছে নাকি আকাশকে? প্রায়ই

তো বলে, তুই মরিস না ক্যান? তোর মা মরছে, তুই মরতে পারিস না? সত্য, আকাশ মরে গেলে কি লোকটা খুশি হবে? হতেও পারে। মাতালদের কোনো বিশ্বাস নেই।

হঠাৎ চোখ পড়ল তারার দিকে। মোটা চশমার ভেতরে দুটি বিস্ময় ভরা চোখ। এত বিস্ময় নিয়ে আকাশকে কী অতো দেখছে মেয়েটা কে জানে! কয়েকটা কোঁকড়ানো চুল কপালে এসে পড়েছে। উড়ছে ফ্যানের বাতাসে তিরতির করে। তারিয়ে তারিয়ে আচার খাচ্ছে। একটু যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে আজ। সেজেছে কি? কই নাহ। মুখে কোনো প্রসাধন নেই··· আছে আছে, একটা খুশির প্রসাধন আছে আজ ওর মুখে। মেয়েটার বোধহয় আজ মন ভালো। রোগা মুখখানায় রোজকার বিষণ্ণ ভাবটা নেই।

– ‘আমাদের তারার অনার্স এর রেজাল্ট বেরিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস এসেছে।’ ঝুমকি বলল, একটা নোনতা বিস্কুট মুখে পুরে দিয়ে

– ‘তাই নাকি? কনগ্রেচুলেশন্স!’ উৎসাহী গলায় বলল আকাশ।

– ‘থ্যাংক ইউ!’ তারার ছোট্ট উত্তর।

ঝুমকি আবার বলল, ‘শুধু এই নয়। আগামীকাল ওর জন্মদিন।’

– ‘তাই নাকি?’

– 'আর জন্মদিন!' বলে তারা নিচের দিকে মুখ নামিয়ে নেয়। জন্মদিন আবার কী? আর দশটা সাধারণ দিনের মতোই একটা দিন। মা বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফিরনি রান্না করতেন। ব্যাস এটুকুই। এর চেয়ে বেশি হৈহুল্লোড় তার জন্মদিনকে ঘিরে কখনোই হয়নি।

– 'কত হলো?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে আকাশ।

– 'কীসের কত?'

– 'তোমার।'

– 'আমার?'

– 'হ্যাঁ, বয়স কত হলো?'

– 'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে হয় না। আপনি জানেন না?

ঝুমকি মাঝখানে ঢুকে পড়ে বলল, 'ওর আর কত হবে, তেইশ হলো মনে হয়।'

আকাশ নিজের কবজিতে জড়ানো হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি। কাল রাতে তাহলে তারার জন্মদিন সেলিব্রেট করব আমরা। সবাই বাইরে খাব।'

এ কথা শুনে তারা একটু লজ্জা পেয়ে গেলো। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না আবার। মুখ নিচু করে মৃদু হাসল শুধু।

৭০

বন্ধুরা ছাড়াও সামিদের বাড়িতে আজ বিকেলে আরো কিছু অতিথি আসবেন। রোমেলার বান্ধবী। প্রায় উইকেন্ডেই এদের কারো না কারো বাসায় কিটি পার্টি থাকে। প্রত্যেকেই ধনাঢ্য লোকের বৌ। তানিশার আম্মাও একসময় এই দলেরই একজন ছিলেন। বিয়ে সংক্রান্ত অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে যাবার পর থেকে রোমেলা তানিশার মাকে এড়িয়ে চলেন। আজকের দাওয়াতে তানিশার মা বাদে অন্য সবাই আসবেন। সব মিলিয়ে আট ন' জন। প্রথমবারের মতো বাড়ির বৌয়ের মুখ দর্শন করবে তারা। রোমেলা ডাইনিং এ বসে কয়েকজন চাকরবাকরকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তার ছোট বোন একটু দূরে দাঁড়িয়ে কফি মেশিনে কফি বানাচ্ছে। কফির সুন্দর গন্ধে ছেয়ে গেছে ঘর। কফির সাথে আছে সদ্য বেক করা কুকি। কুকি বেক করছে লিজা। কদিন আগে ইউটিউব দেখে রেসিপিটা শিখেছে সে। ঘড়িতে বিকেল চারটা। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অতিথিরা চলে আসবে। খুব একটা সময় নেই হাতে। সদর দরজায় কেউ একজন এসেছে বলে মনে হলো। কলিং বেল বেজে ওঠার আগেই হৃদিকে দেখা গেলো দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতে। ডাইনিং এর দরজার ফাঁকে চোখ রেখে রোমেলা দেখলেন, বয়কাট চুলের মেয়েটা এসেছে। তিনি গলা উঁচিয়ে পুত্রবধূকে ডাকলেন একবার, 'এই শোনো!'

হৃদি শাশুড়ির ডাক শুনে ডাইনিংএ আসলো। পেছন পেছন আসলো অমৃতাও।

– 'একটু পরে আমার কিছু গেস্ট আসবে। তুমি তৈরি হয়ে থেকো।

– 'তৈরি··· মানে শাড়ি পরতে হবে?' একটু বোকা বোকা শোনালো হৃদির কণ্ঠস্বর।

– 'ভালো কিছু পরলেই হবে। একটু ক্লাসি ড্রেসআপ করো। মিডল ক্লাস লুক নিয়ে থেকো না দয়া করে।'

চট করে অমৃতার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। হৃদি কিছু বলার আগেই সে ক্যাটক্যাট করে বলে বসল, 'মিডল ক্লাস লুক বলতে আপনি কী বোঝালেন?'

রোমেলার চোখ দুটো মার্বেলের মতো গোল হয়ে গেলো অমৃতার প্রশ্ন শুনে।

– 'কী?' শাশুড়ির হুংকারটা একদম বুকে গিয়ে লাগল হৃদির। সে অমৃতার একটা হাত টেনে ধরে তড়িঘড়ি করে বলল, 'চল, উপরে চল। সবাই ওয়েইট করতেছে।'

অমৃতা যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে রোমেলার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনার ছেলে তো হৃদির মিডল ক্লাস লুক দেখেই প্রেমে পড়ল .. আপার ক্লাস লুক আপনার ছেলের পছন্দ না!... 'শেষের কথাগুলো পরিষ্কারভাবে শুনতে পেলেন না রোমেলা। যতটুকু শুনলেন তাতেই তাঁর কানে তালা লাগার জোগাড়। সারা শরীর রাগে ঝাঁঝাঁ করে উঠল। ছোট বোন এবং কাজের লোকদের সামনে বেশ বিব্রত বোধ করলেন তিনি। এই মেয়ের এত বড় স্পর্ধা! মুখের ওপর কথা বলে! মেয়েটার বেশি বাড় বেড়েছে। সুযোগ পেলেই বড় বড় নীতিবাক্য ঝাড়তে আসে। থাপ্পড়টার কথা কি ভুলে গেছে এই বেহায়া মেয়ে?

সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় হৃদি চাপা গর্জনের সাথে অমৃতাকে বলল, 'তোর সমস্যা কী? তুই এত কথা বলিস কেন?'

– 'তোর সমস্যা কী? তুই একে কিছু বলিস না কেন? এই মহিলা যা তা কথা বলতে থাকবে আর তুই চুপ করে শুনে যাবি? তোর বাপ মা তোরে লেখাপড়া করাইছে এই বেটির খোঁটা শোনার জন্য?'

– 'উফ আল্লাহ! অমৃতা তুই কবে বুঝবি যে বড়দের মুখে মুখে কথা বলতে হয় না? উনি আমার শাশুড়ি। আমি তো উনার সাথে ঝগড়া করতে পারব না।'

– 'ঝগড়া করবি কেন? ঠান্ডা মাথায় উচিত কথা শোনায় দিবি।'

হৃদি হঠাৎ মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আশপাশটা একবার দেখে নিয়ে, গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'আমার জামাই তো মায়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে নারাজ।'

অমৃতা ভীষণ বিরক্ত হলো, 'এটাই কি স্বাভাবিক না? তুই গাধার মতো ওরে কেন বলতে গেছিস?'

– 'তো কারে বলব?'

– 'নিজেকেই প্রোটেস্ট করতে হবে হৃদি! ছেলেকে মায়ের বিরুদ্ধে উসকে দেবার তো কোনো মানে হয় না। কিছু খারাপ লাগলে সরাসরি মুখের ওপর বলে না দিয়ে, আড়ালে কূটনামি করিস কেন?'

হৃদি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, ‘আরে রাখ তোর সরাসরি বলা। আড়ালে শাশুড়ির নামে কূটনামি করার মধ্যে আলাদা মজা আছে। তুই বুঝবি না। সব মেয়েরাই করে। এসব করতে হয়।’

– ‘পিয়ার প্রেশার?’

হৃদি হাসল, ‘হ্যাঁ, পিয়ার প্রেশার।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘তুই এরকম শুকায় গেছিস ক্যান?’

অমৃতা নিজের গালে একটা হাত রেখে একটু আনমনা গলায় বলল, ‘শুকাইছি?’

– ‘হ্যাঁ তো, অনেক শুকাইছিস। কাহিনি কী? বিরহ নাকি?

অমৃতার মুখে ছায়া পড়ল, ‘উনি কেমন আছেন?’

– ‘ভালো আছেন। তোর সাথে যোগাযোগ হয়নি এর মাঝে?’

– ‘নাহ!’ একটা বড় শ্বাস পড়ল অমৃতার

– ‘ভালোই করেছিস। কথাটথা অত বলার দরকার নাই দোস্ত। এত দিনের সংসার। তোর জন্য ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো গণ্ডগোল লেগে যায়?’

অমৃতা হৃদির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, ‘ওদের সম্পর্কটা এমনিতেও খুব একটা মজবুত বলে আমার মনে হয় নায় কখনো।’

– ‘কী বলতেছিস?’ হৃদির মুখটা হঠাৎ আতঙ্কে সাদা হয়ে উঠল

অমৃতা একবার চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খুব আস্তে করে বলল, ‘বোঝা যায় না? বোঝা যায় তো!’

– ‘কী দেখে বুঝলি তুই?’

– ‘বুঝে নিয়েছি। আমার বুদ্ধি আছে।’

হৃদি সরু চোখে তাকায় অমৃতার দিকে, ‘হিংসা থেকে বলতেছিস এসব, তাই না?’

– ‘আল্লাহ! দোস্ত সিরিয়াসলি আমি হিংসা থেকে কিছু বলতেছি না। উনাদের দেখে যেটা মনে হইছে সেটাই বলতেছি।’

– ‘ইশ… আই ফিল ব্যাড ফর সামি।’ ভীষণ আহত গলায় বলল হৃদি।

– ‘ব্যাড ফিল করার কিছু নাই। ওয়ার্ল্ডের এইটি পার্সেন্ট ম্যারেজ কাপলই আনহ্যাপি। যাদেরকে দেখে হ্যাপি মনে হয় তাদের মধ্যেও ম্যাক্সিমাম ফেইক। কিছু আছে জেনুইন। সেই সংখ্যা কম। লিসেন দোস্ত, তোর মা বাবার ভেতরে যদি ভালো

সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে তুই লাকি এর উল্টোটা হলে ইউ আর জাস্ট অর্ডিনারি।
’

– ‘মানে কী?’

– ‘চাইনিজ বলি নাই তো, আজিব। তোর আব্বা আম্মার মধ্যে যদি প্রেম থাকে, ভালোবাসা থাকে তাহলে তুই ভাগ্যবতী আর উনাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা না থাকলে, মনের মিল না থাকলে তুই সাধারণ। সাধারণ হওয়ার মধ্যে অত দুঃখ কীসের?’

– ‘তুই একটা পাগল।’ নাক মুখ কুঁচকে বলে হৃদি।

অমৃতা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল, ‘সত্য বললে মুরুব্বিরা বলে বেয়াদব আর সমবয়সিরা বলে পাগল। এই হইল দুনিয়া!

ছাদের ওপর চৈত্র বিকেলের হলুদ রোদ থৈথৈ করছে। পুল সাইডে তিন বন্ধু বসে ছিল চেয়ার পেতে। তিনজনের সামনে একটি খালি টুলের ওপর সামির অ্যাপল ম্যাকবুক প্রো রাখা। স্ক্রিনে বিভার মুখ ভেসে আছে। দুই বান্ধবীকে সে-ই দেখল প্রথমে। চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘ওই ছেমড়ি তোদের এতক্ষণ লাগে আসতে? কই গেছিলি?’

– ‘হৃদির শাশুড়ি ডাক দিছিল।’ বলল অমৃতা। ওরা কাছাকাছি আসতেই রুদ্র আচমকা এক জোরালো ধাক্কা দিয়ে অমৃতাকে টুপ করে ফেলে দিল সুইমিংপুলের পানিতে। বুক পর্যন্ত পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে, ‘কুত্তার বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চা’

বলে গালি দিতে লাগল সে রুদ্রকে। তারপর পুলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্রর ঠ্যাং ধরে দিল এক হ্যাঁচকা টান। ঝপাং করে পড়ল রুদ্র পানিতে।

বিভা হঠাৎ আর্তনাদ করে বাকি তিন বন্ধুকে বলে উঠল, 'এই তোরা কেউ নামবি না সুইমিংপুলে। খবরদার!'

– 'কেন?' হৃদির অবাক প্রশ্ন।

– 'কারণ আমি নামতে পারব না। ভিডিও কলের ভিতর দিয়ে আমি সুইমিংপুলে নামব ক্যামনে? হিংসা হচ্ছে আমার!'

সামি সল্যুশন দিল, 'তুই মোবাইলটা নিয়া জলঢাকা ব্যারেজে চইলা যা। তারপর নদীতে নাইমা ফোন দিস। আমরাও পানিতে, তুইও পানিতে। কাটাকাটি হয়ে যাবে।
'

কথাটা শেষ করে সামিও নামল পানিতে। আকাশ বিভার কাঁচুমাচু মুখটার দিকে চেয়ে বলল, 'ডোন্ট ওরি। আমি আছি এখানে তোর সাথে।'

– 'আমিও আছি।' বলল হৃদি।

– 'এই তোদের হানিমুন কেমন কাটলরে?' বিভা প্রশ্ন করল।

হানিমুনের প্রসঙ্গ উঠতেই হৃদির মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে উঠল।

– 'অসাম দোস্ত, অসাম! বালি অনেক সুন্দর জানিস? উফ আমার লাইফের বেস্ট চারটা দিন ছিল।'

ওদিকে সুইমিংপুলে রুদ্রকে ধরে বেঁধে সাঁতার শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তখন। রোজই সে জলে নেমে দাপাদাপি করে, কিন্তু সাঁতার শেখা আর হয়ে ওঠে না। পানির ওপর শরীরের ভার ছাড়তে গেলেই তাকে রাজ্যের যত ভয় পেয়ে বসে। কিন্তু আজকে অমৃতা আর সামি ওকে সাঁতার শিখিয়েই ছাড়বে বলে ঠিক করেছে। দুজনে দুদিক থেকে চেপে ধরে তাকে জলের ওপর শুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রুদ্র চেঁচাচ্ছে প্রাণপনে। হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। সামি মুখ উঁচিয়ে আকাশকে ডাকল, 'এই এসহোলের বাচ্চা! দাঁড়ায় আছস ক্যান? আয় এইদিকে হাত লাগা।'

রুদ্র হাঁসফাঁস করতে করতে বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া। একটু সময় দে আমাকে। প্লিজ একটু দাঁড়া।'

অমৃতা রুদ্রর কাঁধে চেপে রাখা হাতের মুঠো একটু শিথিল করল, 'দাঁড়ায়েই তো আছি।'

– 'শোন, এভাবে তো হবে না। সাঁতার শিখতে পারি আমি এক শর্তে।'

– 'কীয়ের শর্ত?' বিরক্তি নিয়ে বলে সামি।

রুদ্র কপালের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে, চোখ পিটপিট করে দ্রুত কী যেন ভাবে। গলা খাঁকারি দেয় কয়েকবার, সাবধানী গলায় বলে, ‘তোদেরকে কুইজ ধরব, যদি উত্তর দিতে পারিস তাহলে আমি সাঁতার শিখব।’

– ‘এত ভীতু! আল্লাহ! কোনো কুইজটুইজ হবে না।’ বিভা বলল ম্যাকবুকের পর্দায় উঁকি দিয়ে।

– ‘তোরা ভীতু। জীবনেও একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিস না।’ অমৃতা আঙুল উঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলে, ‘মিথ্যা বলবি না, আমি বলতে পারছিলাম না? এক অক্ষর দিয়ে আকাশের প্রতিশব্দ?

– ‘অকে ফাইন। এইবার যদি বলতে পারিস তাহলে আমি সাঁতার শিখব। ডিল।’

– ‘আরে না ওসব হবে না।’ সামি ঘোষণা দিল, দৃঢ় গলায়। ফোড়ন কাটল হৃদি ‘আচ্ছা শুনি, ওই কী প্রশ্ন করতে চায়।’

রুদ্র বুঝি বল পেল একটু হৃদির কথা শুনে। জোর দিয়ে বলল, ‘কী বলিস তোরা? প্রশ্ন করব? নাকি ডরাইতেছিস?’

– ‘আরে কর কর।’ তাচ্ছিল্য নিয়ে বলে অমৃতা।

– ‘আচ্ছা বল দেখি পরশু দিনের ইংলিশ কী?’

আকাশ খিকখিক করে হেসে উঠল, ‘এটা কোনো প্রশ্ন হইল? এ তো সবাই জানে। ডে আফটার টুমরো!’

– ‘জি না। হয় নাই। পরশুদিন ইংলিশ হলো ওভারমরো। সাঁতার আজকে শেখা ইচ্ছে না তাহলে। বাই বাই।’ কথাটা বলেই তড়িঘড়ি করে পুল থেকে উঠে আসার পায়তারা শুরু করল রুদ্র। সামি এবার এক ধাক্কায় শুইয়ে দিল ওকে পানিতে। মুখে বলল, ‘তোর কুইজের গুষ্টি কিলাই। সাঁতার তোকে আজকে শিখতেই হবে। এই ধর ব্যাটারে সবাই!’

৭১

সামি গাড়ি করে সব বন্ধুদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল সেই রাতে। চলে আসবার সময় অমৃতার মনটা কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো! ও বাড়িতে গেলেই এখন মানুষটাকে এক নজর দেখতে ইচ্ছে করে। দুদিন পর পরীক্ষা। পড়তে ভালো লাগছিল না। একটা ইমেইল অ্যাড্রেস আছে তার কাছে। কয়েকদিন ধরেই ভাবছে ইমেইল করে দেখবে কিনা। করবে কি? নাহ··· প্রমিজ করেছিল যে, ভুলে যাবে!

বেঁচে থাকাটা এত কষ্টের কেন? অনেক গুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে টুপ করে মরে গেলেই কিন্তু বেশ হয়। সমস্ত সমস্যার একটা সমাধানের পথ তো সর্বদাই খোলা। মৃত্যু! মৃত্যুর চেয়ে সহজ সমাধান আর কী আছে?

মানুষটা নিষ্ঠুর! একটা বার জানতে চাইল না অমৃতা কেমন আছে। বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। চুলোয় যাক! অমৃতা কেন ইমেইল করবে? কোনোদিন করবে না। এত সস্তা না!

রাত বাড়ে। ল্যাপটপের ওয়ালপেপারে সিঁটিয়ে থাকা সুপুরুষ মানুষটার ছবির দিকে অপলক চেয়ে থাকে অমৃতা। ওরকম বেহায়ার মতো তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না একটা ফোঁটাও। মনে হয় ছবির মানুষটা তার নিজেরই মানুষ। একদম আপন মানুষ … সবচেয়ে কাছের মানুষ!

বোকা মেয়ে! নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা দিয়ে ওঠে একসময়। মন লাগে না আইনের ধারায়। মাথা চিড়বিড় চিড়বিড় করে। পড়া টড়া ঢোকে না কিছুই। স্নায়বিক চাপ অনুভব করে সে। মনটাকে বশে আনার জন্য মধ্যরাতে ঘরের মেঝেতে ইয়োগা ম্যাট বিছিয়ে যোগাসনে বসে পড়ে। সারা বাড়ি ঘুমন্ত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু মাথার ওপর শব্দ করে ঘুরছে তিন পাখার ফ্যান। ধুর ছাই… উফ!... হঠাৎ যোগাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। কেমন যেন কান্না পায়। হাত পা কাঁপতে থাকে। ল্যাপটপ টেনে নিয়ে বালিশের ওপর রাখে। উপুড় হয়ে শোয় বিছানায়। চট করে টাইপ করে একটা লাইন। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে পাঠিয়ে দেয় নির্দিষ্ট ঠিকানায়।। যদি উত্তর না আসে… অমৃতা আর ভাবতে পারে না।

নিউইয়র্কে তখন ভরদুপুর। জ্যামাইকার স্থানীয় একটি স্কুলে আজ পার্টির সভা আছে। মিটিং শুরু হওয়ার কথা তিনটার সময়। রাশেদ নিউইয়র্কে এসে উঠেছেন এক পুরোনো বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে। বন্ধুর সাথেই বেরোচ্ছিলেন মিটিং এর উদ্দেশ্যে। হঠাৎ টুং করে শব্দ হলো মোবাইলে। একটা ইমেইল এসেছে। ইমেইল অ্যাড্রেস দেখেই তিনি চিনতে পারলেন প্রেরককে। একটা হার্টবিট মিস করলেন অকস্মাৎ। বন্ধুর পাশে গাড়িতে উঠে বসে মেইলটা ওপেন করলেন। অমৃতা লিখেছে, ‘রাশেদ! কেমন আছেন একটা বার যদি বলতেন!’

ম্যাজিকের মতো কী যেন একটা ঘটে গেলো। এহেন ম্যাজিকের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম! তপ্ত রোদ ঝলসানো ভর দুপুরবেলায় এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া

উড়ে এসে ছুঁয়ে দিয়ে গেলো তাঁকে। এতদিনের ক্লান্তি, অবসাদ, একাকিত্ব, সব ফুৎকারে উড়িয়ে দিল সেই জাদুকরী হাওয়া। বুকের ভেতর ঝুপ করে নেমে আসলো এক অনির্বচনীয় শান্তি! গ্রীষ্মের উত্তপ্ত ঘাম ঝরানো দুপুরটা আচমকা মিষ্টি বনে গেলো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি গাড়ির ভেতর। কী আশ্চর্য! তবে কি মনে মনে এই বার্তাটিরই অপেক্ষা ছিল এতদিন? কে জানে! কে বোঝে! এই অনুভূতি যে সমস্ত জানা বোঝার ওপরে, সমস্ত স্থূল বোধ বুদ্ধির বাইরে… সম্পূর্ণ অলৌকিক কিছু!

মোবাইলের কী প্যাডে আঙুল চলে গেলো। কেউ একজন ডাক দিল ভেতর থেকে।

‘তোমার স্ত্রী এবং সন্তান আছে। ভুলে যেও না!

আঙুল থেমে গেলো। গড়ালো কয়েকটা সেকেন্ড। তারপর আবার নড়ে উঠল হাত। কত দিন কথা হয় না! কেমন আছে মেয়েটা?

ভেতরের মানুষটা ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল ‘মেয়েটা তোমার ছেলের বন্ধু! ছিঃ! শেষ পর্যন্ত…?’

একটা ইমেইলের রিপ্লাই করলে, খুব বড় কোনো অন্যায় হবে না। ভেতরের মানুষটাকে খুব কড়া করে শাসন করলেন তিনি। এভাবেই বিবেক হেরে গেলো বাসনার কাছে। প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে গেলো অনুভূতির উষ্ণ জোয়ারে!

‘আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?’ তিনি লিখলেন ইংরেজিতে। মোবাইল কিংবা ল্যাপটপ কোথাও বাংলা ফন্ট ডাউনলোড করা নেই।

ইমেইলটা টুং করে ল্যাপটপের স্ক্রিনে দৃশ্যমান হয়ে উঠতেই আনন্দে কেঁদে ফেলল অমৃতা। উঠে বসে বালিশের ওপর থেকে ল্যাপটপটা কোলে তুলে নিল। হাত কাঁপছে তার। বুক করছে ধড়ফড়। আহ, শান্তি! শান্তি! শান্তি!

রাশেদ,

একুশ দিন কেটে গেলো। আমার কথা একবারও মনে পড়ল না?

অমৃতা,

গতকাল শপিংমলে একটা চেরি পিঙ্ক রঙের জামা পরা পুতুলকে দেখেই তোমার কথা মনে পড়ল। একটা পুতুলকে দেখে আরেকটা পুতুলকে মনে পড়ল আর কি! তুমি কেমন আছ? বললে না তো!

অমৃতা লিখল,

আমি এখন ভালো আছি। দুদিন পর হাইকোর্টের এম সি কিউ পরীক্ষা কিচ্ছু পড়া হচ্ছে না। আপনার কথা বলুন। কোথায় আছেন? কাদের সাথে আছেন? কী করছেন? কী খাচ্ছেন? খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে!

৭২

– ‘কি? রেডি?’

প্রশ্নটা শোনামাত্র তারা ঘুরে তাকালো চমক লাগা ডগডগে চোখে। আকাশ দাঁড়িয়ে আছে দরজার চৌকাঠে, পকেটে হাত রেখে, সামান্য বাঁকা ভঙ্গিতে। তারা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কানে দুল পরছিল। আকাশের আকস্মিক আবির্ভাব তাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে তুলল। সে ঘাড় নেড়ে আলতো গলায় বলল, 'জি। রেডি।'

মেয়েটাকে কি আজ সুন্দর লাগছে? আকাশ পর্যবেক্ষক চোখ নিয়ে তারার দিকে তাকিয়ে ছিল। ইট রঙের কামিজ। কানে মুক্তোর দুল। কাঁধের ওপর ঝুলছে হৃষ্টপুষ্ট লম্বা বেণী। বেশ একটা সতেজ এবং পরিপাটি ভাব। মুখটা একটু ভরলে··· আর মোটা কাচের চশমাটা না থাকলে··· ওকে কিন্তু দারুণ দেখাতো! কিন্তু খানিক বাদে, মনীষা যখন আকাশী সিল্ক শাড়ি আর খোলা চুলে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, তারার সতেজ ভাবটা নিমেষে কেমন যেন মিইয়ে গেলো। মনীষার ওই বশীকরণ রূপ দেখামাত্র আকাশের দুচোখের তারায় একটা গাঢ় রকমের মুগ্ধতা খেলা করে গেলো। সামনে দাঁড়ানো মানুষী তারা আকাশের সেই চোখের তারার অব্যক্ত সম্মোহন খুব ভালো মতোই উপলব্ধি করল। একটা ছায়া পড়ল ওর চোখে। বুকের ঘোলাটে কোণ থেকে ছিটকে পড়ল এক অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘ শ্বাস। মনীষা সত্য, অনেক বেশি সুন্দর!

ঝুমকি যাবার জন্য তৈরি হয়েও শেষমেশ শরীর খারাপের জন্য যেতে পারল না। কদিন যাবৎ থেকে থেকে তার পেটে একটা ব্যথা হচ্ছে। টানাটানির সংসারে ডাক্তার বদ্যি দেখানো বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। ব্যথা বাড়লেও আকাশকে সে ব্যাপারটা জানাতে চাইছে না আপাতত। তার পতিদেবকে তো কিছু বলা আর না বলা একই কথা। পুরো সংসারের দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে ওই একরত্তি ছেলে আকাশের ওপর।

কাছাকাছি একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আসলো ওরা। মনীষা সঙ্গে আছে বিধায় রুদ্রকেও আসবার জন্য বলে রেখেছিল আকাশ। রুদ্র সাথে করে একটা কেক নিয়ে

এসেছে। আসা মাত্র কেকের বাক্স তারার মুখের সামনে রেখে সে দাঁত বের করা হাসি দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থডে!'

তারা এসব শৌখিনতায় একেবারেই অভ্যস্থ না। কেক উপহার পেয়ে সে খুশি তো প্রকাশ করতে পারলই না, উপরন্তু ভীষণ রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। কুঁকড়ে যাওয়া মুখে একবার তাকালো আকাশের দিকে। যেন কেক উপহার পাওয়া একটা গুরুতর অপরাধ। রুদ্র দাঁত বের করা হাসিটা বর্ষণ করতে করতেই বলল, 'এত মন খারাপ করার কিছু নাই। কেকে আমরা কেউ ভাগ বসাব না। পুরাটাই তোমার।' ওর বলার ঢঙে হেসে ফেলল মনীষা। রুদ্র এবার রেস্টুরেন্টের আলো আঁধারিতে মনীষাকে দেখল পূর্ণ নজর মেলে। চেয়ার টেনে বসল আকাশের পাশে, মুখে বলল, 'আপনার শাড়ির রংটা খুব সুন্দর।'

মনীষা আপ্লুত হলো, 'আকাশী আমার প্রিয় রং।'

– 'উঁহু, এটা আকাশী নয়। এই কালারের নাম টিল।'

– 'ওই একই কথা।' পানিভর্তি ঝকঝকে পরিষ্কার কাচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে মনীষা। রুদ্র সজোরে ঘাড় নাড়ে, 'নাহ, একই কথা নয়। দুটো আলাদা রং।'

– 'এই রংকে আমি আকাশীই বলি।'

সাদা ফুল হাত শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা গম্ভীর মুখো মোচ ওয়ালা ওয়েটার এসে খাবারের মেনু দিয়ে গেলো। আকাশ তারাকে বলল, 'কী বার্থডে গার্ল? কী খাবেন?'

তারা এতক্ষণ জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। ভারি আড়ষ্টতা কাজ করছে তার ভেতর। এই প্রশ্নে শুনে সে আরো বেশি মিইয়ে গেলো যেন। বুকের সাথে চিবুক মিশিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে মেনুটা হাতে তুলে নিল। অস্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল খাবারের তালিকায়। রুদ্র স্মার্ট গলায় বলল, 'তুমি ফ্রাইড টমটম খেয়েছ কখনো?'

তারা মেনু থেকে চোখ না তুলেই নেতানো গলায় বলল, 'না, খাইনি।'

– 'এটা আবার কী খাবার!' মনীষা বিস্মিত।

আকাশ তেরছা চোখে রুদ্রকে দেখল। মিটমিটে হাসি নিয়ে রুদ্র তারার দিকে চেয়ে আছে। মিটমিটে হাসিটাই প্রমাণ, যে এই মুহূর্তে তার মাথায় কোনো দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে।

– 'ফ্রাইড টমটম খাওনি? ভীষণ মজা! না খেলে চরম মিস! ইউ শ্যুড ট্রাই!'

তারা পরীক্ষার পড়া পড়বার মতো মনোযোগের সাথে মেনু দেখতে দেখতে বাধ্য গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

মোটামুটি সব কিছু অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে আকাশ বলল, 'বার্থডে গার্লের কোনো পছন্দের খাবার আছে কি?'

তারা সাদা ফরমাল শার্ট পরা ওয়েটারকে প্রশ্ন করল, 'ফ্রাইড টমটম আছে আপনাদের?'

গম্ভীরমুখো মোচওয়ালা ওয়েটারের মুখখানা আরো দ্বিগুণ গম্ভীর হয়ে গেলো। সে থমথমে গলায় বলল, ‘টমটম মানে? টমেটো?’

– ‘না টমেটো না, টমটম।’ তারা বলল আত্মবিশ্বাসী গলায়।

গম্ভীরমুখো কিছুক্ষণ চোখের পালক নেড়েচেড়ে ব্রেইনস্টর্ম করল বুঝি। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে পাথুরে গলায় বলল, ‘জি না। এই জিনিসের নামই শুনি নাই কখনো।’

রুদ্র তখন অনেক কষ্টে হাসি সামলাচ্ছে। হাসছে আকাশও। মনীষা রুদ্রকে একটা ধমক দিয়ে উঠে বলল, ‘বাচ্চা মেয়েটাকে কেন শুধু শুধু এমন বোকা বানাচ্ছ তোমরা?’

মনীষার কথায় বিষয়টি পরিষ্কার হলো তারার কাছে। বুঝতে পেরেই চোখ মুখ শক্ত করে ফেলল সে। চাইনিজ টাইনিজ খাবার অভিজ্ঞতা তার একেবারে নেই বললেই চলে। সেই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কেউ যে এহেন অপমান করে বসতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি কখনো। রাগে এবং অপমানে চোখে পানি চলে আসার উপক্রম হলো। আকাশ ওর মনের অবস্থা খানিকটা আঁচ করতে পেরেই বুঝি বলে উঠল, ‘রুদ্রর কাজই হচ্ছে কারণে অকারণে ফাইজলামি করা। তুমি মাইন্ড করো না। তোমার পছন্দের কোনো আইটেম থাকলে অর্ডার দিয়ে দাও।’

তারা অর্ধনিমীলিত চোখে বলল, ‘আমার কোনো চয়েজ নেই। আপনারা যা অর্ডার করেছেন তাতেই হবে।

ওয়েটার চলে যাবার পর আকাশ রুদ্রর পেটে একটা গুঁতা মেরে বলল, 'এই তুই এসব দুষ্টামি করার আর জায়গা পাস না? বাচ্চা একটা মানুষকে নিয়ে ফান করতেছিস ক্যান?'

রুদ্র জিব কেটে বলল, 'ও বাচ্চা মানুষ নাকি? বয়স কত? কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস টু নাকি থ্রি?'

তারা অবনত মুখেই চোখের পাঁপড়ি তুলে দেখল মুখোমুখি বসে থাকা হালকা পাতলা ছেলেটাকে। লম্বা ঢেউ খেলানো চুলগুলো টেনেটুনে ঝুঁটি বাঁধা। চোখের মণির রং ধূসর, বেড়ালের মতো। তামাটে গায়ের রং। গালে এবড়োখেবড়ো দাড়ি। ছাই রঙের টি শার্ট। খুব একটা ইম্প্রেসিভ চেহারা নয়। তবে লম্বা ধাঁচের মুখখানায় একটা মায়া মায়া সরল ভাব আছে। আর সবচেয়ে অন্যরকম যে ব্যাপারটা, তা হলো ছেলেটি কথা বলে ভীষণ আমুদে গলায়। ভয়েস শুনলেই মনে হয় যেন কমেডি শো চলছে। কেউ কেউ হয়তো বলবে খুব মন ভালো করা কণ্ঠস্বর। কিন্তু এই মন ভালো করা কণ্ঠস্বর তারার আজ মহাবিরক্ত লাগছে। মনে হচ্ছে বিরক্তিকর ছেলেটা এখানে উপস্থিত হয়ে আজেবাজে কথা বলে নিছক পরিবেশ নষ্ট করছে। সে ভ্রু কুঁচকে, ভাঙচুর হওয়া মুখ নিয়ে পাথরের মতো বসে রইল। এই রগচটা ভাব দেখে অবশ্য রুদ্র টিটকিরি মারতে ভুলল না, 'ভাই, কোথাও কি এমন কোনো নিয়ম লেখা আছে নাকি যে জন্মদিনের দিন হাসা যাবে না? স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকতে হবে?'

– 'উফ, চুপ কর তো!' আকাশ চাপা গলায় ধমক দিল রুদ্রকে।

– 'আমার ছেলেটার জন্য খারাপ লাগছে। আমার ছেলে চাইনিজ ফুড খুব পছন্দ করে।' মনীষা বলল, আক্ষেপের সুরে।

রুদ্র তারাকে আড়চোখে দেখছিল। মেয়েটা এমন কেন? মানে প্রব্লেমটা কী? কোনো অফেন্সিভ কথা বলে ফেলেছে কি সে? যার কারণে এমন কটমটে চেহারা বানিয়ে রাখতে হবে? ভাবল জন্মদিনের দিন একটু কৌতুক করে বিনোদন দিবে। তা না, উল্টো ক্ষেপে গিয়ে বোম! আজিব দুনিয়া!

– 'রাইয়ান দেশে আসবে কবে?' একটু আনমনাভাবে প্রশ্ন করল রুদ্র।

– 'এইতো আগামী মাসেই ওদের সামার ভ্যাকেশন স্টার্ট হচ্ছে।'

– 'ও তাহলে তো খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আপনার ছেলের সাথে।' যোগ করল আকাশ।

মনীষা তারার রুক্ষ মেজাজটা একটু মসৃণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বলল, 'তারা, আপু জন্মদিনে কী উপহার দেই তোমাকে, বল তো?'

তারা অনেকক্ষণ পর একটু হাসার চেষ্টা করল, 'কিছু দিতে হবে না আপু। সময় দিচ্ছেন, এটাই যথেষ্ট। অনেক থ্যাংকস আপনাকে।

রুদ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল, 'ভাই, কেউ কেউ শুধু সময় দিয়াই থ্যাংকস পায়। তাও আবার একটা না, দুইটা না, অনেকগুলা থ্যাংকস। আর কেউ কেউ সময়ের সাথে টাকা খরচ কইরা কেক নিয়া আসলেও থ্যাংকস পায় না। আল্লাহর দুনিয়ায় কি সুবিচার বলতে কিছু নাই?'

মনীষা আর আকাশ হো হো করে হেসে উঠল রুদ্রর কথা শুনে। তারা কিন্তু হাসল না। মুখের গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখেই অনেক কষ্টে রুদ্রকে বলল, 'কেকের জন্য থ্যাংকস।'

খাবার আসার আগেই কেক কাটা হলো। সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটল ওদের। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ একটু সহজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে রুদ্রর ওপর জমে থাকা বরফের মতো রাগটা তার গলছিল না কিছুতেই।

বাড়ি ফেরার সময় মনীষা আর তারা এক রিকশায় উঠল। রিকশা ছাড়ার আগ মুহূর্তে তারা গলা উঁচিয়ে রুদ্রকে বলল, 'আমাদের বাসায় এসেন। সত্যিকারের ফ্রাইড টমটম খাওয়াব আপনাকে।'

– 'ফ্রাইড টমটম একটা বিশেষ খাবার। সবাই রান্না করতে পারে না। তুমিও পারবা না।' কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে পারল না রুদ্র। তার আগেই রিকশা টুংটুং ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চলল সামনে।

রুদ্রকে কিছুদূর এগিয়ে দিল আকাশ। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সিএনজি খুঁজছিল ওরা। হঠাৎ করেই আকাশ বলল, 'মনীষাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল আজকে। তাই না?'

– 'হুম ওকে সবসময়ই সুন্দর দেখতে।' বলে একটু থমকালো রুদ্র। সরু চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, 'তুই কি মনীষার উপর ক্রাশ খাইছিস?'

– ‘আরে নাহ!’ মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল আকাশ।

– ‘মনে হচ্ছে খাইছিস।’ রুদ্র হাসে।

– ‘আজাইরা কথা বলিস না।’

– ‘আজাইরা কথা না দোস্ত, আমি তোরে চিনি।’

আকাশ রুদ্রর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ‘আচ্ছা, একটা কথা বলতো!

– ‘কী কথা?’

– ‘মনীষা নাকি অমৃতা?’

– ‘এটা কেমন প্রশ্ন?’

– ‘কথা বাড়াইস না। জাস্ট নাম বল একটা।’

রুদ্রর খুব একটা সময় লাগল না উত্তরটা দিতে, ‘অমৃতা।’

খালি সিএনজি পাওয়া গেলো। উঠে বসার আগে রুদ্র আকাশকে প্রশ্ন

করল, 'হঠাৎ এটা জানতে চাইলি কেন?'

– 'এমনি!' আকাশ উত্তর করল, দায়সারাভাবে।

রাতে বাড়ি ফেরার পর ডাইনিং এ তারার সাথে দেখা হয়ে গেলো। তারা বুঝি আকাশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জন্মদিন ছিল। এর আগে এত ঘটা করে আমার জন্মদিন কখনোই পালন করা হয়নি।
'

আকাশ মৃদু হেসে বলেছিল, 'ইউ আর ওয়েলকাম।'

কেন যেন মনটা ভালো হয়ে গেলো তার। এ পৃথিবীতে কিছু মানুষকে কত অল্পতে সন্তুষ্ট করা যায়! আবার কিছু মানুষকে নিজের কলিজা কেটে হাতে তুলে দেবার পরেও সন্তুষ্টির স অক্ষরটাও লাভ করা যায় না। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া মানুষগুলোকে তার সব সময়ই বড় বেশি ভালো লাগে! তারা মেয়েটা… আসলে খুব ভালো একটা মেয়ে। বড় দুঃখী মেয়েটা। বেচারী! অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছে। আকাশও তো মা হারিয়েছে সেই কত্ত আগে! সে নিজেও বেশ দুঃখী একটা মানুষ। তারারই মতো!

৭৩

অমৃতা,

নিউইয়র্কে এসে উঠেছি আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে। বন্ধু এবং বন্ধুর স্ত্রী দুজনেই চাকরিজীবী। ওদের দুটি সন্তান এখানকার মিডল স্কুলে পড়ে। এই মুহূর্তে ফ্ল্যাটে আমি একা। বাসার সবাই যার যার কাজে বেরিয়ে গেছে। তিনতলার ঝুল বারান্দায় বসে তোমাকে লিখছি। এখন দুপুর। আকাশ ঝকঝকে নীল। তেজহীন রোদে ফুরফুরে বাতাস। চোখের সামনেই একটা বিশাল বড় রেড মেপললিফ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুঘু ডাকছে আশেপাশে কোথাও। টেম্পারেচার খুব বেশি না। উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো হবে। আমার ল্যাপটপে বাংলা ফন্ট ছিল না। তোমাকে লিখব বলে অভ্র ডাউনলোড করলাম। বাংলায় খুব একটা লেখা হয় না আজকাল। দীর্ঘ বিরতির পর নিজের ভাষায়, নিজের অক্ষরে কিছু লিখতে পেরে বেশ তৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

ম্যানহাটনের একটা হোটেলে রুম বুকিং দেওয়া ছিল। যেহেতু সরকারি প্রজেক্ট নিয়ে আসা, তাই সরকার এসব সুযোগ সুবিধা প্রোভাইড করতে কার্পণ্য বোধ করেনি। কিন্তু এ যাত্রায় নিজের জন্য বরাদ্দ প্রিভিলেজটুকু গ্রহণ করতে পারলাম না। বন্ধুর অনুরোধটিই রাখতে হলো। এই অ্যাপার্টমেন্টে একটা সময় আমরা টানা চারমাস অবস্থান করেছি। সে সময় গ্রিনকার্ড টিকিয়ে রাখার জন্য ছমাস অন্তর অন্তর নিয়ম করে ইউ এস এ আসতে হতো। পরবর্তীতে অবশ্য সংসদ সদস্য হবার লোভ সামলাতে না পেরে আমি আমেরিকার নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলাম। এমনিতেও পরের দেশে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বসবাস করার মাঝে আমি কোনো কৃতিত্ব খুঁজে পাই না। যত আরাম আয়েশই এখানে থাকুক না কেন, পরভূমি কখনো স্বভূমি হয়ে ওঠে না। বিদেশে আসলেই স্বদেশের জন্য আমার মনটা আরো বেশি করে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই চাকচিক্য এবং বিশুদ্ধ বাতাস আমাকে ক্ষণে ক্ষণে নিজের দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজেদের ব্যর্থতা এবং খুঁতগুলো চোখের সামনে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। মনে হয় দেশের মানুষগুলোর জন্য আমার আরো অনেককিছু করা বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু চাইলেই কি আর সব পারা যায়? যে প্রশাসনের শেকড়েই পচন ধরে গেছে, সে প্রশাসনের ডালপালা যত সতেজই হোক না কেন, ফল কিন্তু পুষ্টিকর হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম।

এছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্ণবাদ মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে। ঢুকবেই বা না কেন বল? খুব ছোট বেলায় এদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে সাদা চামড়ার যীশুখ্রিষ্ট হলো গড (প্রকৃত যীশু কিন্তু ব্রাউন ছিলেন) অতএব কালো কিংবা বাদামি চামড়ার লোকেরা সহজাতভাবেই গডের স্বগোত্রীয় হবার যোগ্যতা রাখে না। এই সাদা চামড়ার যীশুখ্রিস্টর মাধ্যমেই রেসিজমের সবচেয়ে বড় ভিত্তিটা গড়া হয়েছিল।

অনেকদিন আগের একটি দিনের কথা খুব মনে পড়ছে। তখন সামি ছোট। বয়স বারো কি তেরো হবে। এই নেইবারহুডেরই একটি গাছের গুড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে সাইকেল নিয়ে উল্টে পড়ে গিয়েছিল আমার ছেলে। হাঁটু ছিলে গিয়ে কী এক রক্তারক্তি কাণ্ড! রক্ত দেখে ছেলে আমার ফেইন্ট হয়ে গেলো। তুমি হয়তো জানো সামির হিমোফোবিয়া আছে। ও রক্ত সহ্য করতে পারে না। ছেলের দুর্দশা দেখে আমার স্ত্রীর হাতে পায়ে কাঁপুনি ধরে গেলো। তাৎক্ষণিকভাবে নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম। সামির হাঁটুতে সেই আঘাতের দাগটা অনেকদিন অবধি রয়ে গিয়েছিল। এখনও আছে কিনা সঠিক জানি না! দুপুরে খাবার দাওয়াত ছিল তিন জায়গায়। শরীর খারাপের এক্সকিউজ দেখিয়ে সব কটাই ডিনাই করে দিলাম। বিকেলে এখানকার একটি হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতে হবে। বাংলাদেশ থেকে একদল ডাক্তার এসেছে প্রশিক্ষণে। এই প্রশিক্ষণটি আমাদের প্রজেক্টের আন্ডারে পড়েছে। সে যাই হোক, কাজের কথা থাক। কাজ নিয়ে খুব বেশি ভাবব না বলে মনস্থির করেছি আজ। জীবনে এই প্রথমবারের মতো ভেতরে ভেতরে কেমন একটু ক্লান্ত বোধ করছি আমি। মানুষের জীবনে ক্লান্তি কোনো নিয়ম মেনে আসে না। কেউ কাজ করে ক্লান্ত হয়, কেউ বা আবার কর্মহীন অবস্থায় অলস দিন কাটিয়ে ক্লান্ত হয়। আমি কিন্তু কখনোই কাজ করে ক্লান্ত হইনি। কাজ আমার নেশা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম বেশ কিছুদিন ধরে একটা নিরবিচ্ছিন্ন ক্লান্তি বোধ আমাকে প্রচণ্ডভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী? এক কবি বলেছিলেন (নামটা ভুলে গেছি, তুমি একটু গুগল করে দেখো তো) ভ্যারাইটি ইজ দ্যা স্পাইস অব লাইফ, দ্যাট গিভস ইট অল ইটস ফ্লেভার। কবি সত্যই বলেছিলেন। বৈচিত্র্যহীন জীবন মানুষকে একঘেয়ে করে তোলে। একইভাবে জীবনযাপন করতে করতে একসময় খুব স্বাভাবিক ভাবেই

মনে অবসাদ নেমে আসে। কিন্তু চাইলেই তো কারো জীবনে দফায় দফায় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। মানুষ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আশায় যে কোন ধরনের পরিবর্তন কামনা করে। আমার ছোট চাচা জীবনের একটা সময়ে নিদারুণ অর্থ কষ্টের স্বীকার হয়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই বলতেন মানুষ হয়ে জন্মানোর চেয়ে বড় কষ্ট আর নাই। এর চেয়ে গাছ হয়ে বা তেলাপোকা হয়ে জন্ম নিলেও ঢের ভালো ছিল। সত্যই কি তাই? গাছ হয়ে বা পোকা হয়ে জন্ম নিলেই কি আমাদের এই এক জন্মের জ্বালা যন্ত্রণা সব মিটে যেত? তুমি কি ফ্রানৎস কাফকার মেটামরফোসিস গল্পটা পড়েছ? এ গল্পের মূল চরিত্র গ্রেগর সামসা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে পোকা হিসেবে আবিষ্কার করে। সে তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল। ছিল একমাত্র নির্ভরতার স্থান। পারিবারিক সদস্যদের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে গ্রেগর এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিল। আকস্মিক পোকায় রূপান্তর হওয়াটা তাই তার যান্ত্রিক একঘেয়ে জীবন থেকে একধরনের নিষ্কৃতি ছিল। কিন্তু সেই নিষ্কৃতি তাকে কোনোভাবেই বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। শারীরিকভাবে পোকা বনে যাবার পরেও মনের দিক থেকে গ্রেগর মানুষই ছিল। পোকা হয়েও মানুষ জন্মের দায় তার মিটল না। ধীরে ধীরে সে পোকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিবারের মানুষগুলোর কাছে হয়ে ওঠে চক্ষুশূল। তারা পোকা গ্রেগরের ওপর এতই অতিষ্ট হয়ে উঠল যে একটা সময় তার মৃত্যু কামনা করতেও পিছপা হলো না। না পড়ে থাকলে গল্পটা পড়ে নিও। রূপান্তর গ্রেগরকে প্রকৃত অর্থে মুক্তি দিতে পারেনি। আমাদের আশেপাশে কিছু মানুষ আছে যারা বাহ্যিকভাবে মনুষ্য জীবনযাপন করলেও তাদের ভেতরকার অবস্থা পোকা জীবনের চাইতেও করুণ। তাদের শারীরিক নয়, মানসিক রূপান্তর হওয়া অতীব জরুরি।

আসলেই কি কোনো ধরনের রূপান্তর বা পরিবর্তন মানুষকে সত্যিকারের মুক্তি দিতে পারে? মৃত্যু কি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ এক জীবন থেকে অন্য জীবনে প্রবেশ করে। সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে মৃত্যুও কিন্তু এক ধরনের মেটামরফোসিস!

আবোলতাবোল বকতে গিয়ে আসল কথা থেকে সরে গেছি। আমার ক্লান্তির কারণ নিয়ে কথা বলছিলাম। কদিন ধরে ভেতর থেকে কেউ একজন ছুটি চাই, ছুটি চাই বলে দাবি জানিয়ে আসছে। এটা কি বয়সের দোষ? হতে পারে। হয়তো এবার সত্যই ছুটি নেবার সময় এসে গেছে। কিন্তু এখনো যে অনেক কাজ বাকি। কাজগুলো শেষ করবার আগে ছুটি যে আমি কোনো ভাবেই নিতে পারব না! তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। এসব ভারি কথা তোমার কেমন লাগছে জানি না। তবে কোনো এক আশ্চর্য কারণে তোমার ওপর আমার এই ভরসা জন্মে গেছে যে, আমার বলা কথাগুলো অন্য কেউ না বুঝলেও, তুমি অন্তত বুঝবে। আমার মনে পড়ে না শেষবার আমি কার সাথে এতটা মন খুলে কথা বলেছি। বহুদিন আগে আমার একজন জার্মান পেনফ্রেন্ড ছিল। প্রায় দেড়বছর যাবৎ আমরা পত্র আদান প্রদান করেছি। আজ এতগুলো বছর পর তোমাকে একটা আবোল তাবোল কথা সম্বলিত দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললাম। আমি আমার জীবনের বেশ কিছু সময় শুধু অন্যের কথা চিন্তা করেই কাজ করে গেছি। বেঁচে থেকেছি বাবা মায়ের জন্য, সংসারের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। আজ হঠাৎ এই কুড়িয়ে পাওয়া অলস দুপুরবেলাটায় তোমাকে লিখতে বসে মনে হলো যেন অনেক অনেক দিন পর শুধু নিজের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে পারলাম। তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে নিজের মতো করে কিছু সময় কাটাবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকে অবশ্য আরেকটি কারণেও আমার মনটা বিশেষ ভালো। আজ প্রথমবারের মতো আমার বৌমা আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছে। মনে হলো আমি যেন নতুন করে একটি কন্যাসন্তান লাভ করলাম জীবনের এই শেষ বেলায় এসে। আমার একটি মেয়ের খুব শখ ছিল। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যদি কখনো আমার মেয়ে হয়, তবে তার নাম রাখব রিমঝিম। সামি জন্মাবার দুবছর পর রিমঝিম মায়ের পেটে এসেছিল বটে। তবে এ পৃথিবীর আলো দেখবার সৌভাগ্য তার হয়ে ওঠেনি।

তুমি বলেছিলে হাইকোর্টের পরীক্ষা চলে এসেছে কিন্তু প্রিপারেশন খুব একটা ভালো না। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বর্তমান প্রেসিডেন্টের সাথে আমার খুব ভালো জানাশোনা আছে। তুমি চাইলে, পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড না করেও তোমাকে পাশ করিয়ে দেওয়া যাবে। সেরকম কোনো প্রয়োজন হলে বলো আমাকে। যদিও তোমাকে যতটুকু

চিনেছি তাতে মনে হয়েছে তুমি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পাশ করতে কখনোই চাইবে না। ভালো থেকো।

ইতি, রাশেদ

পুনশ্চ : একটা প্রশ্ন কিছুদিন ধরেই মনে উঁকি দিচ্ছে। অমৃতা, আমার প্রতি তোমার এই তীব্র আকর্ষণের কারণ কী?

৭৪

রাশেদের ইমেইল অমৃতার মোবাইলে কড়া নাড়ল গভীর রাতে। অমৃতা তখন ঘুম। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ইমেইলটা পেল সে। এত হুড়োহুড়ি করে বাসা থেকে বের হতে হলো যে মেইল পড়বার সুযোগ আর হয়ে উঠল না। পড়তে পারল পাবলিক বাসের বুক চাপা ভিড়ে, চৈত্র সকালের শ্বাসরুদ্ধকর গরমে। পড়তে পড়তে বাসের ভেতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা বেমালুম ভুলে গেলো। মুচকি হাসিতে তার পাতলা ঠোঁট কমলার কোয়ার মতো গেলো বেঁকে। ভিড়ের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক লোক সুযোগ বুঝে তার কোমর ছুঁয়ে দিয়েছিল। অন্যদিন হলে সে হাতটা মুচড়ে দিত তাৎক্ষণিকভাবে। আজ সেরকম কিছুই করল না। মুখের হাসিটা সঙ্গে নিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে অতি বিনয়ের সাথে বলল, ‘প্লিজ, গায়ে হাত দিয়েন না।’ বিনয়ের বাহার দেখে লোকটা একটু বোকা বনে গেলো। অপ্রস্তুতভাবে সরিয়ে নিল হাত। তারপর… পাখনাবিহীন পাখি হয়ে উড়তে লাগল অমৃতা মনে মনে। ইংলিশ রোডের খর রোদ্দুরময় ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঢুকে গেলো রেড মেপললিফের রং, ঘুঘুর ডাক আর ফুরফুরে হাওয়া। চেম্বারে সিনিয়রের সামনে বসে মামলার ডিকটেশন লিখতে গিয়ে তার মুখে লেগে রইল হাসি। সিনিয়র গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে প্রশ্ন করে বসলেন, ‘হাসছ কেন? ‘

সে মাথা নুইয়ে ফেলল। জবাব দিতে পারল না।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, চটপট বসে পড়ল ল্যাপটপ নিয়ে।

প্রিয় রাশেদ,

মাত্র বাড়ি ফিরলাম। ঢাকা শহরের জ্যামের অবস্থা তো আপনার জানাই আছে। তার ওপর আমাকে আসা যাওয়া করতে হয় বাসে করে। রোজ দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লেগে যায়। শুরুতেই আপনাকে একটা কথা বলে নিই যে, আপনি খুব গুছিয়ে চিঠি লিখেছেন। এত সুন্দর চিঠি এর আগে আমি কোনোদিন কারো কাছ থেকে পাইনি। একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরঘুর করছে সেই তখন থেকে। আপনার জার্মান পেনফ্রেন্ডটি কি নারী ছিল? নাকি পুরুষ?

হৃদি আপনাকে বাবা ডেকেছে শুনে খুব খুশি হলাম। আমার বন্ধুগুলো অত্যন্ত উদার এবং নরম মনের অধিকারী। আপনার ছেলের মনটাও যে কত বড় সে বিষয়ে আপনার ধারণা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। আমরা প্রায়ই ভাবতাম এমন অহংকারী বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে হয়ে সামিটা অমন মাটির মানুষ হয় কী করে? (ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এভাবে কথাটা লিখে ফেলার জন্য) এখন আমি খুব করে বুঝি যে সামি আসলে তার বাবার মতোই হয়েছে। উদার এবং মহৎ। অহংকার জিনিসটা আপনার মধ্যে ছিটেফোঁটা থাকলেও আমাদের সামির মাঝে একেবারেই নেই। আর হৃদি হচ্ছে বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল। সবচেয়ে কঠিন এবং আবেগহীন হলাম আমি। সাবালিকা হওয়ার পর থেকে আমি কান্না কী জিনিস ভুলেই গিয়েছিলাম। এই এত বছর পরে এসে আজকাল একটু কান্নাটানা করি। তবুও সেই কান্না শুধু একজন বিশেষ মানুষেরই জন্য। অদ্ভুত ব্যাপারটা, তাই না?

হৃদির কথা বলছিলাম। ও সত্য খুব ভালো মেয়ে। আপনি ভাগ্যবান যে এমন একটি সাদা মনের মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়েছেন।

হাইকোর্টের পরীক্ষায় আপনার সাহায্যটুকু আমি নিতে পারছি না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। চান্স না পেলে নেই। কিন্তু আইনের ছাত্রী হয়ে এমন দুর্নীতির আশ্রয় আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

প্রবাসে গিয়ে নিজের দেশকে আরো বেশি করে মনে পড়ার বিষয়টি জানতে পেরে আপনার প্রতি আমার সম্মান আরো অনেকখানি বেড়ে গেছে। আপনার মতো দেশ প্রেমিক লোক আমাদের দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত বিরল। যারা থাকেন তাদেরও আমরা খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারি না। আপনাকে নিয়ে তাই আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হয়। কিন্তু আপনার মতো করে তৃতীয় বিশ্বের খুব কম সংখ্যক লোকেই চিন্তা করে। বেশির ভাগ মানুষ বিদেশের মাটিতে পা রাখার পর দেশকে ভুলে যাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। নিজ দেশের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। আমার এক মামাতো ভাইয়ের ছ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার এক স্বনামধন্য ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন হয়ে গেলো। মামার কাফরুলে একটি তিনতলা বাড়ি ছিল। ছেলের পড়াশোনার খরচ জোটানোর জন্য মামা বাড়িটি দিলেন বিক্রি করে। ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমালো। সেই যে গেলো আর ফেরার নাম নেই। পাশ করে সে এখন ভালো চাকরি পেয়েছে। দুহাতে টাকা কামায়। কিন্তু যে বাবা একদিন সন্তানের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি সেই বাবাকে একটা কানা কড়িও সে দেয় না। বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা আমার মামাতো ভাইয়ের মননে এবং মস্তিষ্কে প্রকৃত শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি। যে উচ্চশিক্ষার জন্য বাবা মায়ের এমন উচ্চতর ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং যে উচ্চশিক্ষা নিজের দেশকে, উৎসকে, সংস্কৃতিকে ঘেন্না করতে শেখায়, সে উচ্চশিক্ষা আমাদের কারো জীবনেই কাম্য নয়। আমার বাবার এক বন্ধুর মেয়ে কয়েক বছর আগে বিয়ে করে কানাডায় সেটেল্ড হলো। আমাদের চেয়ে বছর চারেকের বড় হবে। খুবই মিশুক প্রকৃতির একটি মেয়ে।

কদিন আগে ফোনে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, বেশ কিছুদিন হলো সে বাংলাদেশীদের সঙ্গ বর্জন করেছে। কারণ বাংলাদেশীরা নাকি খুব নোজি হয়, ক্রিপি হয়। অন্যের জীবনে নাক গলানোর ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই। কথা সত্য। কিন্তু তার সিদ্ধান্তটা আমাকে অবাক করেছে। আচ্ছা আজকে যদি আপনার নিজের সন্তান বেয়াদব হয়, বাজে হয়, নেশাখোর হয়, তবে সেই সন্তানকে কি আপনি ত্যাগ করবেন? ঠিক একই ধরনের মনোভাব কি আমাদের স্বজাতির প্রতি ধারণ করা বাঞ্ছনীয় নয়? আমি আপুকে বলেছিলাম, আপু ডোন্ট লিভ দেম, ট্রাই টু এডজাস্ট। আপু উত্তরে আমাকে বলেছে, 'এডজাস্ট করা ইম্পসিবল। এরা নাকি লো স্ট্যান্ডার্ড টিপিক্যাল বাঙালি ফ্যামিলি ' এ কথা সত্য যে শিক্ষা আমাদের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা রক্ষা করতে শেখায়। শিক্ষিত লোকমাত্রই জানে যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর মতো চরম অভদ্রতা আর দ্বিতীয়টি নেই এ সমাজে। পাশাপাশি এটাও সত্য যে শেখার কোনো বয়স নেই। আমার যা কিছু ভালো, যা কিছু মঙ্গলময় তা যদি আমি আমার নিজের মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেই না পারলাম তবে সেই ভালোত্বের মূল্য কী?

আপনি আমেরিকায় বর্ণবাদ আছে বলে সমালোচনা করেছেন। আমাদের ভেতরে তো ডিফারেন্ট রেস নেই, কালার নেই, আমরা সব্বাই বাদামি। তবুও একই চামড়ার মানুষের ভেতরে এসব লো স্ট্যান্ডার্ড, হাই স্ট্যান্ডার্ড, মিডল ক্লাস, হাই ক্লাস কোত্থেকে আসে তা আমার বোধগম্য হয় না।

বারে বারে বয়স নিয়ে কথা বলেন কেন? বয়স তো আপনাকে একটুও ছুঁতে পারেনি। এর মানে কি এই যে আপনার শারীরিক বয়স বাড়েনি কিন্তু মানসিক বয়স বেড়ে গেছে? লোকের তো শুনেছি উল্টোটা হয়!

রিমঝিম নামটা আমার খুউব পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমার (ফিউচার) মেয়ের নাম কি রিমঝিম রাখতে পারব? (আমি কখনোই বিয়ে করব না। দত্তক নেব এবং সিঙ্গেল মাদার হিসেবে সন্তান বড় করব) নাম রাখার বিষয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষায় রইলাম।

রাশেদ সাহেব, আপনাকে কেন ভালো লাগে সেই প্রশ্নের উত্তরটা গুছিয়ে লিখতে পারব কিনা জানি না। তবে যেহেতু আমি কখনোই মনের কথা মনে চেপে রাখতে ভালোবাসি না তাই রাখঢাক করে কিছু বলব না। যা বলার তা পরিষ্কার রুপেই বলব। আপনাকে একবার সামনাসামনি বলেছিলাম যে আপনার মতো সুপুরুষ আমি জীবনে আর একটিও দেখিনি। কথাটা শুনে আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। এতটাই রেগেছিলেন যে ঘর থেকে বের করে দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি। যদিও এত রেগে যাবার মতো আদৌ কোনো কারণ ছিল কিনা তা নিয়ে আমার সংশয় আছে এখনো। সে যাকগে, আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাটুকুই এই ভরসার যোগান দিচ্ছে যে আপনার রাগের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যৌক্তিকতা ছিল।

আপনাকে ভালো লাগার প্রথম কারণ হলো, আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় পুরুষ মানুষটি হলেন আপনি। এটা প্রশংসা নয়, এটা ফ্যাক্ট। আপনার কাছে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি নতুন কিছু নয়। মেয়েদের চোখে আপনি হরহামেশাই নিজের জন্য মুগ্ধতা এবং আকর্ষণ অনুভব বা উপভোগ (!) করেন বলেই আমার ধারণা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করি। সেই সমতা শুধু অধিকারের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি স্তরেই প্রয়োগ করার মনোভাব পোষণ করি। সব মেয়েরাই চায় স্বামী বা প্রেমিক তার রূপের প্রশস্তি গেয়ে যাক, অথচ কানা কড়ি প্রশংসাও তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীটির জন্য বরাদ্দ করতে নারাজ। প্রশংসা ব্যাপারটায় যেন শুধু মেয়েদেরই একচ্ছত্র অধিকার। আমি অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম যে যদি কখনো আমার কাউকে ভালো লাগে তবে আমার ভালোলাগার কথা, মনের ভাবের কথা সেই বিশেষ মানুষটিকে খুলে বলতে বা জানাতে বিন্দুমাত্রও

সংকোচ বোধ করব না। কাউকে ভালো লাগার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু আপনাকে ভালো লাগার কারণ শুধু বাহ্যিক রূপ নয়। আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার বাচনভঙ্গি, জীবন সম্পর্কে আপনার দর্শন, সততা, রুচিবোধ, শিক্ষা এই সমস্ত কিছু আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। আপনার সাথে কথা বলে এটা অন্তত বোঝা যায় যে, রাজনীতি এবং ব্যবসা ছাড়াও আপনার নিজস্ব পড়াশোনার বিস্তার অনেক এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনার মতো সচ্চরিত্র পুরুষ মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি।

আমি দুঃখিত আপনাকে বন্ধুর বাবা হিসেবে দেখতে বা চিনতে পারিনি বলে। কোনো এক আশ্চর্য অজানা কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভাগ্যের প্রহসন ছাড়া এটাকে অন্য কিছুই বলব না আমি। প্রথম যেদিন দেখেছিলাম আপনাকে (জানিনা আপনার মনে আছে কিনা, আছে কি?) সেদিন থেকেই আপনি আমার কাছে বন্ধুর বাবা না, সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ ছিলেন।

ফ্রানৎস কাফকার ‘মেটামরফোসিস’ গল্পটার কথা অনেক শুনেছি। পড়া হয়নি এখনো। আমি গল্প উপন্যাস তেমন পড়ি না। তবে গল্পটা এখন পড়ে নেব। ভ্যারাইটি ইজ দ্যা স্পাইস অফ লাইফ’ এই উক্তিটা কবি william cowper এর। গুগল তাই বলল।

আমাকে আপনি খুব একটা পছন্দ না করলেও অপছন্দ যে করেন না তা আমি টের পাই। আমার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা তা এই মুহূর্তে খুব জানতে ইচ্ছে করছে। এই যে সবকিছু অকপটে বলে ফেললাম, এসব শোনার পরে আপনার কি আমাকে ঠুনকো মনে হচ্ছে? সস্তা মনে হচ্ছে? জানাবেন প্লিজ। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি, আপনার অমৃতা

পি : এস : আজকাল আমারও ক্লান্ত লাগে। কেবলই মনে হয় পালাই পালাই। মুক্ত আকাশে সর্বদা বিচরণকারী এই আমারও ভীষণভাবে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে হঠাৎ হঠাৎ। আপনার কাছ থেকে পাওয়া এক টুকরো চিঠির মধ্যে, আর আমার লেখা এই কয়েক ছত্র লাইনের মধ্যে সেই বহু আরাধ্য মুক্তি যেন একটুখানি ঝলক দিয়ে গেলো। ধন্যবাদ আপনাকে।

৭৫

হৃদির আজকাল অখন্ড অবসর। নেই কাজ তো খই ভাজ অবস্থা একেবারে। এই বেকার জীবন অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগছে না তার। বিয়ের পর প্রথম দু সপ্তাহ মনের মধ্যে একটা লাগাতার অশান্তি কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। এখন কিন্তু সেই কাঁটার মতো অশান্তিটা নেই। কদিন হলো সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস উপভোগ করা শুরু করেছে সে।

রোজ সকালে অফিস যাবার আগে সামির গলায় টাই বেঁধে দেয় সে যত্ন করে। ইন করা ফুল হাতা শার্ট, প্যান্ট আর টাই পরা রুপবান স্বামীটিকে নজর ভরে দেখে। ফূর্তিবাজ ক্যাজুয়াল বন্ধুবেশী সামির চাইতে আজকাল তার এই কর্মঠ, একটু পরিণত সামিকেই যেন বেশি ভালো লাগে। সকালের নাশতাটা নিজের হাতে বানায় হৃদি। কাজের লোকরাই অর্ধেক কাজ সেরে ফেলে। সে হয়তো পাউরুটিটা টোস্ট করে দেয়, ডিমে লবনটা দেখে দেয়। খুব বেশি হলে গ্রাইন্ডারে অরেঞ্জ গ্রাইন্ড করে জ্যুস বানিয়ে নেয়। রুদ্রও একই সময়েই বাসা থেকে বের হয়, অফিসের উদ্দেশ্যে। তিন বন্ধুতে মিলে নাশতার সময়টা বেশ ভালোই কাটে ওদের। সামি চলে যাবার পর হৃদি সময় নিয়ে নিজের ঘরটা গোছায়। ডাস্টার দিয়ে আসবাব পত্রের ধূলো ঝাড়ে, কার্পেট ভ্যাক্যুম করে, বিছানার চাদর পাট করে বিছায়। ঘর গোছগাছ করার সময় সে খুব উঁচু ভলিউমে গান ছেড়ে দেয় স্পীকারে। হালকা একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজও সেরে নেয় এই ফাঁকে। বেলা এগারোটার দিকে রোজ একবার দাদি শাশুড়ির ঘরে গিয়ে

উঁকি দেয়। গল্পটা খুব জমে যায় দুজনের মধ্যে। সারাদিনের মধ্যে দুপুরের সময়টাই তার যা একটু খারাপ কাটে। দুপুর বেলায় শাশুড়ির সাথে একত্রে বসে লাঞ্চ করতে হয়। ডিনারে সামি আর রুদ্র থাকে বলে খারাপ লাগে না। আর তিনদিন বাদে শ্বশুর মশাই আমেরিকা থেকে ফিরে আসছেন। ডিনারে প্রতিদিন তিনিও থাকবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু লাঞ্চের সময়টা নিয়েই হৃদির যত ভয়। একা একা শাশুড়ির সাথে কী কথা বলবে, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। নিজেকে খুব বোকা বোকা আর ভীতু বলে মনে হয় সে সময় তার। কোনো কোনো দিন শাশুড়ি তার সাথে একটি সাধারণ বাক্যও বিনিময় করেন না। দুজনে টেবিলের দুই প্রান্তে বসে চুপচাপ খাবার খেয়ে উঠে যায়। সত্য বলতে কি হৃদি এই মহিলার সাথে কথা বলার মতো কোনো বিষয় খুঁজে পায় না। শুধু শাড়ি, গয়না, গাড়ি, বাড়ি, টাকা, পয়সা ছাড়া এই মহিলার মাথায় আর কোনো টপিক নেই। মাঝে মাঝে সে শাশুড়ি এবং তার বোনদের কথপোকথন কান পেতে শুনে দেখেছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, কোন পার্টিতে কে কত দামি শাড়ি পড়ল, কোত্থেকে শাড়িটা কিনল, কার গয়নার ডিজাইন বেশি ভালো, কার বাড়ি কোন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ডেকোরেট করেছে, কোন ব্র্যান্ড বেশি ভালো, কে কোন দেশে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে, এইসব হাবিজাবি। এছাড়াও শ্বশুরবাড়ির বদনাম করতে এরা প্রত্যেকেই ওস্তাদ। হৃদির সামনেই রোমেলা একদিন অসুস্থ ফুপু শাশুড়িকে নিয়ে খুব বাজে মন্তব্য করে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগেনি তার। ওই বৃদ্ধা মহিলাকেই একমাত্র এ বাড়িতে একটু মানুষ বলে মনে হয়। অপর দিকে, রোমেলাকে মাঝে মাঝে তার পরিপূর্ণ মানুষ মনে হয় না। মনে হয় যেন মানুষ হবার ঠিক আগের ধাপে এসে ফেঁসে গেছে মহিলা। মানুষ আর হতে পারেনি। তবে একটা ব্যাপার হলো, মানুষ হিসেবে সে যেমনই হোক না কেন, মা হিসেবে ষোলো আনা সার্থক। সামির চোখে তার মায়ের জন্য যে অগাধ ভালোবাসা হৃদি দেখেছে, সেই ভালোবাসা এটা প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে মা হিসাবে রোমেলার কোনো ত্রুটি কখনো ছিল না। সামির মতে তার মা সেরার সেরা!

খালা শাশুড়ি বিদায় হবার পর, হৃদি ভেবেছিল নিজের শাশুড়িকে এবার হয়তো একটু নিজের মতো করে পাওয়া যাবে। কনভারসেশন শুরু করার উদ্দেশ্যে সে খেতে খেতে

শাশুড়িকে বলল, 'নিউজ দেখেছেন? বাংলাদেশে যে তলায় তলায় এত ক্যাসিনো আছে, তা কে জানত?'

শাশুড়ি বড়ই নিস্পৃহ চোখে তাকালেন তার দিকে। ভাবলেশহীন গলায় বললেন, 'তাই?'

– 'জি।'

ব্যাস এরপর আর কোনো কথা নেই। খানিক বাদে তিনি চোখ তুলে অলস গলায় বললেন, 'তোমার এই শাড়িটা কে দিয়েছিল?'

হৃদি নিজের পরনের শাড়িটার দিকে তাকালো। আড়ং এর জামদানি শাড়ি। বিয়েতে তো কত উপহারই পেয়েছে। কে কোনটা দিয়েছে অত মনে থাকে নাকি? সে মিনমিন করে বলল, 'ঠিক মনে নেই কে দিয়েছিল।'

রোমেলা ভাত চিবোতে চিবোতে নির্বিকারভাবে বললেন, 'বেশ দামি শাড়ি। আমার ভাই বোনদের মধ্যেই কেউ দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

ব্যস, তালটা কেটে গেলো। এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, হৃদির বাড়ির কারো এত দামি উপহার দেবার সামর্থ্য নেই। এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের পর কি এই মহিলার সাথে আর কথোপকথন চালিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে অবশিষ্ট থাকে?

তবে স্বস্তির খবর হলো শাশুড়ি হৃদির সাথে পা মাড়িয়ে ঝামেলা করতে আসেন না। দুজনে দুজনের মতো স্বাধীন সময় কাটায়। রোমেলা নিজস্ব সার্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রায় সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাব নইলে গুলশান ক্লাবে পার্টি থাকে। পার্টি না থাকলে তিনি চলে যান বোনদের বাসায়। কখনো আবার ক্লাবের বন্ধুদের সাথে আউটিং এ যান। শপিং এ যান। মাঝে মাঝে হৃদির ডাক পড়ে এসব আউটিং এ। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয় তাকে। ইদানিং এসব ঝামেলা এড়ানোর জন্য সে নিজস্ব প্ল্যান করে রাখে আগে থেকে। কোনো কোনো দিন চলে যায় বাবার বাড়ি। কখনো টি এস সি গিয়ে বসে থাকে। ভার্সিটির ছোট বড় ভাই বোনদের সাথে আড্ডা দেয়। বিকেলটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ততক্ষণে সামিরও ফিরে আসার সময় হয়।

সামি বাড়ি ফেরার সময়টায় হৃদি আজকাল একটু ফিটফাট হয়ে থাকে। এই অভ্যাস অবশ্য এমনি এমনি হয়নি। কদিন আগে বিকেল বেলা বাবার বাড়ি যাবার সময় একটু সেজেছিল হৃদি। তেমন কিছুই না, শাড়ির সাথে ম্যাচিং কানের দুল, হাতের চুড়ি, চোখে হালকা কাজল, টিপ আর সামির পছন্দের পারফিম মেখেছিল গায়ে। বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসে আর দোতলায় ওঠেনি। দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনের পোর্চের ওপর, সামির অপেক্ষায়।

তখন গোধূলি। অস্তগামী সূর্যের হলদেটে আলো এসে পড়েছে বাগানের ফুটন্ত গোলাপ, জিনিয়া আর সন্ধ্যামালতীর গায়ে। সারাদিনের খর উত্তাপের পর একটু একটু ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল শেষ চৈত্রের আকাশ। হৃদি পোর্চের মোটা সিমেন্টের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গায়ে বাসন্তী রঙের সিল্ক শাড়ি, খোলা চুল, ভ্রুযুগলের মাঝখানে একটি ছোট্ট কালো গোল টিপ। লালিমা ঘেরা আকাশটার দিকে উদাস নয়নে চেয়ে ছিল সে। ভাবছিল কিছু একটা আনমনে। কী ভাবছিল কে জানে!

সামি গাড়ি নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতেই দেখল এক অসম্ভব রূপবতী মেয়ে থামের গায়ে হেলান দিয়ে, আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ পানে চেয়ে। ঝাপটা বাতাসে মেয়েটির খোলা চুল উড়ছে, লুটাচ্ছে অবিন্যস্ত শাড়ির আঁচল। গোধূলিলগ্নর চাপা ফুলরঙা অপার্থিব এক আলো এসে পড়েছে মেয়েটির গালে আর কপালে। দেখামাত্র সামির বুকের ভেতরটা কেমন হুহু করা ভালোলাগায় মাতম করে উঠল। এমন সুন্দর দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় নাতো! এ যেন সত্য নয়, স্বপ্ন! মেয়েটি যেন তার স্বপ্নসুন্দরী। এ মেয়ের বাস ধূলোবালির পৃথিবীতে নয়। এর নিবাস স্বর্গে। জলঢাকা নদী পাড়ের ওই এক টুকরো পাহাড়ি গ্রামটায় আচমকা এক শীতের সন্ধ্যাবেলায় সে দৈবাৎ পেয়ে গিয়েছিল এই স্বর্গের পরিকে। হ্যাঁ স্বর্গ থেকে শুধু তার জন্যই মর্ত্যে নেমে এসেছিল পরিটা।

সামি গাড়ি থেকে দ্রুত পায়ে নেমে এসে ডুয়ার্সের সেই সন্ধের মতোই হৃদিকে কাছে টেনে নিল অতর্কিতে। তারপর কোনো কথা না বলে একটা গভীর চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। হৃদি একদম লালটাল হয়ে গিয়ে বলল, ‘এসব কী? কেউ দেখলে?’

– ‘দেখলে দেখুক না। আমার বৌকে আমি আদর করব না? আজিব!’ সামির দৃঢ় প্রত্যুত্তর।

সেই থেকে সামি বাড়ি ফেরার সময়টায় হৃদি একটু সাজগোজ করে থাকে। সে বোঝে সামি এই সাজগোজটা পছন্দ করে। উপভোগ করে। জীবনের এসব ছোটখাটো ভালো লাগার দাম আছে। হৃদি চায় তার ইচ্ছে জীবনে এসব ছোটখাটো ভালো লাগাকে গুরুত্ব দিতে।

সামি সম্প্রতি নিচতলায় একটা থিয়েটার রুম করেছে। যে হলঘরটায় বিভার বিয়ের আগের দিন ওরা নেচেছিল, সেই ঘরটাকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রজেক্টর স্ক্রিন

বসিয়ে থিয়েটার করা হয়েছে। আজ রাতে বন্ধুদের সবার একসাথে সেই থিয়েটারে সিনেমা দেখার কথা। সন্ধ্যার পর পর আকাশ আর অমৃতা চলে আসলো। সঙ্গে নিয়ে আসলো পিৎজা, চিপস, কোক এবং আরো কিছু হাবিজাবি স্ন্যাক্স। থিয়েটার রুমে তিন চারটা একশ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। বন্ধুরা প্রজেক্টরের কয়েক হাত দূরে সাজিয়ে রাখা লাল ফোমের গদি আঁটা সোফার ওপর বসেছে। সেন্টার টেবিল বোঝাই হয়ে আছে খাবার দাবারে। সিনেমা শুরু হলে ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হবে। ওরা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ঠিক কোন মুভিটা আজ দেখবে। কোনটা দেখা যায় তার ওপর আলোচনা চলছে। সামি অফিস থেকে ফিরে এসে গোসল সেরে একটা ঘরোয়া টি শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরেছিল। হঠাৎ করেই ওর হাঁটুর ওপর অমৃতার নজর পড়ে গেলো। বৈদ্যুতিক আলোর নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডান হাঁটুতে একটা চওড়া কাটা দাগ। ফর্সা চামড়ার ওপর অনেকটা কালশিটের মতো দেখাচ্ছে পুরোনো ক্ষতটা। অমৃতা কোকের ক্যান

খুলে চুমুক দিল। বলল, ‘এই সামি, তোর হাঁটুর দাগটা কীসের রে? নিউইয়র্কে সাইকেল চালাইতে গিয়ে নাকি একবার পড়ে গেছিলি? সেই দাগ?’

সামি পিৎজায় কামড় বসাতে বসাতে সাম্প্রতিক সময়ে হলিউডে মুক্তি পাওয়া একটি মুভি নিয়ে খুব গুরুতর আলাপ করছিল বন্ধুদের সাথে। অমৃতার প্রশ্ন শুনে সে পাশ কাটানো গলায় ছোট করে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ।’ তবে উত্তরটা দেওয়ার পর মুহূর্তেই একটু কেমন বিভ্রান্ত দেখালো তাকে। ভ্রু কুঁচকে বলল, ‘তুই ক্যামনে জানলি?’

অমৃতা ভড়কে গেলো। কয়েক সেকেন্ড বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চেয়ে রইল সে সামির দিকে। তারপর খকখক করে কেশে নিয়ে নিজের মধ্যে সপ্রতিভ একটা ভাব আনার চেষ্টা করে বলল, ‘ক্যামনে জানব আবার। তুই বলছিস!’

সামি একটা ভ্রু উঁচিয়ে বলল, ‘আমি বলছি?’

– ‘হুম তুই বলছিস।’

বাকি বন্ধুরা অমৃতার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময় নিয়ে। সবার মধ্যে একটা হতভম্ব ভাব। অমৃতা বুঝতে পারছে বড়সড় ভুল হয়ে গেছে তার। কারণ সামি অনেক আগে একবার দুষ্টুমি করে বলেছিল ছোট বেলায় নাকি বাবার সাথে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে বাঘের সাথে লড়েছিল সে একবার। সেই লড়াইয়ের সময় বাঘ তার হাঁটুতে থাবা দিয়েছিল। হাঁটুর এ দাগটা হলো সেই বাঘের থাবার প্রমাণ। দুষ্টুমি করে বলেছিল সেটা বন্ধুরা সবাই জানত। কিন্তু দুষ্টুমি করতে গিয়ে দাগের পেছনের আসল ঘটনাটা আর কখনোই বন্ধুদের বলা হয়ে ওঠেনি সামির।

– ‘আমি তো কখনো বলি নাই তোদেরকে। তুই কোত্থেকে শুনলি?’

অমৃতা চোখ সরিয়ে নিল। প্রশ্নটা ধারালো ফলার মতো গিয়ে বিঁধেছে তার বুকে। হাতে পায়ে একটা অসাড় ভাব টের পাচ্ছে সে। বুক কাঁপছে। কতদিন লুকোবে নিজেকে? এত কাছের বন্ধুর কাছ থেকে এমন লুকিয়ে থাকা যায় নাকি? ধরা যে একদিন পড়তেই হবে! কেমন হবে যদি সামি নিজ থেকে কিছু ধরে ফেলার আগেই অমৃতা ওকে সবটা খুলে বলে? কেমন হবে যদি অমৃতা এখন স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দেয় যে, সামি আমি ঘটনাটা শুনেছি তোর বাবার কাছ থেকে। তিনি আমাকে ইমেইলে লিখেছেন। তোর বাবার সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়। আর দোস্ত শোন, আমি তোর বাবাকে খুব ভালোবাসি!

কথাটা শোনার পর সামির প্রতিক্রিয়া কী হবে? খুব রেগে যাবে কি? কষ্ট পাবে? অমৃতাকে ঘেন্না করবে? বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে? ভাবতে ভাবতে চোখে কেমন অন্ধকার নেমে আসছে। বুকের মধ্যে ছুটছে বিরতিহীন ট্রেন।

হঠাৎ আকাশ বলে উঠল, 'আরে তুই-ই বলছিস। ভুইলা গেছিস শালা।' আকাশের কথাটা শুনে সামি একটু চমক লাগা গলায় বলল, 'আসলেই? আমি বলছি তোদের? কবে?'

এবার একই সাথে হৃদি আর রুদ্র কথা বলে উঠল, 'বলছিস, তুইই বলছিস।'

– 'কবে বলছি?' সামির গলায় অবিশ্বাস।

– 'এইতো কয়েকমাস আগে।' হৃদি বলল।

রুদ্র প্রসঙ্গ পরিবর্তনের নিমিত্তে তাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'আরে ভাই কী সিনেমা দেখবি তোরা, চালাস না ক্যান? আমার তো ঘুম পাইতেছে।'

অমৃতা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বন্ধুরা তাকে বাঁচিয়ে দিল, এ যাত্রায়ও।

৭৬

অমৃতা,

গত কয়েকদিন আইএমএফ সম্মেলন নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেলো। আশা করি ভালো আছ। আজকেও ঝুল বারান্দায় বসে লিখছি তোমাকে। মাথার ওপর ভর দুপুরের ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর। তবে একটা ঠান্ডা বাতাস আছে বলে অতটা গরম অনুভূত হচ্ছে না। তুমি বলেছিলে হাইকোর্টের সনদ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নেবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

তোমার মামাতো ভাইয়ের ঘটনাটি সত্যিই বড় দুঃখজনক। যে কোনো পিতা মাতার জন্যেই এমন কষ্ট সহ্য করা দুষ্কর। কিন্তু আমার মনে হয়, ছেলেমেয়েদের এ ধরনের মনোভাব তৈরির পেছনে পরিবারের একটি বড় ভূমিকা থাকে। বাল্যকাল থেকেই যদি দেশপ্রেম এবং দেশীয় সংস্কৃতি বাচ্চাদের মগজে এবং মননে নানা কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছু বড় হবার পর কোনোভাবেই তারা নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলার সাহস করবে না। আমরা বাবা মায়েরাই সন্তানদের আজকাল বড় বেশি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুখী করে তুলছি। বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা না হলে ক্যারিয়ার নেই, এমন একটি মানসিকতা আধুনিক বাবা মায়েদের মধ্যে খুব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা ভিটে মাটি বিক্রি করে, নিঃস্ব হয়ে সন্তানদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যে সন্তান বাল্যকালে পিতামাতার চোখে কখনো দেশপ্রেম দেখেনি, দেশের জন্য কর্তব্যবোধ দেখেনি, সে সন্তানের জন্য নিজ সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে পারাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। তোমার মামা-মামীকে আমি দায়ী করছি না তাদের সন্তানের পরিণতির জন্য। অনেক সময় চেষ্টা করার পরেও ভাগ্য সহায় হয় না আমাদের।

বর্তমানে অনেক বাবা মা, সন্তানদের ইংরেজি চর্চার ওপর এত বেশি জোর দিয়ে থাকেন যে, তাদের ইংরেজি মাধ্যম পড়ুয়া সন্তানেরা বাংলায় এক লাইন লিখতে বা পড়তে তো পারেই না, উপরন্তু এই অপারগতার কথা সদর্পে বলে বেড়ায়। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় ইংরেজি জানাটা নয়, বরং বাংলা বলতে বা লিখতে না

জানাটাই দিনকে দিক নতুন প্রজন্মের স্মার্টনেসের নিক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা মায়েরা সন্তানদের মাতৃভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এই মনে করে যে, তাদের ইংরেজি জানা সন্তান উন্নত বিশ্বের জন্য বুঝি ফিট হয়েই গেলো এবারে। এসব বাবা মায়েরা নিজেদের আধুনিক হিসেবে দাবি করে। কিন্তু আমার কাছে এমন বিবেকবর্জিত আধুনিকতার কোনো মূল্য নেই। হ্যাঁ এ বিষয়ে আমি শতভাগ একমত যে, ইংরেজি জানাটা আজকের যুগে বাঞ্ছনীয়। ইংরেজি তোমাকে জানতেই হবে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে সেই জানাটা যেন কোনোভাবেই নিজস্ব ভাষার ওপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি। দুটি ভাষার কোনোটিতেই এদের যথাযথ জ্ঞান নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন এরা সাদা কালো পোশাক পরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে ঠিকই, কিন্তু এদের হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণও একুশের চেতনা নেই। নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা একটি জাতিকে অনেক দূর অবধি নিয়ে যেতে পারে। চায়নায় তো ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয় না। এমন কি দেশটিতে ফেসবুক, নেটফ্লিক্স, গুগল এসব কিছুই নেই। আছে ওদের নিজস্ব ভাষায় নিজেদের তৈরি করা বিকল্প মাধ্যম। তবুও দেশটি কিন্তু কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই, বরং আধুনিক পৃথিবীর সেরা দশ শক্তিশালী রাষ্ট্রের একটি বলা হয় চায়নাকে। অনেক ভাষা জানতে পারাটা নিশ্চয়ই খুব ভালো একটি গুণ। কিন্তু সেই অনেক ভাষার ভিড়ে যারা মাতৃভাষাকে হারিয়ে ফেলে তাদের মতো দুর্ভাগা বোধহয় পৃথিবীতে আর হয় না।

তোমার মেয়ের নাম তুমি নির্দ্বিধায় 'রিমঝিম' রাখতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ে না করার এবং সিঙ্গেল মাদার হিসেবে সন্তান বড় করতে চাওয়ার সিদ্ধান্তটি আমার ঠিক যৌক্তিক বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে এই সিদ্ধান্ত তোমার নারীবাদী চিন্তাধারার একটি বাহুল্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষের জীবনে বাবা এবং মা উভয়েরই সমান ভূমিকা আছে। বাবা মা জীবনের দুটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি বলতে পারো। এদের একটি দুর্বল হলেই মূল কাঠামোতে ধ্বস নামার সম্ভাবনা আছে। আমি জানি তুমি সাহসী এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সব সময় সাহসিকতা বা স্বাধীনতার স্ফুটন কেন প্রথা ভাঙার মাধ্যমেই হতে হবে? মনে রেখো, নিয়ম ভাঙাটা

খুব কঠিন কাজ নয়, বরং নিয়মের মধ্যে থেকে সৎ, সাহসী এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারাটাই কঠিন এবং একই সাথে সম্মানের। তুমি যদি তোমার জীবনসঙ্গীর সাথে সন্তান লালন পালনের দায়িত্বটা ভাগ করে নাও, তাহলে বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি সহজ এবং সুন্দর হয়ে উঠবে এবং এতে করে তোমার স্বাধীনতা কোনো অংশেই খর্ব হবে না। তোমার বন্ধুদের মধ্যে থেকেও কিন্তু তুমি যে কোনো একজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে পারো। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সিঙ্গেল মাদারদের জন্য খুব একটা অনুকূল নয়। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানকে প্রতি পদে পদে প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে দেবে। আর এই প্রতিকূলতা তোমার সন্তানের মানসিক বিস্তারে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আশা করি আমার কথাগুলো বুঝবে, এবং ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করবে।

তুমি জানতে চেয়েছ তোমাকে আমার কেমন লাগে। তুমি যেমন মনের কথা লুকোতে ভালোবাসো না, ঠিক তেমনি আমিও মিথ্যে বলতে ভালোবাসি না। কিন্তু আমার এই বহুল অভিজ্ঞতাময় জীবনে নানা সময়ে, নানা কারণে, সত্যকে সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে হয়েছে। আজকেও আমি সত্যটা এড়িয়ে গেলাম, কেমন? আর সব সময় সব কথা মুখ ফুটে বলতে বা লিখতে হয় না। কিছু কথা না বলাতেই সুন্দর।

তোমার সাথে প্রথম দেখার দিনটি আমার স্পষ্টভাবে মনে নেই। তবে মনে আছে এক বিকেলে কী একটা দরকারে যেন সামির কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার আসার খবরটা সামির জানা ছিল না। কলেজে পৌঁছে দেখি ছেলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। পাশে একটি হ্যাংলা পাতলা বয়কাট চুলের মেয়ে। রাগটা গিয়ে তোমার ওপরেই পড়ল। বাড়ি ফিরে আচ্ছা মতন শাসালাম ছেলেকে। তোমাকে সেদিন আমার খুবই ডেসপারেট এবং উদ্ধত বলে মনে হয়েছিল। পরবর্তী বেশ কয়েক বছর যাবৎ তোমার প্রতি আমার এই ধারণা বহাল ছিল। সে সময় আমি মনে প্রাণে চাইতাম সামি যেন তোমাদের সঙ্গ অতি দ্রুত

ত্যাগ করে। তবে এখন আমি জানি সামির জীবনে তার বন্ধুরা একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। এটাও জানি যে বন্ধুদের ছাড়া সে বাঁচার মতো করে বাঁচতে পারবে না।

আমার জার্মান পেনফ্রেন্ডটি অবশ্যই নারী ছিল। কিন্তু তার সাথে আমার কোনো মানসিক সখ্য গড়ে ওঠেনি। আজ আর লিখছি না। বিকেল তিনটায় এখানকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ পার্টির মত বিনিময় সভা আছে। যেতে হবে।

পুনশ্চ : অমৃতা, সামির দেওয়া লিস্ট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে আজ সকালে আরো একবার গিয়েছিলাম শপিংমলে। চেরি ফুল রঙের জামা পরা পুতুলটাকে আজকেও দেখলাম। দেখতেই আর একজন পুতুলের কথা মনে পড়ল। জামাটা কি আমি সেই পুতুলের জন্য উপহার হিসেবে কিনে আনতে পারি? অনুমতির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি, রাশেদ।

৭৭

প্রিয় রাশেদ,

হাইকোর্টের প্রিলিমিনারি এক্সামে পাশ করে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ। এম সি কিউর রেজাল্ট দিনে দিনেই দিয়ে দেয় ওরা। আপনি বলেছেন আমাদের দেশের বাবা মায়েরা আজকাল ছেলেমেয়েদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুখি করে তুলছে। উইদ ডিউ রেসপেক্ট আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে, আমি এতে দোষের কিছু দেখি না। ইংরেজিটা ভালো মতো জানা থাকলে আজকাল কোথাও ঠেকতে হয় না। যেসব বাবা মায়েরা

সন্তানদের বাংলা না জানা দেখে মনে মনে আপ্লুত হয়, তারা ঠেকে শিখেছে যে, বাংলায় যথার্থ জ্ঞান থাকা না থাকাটা আসলে পেশাগত জীবনে তেমন একটা প্রভাব ফেলে না। এরা প্রত্যেকেই পরিস্থিতির শিকার। একটু খুলে বলতে গেলে বলতে হয় যে কুশিক্ষার শিকার। দেশীয় সংস্কৃতি বা ভাষা যে ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার পাকাপোক্ত করতে না পারলেও মানসিকতা কিংবা রুচিবোধের উৎকর্ষ সাধন করে, এই বাস্তবতাটা অধিকাংশ সাধারণ বাঙালি পরিবারই হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ।

তবে একটা কথা কী, ইংরেজি বলা নিয়ে আমার অতটা আপত্তি নেই, কারণ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। আপনার সাথে আমি একমত, যে আজকের যুগে ইংরেজি জানতেই হবে। আমার আপত্তি বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের গড়গড়িয়ে হিন্দি বলা নিয়ে। বাংলার সাথে ইংরেজি মিশিয়ে কথা বললে আমার মোটেও খারাপ লাগে না। খারাপ লাগে হিন্দি মিশালে। বছর দুয়েক আগে আমাদের মুটকোর্ট ওয়ার্কশপে নেপালের কাঠমুন্ডু ল স্কুল থেকে একটা দল এসেছিল। আমাদের দলের কতিপয় ছেলেমেয়ে লাফ দিয়ে উঠে তাদের সাথে হিন্দিতে কথা বলা শুরু করে দিল। (নেপালিরা হিন্দি খুব ভালো পারে, আপনি বোধহয় জানেন) ব্যাপারটা কী যে বিশ্রী লাগল আমার কাছে বলার মতো না। মজার বিষয় কী জানেন? যারা দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টা হিন্দি গান শোনে, হিন্দি সিরিয়াল দেখে এবং হিন্দিতে কথা বলে, তারাই আবার ভারতীয়দের গালাগাল দিতে পিছপা হয় না। এরা একমুখে বলে ভারত খারাপ, মোদী খারাপ। শেখ হাসিনা হিন্দুদের দালাল। আবার সেই একই মুখে সারাদিন হিন্দি গান গায়। চরম হিপোক্রেসি!

আপনার সাথে প্রথম দেখা হবার দিনটির কথা আমার মনে আছে। যেদিন আপনি আমাকে আর সামিকে স্মোকিং করতে দেখে ফেলেছিলেন সেদিন আমি আপনাকে নোটিস করিনি। পরে সামির কাছ থেকে শুনেছিলাম যে সে তার বাবার কাছে ধরা খেয়েছে। আপনাকে নোটিস করেছিলাম তারও এক বছর পর। সেদিন আমাদের এইচ এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছিল। সামি গোল্ডেন এ প্লাস পায়নি বলে

আপনি আর আপনার মিসেস খুব মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সবারই গোল্ডেন এ প্লাস ছিল শুধু সামি আর বিভা ছাড়া। বিভার আব্বা আম্মা অবশ্য গোল্ডেন এ প্লাস না আসায় তেমন একটা মন খারাপ করেননি। বিভাও ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু আপনাদের দুজনের হা হুতাশ দেখে সামি বেশ ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছিল। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি আর বিভা সন্ধ্যার দিকে আপনাদের বাড়িতে গেলাম। অন্য বন্ধুরা সবাই নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সবার বাড়িতে পরীক্ষা পাশের সেলিব্রেশন চলছে। সামিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে আমরা যখন বিদায় নেব ঠিক সেসময় সিঁড়ির গোড়ায় আপনার সাথে দেখা। সেইদিনই আপনাকে আমি প্রথমবার খুব কাছ থেকে দেখলাম। কলেজের ছেলেমেয়েদের মুখে শুনেছিলাম আপনাকে দেখতে নাকি সামির বাবা কম বড়ভাই বেশি মনে হয়। সেদিন নিজের চোখে দেখে সেই বিবৃতির সত্যতার প্রমাণ পেলাম। কিন্তু আপনি আমাদের দেখেও যেন ঠিক দেখলেন না। চোখে চোখ পড়ল, দৃষ্টি বিনিময় হলো ঠিকই, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে কী ভীষণ নিরাসক্তি! কী ভীষণ অবহেলা! সেদিন থেকেই আমি আপনাকে অহংকারী বলে জেনেছিলাম। কে জানত! সেই অহংকারী মানুষটাকেই আমি একদিন··· থাক, আপনিই তো বলেছেন। কিছু কথা না বলাতেই সুন্দর!

সিঙ্গেল মাদারদের প্রতি আমাদের সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা আমার অজানা নয়। এ কথাও শতভাগ সত্য যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানকে প্রতি পদে পদে প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে দেবে। তবে একটি বিষয়ে আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করব। আপনি বলেছেন সিঙ্গেল মাদার হবার বাসনাটি আমার নারীবাদী চিন্তাধারার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আপনার ধারণাটি ভুল। নারীবাদী নারীদের ভেতরেও কিন্তু নারীত্ব কোনো অংশেই কম থাকে না। অন্য সব সাধারণ মেয়েদের মতো আমরাও চাই একটি সাধারণ, ছিমছাম, পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু যাকে আমি ভালোবাসি না, যাকে আমার ভালো লাগে না তার সাথে শুধু সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থে এক ছাদের নিচে বসবাস করা আমার কাছে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। লোক দেখানোর নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। যাকে আমি ভালোবাসি শুধু তার সাথেই আমি

আমার পারিবারিক জীবন, সংসার এবং সন্তান ভাগ করে নিতে রাজি আছি। অন্য কারো সাথে নয়।

আপনি বলেছেন বন্ধুদের মধ্যে কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে। এই কথার যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে হয়তো আপনি বলবেন আমার বন্ধুরাই আমাকে সবচেয়ে ভালো বুঝবে, একজন বন্ধুর মধ্যেই একজন যোগ্য স্বামী হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। আমার প্রশ্ন হলো, বন্ধুকে জোর করে হাজবেন্ড কেন বানিয়ে দিতে হবে? বন্ধু বন্ধুই থাক না! মানুষের জীবনে বন্ধুদের আলাদা জায়গা থাকে। প্রত্যেক হাজবেন্ড কিংবা ওয়াইফকেই কেন বেটারহাফ হওয়ার পাশাপাশি বন্ধুর ভূমিকা পালন করতে হবে? হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি পরস্পরের বন্ধুই হয়ে গেলো তবে জীবনে অন্যান্য বন্ধুদের আর প্রয়োজন কী? বন্ধুদের সাথে আমি স্ল্যাং বলব। উড়াধুরা কাজ কারবার করব, পাগলামো করব, আর অন্যদিকে যিনি আমার স্বামী বা অর্ধাঙ্গ তার সাথে থাকবে আমার প্রেমময় সাংসারিক গভীরতার এক পবিত্র সম্পর্ক। ধরুন বিয়ের পর একজন মেয়ে তার হাজবেন্ডের সাথে ফাইন ডাইনিং ওয়ালা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খেতে পছন্দ করে। এবং বন্ধুদের সাথে পছন্দ করে রাস্তার ধারের ফুচকা। হাজবেন্ডের সাথে ফুচকা খেতে আসলে তার মনে হয় যেন ফুচকাটা ঠিক জমছে না। আবার একইভাবে বন্ধুদের সাথে দামি রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে গেলেও মনে হয় কিছু একটা মিসিং। হ্যাঁ, ব্যাপারটা অনেকটা 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' র মতো অর্থাৎ যার যেখানে জায়গা তাকে সেখানেই অবস্থান করতে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ। আপনার দ্বিমত থাকতেই পারে। আমাদের সামি হৃদি বন্ধুর মধ্যেই জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আমি হলফ করে বলে দিতে পারি ওদের বন্ধুত্ব এখন আর আগের মতো নেই। বন্ধুত্বকে ছাপিয়ে গেছে দাম্পত্য সম্পর্ক, প্রেম এবং সাংসারিক দায়বদ্ধতা। আমি আমার বন্ধুত্বকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দিতে রাজি নই।

আমি সেই মানুষটাকেই আমার জীবনে স্বামীর স্থানটি দিতে পারব যে কিনা আমার চাইতে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় অনেক বড়। যাকে দেখলে আমার সম্মান করতে ইচ্ছে করে। নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্পণ করতে ইচ্ছে করে।

আপনার কাছ থেকে পাওয়া যে কোনো উপহার সেই পুতুলটা মাথায় করে রাখবে। অনুমতি নেবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই দেখছি না আমি। এই মুহূর্তে আপনারই বাড়িতে অবস্থান করছি। আজ আমাদের রাত জেগে সিনেমা দেখার কথা। আমি গেস্টরুমে বসে আপনাকে লিখছি। কেউ একজন দরজা নাড়ছে। এবার তবে যাই।

রাশেদ, আপনি এত সুন্দর করে চিঠি লেখেন কী করে? আপনার চিঠির নেশা ধরে যাচ্ছে আমার। এই চিঠিগুলো আমার জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার। সুযোগ পেলেই লিখবেন, কেমন? ভালো থাকবেন।

বি:দ্র: একজনকে ছাড়া কোনো কিছু আর ভালো লাগে না আমার সেই জনকে এক নজর দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কবে দেখা হবে?

ইতি,

আপনার অমৃতা

৭৮

এ বছর বর্ষা বুঝি একটু আগেই চলে এলো। কদিন ধরে রোজ বিকেলের দিকে আকাশ থমথমে কালো হয়ে ওঠে। সন্ধে থেকে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। তারপর

সারারাত ধরে ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ঝরতে থাকে বৃষ্টিটা। রাস্তাঘাটে পানি জমে একাকার অবস্থা। আজকেও সন্ধের মুখে ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল। আকাশ রিকশা থেকে নামতে নামতে দেখল গেটের সামনে মনীষা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসলো সে। উতলা বাতাসে মনীষার শাড়ির আঁচল পতাকার মতো উড়ছে। উড়ছে কপালের কাছের কয়েক গাছি চুল। রাস্তার ফ্লুরোসেন্ট আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে ওর মনোরম মুখটা। গত কয়েকদিন মনীষার সাথে তার দেখা হয়নি। আজকে দেখতে পেয়ে চট করে সেদিন রুদ্রর বলা কথাটা মনে পড়ল। রুদ্র হঠাৎ ওই কথাটা কেন বলল? এ কথা সত্য মনীষাকে তার খারাপ লাগে না। খারাপ লাগার মতো মেয়ে তো মনীষা না। কিন্তু··· ধ্যাৎ ভালো লাগলেই কি ভালোবাসা যায়? রুদ্রটা একটা গাধা!

– ‘কোথায় যাচ্ছেন?’ কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করল আকাশ।

মনীষা আকাশের ছেড়ে দেওয়া রিকশাটা এক পলক দেখে নিয়ে বলল, ‘থামাও তো এই রিকশাওয়ালাকে।’

আকাশ হাত বাড়িয়ে ডাকল, ‘এই খালি, দাঁড়াও।’

মনীষা জরুরিভাবে বলল, ‘শোনো রাইয়ানের বাবার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।’

– ‘কেন? হঠাৎ?’

– ‘খুব বিরক্ত করছে লোকটা। বলেছে দেখা না করলে আমার অফিসে গিয়ে ঝামেলা লাগাবে।’

কথাটা শেষ করে মনীষা আর দাঁড়াল না। তড়িঘড়ি করে রিকশায় উঠে বসে রিকশাওয়ালাকে বলল, ‘মামা চল, শ্যামলী যাব। ভাড়া যা হয় দেবো। হুড তুলে দাও।’

বৃষ্টির রেলগাড়িটা ইতোমধ্যে ছুটে গেছে। আকাশ রিকশার কাছে এসে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে নিয়ে মনীষাকে প্রশ্ন করল, ‘আপনি একা যেতে পারবেন? কোনো সমস্যা হবে না তো?’

– ‘একাই তো যেতে হবেরে ভাই। আমার আর আছে কে?’

মনীষার চোখে মুখে লেপ্টে থাকা আতঙ্কের ছাপটা এতক্ষণে টের পেল আকাশ। একটু কেমন মায়া হলো।

– ‘আপনি চাইলে আমি আসতে পারি আপনার সাথে।’

– ‘না থাক। তুমি এসে আর কী করবে? বজ্জাত লোকটাকে যদি নিজের হাতে খুন করতে পারতাম তবেই আমার শান্তি হতো। এখন যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

রিকশাওয়ালা প্যাডেল ঘোরালো। টুংটাং শব্দ করে বেরিয়ে গেলো রিকশাটা গলি থেকে। আকাশ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে তিন চাকার বাহনটার চলে যাওয়া

দেখল। বৃষ্টির তোড় বাড়তেই ঢুকে গেলো সিঁড়িঘরে। লোকটা চায় কী মনীষার কাছে? টাকা? নাকি ছেলের কাস্টডি চায়? ভাবতে ভাবতে তার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। দরজা খুলল তারা। খোলা মাত্রই উদ্বেগ নিয়ে বলল, ‘ভাইয়া, খালার শরীরটা ভালো না।’

– ‘কেন কী হয়েছে?’

– ‘খুব পেট ব্যথা। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।’

আকাশ হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল। ঝুমকির ঘরের বাতি নেভানো আকাশ ঘরে ঢুকেই বাতিটা জ্বলালো প্রথমে। ঝুমকি শুয়ে আছে বিছানায় পাশ ফিরে। বুজে থাকা চোখের কোল ভেজা। ঠোঁটজোড়া শুকনো। রক্তশূন্য মুখ। আকাশ এগিয়ে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালো, ‘কেমন লাগছে আপনার?’

ঝুমকি ফ্যাকাশে চোখে তাকালো আকাশের দিকে, ‘আমি ঠিক আছি।’

– ‘তারা বলল আপনার শরীর নাকি খারাপ?’

– ‘পেটে একটু ব্যথা হচ্ছে। গ্যাস্ট্রিকের মনে হয়। ঠিক হয়ে যাবে। এন্টাসিড খেয়ে নিয়েছি।’

আকাশ ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ঝুমকির মুখটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করল। বলল, ‘বেশ কদিন ধরেইতো দেখছি আপনার শরীর ভালো না। চলেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।’

ঝুমকি নিরীহ গলায় বলল –’নারে বাবা। তোমার চিন্তা করতে হবে না। এসব টুকটাক অসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। এমনিই ঠিক হয়ে যাবে।’

– ‘ব্যথাটা কোথায় হচ্ছে?’

– ‘তুমি যাও তো বাবা। হাত মুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া করো। আমার কথা ভাবতে হবে না।’

আকাশ চিন্তিত মুখে খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল ঝুমকির বিছানার পাশে। ঝুমকির সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা সহজ নয়। দীর্ঘকাল ধরে সে এই মহিলাকে নিজের শত্রুপক্ষ ভেবে এসেছে। যেচে পড়ে কখনো কোনো কথা বলেনি এর সাথে। উপরন্তু ইনি নিজ থেকে কথা বলতে আসলে দূর দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল সে একটু একটু বোঝে যে তার কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষের শত্রু হবার মতো কোনো যোগ্যতাই এই মানুষটির নেই। শত্রুপক্ষ শক্ত সমর্থ হয়। আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং ক্ষতিকারক হয়। এই রমণীটি নিতান্তই অসহায়। এতকাল পরে এসে আকাশ বুঝতে পারে যে পরিস্থিতির চাপে না পড়লে এই রমণী কখনোই তার বাবার মতো একজন নামানুষ, বর্বরপ্রায় লোককে বিয়ে করে নিজের জীবনের সর্বনাশ করত না।

আকাশ ভাঁজযুক্ত কপাল নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসলো। বেরোনোর আগে বাতি নিভিয়ে দিল ঘরের। ডাইনিং এ পা রাখতেই তারা বলল, ‘যাচ্ছে না ডাক্তারের কাছে?’

– ‘উনি তো বললেন গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা।’

তারা একটু রাগ নিয়ে বলল, ‘খালাম্মা এইগুলা কী শুরু করছে বুঝলাম না। মরে যেতে চায় নাকি?’

আকাশ তারার কথার কোনো প্রত্যুত্তর করল না। ড্রইংরুমে পিতৃদেব বসে আছেন সোফায়। টিভিতে ফুটবল খেলা চলছে। তিনি পা দোলাতে দোলাতে খেলা দেখছেন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আকাশ পিতৃদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘উনার কী হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি?’

কোটরে ঢোকা চক্ষুদুটোতে স্পষ্ট বিরক্তি ভেসে উঠল।

– ‘কার কী হয়েছে?’

আকাশের মুখটা তিক্ততায় বাঁকা হয়ে গেলো, প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে বলল, ‘আপনার বউয়ের!’

পিতৃদেব ঝেঁঝে উঠলেন এ কথা শুনে, ‘বেয়াদবি করছ কেন? বুঝে শুনে কথা বল!’

আকাশের মাথা গরম। ভেতরে ঘাঁপটি মেরে বসে থাকা ঘুমন্ত সাপটা ফণা তুলে জেগে ওঠার পায়তারা করছে, আজ বহু দিন পর। লোকটা পেয়েছে কী? বৌয়ের দায়িত্ব নিতে পারবে না তো বিয়ে করেছিল কেন?

– 'আপনি জানেন না, উনি যে অসুস্থ?'

লোকটা একটু আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ বলেছিল, ওই পেট ব্যথা না কী ছাই হয়েছে যেন।'

– 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান না কেন?'

– 'একটু পেট ব্যথার জন্য ডাক্তার? টাকা কি গাছে ধরে নাকি?'

– 'হঠাৎ করে যদি মরে যায়? তখন কী করবেন? অবশ্য আপনার কিছু আসবে যাবে না। বৌ মরে যাওয়ায় তো আপনার অভ্যাস আছে। ইনি মরে গেলে কয়েকদিনের মাথায় আরেকটা বিয়ে করে ফেলবেন। ব্যস ঝামেলা শেষ।'

লোকটার মুখ হা হয়ে গিয়েছিল আকাশের কথা শুনে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। ছেলে কখনোই তার সামনে এত স্পর্ধা দেখায়নি আগে। গত কয়েকমাস যাবৎ ছেলেই সংসারের সমস্ত খরচ দিচ্ছে বলতে গেলে। টাকা সবসময়ে কথা বলে। পুত্রর টাকাও তবে এখন কথা বলছে। এটাই জগতের নিয়ম।

আকাশ লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, যন্ত্ররুঢ়ের মতো হনহন করে হেঁটে সরে আসলো জায়গাটা থেকে। কথাগুলো বলতে পেরে ভালো লাগছে তার। অনেক দিন ধরে বুকের ওপর চেপে থাকা একটা ভারি পাথর যেন নেমে গেলো এই মাত্র। তার মায়ের হয়েছিল ব্রেইন টিউমার। আজ এতগুলো বছর পরে আকাশের হঠাৎ মনে হলো, মায়ের চিকিৎসায় বুঝি যথেষ্ট অবহেলা ছিল। আহা সঠিক চিকিৎসা পেলে মা হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচত!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন কালো মেঘের মতো এক থমথমে মন খারাপের দল ঘিরে ধরল তাকে চারপাশ থেকে। আগামীকাল সকালে খাগড়াছড়ি যেতে হবে। ইউনিভার্সিটির বাৎসরিক পিকনিক। তিনদিনের ট্যুর। এর মাঝে ঝুমকির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কী উপায় হবে? আকাশ তারাকে ডেকে ওর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা রাখো, তোমার খালার শরীর যদি বেশি খারাপ হয় তাহলে একবার উনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও। কেমন? আর আমি ফিরে এসে অবশ্যই উনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি চিন্তা করো না। তোমাকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর নম্বর। প্রয়োজনে ওই নম্বরে ফোন করবে কেমন?’

তারা একটু অপ্রতিভভাবে বলল, ‘কোন বন্ধু? ফ্রাইড টমটম?’

আকাশ এই মন খারাপের সময়েও হেসে ফেলল তারার কথা শুনে।

– ‘না ফ্রাইড টমটম আজ রাতে চট্টগ্রাম যাচ্ছে। তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই।’

তারা ঘর থেকে বেরোবার পর সে সামিকে ফোন করল। দুবার রিং পড়তেই ওপাশ থেকে কথা বলে উঠল সামি।

– ‘কীরে?’

– ‘শোন, কাল সকালে খাগড়াছড়ি যাচ্ছি। ভার্সিটি থেকে।’

– ‘তো আমি কী করমু? নাচুম?’

– ‘মনে চাইলে নাচ শালা! ফোন দিছি দরকারে।

– ‘ক, কী দরকার?’

– ‘আমার বাপের বউ আছে না, উনি একটু অসুস্থ। যদি কোনো দরকার হয় তাহলে উনারা ফোন দিবে তোরে। বুঝছস?’

– ‘ও এই কথা? তুই চিন্তা করিস না দোস্ত। আমি খেয়াল রাখব।’

– ‘হ্যাঁ, একটু দেখিস। আমার হয়তো নেটওয়ার্ক থাকবে না।’

– ‘আমাকে উনার নম্বর দে। ফোন করে খবর নিব।’

– ‘আচ্ছা, নম্বর টেক্সট করতেছি।’

৭৯

সামির মুখখানা আজ আনন্দে ঝলমল করছে। অনেকদিন পর তার পুরো পরিবার একত্রে বসে ডিনার করছে। অনেক দিন পর বললে ভুল হবে। আদতে প্রথমবারের মতো স্ত্রী এবং বাবা মা-সহ একই টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছে। বাবা এসে পৌঁছেছেন বিকেলে। প্রতিবারের মতো এবারেও বাবা পৌঁছনো মাত্রই সামি লিস্ট মোতাবেক শপিং করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিয়েছে প্রথমে। এসব ছেলেমানুষী তার ভেতর থেকে কখনো দূর হবে বলে মনে হয় না। এবার হৃদির জন্যেও অনেক উপহার এসেছে। নব দম্পতির বিকেলটা আজ কেটেছে আমেরিকা থেকে আগত নানা রকম উপহার সামগ্রী বরণ করে।

খাবার টেবিলে রুদ্রও আছে। রাত এগারোটার বাসে সে চট্টগ্রাম যাচ্ছে। তিন চারদিন থাকবে বাবা মায়ের সাথে। হৃদির একটু নার্ভাস লাগছিল। শ্বশুরমশাইয়ের সাথে গত এক মাস তার নিয়মিত ফোনালাপ হলেও সামনাসামনি কথোপকথন এই প্রথম। লোকটা আন্তরিক এ কথা সত্য, কিন্তু কেমন একটা রাশভারি ব্যাপার আছে ইনার মাঝে। চট করে সহজ হওয়া যায় না। শাশুড়ির ভাবসাব সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। শ্বশুর মশাইয়ের আগমন শাশুড়ির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। বরং অন্যান্য দিনের চাইতে তাকে আরো বেশি গোমড়ামুখো দেখাচ্ছে। এদের দুজনের ভেতরে কি কোনো কলহ বিবাদ চলছে নাকি? হঠাৎ করেই মনে হলো হৃদির কথাটা। তবে ভালো লাগছে সামিকে দেখে। পুরো একটা মাস পর বাবাকে পেয়ে সে খুশিতে একদম বাকবাকুম হয়ে গেছে। হৃদি শ্বশুরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর প্লেটে এটা সেটা তুলে দিচ্ছিল। হক সাহেব এক পর্যায়ে বাধা দিয়ে বললেন,

– 'তুমি বসো মা। তোমাকে এত কষ্ট করতে হবে না।'

হৃদি ভালো মতোই জানে তার এসব করার কোনো প্রয়োজন নেই। না করলে ইনারা কিছুই মনে করবেন না। তাছাড়া খাবার সার্ভ করার জন্য চাকরবাকর তো আছেই। তবুও প্রথম দিনটায় শ্বশুরকে এতটুকু সম্মান না করে পারল না সে। নিজের মাকে দেখেছে দাদাসাহেব বাড়ি আসলে মা কী ভীষণভাবে যত্নআত্তি করতেন। মায়ের কাছে থেকেই একটু একটু শিখেছে এসব ভদ্রতা। রোমেলা হৃদির এই আদিখ্যেতা দেখে বেশ বিরক্ত হলেন। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এই এক সমস্যা। মুখে অবলা অবলা একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে সেবা করার ছলে বাড়ির কর্তাব্যক্তিদের সিম্প্যাথি পেতে চায় এরা। টিপিক্যাল খ্যাৎ মেন্টালিটি যত্তসব!

– ‘তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ঘাড়ের ওপর? এসব করার জন্য কাজের লোক আছে তো!’

হৃদির মুখে মুহূর্তে একটা মেদুর রঙের ছায়া পড়ল। সামি একবার মায়ের দিকে তাকালো চমক লাগা চোখে। মায়ের কথার ধরনটা যেন একটু কেমন খটোমটো। এত শক্ত কথা বলার মতো কোনো ঘটনা তো ঘটেনি! অপ্রস্তুতভাবে সরে আসলো হৃদি জায়গাটা থেকে। মুখ কালো করে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো সামির পাশে।

হক সাহেব রাতে ইদানিং তেমন কিছুই খান না। দুখানা রুটি আর একটু সবজি হলেই তাঁর চলে যায়। তবে এতদিন বাড়ির বাইরের খাবার খেয়ে খেয়ে মুখে একদম অরুচি ধরে গিয়েছিল। আজকে তাই তিনি প্লেটে একটু তরকারিসহ ভাত তুলে নিয়েছেন। খেতে খেতে হৃদিকে প্রশ্ন করলেন, ‘তারপর, কেমন লাগছে তোমার সব?’

হৃদি হাসল, ‘এইতো বাবা, খুব ভালো।’

রোমেলা চোখ কপালে তুললেন। কী কাণ্ড! বাবা ডাকটাও রপ্ত করা হয়ে গেছে এর মধ্যেই? কই, আজ পর্যন্ত তাকে তো কেউ মা বলে সম্বোধন করল না। এদিকে যে বাবা বাবা ডেকে একেবারে মাথায় চড়ে বসবার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। এই লোকটাও বা এত আশকারা দিচ্ছে কেন মেয়েটাকে? বিরক্তিতে গা চিড়চিড় করে ওঠে তার। সত্য বলতে কী, তার স্বামী জীবনে যত উন্নতিই করুক না কেন, যত বড় মানুষই হোক না কেন, একটা ভীষণ রকমের গেঁয়োপনার বীজ এখনো রয়ে গেছে এর ভেতরে। ব্রটআপ ঢাকা শহরে হলে কী হবে? গ্রামের বাড়ির সাথে এর যোগাযোগ সর্বদাই অক্ষুণ্ণ ছিল। রোমেলার নিজের বাবা মা ছিলেন বিহারী। ঢাকায় ছিল তার পৈতৃক নিবাস। বাবা বড় চাকরি করতেন। ছোট বেলা থেকে বাড়ি ভর্তি কাজের লোক দেখে অভ্যস্থ তারা। নিজের মা এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেতেন না। সব ভাইবোনরা পড়তেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। জীবন যাত্রার ধরনে, চলাফেরায় দারুণ একটা আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল সর্বদা। অন্যদিকে তার স্বামী ছেলেবেলায় খুব একটা জাঁকজমক জীবনে অভ্যস্থ ছিলেন না। রোমেলার শ্বশুরমশাই পেশায় ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারি করে ঢাকা শহরে একটা বাড়ি করতে পেরেছিলেন কোনো রকমে। স্বচ্ছলতা ছিল কিন্তু প্রাচুর্য ছিল না। এ কারণেই তার স্বামীর ভেতরে কোথায় যেন একটা মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণতা রয়ে গেছে এখনো। ভাবতে ভাবতে বিরক্তিতে নাক কুঁচকে যায় রোমেলার। আজ যদি এই মেয়েটির পরিবর্তে তানিশা বাড়ির বৌ হয়ে আসত… আহারে তানিশা মেয়েটাকে বড়ই পছন্দ ছিল। তানিশার পরিবারের সাথেও খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গিয়েছিল তার। বিয়েটা হয়ে গেলে দুপরিবারে আনন্দের ধুম পড়ে যেত একেবারে। কত প্ল্যান করে রেখেছিলেন তিনি এবং তানিশার মা দুজনে মিলে! সব জলে গেলো। ভাগ্যে ধরল না! তার স্বামী গদগদ হয়ে ছেলের বৌয়ের সাথে গল্প করছেন। লোকটাকে কি আজকাল ঘেন্না হয় একটু একটু? বিশেষ করে সেই ঘটনাটা জানার পর থেকে? রোমেলার মতো সুন্দরী, স্মার্ট, বড় ঘরের মেয়ে সহধর্মিণী হিসেবে পাবার পরেও যে লোক পরনারীতে আসক্ত হয় সে লোককে ঘেন্না না করে কি উপায় আছে? রোমেলা কেন? জগতের প্রতিটা মানুষই এই জঘন্যতম অপরাধীকে ঘেন্না করবে। এতকাল মানুষটার সচ্চরিত্র স্বভাবটাকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। হ্যাঁ

মনের হদিশ কখনো পাননি ঠিকই কিন্তু এতটুকু জেনে অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন যে তার স্বামীর চরিত্রে কোনো দাগ নেই। কিন্তু শেষমেশ··· ছিঃ!

– 'তোমার বাবা মা কেমন আছেন?'

– 'ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ট্যুর কেমন ছিল বাবা?'

– 'ভালোই।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা ছেলের ব্যবসায়িক আলাপ বেশ জমে গেলো। সামি বাবার সাথে এর আগে কখনোই এত এত গুরুত্বপূর্ণ কথা একসাথে বলেনি, আজ যতটা বলল। রুদ্র চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। সামনে বসা ভদ্রলোকটিকে তার ইদানিং একেবারেই সহ্য হয় না। আগেও যে খুব একটা হতো তা না। তবে ইদানিং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বিরক্তির পরিমাণটা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে।

আচমকা ডোরবেল বাজল। যে চাকরটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল সে দৌড়ে ছুটে গেলো দরজা খুলতে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল এক আগন্তুক। আগন্তুককে সবার প্রথমে সামিই দেখল। গালভর্তি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো সে, 'আরে দোস্ত! তুই কোত্থেকে?'

হৃদি চমক লাগা চোখ মেলে চেয়ে দেখল অমৃতাকে। দেখামাত্র কী কারণে যেন তার চোখের তারায় অতর্কিতে এক টুকরো বিরক্তির ছায়া পড়ল। সামির মতো ঝলমলে

আনন্দে ভাসতে পারল না সে। অভ্যর্থনাও জানাতে পারল না। গুমোট চোখে চেয়ে রইল শুধু সদ্য আগত বান্ধবীর দিকে।

– ‘এইতো, রুদ্রকে দেখতে আসলাম। ও নাকি চিটাগাং যাচ্ছে আজকে রাতে?’ বলল অমৃতা। মুখে যা-ই বলুক না কেন রুদ্র আর হৃদিতা সহজেই অমৃতার এই অসময়ে সামির বাড়িতে আসার প্রকৃত কারণটা ধরতে পারল। বান্ধবীর আগমনে সামি ছাড়া অন্য কাউকেই খুব একটা প্রফুল্ল হতে দেখা গেলো না। রোমেলার মুখখানা আগের চাইতেও বেশি থমথমে হয়ে গেলো। হৃদি বিচলিত। রুদ্র ভাবলেশহীন।

– ‘বসে পড়। ভাত খা।’ সামি বলল, সহাস্যে।

অমৃতা রুদ্রর পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল, ‘নারে খাব না কিছু।’ পলক তুলে তাকালো একবার মানুষটার দিকে। অমৃতার ঠিক মুখোমুখি চেয়ারটাতেই তিনি বসা। গায়ে হালকা বাদামি রঙের ফতুয়া। মুখে কয়েকদিনের দাড়ি। গভীর চোখজোড়ায় কেমন যেন বিষণ্ণতা। মুখে অবিচল গাম্ভীর্য। এই গাম্ভীর্যটাই কি ব্যক্তিত্ব? নাকি চার্ম? কে জানে! ছেলের সাথে কথা বলতে বলতেই তিনি চোখ তুলে তাকালেন। মেয়েটিকে দেখেও না দেখার ভান করলেন প্রথমটায়। কিন্তু ভান আর কতক্ষণ ধরে থাকা যায়? একটা সময় চোখে চোখ পড়েই গেলো। অমৃতার পরনে সাদা রঙের ফুলহাতা শার্ট। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। বয়কাট চুল বাম দিকে সিঁথি করে আঁচড়ানো। মনে হচ্ছে মেয়েটার চুলের ধরনে একটু পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনটা তার সৌন্দর্য কমায়নি কোনো অংশেই। ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রুযুগলের নিচের চোখদুটি ক্লান্ত। আরক্ত মুখ। দৃষ্টির আলিঙ্গনে মুখে কোনো কথা না বলেই নিমেষে অনেক কথা বলে ফেলল দুই জোড়া চোখ। কেউ জানল না, কেউ দেখল না।

– ‘তুই কোর্ট থেকে আসলি?’ রুদ্র প্রশ্ন করল অমৃতাকে। অমৃতা কথাটা শুনতে পায়নি। তার চোখ সম্মুখে নিবদ্ধ। মুখে একটা চঞ্চল ভাব। শ্বাস প্রশ্বাস অস্বাভাবিক। রুদ্র অবাক চোখে একবার দেখল অমৃতাকে। এই অমৃতাকে যেন সে চেনে না।

– ‘এই, রুদ্র কী বলল শুনিস নাই?’ অমৃতার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে উঠল হৃদি।

– ‘হ্যাঁ? কী?’

– ‘কিছু না।’ রুদ্র বলল, ম্লান গলায়।

রোমেলা খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন খুব দ্রুত। এই বাড়িতে তার অপছন্দের মানুষদের উপস্থিতি দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। নিজের সংসারটাকে আজকাল পরের জায়গা বলে মনে হয়। তিনি উঠে যাবার খানিক পর রুদ্রও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। হক সাহেব ছেলে আর ছেলের বৌয়ের সাথে আরো খানিকটা সময় গল্প করলেন। ব্যবসা, আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত আলোচনা হলো। অমৃতা চুপচাপ শুনছিল। কোনো কথা না বলে লোকটার কথা শুনে যেতেই ভালো লাগছিল তার। হৃদি অমৃতার মুখের চকচকে ভাবটা লক্ষ্য করছিল অনেকক্ষণ ধরে। খাবার টেবিল থেকে সবাই একটু দূরে সরে যেতেই সে চাপা গলায় বলল, ‘অমৃতা, এদিকে আয় তোর সাথে আমার কথা আছে।’

– ‘কী কথা?’

– ‘আয় আমার সাথে।’

হৃদির পেছন পেছন ডাইনিং ছেড়ে বেরিয়ে আসলো অমৃতা। ড্রইংরুমে এসে দেয়ালে লাগানো বাতির সুইচ টিপল হৃদি। ঝলমল করে জ্বলে উঠল সিলিং এ ঝোলা ফুলের মতো বিশাল বড় ঝাড়বাতি। হৃদি ঘরের মাঝখানে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে ঝগড়াটে ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল,

– 'কেন আসছিস?' হৃদির খটোমটো প্রশ্নটা অমৃতাকে চমকে দিল।

- 'মানে কী?'

– 'মানে তুই এই অসময়ে কেন আসছিস এখানে?' কাটা কাটা গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করল হৃদি। অমৃতা বিস্ময় নিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল বান্ধবীর দিকে। তার মুখের চকচকে ভাবটায় হঠাৎ কোত্থেকে যেন উড়ে এসে ভর করল এক নিচ্ছিদ্র মলিনতা।

– 'কেন আসছি মানে? আমার বন্ধুর বাসায় আমি আসতে পারব না? আসার জন্যে কারণ লাগবে নাকি?'

হৃদির মুখটা বিরক্তিতে একদম কাদা কাদা হয়ে গেলো, 'অমৃতা শোন, আমি খুব ভালো মতো জানি তুই কেন আসছিস এখানে এই অসময়ে। তুই মোটেও রুদ্রর সাথে দেখা করতে আসিস নাই। তুই আসছিস আমার শ্বশুররে দেখতে।'

অমৃতা চোখ নামায় নিচে। অপ্রতিভভাবে বলে, 'হুম।'

– 'কীসের হুম? হুম মানে কী? তুই কেন এসব করতেছিস? তোর কি একটু ভয় হয় না? আর কাউরে ভয় না পাইলেও আল্লাহকে ভয় কর। অন্যের জীবন এভাবে বরবাদ করিস না।'

এ কথায় অমৃতার চোখজোড়া জ্বলে উঠল ধক করে।

– 'মানে কী? আমি কি কাউরে খুন করতেছি নাকি? ভালোবাসায় কোনো পাপ নাই। আর উনি যদি উনার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করে তাহলেও কোনো পাপ থাকবে না।'

হৃদি একদম আঁতকে উঠল কথাটা শুনে, 'হায় হায় শেষ পর্যন্ত তুই আমার শাশুড়ি হতে চাচ্ছিস? এসব কী বলতেছিস? ডিভোর্স দিবে কেন?'

– 'দিতেই পারে। ডিভোর্স হয় না মানুষের? নাকি যাদের ডিভোর্স হয় তারা সবাই খুব খারাপ মানুষ? হ্যাঁ? তোদের এইসব নিয়মকানুন আমি বুঝি না। একটা মানুষকে পছন্দ না হইলেও তার সাথে আজীবন এক ছাদের নিচে কাটায় দিতে হবে?'

হৃদি চোখ সরু করে সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'পছন্দ না হইলেও মানে? আমার শ্বশুর কি তোকে বলছেন যে উনার ওয়াইফকে উনি পছন্দ করেন না?'

– 'সব কিছু বলতে হয় না হৃদি। বোঝা যায়।'

– 'আর এই চান্সে তুই খুব এন্ট্রি মারলি অন্যের লাইফে? ছিঃ অমৃতা! ছিঃ

– 'এত ছিঃ ছিঃ করিস না। অন্যের লাইফে এন্ট্রি নেয়ার কিছু নাই। ওই লোকটার সাথে আমার মেন্টাল একটা ব্যাপার আছে। মনের সম্পর্ক। এগুলোর উপর মানুষের হাত নাই।'

হৃদি অধৈর্যভাবে বলল, 'তোর মাথার তার ছিঁড়ে গেছে। সবাই তোকে ধিক্কার দিবে। থুতু দিবে তোর মুখে। এত হেট্রেড নিয়ে তুই বেঁচে থাকতে পারবি? জীবন তছনছ হয়ে যাবে তোর!

– 'কে থুতু দিবে? তুই?'

– 'আমি কেন? সমাজের মানুষ।'

অমৃতার গলা থেকে শ্লেষ ঝরে পড়ল, 'সমাজের মানুষ আমারে খাওয়ায় না পড়ায়?'

– 'তোর নিজের বাবা মার কথা চিন্তা কর।'

– 'আমার বাবা মা আমি ম্যানেজ করব। তোকে চিন্তা করতে হবে না।'

– 'আচ্ছা? বেশ তো, সামিকে কীভাবে ম্যানেজ করবি শুনি?' অমৃতা একটু থমকায়। চোখের পর্দায় অসহায় ভাব ফুটে ওঠে ক্ষণিকের জন্য।

– 'সামি কি বুঝবে না ব্যাপারটা? বিভার বিয়ের পর কি রাত জেগে জেগে সে বিভার সাথে ফোনে কথা বলে নাই? বিভাকে নিয়ে পালায় যাওয়ার প্ল্যান করে নাই? বিভা কি তখন অন্যের বৌ ছিল না? তুই কি ভরা মজলিশে সামিকে সবার সামনে আই লাভ ইউ বলিস নাই? তখন কোথায় ছিল তোদের এত মরালিটি? কোথায় ছিল সোসাইটি?'

– 'আমাদেরটা টোটালি ডিফারেন্ট কেস ছিল।'

– 'পৃথিবীতে সব কেসই ডিফারেন্ট। আমাদের প্রত্যেকের লাইফের স্টোরি আলাদা। মিল শুধু একটা জায়গায়ই যে আমরা সবাই মানুষ। ফর গড সেক হৃদি একটা বার তুই এই বাড়ির বৌ হিসেবে না ভেবে আমার বন্ধু হিসেবে ভেবে দ্যাখ।'

– 'বন্ধু হিসেবেই বলতেছি, তুই ভুল করতেছিস। সামি কখনোই নিজের বাবার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে তোকে মেনে নেবে না।'

– 'উফ আল্লাহ! মেনে নিবে না তা তো আমি জানি। এই জন্যেই তো ওরে কিছু জানাইতে চাই না। লোকটার সাথে দুইটা কথা বলে যদি আমি শান্তি পাই তাহলে বাল তোদের এত লাগে ক্যান?'

– 'এর মানে সারাজীবন তুই ওরে ঠকায় যাবি? তুই তোর বন্ধুরে ঠকাবি?

অমৃতাকে বিভ্রান্ত দেখায়, 'জানি না!

– ‘জানার চেষ্টা কর।’

– ‘আমি কিছুই জানি না দোস্ত। শুধু জানি যে সামি আমার বন্ধু। ও আমাকে ক্ষমা করবে।’

হৃদি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘তোর লজ্জা লাগে না?’

একটা বড় শ্বাস পড়ল অমৃতার, ‘না, লজ্জা লাগে না। আমার জায়গায় থাকলে বুঝতি হৃদি! লজ্জা দিয়ে জীবন চলে না!’

৮০

রোমেলা ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলের ওপর বসে হাতে গলায় লোশন মাখছিলেন। হক বেডরুমে ঢোকা মাত্রই তিনি কটাক্ষ করে বলে উঠলেন, ‘ছেলের বৌয়ের সাথে তো খাতির ভালোই জমেছে তোমার।’

আড়চোখে একবার স্ত্রীকে দেখলেন হক, ‘খারাপ কিছু তো দেখছি না এর মাঝে।’

রোমেলা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোমর পর্যন্ত খোলা চুলগুলো দু হাত দিয়ে মুড়িয়ে হাত খোঁপা করতে করতে বললেন, ‘তোমার গার্লফ্রেন্ড কেমন আছে?’

হক সাহেব জানালার পাশে রাখা ইজি চেয়ারে বসলেন ‘আমি প্রচণ্ড টায়ার্ড। এখন এসব কথা বলতে ভালো লাগছে না।’

রোমেলা কয়েক পা এগিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, ‘তুমি কি ভেবেছ তুমি না বললে আমি জানতে পারব না কখনো মেয়েটি কে?

হক নিরুত্তাপ গলায় বললেন, ‘কী করে জানবে?’

– ‘যে কোনো উপায়ে জানব। আমাকে তুমি চেনো না।’

– ‘আমি সত্যিই তোমাকে চিনি না!’

– ‘আমাকে এভাবে ধোঁকা দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই!’ রোমেলার কণ্ঠার রগ ফুলে উঠেছিল ক্রোধে। ফর্সা মুখ ধকধক করে জ্বলছিল তেজের হলকায়।

– ‘বাড়াবাড়ি করো না।’

রোমেলা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, ‘মেয়েটা কে?’

– ‘তোমার জানার সময় এখনো হয়নি। হয়তো কখনো হবেও না। শুধু শুধু কেন ঝামেলা করছ?’

– ‘তুমি কি মনে করেছ সুলেমানের কাছ থেকে আমি কথা বের করতে পারব না?’

– ‘না পারবে না।’

এতক্ষণের অবরুদ্ধ কান্নার অর্গল বুঝি খুলে গেলো এবার। রোমেলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ‘তোমরা পেয়েছ কী? আমার সংসারে যা ইচ্ছা তা করে যাবে আর আমি চুপচাপ বসে থাকব? হ্যাঁ? তুমি ইচ্ছে করে ষড়যন্ত্র এঁটে আমার অপছন্দের মেয়েকে ঘরের বৌ করে এনেছ। আমার জীবনের সুখ নষ্ট করাই তোমার মূল উদ্দেশ্য। এখন নিজে পছন্দ করে বসে আছ কোন শাকচুন্নিকে তা খোদা জানে! আমি কিছু বুঝি না মনে করেছ? তুমি চাও আমি যেন অশান্তিতে থাকি। আমাকে কষ্ট দিয়েই তোমার সুখ!

– ‘কাঁদছ কেন? এখানে কান্নাকাটির মতো তো কিছু হয়নি!

– ‘তুমি বলো মেয়েটা কে?’ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন রোমেলা।

– ‘কেউ না!’ অস্ফুটে বললেন হক।

রোমেলা কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন, ‘আমার কি কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে? এতই ফ্যালনা আমি?’

হক ইজি চেয়ারের মাথায় হেলান দিলেন। চোখ বুজলেন ক্লান্তভাবে। মূল্য! মূল্য তো অবশ্যই আছে! এই যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে এত বছরের পুরোনো সংসার। এ সংসারের এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। অপর দিকে সেই মেয়েটার সাথে তাঁর মানসিক সংযোগ বা নির্ভরতাটুকুও এই সংসারের মতোই সত্য! এই দুটি সত্য একই সাথে, একই চিত্রপটে

পাশাপাশি দুটি জ্যোতির্ময় বিন্দুর মতো অবস্থান করছে। ন্যায়পরায়ণতার পাল্লায় হয়তো সংসারটাই ভারি হবে, হওয়া উচিত। কিন্তু হৃদয়ের পাল্লায়? বুকের ভেতরের মানুষটা আজ মনের দাবিকেই গ্রহণ করার তাগাদা দিয়ে আসছে বারেবারে! অন্যায়! এ ভীষণ অন্যায়! তিনি জীবনভর নীতির কথা বলে এসেছেন। নিয়মবদ্ধ মার্জিত জীবন যাপন করে এসেছেন। এত কাল পরে এসে তাঁর মতো একজন মানুষকে কি এমন রীতি গর্হিত কাজ করা মানায়? বাবা বলতেন পরিশ্রম, সততা এবং কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা এই তিনটি গুণ মানুষের জীবনে সফলতা বয়ে আনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বাবার বলা কথাটা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছেন। সেই মোতাবেক কাজ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সফল। আসলেই কি সফল? সফলতা কাকে বলে? সার্থকতা কাকে বলে? আজ সুনাম, সম্মান, অর্থ সবই আছে। তবুও কেন বুকজোড়া এমন নেই নেই ভাব? কেন মনে হয় কী যেন হবার ছিল... হলো না। কী যেন পাওয়ার ছিল··· পাওয়া গেলো না!

অন্যায় ভীষণ অন্যায়! হুঁশিয়ারি দিয়ে ওঠে কে যেন।

তিনি ভাবনার ঘোর কাটিয়ে বাস্তবে ফিরলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসলেন স্ত্রীর কাছে। রোমেলা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। তিনি রোমেলার মাথায় একটা হাত রেখে আলতো ভাবে বললেন, 'তুমি মন খারাপ করো না। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

রোমেলা এক ঝটকায় হক সাহেবের হাতটা সরিয়ে দিলেন, 'আমাকে ছুঁবে না তুমি খবরদার! ঘেন্না হয় তোমাকে আমার!'

হক কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, 'ঘেন্না হয় কেন?'

– ‘ঘেন্না হয় কারণ তুমি যা পেয়েছিলে তার মূল্যায়ন করতে পারোনি কখনো। আমাকে কখনোই তুমি মন থেকে ভালোবাসোনি।’

– ‘তুমি বেসেছিলে?’

রোমেলা ভেজা দুটি চোখ বহু বছরের পুরোনো স্বামীর মুখের ওপর তুলে ধরলেন, ক্ষীণস্বরে বললেন, ‘চেষ্টা করেছিলাম।’

– ‘আমিও··· চেষ্টা করেছিলাম।’

– ‘আমাদের মধ্যে কি কখনো কিছুই ছিল না?’

– ‘নিশ্চয়ই ছিল। যা ছিল, তা এখনো আছে!’

– ‘যা ছিল বা যা আছে তার নাম কী?’ কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন রোমেলা।

হক শূন্য চোখে চেয়ে থাকেন সম্মুখে। তার চোখ খোলা কিন্তু তিনি যেন কিছুই দেখছেন না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর তিনি স্তিমিত গলায় বললেন, ‘অভ্যাস! তার নাম বোধহয় অভ্যাস!’

রোমেলার অশ্রুরুদ্ধ মুখে তখনও ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণা খেলা করছিল। কথাটা শোনামাত্র তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন বসা থেকে। তড়িঘড়ি করে নিজের বালিশটা

বগলদাবা করে নিয়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি। আজ থেকে আর তোমার সাথে এক ঘরে থাকব না।'

হক স্ত্রীকে বাধা দিলেন, 'তুমি কেন যাবে? এটা তোমার ঘর। প্রয়োজনে আমিই চলে যাব।'

– 'বেশ তো, যাও তবে!'

হক সাহেব বিছানাপত্র কিছুই নিলেন না। খালি হাতে বেরিয়ে আসলেন ঘর থেকে। ঘরের দরজা বন্ধ করার আগমুহূর্তে স্ত্রীকে বললেন, 'ওই সুটকেসে তোমার জিনিসগুলো আছে। দেখে নিও।'

রোমেলা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন মেঝের ওপর রাখা কালো রঙের সুটকেসটা। ঘরের দরজা বন্ধ হবার পর তিনি চোখের জল মুছে নিলেন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। উঠে এসে খুললেন সুটকেসটা। লিস্টে যা যা লিখে দিয়েছিলেন তার সব কিছুই এসেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। জিনিসগুলো সব সুটকেস থেকে বের করে কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলেন তিনি। ভ্যানিটি ব্যাগ, জুয়েলারি, হাতঘড়ি, কসমেটিক্স, শ্যাম্পু, সাবান, আর তার পছন্দের ব্র্যান্ডের পারফিউম। কসমেটিক্সগুলো সব বোনদেরই গিফট করবেন তিনি। মোবাইল হাতে নিয়ে ছবি তুললেন কয়েকটা। আর দেরি না করে বন্ধুবান্ধব আর বোনদের কাছে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিলেন। লোকটার এই এক গুণ আছে। রোমেলা জীবনে যা কিছু চেয়েছেন এর কাছে, সব পেয়েছেন। পাননি শুধু লোকটার মন! কিন্তু যা তিনি পান নি, তা অন্য কেউ পাবে কোন সাহসে? তাঁর ভ্রু দুটি চকিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মোবাইলের ডায়াল লিস্ট ঘেঁটে তিনি সুলেমানের নম্বরটা বের করলেন। রিং পড়তে থাকল।

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলেন হক। নিচতলার সিঁড়ির গোড়ায় সদরের সামনে হঠাৎ তার সাথে দেখা! সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, পায়ে জুতো, কনুইয়ে ঝোলানো কালো কোট, কাঁধে ব্যাকপ্যাক। সেকেন্ড না গড়াতেই ঝুপ করে মনের মাঝে নেমে আসলো শান্তি। ফুৎকারে উড়ে গেলো এতক্ষণের বিষণ্নতা, ক্লান্তি আর মানসিক দ্বন্দ্ব! হায়, যে পুরুষের অভ্যাস এক নারীর কাছে আর শান্তি অপর নারীর কাছে সেই পুরুষের জীবন নরকের চাইতে কোনো অংশে কম নয়!

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। হৃদি, সামি আর রুদ্র সিঁড়ি ভেঙে নামছে নিচে। রুদ্রর বাস স্টেশনে যাবার সময় হয়ে এসেছে। হক আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসলেন বাড়ি থেকে। আজ রাতটা হয়তো তিনি লাইব্রেরি রুমেই কাটাবেন।

গভীর রাতে অমৃতা ইমেইল করল,

দেখা হবে?

ইমেইলের উত্তর সে রাতে আসলো না আর। রাতে ঘুমও হলো না ভালো। পরদিন কাজে বসল না মন। সন্ধ্যার দিকে চেনা নম্বরটা থেকে কল আসলো,

– ‘অমৃতা!’

– ‘রাশেদ! কেমন আছেন?’

কোনো উত্তর নেই। দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কারো মুখে কথা নেই! একটা সময় রাশেদ বললেন,

– ‘কাল বিকেলে কী করছ?’

– ‘ফ্রি আছি।’

– ‘বাসায় থাকবে?’

– ‘আপনি বললেই থাকব!’

– ‘শোনো, পাবলিক প্লেসে দেখা করাটা এ মুহূর্তে একেবারে সেইফ না। ঢাকার অদূরে আমার একটা গেস্টহাউজ আছে। তুমি কি ওখানে আসতে পারবে?’

– ‘পারব!’ নিশ্বাস বন্ধ করে বলল অমৃতা

– ‘ঠিক আছে। কাল বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো তোমার বাসায়।’

– ‘গাড়ি লাগবে না। আপনি ঠিকানা দিন, আমি চলে আসব।’

– ‘পাকামো করো না। গাড়ি পাঠাব ঠিক পাঁচটায়। রাখছি এখন।’

‘ওকে। সি ইউ টুমরো!’

– ‘সি ইউ টুমরো।’

৮১

ছাই রঙের টয়োটা গাড়িটা অমৃতাকে নিয়ে গাজীপুরের বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সাড়ে ছটা নাগাদ। তখনো শেষ বিকেলের সিঁদুর রং পশ্চিম আকাশ থেকে পুরোপুরি মেলায়নি। একটু একটু ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে। গাড়ির জানালা দিয়ে অমৃতা বাড়ির সামনের কাঁচা রাস্তাটা দেখল। পাশেই একটা ছোট্ট পুকুর। বেশ কিছু জংলা জায়গা। সাদা গেটের ওপর ঝুলে আছে গোলাপি রঙের লতানো বাগানবিলাস। সাদার ওপর গোলাপি রংটা বেশ ফুটেছে। দেখলে মনে হয় যেন কোনো উঁচুদরের শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। একবার হর্ন দিতেই ভেতর থেকে গেট খুলে দিল দারোয়ান।

টালির ছাদ দেওয়া ইট রঙের একটা দোচালা বাড়ি। বাড়ির সাথেই লাগোয়া গাড়ি বারান্দা। গেট থেকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তাটির দুপাশ ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরাও করা। সন্ধ্যার ধূসর আলোতে ডুবে আছে বাগানে ফুটে থাকা টকটকে লাল গোলাপ। গোলাপের পাশে আছে গাঁদা, টিউলিপ আর অলকানন্দা ফুল। বাড়ির ঠিক পাশেই একটি বিরাট বড় রেইন ট্রি। ঝিরঝিরে বাতাসে রেইনট্রির পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে, উড়ে উড়ে এসে পড়ছে লাল রঙের টালির ছাদের ওপর। এই বাড়িটি গেস্টহাউজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিদেশ থেকে বায়াররা আসলে এখানেই থাকে। আগে মাঝে মাঝে সামিদের পরিবার ছুটিছাটায় বেড়াতে আসত এখানে। আজকাল আর সেসব হয়ে ওঠে না। ভ্যাকেশনে এখন দূর দূরান্তেই যাওয়া হয় বেশির ভাগ সময়। অমৃতার বুক ঢিবঢিব করছিল। আনন্দ, ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এই সমস্ত অনুভূতির মিশ্রণে ভেতরটা কেমন অবশ প্রায় হয়ে আছে। যেন ঠিক জাগরণে নেই সে। একটা দুর্ভেদ্য, নিগূঢ় ঘোরে ডুবে আছে নিচ্ছিদ্রভাবে।

গাড়ি থেকে নেমে আশপাশটা একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখল অমৃতা। তার পরনে আজ হালকা সবুজ রঙের একটা ফুল হাত ফতুয়া। ব্ল্যাক জিন্স। অল্পবয়সি ড্রাইভারটা মুগ্ধ চোখে দেখছিল তাকে। বয়স একুশ কি বাইশ বছর হবে। হ্যাংলা পাতলা গড়ন। ঠোঁটের ওপর পাতলা গোঁফ। ছেলেটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে অমৃতার সামনে এসে দাঁড়ালো। পকেট হাতড়ে কিছু একটা বের করে নিয়ে ব্যস্ত গলায় বলল, 'ম্যাডাম, স্যার আপনাকে বাসার চাবি দিতে বলছে। স্যারের আসতে আসতে সাতটা বাজবে। আপনি ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করেন।

অমৃতা হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল। ছেলেটাকে এক নজর দেখল ভালো মতো। চোখ ভরা প্রশ্ন আর কৌতূহল। কেমন বোকা বোকা দৃষ্টি। একটু কেমন ভয় খেলে গেলো বুকে। এদের মারফতে যদি কথা ছড়িয়ে যায়? দেয়ালেরও যে কান আছে!

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অমৃতা ছোট করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' চাবিটা হাতে নিয়ে দুই ধাপের সিঁড়ি ভেঙে পোর্চ এ উঠে আসলো সে। দরজার বাইরে একটি সুন্দর জিনিসে চোখ আটকে গেলো। আকাশি রঙের একটি সিরামিকের তৈরি জুতো। জুতোর মাথায় বসে আছে সবুজ রঙের ছোট্ট সিরামিকের ব্যাঙ। জুতোর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে কয়েকটা মানিপ্ল্যান্টের লতা। তার পাশেই একটা মাটির টবে বটগাছের বনসাই। কারুকার্য করা বাদামি রঙের কাঠের দরজার ওপর একটা নেমপ্লেট ঝোলানো, তাতে ইংরেজিতে বড় করে লেখা 'রাশেদুল হক '

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। মাঝারি আকারের ড্রইংরুম। জানালার পর্দা টানানো বলে ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার আর ভ্যাপসা হয়ে আছে। অমৃতা প্রথমেই জানালার পর্দা সরালো। তুলে দিল কাচ। এক ঝলক বিশুদ্ধ বাতাস ছুঁয়ে দিল তাকে। জানালার একদম ধার ঘেঁষেই গোলাপ গাছ। চার পাঁচটা টুকটুকে লাল গোলাপ মাথা উঁচিয়ে সন্ধ্যার বাতাসে দোল খাচ্ছে ধীর লয়ে। দেখলেই মনটা পবিত্র হয়ে যায়। ঘরের

ভেতর দু সেট লাল গদির কাউচ। একটা রেক্সিনের সাদা ফুটন। কাচের টেবিল। টেবিলের ওপর ছড়ানো ছিটানো দেশ বিদেশের নামকরা ম্যাগাজিন আর একটা সিগারেটের ছাই সহ ছাইদানি। অমৃতা হেঁটে পাশের ঘরে আসলো। ডাইনিং স্পেসের সাথেই রান্নাঘর। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখল সব পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। মনে হচ্ছে বেশ অনেক দিন যাবৎ এই রান্নাঘর ব্যাবহার করা হয়নি। লম্বা ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা চকচকে কাচের জগ আর দুটো গ্লাস। ফলের ঝুড়িতে কয়েকটা আপেল আর কমলা রাখা। ডাইনিং এর পাশ ঘেঁষেই একটা ছোট্ট করিডোর। করিডোর থেকে ডালপালা গজানোর মতো করে চারদিকে চলে গেছে চারটা তিন কদমের রাস্তা। তিন রাস্তা গিয়ে মিশেছে তিনটি বন্ধ ঘরের দরজার সাথে। চতুর্থ পথটি দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে অমৃতা একটি রোগা সিঁড়ি দেখতে পেল। উপরে উঠে আসলো সে নিঃশব্দে। সিঁড়ির মুখেই একটি কাঠের দরজা। ভেতরে ঢুকে দেখা গেলো পরিষ্কার সাদা রঙের চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল আর ওয়ার্ডোব। দেয়ালে একটি চতুষ্কোণ জানালা। টালির চালের ফাঁক গেলে গোধূলির হলদে আলোর রেখা তেরছা হয়ে এসে পড়েছে বিছানার চাদর, বালিশ আর মেঝেতে পাতা লাল কার্পেটের ওপর। ঘরটা দেখামাত্র পছন্দ হয়ে গেলো অমৃতার

কিছুক্ষণ খালি পায়ে কার্পেটের ওপর পায়চারি করে নিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো সে। এই ঘরের সিলিং খুব নিচু। হাত উঁচু করলেই টালির তিনকোণা ছাদটা ছোঁয়া যায়। জানালা খুলে দিল। মিষ্টি একটা সুবাস নাকে এসে লাগল। কোনো ফুলের ঘ্রাণ হবে। কী ফুল, কোথায় তার বাস কে জানে! রেইন ট্রির ডালে ডালে হরেক পাখির মাতামাতি এখন। খুব হইচই করে বাড়ি ফিরছে তারা। ওপর থেকে নিচের উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। গেটের পাশে মধ্যবয়স্ক দারোয়ান লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে টুলের ওপর বসে আছে গোমড়া মুখে। হাত দিয়ে গামছা নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে। আপাতত পাখির কোলাহল ছাড়া আশেপাশে আর কোনো শব্দ নেই। যন্ত্রচালিত রাজধানীর কাছেই যে এমন নিবিড় ছায়াঘেরা সবুজ জায়গা থাকতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গেটের কাছে কেউ একজন এসেছেন। একজন ভদ্রলোক। মাথায় টাক। শার্টের বোতাম ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পেটের

বিলাসী ভুঁড়ি। কোথায় যেন দেখেছে অমৃতা লোকটাকে। ভদ্রলোক গেট ধাক্কালেন কয়েকবার। দারোয়ান বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেটের ছোট খিড়কিটা খুলে মাথা বের করল। সেই সময় টেকো লোকটা হঠাৎ কী মনে করে যেন মাথা উঁচু করে ওপরে তাকালো একবার। তাকাতেই জানালার খোপ টপকে ঝুলে থাকা অমৃতার মুখটা দেখতে পেল সে। বিদ্যুতের মতো একটা চমক খেলে গেলো অমৃতার মেরুদণ্ডে। এই যা! এটা তো মহসিন আংকেল। আগে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে প্লামারের কাজ করত। বাবার সাথে এখনো নিয়মিত যোগাযোগ হয় ফোনে। চট করে সরে আসলো সে জানালা থেকে। দেখে ফেলল কি? চিনে ফেলল কি? হায় হায়! এই একলা বাড়িতে অমৃতাকে দেখে কী ভাববে লোকটা? আর রাশেদের সাথেই বা ইনার কাজ কী? আংকেল যদি বাবাকে কিছু বলে দেয়? আসবার সময় মাকে বলে এসেছে রাতে ফিরতে দেরি হবে। বলেছে খুব বেশি রাত হলে হৃদির বাসায় থেকে যেতে পারে। এ বিষয়ে তাকে আরো একটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে বলেছে হৃদি এখন তার বাবার বাড়িতে অবস্থান করছে। মা চাইছেন সামিদের বাসায় যেন অমৃতার যাতায়াতটা কমে যায়। চাইছেন সঙ্গত কারণেই। অমৃতা তা বোঝে। আসলে বোঝে মস্তিষ্ক, মন বোঝে না। মহসিন আংকেলকে দেখে তার হাসিখুশি মনটা হঠাৎ কেমন একটু বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল। এলোমেলো নানা কথা মনে আসছিল থেকে থেকে। ভাবতে ভাবতে দুর্ভাবনার গাঁজলা উঠছিল বুকের ভেতর। আকাশ থেকে সন্ধ্যার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দিনমণি তখন হারিয়ে গেছে পৃথিবীর অন্য পাশে। গোধূলির হলুদ রং হটে গেছে। ঘরের ভেতর এখন জায়গা করে নিয়েছে রাত্রির অন্ধকার। হঠাৎ গাড়ির হর্ন শোনা গেলো। তারপর গেট খোলার ঘড়ঘড় শব্দ। দৌড়ে এসে জানালায় দাঁড়ালো সে। দেখতে পেলো গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পাজেরো গাড়িটা।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্রুত পায়ে সে একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালো। উষ্কখুষ্ক চুলগুলো হাতের আঁচড় দিয়ে পাট করে নিল। তারপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পা চলছে না, নিশ্বাসেও কষ্ট! তবুও যে কী ভীষণ বাঁধছেড়া এক অনাবিল হর্ষে দাপাদাপি করছে ভেতরটা! সদর দরজা একটু ফাঁক করে দাঁড়ালো অমৃতা। বাগানে জ্বলতে থাকা ল্যাম্পপোস্টের আলোতে দেখল গাড়ি থেকে নামছেন তিনি।

পরনে একদম হালকা নীল রঙের একটা ফরমাল শার্ট। গলায় কালো টাই। কালো প্যান্ট। কাঁধে ল্যাপটপের ব্যাগ দরজাটা উল্টো পাশ থেকে খুলে গেলো। তারপর দুজনে মুখোমুখি ল্যাম্পশেডের হলুদ আলোর ভেতরে। কয়েকটা অস্বস্তির মুহূর্ত কাটলো। কেউ কোনো কথা বলল না। একটু শুধু মুচকি হাসলেন রাশেদ অমৃতার দিকে চেয়ে।

ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা আটকে দিয়ে তিনি ফুটনের ওপর বসলেন। অমৃতা তাঁর কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। হাতদুটো পেছনে আর শরীর ঈষৎ বাঁকা। মুহূর্তে বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হচ্ছে দাঁড়ানোর ভঙ্গি। বোঝা যাচ্ছে সে বেশ নার্ভাস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কিছু একটা বলা দরকার এখুনি। কিন্তু কী বলবে? ইশ অমৃতা এত আনস্মার্ট হলো কবে থেকে?

– ‘কী খাবে রাতে?’ ঝুঁকে বসে হয়ে জুতোর ফিতা খুলতে খুলতে প্রথম কথা বললেন তিনি।

অমৃতাকে একটু চিন্তিত দেখালো, ‘খাবার… রান্না করতে হবে?’

– ‘রান্না করতে পারো তুমি?’

– ‘চিকেন বিরিয়ানি রান্না করতে পারি।’

– ‘তাই?’ প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন রাশেদ।

– ‘আমার চিকেন বিরিয়ানি খুবই মজা হয়।’ জোর গলায় বলল অমৃতা।

বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাশেদ খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, ‘তাহলে আর কী, রান্না করে ফেলো!’

– ‘আসলেই? ইনগ্রিডিয়েন্স আছে সব?’ অমৃতাকে বেশ প্রফুল্ল দেখালো।

– ‘ডোন্ট নো!’ মানুষটার দু ঠোঁটের প্রান্তিক কোণে একটি লঘু হাসির রেশ। সেই রেশ খানিকটা মেখে আছে গভীর চোখের তারায়। হাসিটা একটু কেমন নতুন বলে ঠেকলো অমৃতার কাছে। ঠিক এই হাসি অমৃতা ইনার মুখে এর আগে কিন্তু কখনো দেখেনি! আজকের রাশেদ যেন অনেক বেশি আন্তরিক আর ঘরোয়া। ভালো লাগছিল অমৃতার। একটু বেশিই ভালো লাগছিল। তাই অরুণ রঙা খুশিতে একদম থৈথৈ হয়ে গিয়েছিল মুখ। রাশেদ ড্রইংরুম ছেড়ে বেরোবার মুখে থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। ভ্রু কুঁচকে অমৃতার চোখে চেয়ে বললেন, ‘হাসছ কেন?’

অমৃতা অনেক কষ্টে মুখের হাসি হাসি ভাবটা লুকিয়ে নিয়ে বলল, ‘কই? হাসছি না তো! আপনি হাসছেন কেন?’

– ‘আমি হাসছি নাকি?’

– ‘হ্যাঁ হাসছেন তো!’

রাশেদ ঠোঁট টিপে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললেন, 'ও, তাহলে বোধহয় তোমাকে হাসতে দেখে হাসছি।'

– 'আমি হাসলেই আপনি হাসবেন?'

– 'হাসি ছোঁয়াচে, তুমি জানো না?'

সদর দরজায় একটা টোকা পড়ল। রাশেদ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। ড্রাইভার ছোকরাটা হাতে করে একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। রাশেদ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিলেন। দরজাটা অল্প একটু খোলা রেখেই ঘাড় ঘুরিয়ে অমৃতাকে প্রশ্ন করলেন, 'বললে না কী খাবে? এদিকে অবশ্য তেমন ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট নেই।'

– 'বিরিয়ানি রান্না করব না?'

– 'আজ সময় হবে কি? এখনই সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে। তোমার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তুমি চিকেন বিরিয়ানি খেতে চাইলে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।'

অমৃতা আর কিছু বলল না। হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ল শুধু একবার। ড্রাইভারকে খাবারের কথা বলে নিয়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করলেন। হাতে ধরা প্যাকেটটা অমৃতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার।'

– 'থ্যাংক ইউ!' একটু অপ্রতিভভাবে বলল অমৃতা। রাশেদ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর সে কাউচের ওপর বসে প্যাকেটটা খুলল। উপহার পেতে কার না ভালো লাগে? আর সেই উপহার যদি হয় কোনো বিশেষ মানুষের কাছ থেকে তাহলে তো আর কথাই নেই। প্যাকেট খুলতেই চেরি পিংক রঙের একটা সিল্ক কাপড়ের জামা বেরিয়ে আসলো। অমৃতা মুখের সামনে মেলে ধরল জামাটা। হাতে আর কোমরে কুচি। ঘেরটা আঁকাবাকা হয়ে একটু উপরের দিকে উঠে গেছে। পেছনের ঘেরটা অপেক্ষাকৃত লম্বা সামনেরটার চেয়ে। অমৃতার ঠোঁটে মিটমিটে হাসিটা ফিরে আসলো। প্যান্ট শার্ট পরা টমবয় মেয়েটাকে কিনা এখন এই ফ্যাশনেবল জামা পরতে হবে? কত্তদিন পর মেয়েদের জামা পরবে সে! অন্তর থেকে যে নারী সত্তাটাকে অনেক বছর আগে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল আজ সেই নারীসত্তাকেই পুনরায় হেসে খেলে বরণ করে নিতে যাচ্ছে। উঠে পড়ল জামা হাতে নিয়ে। পা বাড়ানোর আগ মুহূর্তে কাউচের ওপর রাখা সাদা প্যাকেটটার দিকে নজর পড়ল একবার। কী ওটা? ছোট্ট একটা জিনিস উঁকি দিয়ে আছে প্যাকেটের ভেতর থেকে। ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা হাতে নিল। জুয়েলারি বক্স। সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে খুলল বাক্সটা। হোয়াইট গোল্ডের একটা চেইন। চেইনের সাথে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের ছোট্ট লকেট। সোনাদানা, হীরে মুক্তো কিংবা গয়নাগাটি অমৃতাকে কখনোই সুখ দেয় না। এখনো দিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে সুখের এক তীব্র শিহরণ ছুঁয়ে গেলো সম্পূর্ণ অন্য কারণে। চোখের সামনে সে স্বর্ণ দেখতে পাচ্ছে না বরং দেখতে পাচ্ছে ভালোবাসা! যে ভালোবাসা অনেক দূর থেকে ছোট্ট একটা বাক্সে বন্দি হয়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে তার কাছে এসেছে। হৃদয়টা কুলকুল করে ভরে উঠল আনন্দে। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল জল। মনের ডানায় ভর দিয়ে উড়ে উড়ে চিলেকোঠার ঘরটায় ফিরে আসলো। দরজা বন্ধ করে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। কিছুক্ষণ গ্লাসের ভেতরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকল অপলক। তারপর পরনের ফতুয়াটা খুলে ফেলল একটানে। চেরি পিংক রঙের জামাটা যেন ওর মাপেই তৈরি। শুধু ভি শেপের গলাটা একটু বড়। এটা ছাড়া পুরো জামাতে আর কোনো ত্রুটি নেই। বড় গলাটা একটু অস্বস্তিতে ফেলল তাকে। জামা পরা হয়ে গেলে জুয়েলারি বক্সটা হাতে তুলে নিল সে। ঠিক সেই সময় নিচতলা থেকে হঠাৎ ডাক ভেসে আসলো,

– ‘অমৃতা!’

ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসলো অমৃতা ঘর থেকে।

৮২

বিকেলের দিকে হৃদি গিয়েছিল পার্লারে স্পা করতে। বাড়ি ফিরে বৌকে দেখতে না পেয়ে সামির মেজাজটা বিগড়ে গেলো হালকা। তবে আজ মা আছেন বাড়িতে। এটা ব্যতিক্রম। সাধারণত মাকে এই বিকেল সন্ধের সময়টাতে বাড়িতে পাওয়া যায় না। মা ডাইনিং রুমে বসে মোবাইলে কথা বলছিলেন কারো সাথে। সামি অফিসের জামা কাপড় না পাল্টেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মায়ের দুই ভ্রুর মাঝখানের আধ ইঞ্চি কুঞ্চিত চামড়াটা তার নজর এড়াল না। দেয়ালে লাগানো ঘড়িটা দেখল একবার সে। সন্ধে সাতটা বাজে। বাবা অফিস থেকে বেরিয়েছেন ঘণ্টাখানেক আগে। বাড়ি এখনো ফেরেননি। হয়তো অন্য কোনো কাজে আটকে গেছেন।

রোমেলা কান থেকে ফোনটা সরিয়ে নিয়ে ছেলেকে বললেন, ‘কেমন আছ বাবা?’

– ‘এইতো। তোমার কী হয়েছে?

রোমেলা মুখের ভাব পাল্টানোর চেষ্টা করে বললেন, ‘কিছু না।’

সামি চোখ সরু করে তাকালো মায়ের দিকে, ‘কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।’

– ‘তোমার বাবা কোথায়?’

সামি ঠোঁট উল্টে বলল, ‘আমি তো জানি না! ত

এই ফাঁকে কাজের মেয়ে এসে সামিকে প্রশ্ন করল, ‘স্যার চা/ কফি কিছু দিব আপনাকে?

সামি মাথা নেড়ে না করল। রোমেলা একটু শুকনো মুখে বললেন, ‘শোনো, আমাদের যে কেয়ারটেকার আছে না? সুলেমান?’

– ‘হ্যাঁ কী হয়েছে তার?’

– ‘সে অসুস্থ।’

– ‘হঠাৎ কী হলো?’

রোমেলাকে এ প্রশ্নে একটু বিচলিত দেখালো। ছেলের চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি যতটা সম্ভব সহজভাবে বললেন, ‘আমি ঠিক জানি না।’

সামি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলায় বলল, ‘অবস্থা কি বেশি খারাপ? গত একমাস তো আমি উনাকে দেখিনি এ বাড়িতে। এক মাস ধরেই কি অসুস্থ?’

– ‘মনে হয়।’

– ‘তুমি চিন্তা করো না। আমি বাবার সাথে কথা বলছি।

কথাটা বলে সামি নিজের সেলফোনটা হাতে নিল। আড়চোখে তাকালো মায়ের দিকে। মায়ের মুখটা একটু কেমন শুকনো দেখাচ্ছে আজ। চোখের নিচে কালি। মনে হচ্ছে কোনো গভীর দুশ্চিন্তায় পেয়েছে তাকে।

– ‘চিন্তা করো না। সুলেমান কাকা ঠিক হয়ে যাবেন।’ আরো একবার সান্ত্বনা দিল সে মাকে।

– ‘বাবা শোনো। তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে।’

এ কথা শুনে সামি সেলফোনটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ডান কনুই ঠেস দিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। হাতের তালুতে নিজের গাল বসিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, ‘হ্যাঁ শুনছি। বলো।’

রোমেলা নিজের ছেলের সুকুমার মুখটার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকলেন। জীবনে তিনি এই একজনকেই হৃদয়ের সমস্তটা দিয়ে ভালোবেসেছেন। জগতে এই একটা মুখের দিকে তাকালেই তার মন নরম হয়ে আসে। দৃষ্টিজুড়ে শীতলতা নামে। প্রাণ জুড়োয়। তার একটা মাত্র ছেলে। একটা মাত্র মানিক রত্ন। এই একটা রত্নকে তিনি কোনোভাবেই কষ্ট দিতে চান না। কিন্তু ওই লোকটাকে শাস্তি দেবার জন্য হলেও প্রাণের অধিক প্রিয় সন্তানকে আজ কট্টর সত্যের মুখোমুখি করতে হবে। ওই লোকটা

তলে তলে কুকর্ম করে যাবে আর পুত্রের চোখে দেবতা সেজে বসে থাকবে তা কিছুতেই হবে না!

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে রোমেলা বললেন, 'তোমার বাবা…'

– 'কী হয়েছে বাবার?

– 'তোমার বাবার জীবনে অন্য কেউ আছে।'

গাছের পাতার ওপর থেকে রোদ সরে যাবার মতো করে সামির মুখের রক্ত সরে গেলো। খরখরে এক ঠান্ডা স্পর্শে শিরশির করে কেঁপে উঠল তার অন্তরাত্মা।

– 'মানে?'

রোমেলা ছেলের চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

– 'মানে তুমি বোঝো না? তুমি তো বড় হয়েছ। তোমাকে কি বানান করে বুঝিয়ে দিতে হবে?'

সামির চোখে প্রচণ্ড অবিশ্বাস খেলছে। পাণ্ডুরমুখে চেয়ে আছে সে মায়ের দিকে। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলো স্তব্ধতায়।

– ‘বিশ্বাস করি না!’ হঠাৎ শব্দগুলো উচ্চারণ করল সামি দৃঢ় গলায়।

– ‘তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে আমি জানি। আমারও কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তোমার বাবা নিজের মুখে আমাকে বলেছে।’

– ‘কী বলেছে?’

– ‘বলেছে যে তার অন্য কারো জন্য ফিলিংস আছে।’

সামির শ্বাসনালিতে আটকে গেছে নিশ্বাস। পথহারা নাবিকের মতো উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

– ‘তোমাকে এ কথা বাবা বলেছে?’ ফাঁপা বাঁশের মতো আওয়াজ বের হলো সামির গলা দিয়ে।

– ‘হ্যাঁ বলেছে।’

– ‘কে সেই ব্যক্তি?’

– ‘সেটাই তো জানি না। জানার কোনো পথ নেই!’ একটু থেমে রোমেলা ছেলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে খাদে নামানো গলায় বললেন, ‘এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য

চাই আমার। তোমার বাবা লোকটা ধুরন্ধর চালাক। খুব সহজে ধরা দেবে না। কোথাও কোনো প্রমাণ রাখেনি।'

সামি বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী বলছে মা এসব? মায়ের বলা প্রতিটা কথা পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে··· গোটা দুনিয়া মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে···! বাবার মুখটা ভেসে উঠল সামনে। এই মানুষটা শুধু তার বাবাই নয়, বরং গর্ব, নির্ভরতা এবং আশ্রয়। বাবা এমনটা করতেই পারে না। কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। বড়সড় ভুল হচ্ছে!

– 'তুমি ভুল করছ মা।'

রোমেলা অধৈর্য গলায় বললেন, 'তোমার বাবা নিজ মুখে বলেছেন আমাকে।'

নিজের বাবা মাকে নিয়ে ছোটবেলা থেকেই বুকের কোণে একটা জমজমাট অহংকার ছিল সামির। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত তার বাবা মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা মা। আর বাবা তো তার কাছে সুপার হিরো! যে সব পারে। যার কাছে চাওয়া মাত্র সব কিছু পাওয়া যায়। কাঁপা হাতে সে সেলফোনটা তুলে নিল। ডায়াল করল বাবার নম্বরে। রিং পড়ল টানা অনেকক্ষণ। উত্তর আসলো না। মায়ের বলা কথাগুলো যদি সত্য হয় ··· যদি সত্য হয় তাহলে··· কী করবে সামি? কী করবে? কী করা উচিত? না, ছেড়ে দেবে না। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না সে! তার মাকে কষ্ট দেবার মতো দুঃসাহস যদি কেউ করে থাকে, তো সামি তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই ছাড়বে। হোক না সে তার নিজের বাবা!

কে হতে পারে এই তৃতীয় ব্যক্তি? সামি চোখ বন্ধ করে খুব দ্রুত চিন্তা করতে থাকল। বাবার সাথে কাজের সুবাদে অনেক মহিলাকেই প্রায় সময় দেখেছে সে। কিন্তু কখনো অন্যরকম কিছু চোখে পড়েনি তো! মস্তিষ্কে পোকার মতো কিলবিল করে উঠল নানা রকম চিন্তা। সে খুব ভালো মতোই জানে যে তার বাবা শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত, যশস্বী এবং খ্যাতিমান একজনই নন, সেই সাথে সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বলতে নেই, এ নিয়ে তার মনের মধ্যে সুপ্ত একটা গর্বও ছিল আজীবন। ছোটবেলা থেকে সে লোকমুখে বাবার প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত। মা নিঃসন্দেহে সুন্দরী। তবে বাবার গুণ এবং প্রতিভার কাছে মায়ের রূপ সর্বদাই বড় বেশি ম্লান এবং নিভন্ত। কিন্তু তাই বলে মায়ের প্রতি বাবাকে কখনো উদাসীন বলে মনে হয়নি তো তার! মা সবসময় যা চেয়েছেন বাবা তা দিয়েছেন। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এই বিশেষ দিনগুলোও বাবা কখনো ভুলে যান না। সামি ভুলে গিয়েছে সময়ে অসময়ে। কিন্তু বাবা ভুলেননি। বরং মাকেই মাঝে মাঝে একটু কেমন উদাসীন মনে হয়েছে সামির কাছে। মনে হয়েছে বাবা মায়ের প্রতি যতটা দায়িত্বশীল এবং যত্নবান, মা বাবার প্রতি ঠিক ততটা না। বাবার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে মা কখনোই তেমন একটা মাথা ঘামান না। তবে এতে মায়ের দোষ খুব একটা খুঁজে পায় না সামি। তার মা একটু সহজ সরল, বোকাসোকা। বাবা তো মায়ের এই বোকাসোকা ভাবটাকে মেনে নিয়েই ভালোবেসেছিলেন, নাকি?

হৃদি ফিরে এসেছে তখন। ডাইনিংরুমে শাশুড়ি আর স্বামীকে বিদ্ধস্ত এবং বিচলিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল।

– ‘কী হয়েছে?’

সামি রক্তশূন্য মুখে একবার তাকালো হৃদির দিকে। কিছু বলল না।

রোমেলা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা শেয়ার করতে পেরে তাঁর মন থেকে ভার কিছুটা নেমেছে। কিন্তু সুলেমানের বিষয়টা নিয়ে তিনি এখনো বেশ চিন্তিত। সুলেমানকে একটু ভয় ভীতি দেখিয়ে কথা বের করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কয়েকজন ভাড়া করা মাস্তানকে। রোমেলার আপন মামা বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গুন্ডাগুলো একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সুলেমান বয়স্ক লোক। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে বেচারার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। হাতে পায়ে আঘাতের চিহ্নও আছে। সুলেমানের পরিবার এর মাঝেই পুলিশে রিপোর্ট করেছে। ঘটনা ঘটেছে আজ বিকেলে। হার্ট অ্যাটাক করার পর গুন্ডারাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। খুব সম্ভবত হক সাহেবের কানে খবরটা এখনো পৌঁছয়নি। পৌঁছুলে এর পেছনে যে রোমেলার হাত আছে তা বুঝতে খুব একটা সমস্যা হবে না তাঁর। হসপিটালে গুন্ডারা এখনও অপেক্ষা করছে। সুলেমানের জ্ঞান ফিরলেই তাকে শাসানো হবে যেন ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে রোমেলার নাম প্রকাশ না করে। কিন্তু জ্ঞান আদৌ ফিরবে কি? বড়ই দুশ্চিন্তার বিষয়।

৮৩

বেডরুমের দরজার সামনে রাশেদ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টেছেন তিনি। গায়ে এখন সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। এই করিডোর থেকে রোগা সিঁড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। পায়ের শব্দ শুনে তিনি ওপরে মুখ তুলে তাকালেন। টিউবলাইটের সাদা আলোর ভেতর দিয়ে অমৃতা তখন এক পা দু পা করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। তার পরনে চেরিফুল রঙের জামা। জামার কুচিটা ভারি সুন্দরভাবে বসে আছে তার সর্পিল ছিপছিপে কোমরখানিতে। পেছনের ঘেরযুক্ত অংশ গড়াচ্ছে সিঁড়িতে। সম্মুখে তার ফর্সা খালি দুটি পা··· সুন্দর··· পবিত্র··· আর নিটোল! পরী কখনো তিনি সামনাসামনি দেখেননি। এত দেশ বিদেশ ঘুরে, এত মানুষের সাথে মিলেমিশে, অবশেষে মাতৃভূমিতে এসে নিজ বাড়িতে সত্যিকারের পরী দর্শন হলো তাঁর। হঠাৎ করেই চোখ পড়ল। ওর ফর্সা চামড়ার কণ্ঠাস্থিতে একটা কালো তিল।

চুম্বকের মতো টানছে যেন ছোট্ট বিন্দুটা গোটা জল স্থল অন্তরীক্ষকে একযোগে! 'সুন্দর!' শুধু এই একটা শব্দই মাথায় এলো সেই মুহূর্তে।

– 'বলুন।' এক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে অমৃতা। হাতে ধরা জুয়েলারি বক্স। চোখে হাসির ঝিলিক। ঈষৎ বাঁকা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ওর ছিপছিপে আশ্চর্য সুন্দর কায়াখানি যেন ভাস্কর্যের এক অভীষ্ট সিদ্ধি।

রাশেদ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটিতে একটু বিচলিত ভাব। কীসের যেন অস্থিরতা।

– 'আমাকে কেমন লাগছে?' অমৃতার সহাস্য প্রশ্ন।

একবার ঢোক গিললেন রাশেদ। চোখ সরিয়ে কিয়ৎ অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'খাবার এসে গেছে। খেয়ে নাও।'

কেমন লাগে মেজাজটা? যেন অমৃতা এখানে খেতে এসেছে! এমন বেরসিকও হয় নাকি মানুষ? অমৃতা ঠোঁট উল্টে বলল, 'আপনি খেয়ে নিন আমি খাব না। খিদে নেই। ' কথাটা বলে সে টাইলসের মেঝেতে সুন্দর ফর্সা নগ্ন পা দুখানি ফেলে এগিয়ে গেলো সামনে। ড্রইংরুমের কাউচে এসে বসল। তার পুতুল চোখে এখন বিরক্তির ছাপ। ঠোঁটে হতাশা। এই লোকটা ইগো ছাড়া কিছুই বোঝে না ছাই! বিরক্ত লাগে ঢং দেখলে! গজগজ করতে লাগল নিজের মনে মনে।

– ‘কী বলছ?’ প্রশ্নটা উড়ে এলো হঠাৎ। মানুষটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে কীসের একটা কাগজ নিয়ে। অমৃতা চোখ না তুলেই বলল, ‘কিছু না!’

– ‘এটা দেখো।’ ‘হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা কাগজটা দিলেন তিনি অমৃতাকে।

হাতের জুয়েলারি বক্স কাউচের ওপর রেখে কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে কাগজটা হাতে নিল অমৃতা, ‘কী এটা?’

ভাঁজ খুলে দেখল এ ফোর সাইজের কাগজের মাথায় এক যুবকের ছবি আটকানো।

– ‘এটা কার রেজ্যুমে?’

রাশেদ অমৃতার মুখোমুখি সোফায় বসতে বসতে বললেন, ‘বায়োডাটা।’

– ‘এটা দিয়ে আমি কী করব?’ বিরক্তিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তখন অমৃতার গলার স্বর।

– ‘ভাবছি তোমাকে একটা বিয়ে দেবো।’ সোফায় হেলান দিতে দিতে আয়েশ করে বললেন তিনি। ম্যাচের কাঠির মতো ভস করে জ্বলে উঠল অমৃতা।

– ‘কী?’ ঘরের ভেতর যেন বোমা বর্ষণ হলো অকস্মাৎ।

– ‘তোমার বন্ধুদের সবার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এবার তোমারও তো এ ব্যাপারে কিছু ভাবা দরকার তাই না? এই ছেলেটা ব্যারিস্টার। তোমার ফিল্ডেরই। গুলশানে নিজের চেম্বার আছে। ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো।’

অমৃতা আক্রোশে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সামনে বসা মানুষটাকে একদম আঁচড়ে কামড়ে দিতে মন চাইছিল তার হিংস্র জন্তুর মতো।

– ‘ফাজলামো করছেন?’

রাশেদের মুখে একটা ছায়া পড়ল।

– ‘ফাজলামো মনে হচ্ছে তোমার কাছে?’

– ‘তা নয়তো কী? আপনার কি আমাকে বিশ্বাস হয় না? আমি কি চিঠিতে আপনাকে বলিনি যে আমার পক্ষে অন্য কাউকে ভালোবাসা সম্ভব না?’

রাশেদ কুঞ্চিত কপাল নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন অমৃতার দিকে।

– ‘তোমাকে বিশ্বাস করেছি অমৃতা। আর বিশ্বাস করেছি বলেই আমার মনে হচ্ছে ইউ শ্যুড মুভ অন এ এস এ পি।

– ‘এতই সোজা?’

– ‘চেষ্টা করতে দোষ কোথায়?’

অমৃতা হাতে ধরে থাকা কাগজটা প্রচণ্ড ক্রোধের সাথে দুমড়ে মুচড়ে ফেলল একদম। ফুঁসে উঠে বলল,

– ‘আপনি এজন্যে ডেকেছেন আমাকে?’

রাশেদ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, ‘এরকম করছ কেন? এত ছেলেমানুষ হলে হয়?’

– ‘আর কোনোদিন আমাকে এসব বলবেন না। বললে খুব খারাপ হবে!

রাশেদ কী যেন একটা বলতে গিয়েও বললেন না আবার। চুপ করে গেলেন। কয়েকটা মুহূর্ত শব্দহীনভাবে কাটালো। ল্যাম্পশেডের হলদে নিষ্প্রভ আলোয় অমৃতা কটমটে চোখে তাকিয়ে রইল মানুষটার দিকে। জানালা দিয়ে একটা মিহি বাতাস ভেসে আসছিল। তিরতির করে কাঁপছিল ঝুলে থাকা পর্দা। কাউচে হেলান দিয়ে বসে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে চুপচাপ অমৃতাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন রাশেদ। এই মুহূর্তে পেশাগত বা সাংসারিক জীবনের কোনো চিন্তাই খেলছে না মাথায়। একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি সমগ্র চৈতন্যকে বশীভূত করে রেখেছে। মেয়েটির উপস্থিতি তাঁর কর্ম এবং ব্যক্তিজীবনের ওপর জমে থাকা সমস্ত ক্লান্তি, হতাশা এবং একঘেয়েমিগুলো যেন ঝাড়ন দিয়ে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

খানিক বাদে অমৃতার রাগ মোমের মতো গলে গেলো একেবারে। এখন কি রাগ করে থাকার সময়? এখন এই একলা নির্জন ঘর আর চোখের সামনে তার জীবনের একমাত্র আরাধ্য পুরুষ! সে তার সারা জীবনের বিনিময়ে আজকের এই মুহূর্তটিকে কিনে নিতে রাজি আছে। জুয়েলারি বক্সটা হাতে ধরে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো অমৃতা। হঠাৎ!

– ‘এটা আমাকে পরিয়ে দেবেন প্লিজ?’

কয়েক সেকেন্ড অমৃতার দিকে চেয়ে থেকে একটু অপ্রস্তুতভাবে রাশেদ বললেন, ‘শিওর!’

অমৃতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। ওর হাতে ধরা বাক্স থেকে চেইনটা তুলে নিলেন নিজের আঙুলে। অমৃতা পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। ফর্সা উন্মুক্ত ঘাড়ের ওপর ল্যাম্পশেডের হলদে আলো নেচে উঠল ঝিকমিকিয়ে। মানুষটার উষ্ণ নিঃশ্বাসের ঝাপটা এসে পড়ছিল ওর কাঁধের ওপর। রক্তে রক্তে নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল সেই নিশ্বাস। রাশেদ আস্তে করে চেইনটা ওর গলায় পরিয়ে দিলেন। হুক আটকাতে একটু সময় লাগল। হাতের আঙুল কয়েকবার ঘষা খেলো মসৃণ চামড়ায়। পরানো হয়ে গেলে অমৃতা ঘুরে দাঁড়ালো। ওর বুকের ওপর তখন লকেটটা দুলছে। লকেটের ওপর একটা আঙুল রেখে সে ধীরস্বরে বলল, ‘এটা আমার সাথে সব সময় থাকবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।’

কথাটা বলা শেষ করে সে সম্মুখে দাঁড়ানো মানুষটার চোখের দিকে তাকালো মুখ তুলে। আচ্ছন্ন গলায় বলল, ‘আপনি কি আমাকে একটু আদর করবেন এখন? নাকি সেদিনের মতো আজকেও বলবেন, নো ওয়ে!’

প্রতিরোধের শেকলটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে যাচ্ছিল। এক দুর্বার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল বিবেক, নীতিবোধ এবং অহংকার। মনে হচ্ছিল যেন অমৃতাই পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ নারী! রাশেদ আচমকা একটা হাত বাড়িয়ে অমৃতাকে নিজের খুব কাছে টেনে আনলেন। তারপর হাতের উল্টো পিঠ ছোঁয়ালেন আলতোভাবে ওর হেম রঙের গালের ওপর। গভীর কণ্ঠে – বললেন, 'এত চেষ্টার পরেও তোমাকে আমি এড়াতে পারছি না কেন বলোতো?' মানুষটার হাতের স্পর্শে অমৃতার বুক ধড়ফড় করছিল কবুতরের দুর্বল সিনার মতো। রক্তকণিকায় অগ্নি স্ফুরণ ছড়িয়ে যাচ্ছিল ফরফর করে। নিশ্বাস হয়ে উঠছিল ভারি। চারপাশে তখন শুধুই মদির রঙের এক ঝাপসা কুয়াশা। এই সময়টা অন্য সময়। এ এক অন্য পৃথিবী। এখানে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। শুধুই দুজন মোহাচ্ছন্ন মানব-মানবী। এদের বক্ষজুড়ে কেবল অতলস্ত তৃষ্ণা। বাকি সমাজ সংসার মিছে সব!

অমৃতা অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ে ধীরস্বরে বলল, 'পারছেন না কারণ আমি আপনাকে যতটা ভালোবেসেছি এতটা ভালো পৃথিবীর কেউ কোনোদিন কাউকে বাসেনি!

– 'এত মানুষ থাকতে হঠাৎ আমাকেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হলো কেন তোমার?'

– 'ইচ্ছে হলো কারণ আমাদের ইচ্ছেগুলোও আসলে অন্য কারো ইচ্ছে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'

রাশেদ ডান হাতের আঙুল খুব আলতোভাবে অমৃতার পাতলা ঠোঁটজোড়ায় ছোঁয়ালেন একবার তারপর সেই আঙুল নেমে এলো ওর গলায়··· কণ্ঠার হাড়ের সুন্দর তিলটায় ··· ধীরেধীরে রাশেদের ঠোঁটে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটে উঠল তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, 'পুতুলটাকে সুন্দর লাগছে!'

হঠাৎ করেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেল লোকটা। দুদিকে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক হচ্ছে না!' নেশাগ্রস্ত চোখ মেলে অমৃতা দেখল লোকটা মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে যাচ্ছে কাউচের দিকে। ধপ করে কাউচের ওপর বসে পড়ে কপালে হাত রাখল ক্লান্তভাবে। তারপর ভীষণ গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা সম্ভব না!

অমৃতা ছুটে এসে তার পায়ের কাছে বসল। দিশাহারা ভাবে বলল, 'কী হলো হঠাৎ?'

– 'সম্ভব না।'

– 'অসম্ভব বলে কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে?'

রাশেদ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'আমার ছেলেকে আমি কষ্ট দিতে পারব না।'

অমৃতা রাশেদের হাত চেপে ধরল, 'সামিকে আজ নয়তো কাল জানতেই হবে!'

- 'কষ্ট পাবে আমার ছেলে। ওর এত বড় ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দিতে পারব না।'

– 'আপনার কি মনে হয় না সত্যি লুকানোটাও এক ধরনের অপরাধ? সামির কি সত্যি জানার অধিকার নেই?'

– 'ইম্পসিবল! ওকে এসব জানানো যাবে না কিছুতেই!'

– 'আপনি কি ওকে ভয় পাচ্ছেন?

এ প্রশ্নে রাশেদের চোখের তারায় একটা শূন্যতা এসে ভর করল, 'ভয় আমার ছেলেকে নিয়েই। অন্য কিছুই নয়।'

– 'আপনি তো সারা জীবন ছেলের জন্য অনেক করলেন। আপনার ছেলে তো এখন বড় হয়েছে। তাকে তার মতো ছেড়ে দিন না! ও ভালোই থাকবে ইন শা আল্লাহ। এত ভাবছেন কেন? আপনি কি পুরনো দিনের লোক নাকি?'

– 'আমার ওই একটাই ছেলে।'

– 'আপনি জিবরান পড়েননি? তিনি বলেছিলেন– 'Your children are not your children. They are the sons and daughters of Life's longing for itself. They come through you but not from you. though they are with you, they belong not to you!' আমি কবিতা টবিতা পড়ি না। এই লাইনগুলো একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম।'

– 'আমি জানি সন্তান আমার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কিন্তু বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। থাকবে আজীবন।'

– 'তাহলে চলুন কোথাও চলে যাই আমরা। অনেক দূরে।'

রাশেদ ম্লান হাসলেন, 'তুমি এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।'

অমৃতার চোখে কোত্থেকে যেন এক টুকরো অভিমান এসে ভর করল। পাতলা ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে বলল, ‘জানি তো আপনার ছেলে, আপনার বিজনেস, আপনার পলিটিক্স, আপনার বৌ··· এগুলোই আপনার কাছে সব আমি তো কেউ না। আমার জন্য তো একটা ফোঁটা মায়া নাই কোথাও।’

রাশেদ অমৃতার হাত ধরে পায়ের কাছ থেকে টেনে তুললেন ওকে। বসালেন নিজের পাশে। তারপর ওর চোখের দিকে চেয়ে স্থিরতার সাথে বললেন,

– ‘আমি চাই তুমি যেন ভালো থাকো। তুমি ভীষণ ব্রাইট একটা মেয়ে। জীবনটাকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নাও। এই দেশের জন্য, দেশের মানুষগুলোর জন্য তোমার অনেক কিছু করার আছে।’

– ‘আপনাকে ছাড়া কিছুই সম্ভব না।’

– ‘অমৃতা তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমার স্ত্রী পুত্র আছে। সংসার আছে। বোঝার চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি!’

– ‘আপনি কি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন?’ প্রশ্নটা কেমন কাঁপিয়ে দিল রাশেদকে। একটু চমকানো চোখে তাকালেন তিনি অমৃতার দিকে। কীসের যেন একটা দ্বিধা খেলে গেলো চোখে। উত্তরে কিছুই বললেন না। দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব নিয়েই চুপ করে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ। তারপর একটা সময় খুব গম্ভীরভাবে বললেন, ‘তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এটা তোমার জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। আমি কোনোভাবেই আমার এতদিনের পুরোনো সংসারকে অপমান করতে পারব না।’

– ‘অপমান করবেন কেন? পরিবর্তন মেনে নেয়ার সাহস থাকা উচিত সকলের। পরিবর্তন মানেই অপমান নয়।’

– ‘সে শুধু আমার স্ত্রীই নয়। আমার সন্তানের মা। তোমার মতো ছেলেমানুষী করলে তো আমার চলবে না অমৃতা!’

– ‘এর মানে আপনি আমাকে ছাড়তে পারবেন কিন্তু আপনার সংসার ছাড়তে পারবেন না। এই তো?’

রাশেদ চুপ করে রইলেন। উত্তর দিলেন না।

অমৃতার চোখ দুটো আস্তে আস্তে ভিজে উঠছিল। সে চাপা গলায় বলল, –’আমি এমন ছিলাম না রাশেদ। আমাকে আপনি পাগল করে দিয়েছেন! কী করেছেন আপনি? জাদু জানেন নাকি?’

রাশেদ অমৃতার পুতুল মুখটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা বড় শ্বাস ফেললেন,

– ‘জাদু তো তুমি করেছ আমাকে। এই যে আমি ইম্পরট্যান্ট মিটিং ক্যানসেল করে তোমার সাথে এখানে এসে বসে আছি। আমিও কি আগে এরকম ছিলাম নাকি?’

এ কথা শুনে অমৃতার ঠোঁটে একটা স্ফীত হাসি ফুটল। কান্নার ভেতরে উঁকি দেওয়া হাসিটা মেঘ ভাঙা সূর্যের আলোর মতোই সতেজ। ভারি সুন্দর দেখালো তাকে সেই

সময়। কিন্তু হাসিটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেলো আবার। চিন্তাযুক্ত গলায় সে বলল,

– ‘আমি যে আপনাকে চাই। ভীষণভাবে চাই! এই সত্যিটা সামিকে আমার বলতেই হবে আজ নয়তো কাল। সামি আমার বন্ধু। আমার বন্ধুকে আমি ঠকাতে পারব না!’

হঠাৎ সেলফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। রাশেদ ফোন কানে ধরে ‘হ্যালো’ বললেন। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। তারপর তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজযুক্ত রেখা ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্তভাবে ‘আচ্ছা আমি আসছি’ বলে ফোনটা কেটে দিলেন।

– ‘কী হয়েছে?’

– ‘সুলেমান হার্ট অ্যাটাক করেছে। আমি এখনই একবার যাব ওকে দেখতে। চলো তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেই।’

অমৃতা চিন্তিত গলায় বলল, ‘হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করল? আহা বেচারা! সেদিনও তো সুস্থ ছিল। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি জামা চেঞ্জ করে আসছি।’

৮৪

সুলেমান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল রাত বারোটায়। মৃত্যু সংবাদটা সামিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। সে ঘুমোতে পারছিল না। সারারাত বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে। একটু পর পর বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। হৃদি হাজার চেষ্টা করেও তাকে এক মুহূর্তের জন্যে শান্ত করতে পারছিল না। তার নিজেরও অস্থির লাগছিল।

খাঁচা বন্দি পাখির মতো ছটফট করেছে দুজনে সারারাত। সামির উদ্বেগের কারণ অবশ্য শুধু সুলেমানের মৃত্যু নয়, তার বাবা মায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিপর্যয়ও তাকে অনেকাংশে দুর্বল করে তুলেছে।

হৃদির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ছিল অমৃতার ওপর। বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল রাগটা শরীরের সমস্ত কোষে কোষে। একজনের ভুলের কারণে আজ কতগুলো মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সমস্ত দোষ অমৃতার। হৃদি এই মুহূর্তে একশবার, হাজারবার চিৎকার করে বলতে পারবে কথাটা। অমৃতাকে এখন তার আচমকা উড়ে আসা কালবৈশাখীর এক সর্বনাশা আগ্রাসী ঝড় বলে মনে হচ্ছে। স্বার্থপর, হীন এবং নীচ! এমন তো ছিল না মেয়েটা। হঠাৎ করে কেন এমন ধুম পাগল হয়ে গেলো? এ কোন শনির দশা লাগল তাদের জীবনে? ভালোই তো ছিল। বাবা, মা, ভাই, বোন আর বন্ধুরা। এই আপন কিছু মানুষ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট দুনিয়াটায় হেসেখেলে ভালোবেসে ভালো থেকে কি একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত না? কেন এমন হলো? কেন?

সামির একটু চোখ লেগে এসেছিল। হৃদি সেই সুযোগে গভীর রাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিভাকে ফোন করল। কারো সাথে কথা বলাটা খুব জরুরি এখন তার জন্য। বুক ভার হয়ে আছে। বিভা সব শুনেটুনে বলল,

– 'অমৃতা বেচারির ওপর এতটাও রাগ করিস না তুই। ও তো একটু এমনই। গাধাছাদা পাগল ছাগল!'

– 'অমৃতা পাগল ছাগল হতে পারে। কিন্তু গাধাছাদা কোনোমতেই না। তুই জানিস না সামি কী পরিমাণ আপসেট হয়ে গেছে। আমি এখন কী করব?

– 'এত ভেঙে পড়ার কিছু নাই। দ্যাখ পৃথিবীতে সব সম্পর্ক আজীবনের জন্য হয় না। সামির বাবা মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আসলে তাকে সেটা মেনে নিতে হবে। ও তো ছোটবাচ্চা না। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ হয়ে এই বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে পারবে না?'

– 'আরে ভাই, সেটা নাহয় মানল। কিন্তু এর পেছনে যে অমৃতা দায়ী। ওর নিজের বন্ধু দায়ী সেটা কীভাবে সহ্য করবে? উফ আল্লাহ! আমি ভাবতে পারতেছি না কিছুই!'

'কী করিস?' হঠাৎ প্রশ্নটা কানে এসে লাগল। চমকে উঠে পেছন ফিরল হৃদি। সামি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার দরজার সামনে। দেখামাত্র এক অজানা শঙ্কায় হৃদির আত্মা কেঁপে উঠল থরথর করে। সামি কথাগুলো শুনতে পায়নি তো!

ফোন কেটে দিয়ে সে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, 'এই তো, বিভা ফোন করেছিল।'

– 'তুই কী বলছিলি?' সামির কণ্ঠস্বর কেমন যেন অদ্ভুত শীতল! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে হৃদির।

– 'বলছিলাম··· বলছিলাম যে··· মানে সুলেমান চাচার মৃত্যু সংবাদটা দিলাম। মনটন খারাপ আমাদের। এটাই বললাম।'

কথাটা শুনে সামি কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইল হৃদির দিকে। তারপর হৃদির একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে আসলো ঘরের ভেতর। বিছানায় বসিয়ে দিল ওকে। আস্তে ধীরে ওর কোলের ওপর মাথাটা রেখে পা টেনে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

কেমন যেন থম ধরা গলায় বলল, 'আমাকে ফেলে যাস না কোথাও। একা থাকতে ভালো লাগে না।'

হৃদি সামির ঝাঁকড়া চুলের ভেতর চিরুনির মতো হাতের আঙুল চালিয়ে বলল, 'কোথাও যাব না। যাইনি তো! এখানেই ছিলাম!'

– 'মানুষের জীবনটা কী অদ্ভুত নারে? সুলেমান চাচার মতো আমরা সবাই একদিন মরে যাব!' ভারি বিষণ্ণ আর করুণ শোনায় সামির গলা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে হৃদির, 'হ্যাঁ, মরতে তো হবেই!'

– 'এইযে এই পৃথিবীকে আমি এত ভালোবাসি। আমি মরে গেলে এ পৃথিবীর কিছু আসবে যাবে না। সবকিছু একই রকম থেকে যাবে। থাকব না শুধু আমি।'

– 'এসব ভাবিস না।' অস্ফুটে বলল হৃদি।

কয়েকটা ক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। ঘর অন্ধকার। এয়ারকন্ডিশনের চিঁচিঁ ভোঁতা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই চারপাশে। আছে শুধু নিশ্বাসের শব্দ। সামির বুক উঠছে নামছে। ঘড়ঘড় করে একটা শব্দ হচ্ছে তার বুকে। মনে হচ্ছে বুঝি দম নিতে খুব কষ্ট।

– 'আমার বাবা কাকে ভালোবাসে? যাকে ভালোবাসে তার মধ্যে কী আছে? যা আমার মায়ের মধ্যে নেই?'

প্রশ্নটা হৃদিকে শিহরিত করে তুলল। চোখের কোলে উপচে উঠল জল। সে সামির কপালে একটা চুমু খেয়ে ধরা গলায় বলল, 'ধুর বাদ দেতো এসব! ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

৮৫

রাশেদ অনেক রাত অবধি হাসপাতালে অবস্থান করেছিলেন। সুলেমানের পরিবার খুব প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল। তাদের ভাষ্যমতে গত পরশু রাত দশটায় সুলেমানকে একদল গুণ্ডা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। খুব ভোরে হাসপাতাল থেকে ফোন যায় বাড়িতে। খবর পেয়ে ছেলেমেয়েরা হাসপাতালে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। সুলেমানের সন্তানদের ধারণা এই মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যে কোনো উপায়ে তারা পিতার হত্যাকারীর শাস্তি চায়। ঘটনার পেছনের গল্পটা টের পেতে রাশেদের খুব বেশি সময় লাগল না। তিনি অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান মানুষ। রোমেলার মেজো মামা এধরনের কাজে বরাবরই ওস্তাদ। এর আগে এক বেয়াদব ড্রাইভারকে শায়েস্তা করেছিল রোমেলা মামার সাহায্য নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে এবারেও এ ধরনের কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়েছিল। সুলেমান নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তার কোনো শত্রু নেই, পাওনাদার নেই। তার মতো গুরুত্বহীন মানুষের পেছনে সময় নষ্ট করার মতো লোক পৃথিবীতে বিরল। অতএব এই দুর্ঘটনার পেছনে যে রোমেলার ষোলো আনা হাত আছে তা জলের মতো পরিষ্কার।

হক সাহেব খুব প্রয়োজন না পড়লে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। একেবারে নিরুপায় হয়েই করতে হয় কালেভদ্রে। যেমন আজকে হলো। পুলিশের উপরিমহলের

সাথে যোগাযোগ করে তিনি অভিযোগ নামাটি বাতিল করার ব্যবস্থা করলেন। পুলিশ কোনোমতেই আর এই মামলা নেবে না। কিন্তু সুলেমানের ছোট ছেলেটা খুব ঘাড়ত্যাড়া। সে ইতিমধ্যে দুই একজন মানবাধিকার কর্মীর সাথে কথা বলে ফেলেছে। তাদের বাবা হক সাহেবের পুরোনো কর্মচারী এটা সকলে জানে। সংবাদ মাধ্যমগুলো পান থেকে চুন খসলেই হুড়মুড় করে ছুটে আসে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পিন্ডি চটকাতে। সুলেমানের পরিবারকে না থামালে এই খবর চাপা থাকবে না। যে ক্ষতি হয়েছে তা টাকা দিয়ে কোনোভাবেই পূরণযোগ্য নয়। টাকা সব পারলেও মানুষের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবুও তিনি মোটা অংকের টাকা দিলেন সুলেমানের পরিবারকে। এই ছেলেমেয়েগুলো তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। তাদের বাবার মৃত্যুর জন্য যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হক পরিবার দায়ী তা এদের চিন্তার বাইরে।

বাড়ি ফিরলেন খুব ভোরে। প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিয়ে। সুলেমান তাদের পরিবারের পুরোনো লোক। তিনি যখন ক্লাস ফাইভ কি সিক্সে পড়েন সেই সময় থেকে সে এ বাড়িতে কাজ করে। এরকম সৎ, বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান কর্মচারী আজকালকার জামানায় একেবারেই দুর্লভ। বাড়ি ফেরার পর তিনি নিজের বেডরুমে গেলেন না আর। ছাদে এসে বসলেন। তখনও ছোপ ছোপ অন্ধকারে ভরে আছে চারপাশ। পুবের আকাশ লাল। সুইমিংপুলের নীল জল ভোরের আবছা আলোতে ধূসর হয়ে আছে। পুল সাইডে চেয়ার পেতে বসলেন তিনি। সারা রাত নির্ঘুম কেটেছে। এখনো চোখে ঘুম নেই। বুকে একটা ব্যথা ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কাঠকয়লার মতো পুড়ছে ভেতরটা। এক নিগূঢ় অপরাধবোধ চোরাবালির মতো যেন টেনে নিচ্ছে মাটির অতল গহ্বরে। সুলেমানের মৃত্যুর দায়টা তো তাঁর ঘাড়ে এসেই বর্তায়। যদি তিনি সেদিন রোমেলাকে কথাগুলো না বলতেন… সুলেমানকে মরতে হতো না। অমৃতা তাঁর জীবনে না আসলে… সুলেমানকে মরতে হতো না। তাঁর স্ত্রীর যদি বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সত্যিকারের একটা ভালো মানুষের মন থাকত… সুলেমানকে মরতে হতো না। আজ শুধু তাঁর এলোমেলো, অবিন্যস্ত, উচ্ছন্ন জীবনের জন্যেই সুলেমানকে মৃত্যুর দ্বারগ্রস্ত হতে হলো। ছেলেমেয়েগুলোকে হতে হলো পিতৃহারা।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় পর তিনি নিচে নেমে নিজের বেডরুমে আসলেন। স্ত্রীর সাথে চোখাচখি হলো। তিনি কোনো বাক্য বিনিময় করলেন না। চুপ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলেন। রোমেলার মুখে আতঙ্ক আছে কিন্তু অপরাধবোধ নেই। বিছানার ওপর গুটিশুটি হয়ে থম ধরে বসে আছেন। নির্বিকার, নিথর। তাঁর কি উচিত না এই মুহূর্তেই ক্রোধে ফেটে পড়ে এই মানবীটিকে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দেওয়া? একটা ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া ভেতরে জমে থাকা সমস্ত ক্রোধ এবং তিক্ততা? হ্যাঁ সেটাই হয়তো করা উচিত কিন্তু সবার জীবনে সব উচিত কাজ যথা সময়ে করা হয়ে ওঠে না। মনে চেপে রাখা দুঃখ, কষ্ট আর একাকিত্ব আপনজনের সাথে ভাগ করে নেয়ার সুখটা রাশেদ আজ অবধি উপলব্ধি করতে পারেননি। হয়ে ওঠেনি··· আর হয়ে ওঠেনি বলেই তাদের এত বছরের জীবনে কখনোই দাম্পত্য কলহ কিংবা মান অভিমান ছিল না। ছিল না কোনো তরঙ্গ। তরঙ্গবিহীন নদী আর প্রাণহীন মাটির পুতুলের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

৮৬

– 'গতকাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

আজ ছুটির দিন। ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজে। নাশতার পালা শেষ হলো মাত্র। নিজের ঘরে দীপার সাথে এটা সেটা নিয়ে গল্প করছিল অমৃতা। মায়ের এই আচমকা প্রশ্নটা হঠাৎ বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের মতো এসে বিঁধল তার বুকে। মিথ্যা কথা চট করে মুখে আনা আজও দুষ্কর ব্যাপার তার জন্য। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো সে। চোখের ওপর পড়ল কীসের যেন গাঢ় ছায়া। স্বভাববিরুদ্ধ মিনমিনে গলায় অনেক কসরৎ করে বলল,

– 'কেন জানতে চাইছ?'

মায়ের চোখদুটি যেন আগুনে ঝলসাচ্ছে। ফোঁসফোঁস করে পড়ছে নিশ্বাস। দীপা বেশ ঘাবড়ে গেছে। তার নিজের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটে থাকলেও বড়বোনের সাথে এই প্রথম। মায়ের এই চেহারাটা সে চেনে। দারুণ কোনও খারাপ সংবাদ শুনলে মা এমন দিশাহারা পাগল পাগল হয়ে যান। তার চোখের দৃষ্টি তখন হয়ে ওঠে ক্ষ্যাপাটে।

অমৃতা ইচ্ছাকৃতভাবে একটু বেশি সময় খরচ করে ধীরেধীরে বিছানা ছেড়ে উঠল। মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে তো বলেছিলাম যে··· হৃদির বাসায় যাচ্ছি। '

– 'মিথ্যা কথা বলিস না!' চিৎকার করে উঠলেন মা।

ঠিক সে সময় গুমোট এবং ভ্রুকুটি গম্ভীর চেহারা নিয়ে বাবা প্রবেশ করলেন ঘরের ভেতর। হাত দুটি পেছনে। শরীরটা একটু কুঁজো। দুই ভ্রুর মাঝখানের চামড়ায় কুঞ্চন। চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

– 'তুই কি গতকাল গাজীপুর গিয়েছিলি?' বাবা প্রশ্নটা করলেন সরাসরি। অমৃতার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায়।

দম আটকে গেলো স্বরনালির কাছে। মেরুদণ্ডে খেলে গেলো ভয়। ফ্যাকাশে মুখে অমৃতা শুধু চেয়ে রইল বাবার দিকে। কিছু বলতে পারল না। কয়েকটা সেকেন্ড এমন থম ধরা অবস্থায় কেটে যাবার পর বাবা হুংকার ছেড়ে বললেন, 'কথা বলছিস না কেন?'

অমৃতা বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। যন্ত্রচালিত গলায় বলল, ‘হ্যাঁ গিয়েছিলাম।’

– ‘কেন গিয়েছিলি?’

বিছানার চাদর শক্ত করে দু হাত দিয়ে খামচে ধরে অমৃতা কোনো রকমে বলল, ‘একজনের সাথে মিট করতে।’

– ‘কার সাথে?’ শীতল! ভীষণ শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বাবা।

অমৃতা এ প্রশ্নের কোনো তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারল না। পরের ঘটনাগুলো কী রকম যেন ঝড়ের মতো ঘটে গেলো। মা কোনো কথাবার্তা না বলেই অমৃতার মাথায় একটা গাট্টা মেরে তারস্বরে বললেন, ‘তুই কি ওই লোকটার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলি?’

অমৃতা গাট্টা খেয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল। স্থানুর মতো। নড়ল না। কিছু বললও না।

– ‘তোমার মা যা বলছে তা কি সঠিক?’ বাবার প্রশ্ন।

রুদ্ধশ্বাসে অমৃতা বলল –’মা কী বলেছে?’

মায়ের আজকে হয়েছে কী কে জানে! সেকেন্ডও গড়াল না তার আগেই অমৃতার মাথায় দ্বিতীয় গাট্টাটা এসে পড়ল।

– 'উফ, মারছ কেন?' অস্ফুটে কঁকিয়ে উঠে বলল অমৃতা।

মায়ের গলা সপ্তমে চড়ল, 'মারব না তো কী করব? তোর মতো মেয়েকে মেরেই ফেলা উচিত। বল গাজীপুর কেন গিয়েছিলি? কার বাসায় গিয়েছিলি?'

অমৃতার ঠোঁট শুকনো। মুখে রক্ত নেই। চোখদুটো মেঝের দিকে নিবদ্ধ। বিছানার চাদর ওর খামচির আঘাতে তখন দুমড়ে মুচড়ে জীর্ণপ্রায়।

– 'তুই কি সামির বাবার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলি?' গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে টেনে টেনে কথাটা বললেন মা।

অমৃতার চিবুক ঝুলে যাচ্ছিল বুকের ওপর। সাইক্লোনের মতো একটা শব্দ হচ্ছে চারপাশে। মাথায় কিছুই খেলছে না। মায়ের কানে এসব কথা কী করে গেলো তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সে। মহসিন আংকেল যদি কিছু বলেও থাকেন মা কী করে শিওর হলেন যে ওটা রাশেদের বাসাই ছিল? হিসাবে গোলমাল লেগে যাচ্ছে। লজিক দিয়ে আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সে।

মায়ের কথাবার্তা লাগামছাড়া হয়ে গেছে। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন তিনি, 'এই তোর লজ্জা করে না? একটা ম্যারিড লোকের সাথে যে লোকের এতবড় ছেলে আছে তার সাথে তুই লুকায় লুকায় দেখা করিস? তোকে কি আমরা এই শিক্ষা দিয়ে বড় করেছি?

হ্যাঁ? এই দিন দেখার জন্য তোকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছি?' এটুকু বলে মা বাবার দিকে ঘুরে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলেছিলাম মেয়েকে শাসন করো! শাসন করো! তোমার ছেলে নেই বলে মেয়েকে তুমি ছেলের মতো স্বাধীনতা দেবে। কোনো কাজে বাধা দেবে না! এখন হলো তো শিক্ষা?'

বাবা ঠান্ডা চোখে অমৃতাকে দেখছিলেন। তাঁর মুখখানা এখন ঝড় ওঠার পূর্ব মুহূর্তের থমথমে আকাশের মতো কালো হয়ে আছে।

– 'এই দীপা! আমার ফোনটা নিয়ে আয় তো। ওই লোকের সাথে একটা বোঝাপড়া করে নেই। আমার মেয়ের সাথে এসব ফাজলামো চলবে না।' বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন অত্যধিক কঠিন স্বরে।

অমৃতা অনেক কষ্টে বলল 'বাবা প্লিজ!'

দীপার ফোন নিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না। বাবার হাত কাঁপছে উত্তেজনায়। রাগে ফুলে আছে কপালের দুপাশের নীল রগ। অমৃতা অস্থিরভাবে উঠে এসে বাবার হাত ধরল, 'প্লিজ, বাবা প্লিজ! উনাকে তুমি ফোন করে অপমান করো না!'

হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন বাবা।

– 'চুপ কর!'

– ‘বাবা! ও বাবা! উনার কোনো দোষ নেই বিশ্বাস কর। মানুষটাকে তুমি কিছু বোলো না। ইনসাল্ট করো না প্লিজ!’ কাকুতিমিনতি করতে লাগল অমৃতা। বাবার মন কিছুতেই গলছে না। রক্তচক্ষু নিয়ে তিনি মোবাইলের ডায়াললিস্ট ঘাঁটছেন। অনেক আগে একবার সামির বাবার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল। সেই সুবাদে ফোন নম্বরটা হয়তো মোবাইলে সেভ করা আছে কিন্তু এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজনের সময় কিছুই পাওয়া যায় না ছাই!

অমৃতা বাবার পা জড়িয়ে ধরে করুণ গলায় বলল, ‘বাবা, যা বলার আমাকে বলো। উনাকে কিছু বোলো না। বিশ্বাস করো সব দোষ আমার!’

বাবা নিজের পা অমৃতার বাহুবন্ধন থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ‘ওই ব্যাটাকে আমি শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব। কী ভেবেছে সে? দেশে কি আইন কানুন নেই? ক্ষমতা আছে বলে যাচ্ছেতাই করে বেড়াবে?’

– ‘না বাবা! না!’

– ‘চুপ কর তুই!’

– ‘বাবা আমি উনাকে পছন্দ করি।’ কণ্ঠনালি ছিঁড়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসলো কথাটা অমৃতার গলা থেকে। বাবার চোখে ধক করে জ্বলে উঠল এক থোকা আগুন।

– ‘কী বললি?’

অমৃতার কণ্ঠ রোধ করে দিল অশ্রুর ডেলা। অনেক কষ্টে কান্নাটা ঢোক গিলে ফেলে সে যথাসাধ্য দৃঢ় গলায় বলল, 'আই লাভ হিম!'

স্তম্ভিত বাবার হাত থেকে সেলফোনটা অবলীলায় খসে পড়ে গেলো। মনে হলো তিনি বুঝি আরেকটু হলেই জ্ঞান হারাবেন।

– 'স্যরি বাবা! তোমাদের কষ্ট দিতে চাইনি। হয়ে গেছে ব্যাপারটা। স্যরি!' মা এগিয়ে এসে অমৃতার হাত ধরে বসা থেকে টেনে দাঁড় করালেন।

– 'কত দূর এগিয়েছিস?'

অমৃতা প্রশ্নের ধরন বুঝল। কিন্তু কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

– 'বের হয়ে যেতে বল ওকে আমার বাসা থেকে!' হঠাৎ বাক্যটা উড়ে এলো খরশান রক্ত হিম করা তুষার ঝড়ের মতো। অমৃতা চমকে তাকালো বাবার দিকে।

– 'বের হয়ে যা!' কথাটা বলে বাবা বুনো মোষের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসলেন। তাঁর যেন জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তাঁকে দেখাচ্ছে ক্ষিপ্তবৎ উন্মাদের মতো। অমৃতার কনুই ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসলেন ঘর থেকে। অমৃতা স্তব্ধ হয়ে বাবাকে দেখছিল। এই বাবাকে যেন সে চেনে না।

মা বাধা দিলেন, 'কী করছ তুমি? কোথায় যাবে ও?'

বাবা তখন ক্রোধে অন্ধ। চোখ দুটি হিংস্র পশুর মতো জ্বলছে নিরন্তর, —'যেখানে খুশি যাক। এমন মেয়ে আমার দরকার নেই!'

দীপা ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এসে বাবার পথ আটকে দাঁড়ালো, 'বাবা প্লিজ! এমন করো না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

ছোট মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তিনি সামনে থেকে। তারপর বড় মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে বের করে দিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো মুখের ওপর অমৃতা ঠিকমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই। স্তম্ভিত অমৃতা অনেকটা ক্ষণ নড়তে পারল না। পায়ের তলা থেকে যেন সরসর করে মাটি সরে যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসের খুঁটি হয়ে যাচ্ছে নড়বড়ে। জীবনে এর আগে কোনোদিন এতটা অসহায়বোধ করেনি সে। বুকের গভীর থেকে অভিমানের চাপা একটা আর্তনাদ উঠে আসতে চাইছে। বাবা এমনটা করতে পারল? এতটা নিষ্ঠুর হতে পারল? মিনিট পাঁচেক সময় অমৃতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। স্থির, প্রতীক্ষমাণ এবং নিশ্চল হয়ে। মনে বড়ই আশা, দরজাটা বুঝি একসময় খুলে যাবে। বাবা মা আদর করে মেয়েকে পুনরায় ঘরে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর অন্য কেউ না বুঝলেও নিজের বাবা মা অন্তত তার মন বোঝার চেষ্টা করবে। সময় কাটতে লাগল টিকটিক করে। দরজাটা চোখের সামনে ম্যাজিকের মতো খুলে গেলো না একটি বারের জন্যও। বন্ধ হয়েই রইল।

একটা সময় অমৃতা ধীর পায়ে হেঁটে সরে আসলো দরজার সামনে থেকে। তার পরনে লাল রঙের টি শার্ট। কালো ট্রাউজার। ট্রাউজারের পকেটে ভাগ্যক্রমে সেলফোনটা রাখা আছে। কোনো টাকা পয়সা সঙ্গে নেই। পায়ে এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল। এরকম নিঃস্ব অবস্থায় সে কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? আকাশ আর রুদ্র দুজনেই ঢাকার বাইরে। এ মুহূর্তে সামি হৃদি ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়স্থল তার মাথায় আসছে না। বন্ধুরাই একমাত্র ভরসা।

বাইরে তখন মেঘ ডাকছে গুরুগুরু শব্দে। ঝড়ো বাতাসে উড়ছে ধূলো। লিফ্ট থেকে বেরিয়ে বিধ্বস্ত, অসহায়, ভগ্নহৃদয় অমৃতা যখন এলোমেলো পায়ে অ্যাপার্টমেন্টের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক তখনই পকেটে রাখা সেলফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। মেসেঞ্জারে কল এসেছে। গ্রুপ কল। ফোন করছে বন্ধুরা। এই গ্রুপে সবাই আছে শুধু সামি নেই। অমৃতা ফোন ধরতেই হৃদি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'অমৃতা! প্রব্লেম কী তোর? হোয়াট দ্যা ফাক আর ইউ ট্রাইং টু ডু?'

– 'মানে কী?' মন খারাপের অতল কুয়োর ভেতর থেকে প্রতিধ্বনির মতো বেরিয়ে আসলো শব্দ দুটো।

হৃদি ফণাধারী সাপের মতো ফোঁস করে উঠে বলল, 'তুই কি একটা মানুষ? মানুষ কখনো এত খারাপ হইতে পারে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

বিভার আওয়াজ পাওয়া গেলো, 'আহা! তুই এরকম অফেন্সিভ কথাবার্তা বলতেছিস কেন?'

– 'একশবার বলব অফেন্সিভ কথা। তুই কি জানিস? আমার শাশুড়ি সামিরে বলছে যে ওর বাপের অন্য একজনের জন্য ফিলিংস আছে?'

অমৃতা কম্পিত বক্ষ নিয়ে বলল, 'কবে বলেছে?'

– 'কবে বলেছে তা জেনে তুই কী করবি? তোর কি মনের মধ্যে একটু মায়া দয়া নাই? একটা ছেলের এই বয়সে এসে এরকম কথা শুনলে কেমন লাগে তোর কোনো

ধারণা আছে? তুই কেমন মেয়েমানুষ? একটা মেয়ে হয়ে অন্য মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছিস? তুই কি আমার বন্ধু অমৃতা? তোকে আমার বন্ধু বলতে লজ্জা হচ্ছে!'

– 'আরে থাম থাম!' আকাশ বলে উঠল, 'হৃদি লিসেন। মাথা ঠান্ডা কর। অমৃতা!... শোন!

অমৃতার গলা কাঁপছিল। বাইরে তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। ভর দুপুরে সন্ধ্যা নেমেছে যেন। হাওয়ায় খুব জোর। গেটের ফাঁকফোকর গেলে বৃষ্টির জল তেড়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল ওকে। তবে ভিজছিল শুধু শরীরটাই। বুকের ভেতরে তো মরুভূমির শুষ্কতা!

–' বল।'

– 'আমাদেরকে প্লিজ একটু খুলে বল যে তোরা আসলে এখন কোন স্টেজে আছিস। মানে তোর কি উনার সাথে রেগুলার যোগাযোগ হয়?' আকাশের স্থির গলার প্রশ্ন।

– 'না।'

এবার রুদ্র কথা বলল, 'তাহলে দোস্ত ব্যাপারটা তুই এখানেই মিটায় ফেলা। কারণ হৃদির কাছ থেকে যা শুনলাম সামি অনেক শকড। ও এমনিতেই আলালের ঘরের দুলাল টাইপ ছেলে। এই প্রেশার ও নিতে পারবে না। আর যদি কোনো একভাবে জানতে পারে যে এই ঘটনার সাথে তুই জড়িত আছিস। তাহলে বুঝতেই পারতেছিস কাহিনি কী হবে।'

অমৃতা চুপ করে রইল। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। মুখ পাণ্ডুর। এক প্রবল ঝড় যেন এইমাত্র তার মাথার ওপরের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সব কিছু যেন শেষ হয়ে গেছে। বাবা মা ছোট বোনকে নিয়ে তার একটা পরিবার ছিল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধুরা ছিল, মনের গভীরে একটা বৃষ্টিমহলের স্বপ্ন ছিল… এখন কেউ নেই। কিচ্ছু নেই! এ জীবনে আর বৃষ্টিমহল সত্য হলো না। আহা বৃষ্টিমহল! আহারে বৃষ্টিমহল। স্বপ্নে ছিলি, স্বপ্নেই রইলি তুই!

চলে যাবে সে। দূরে, বহুদূরে। এই বাসায় আর কখনোই ফিরে আসবে না। ফিরবে না এই শহরে। এ শহরে সবকিছু মিথ্যে। উঁচু উঁচু দালানগুলোর মতোই মানুষের মনও এখানে ইট কাঠ পাথরেরই তৈরি। নির্জীব এবং যান্ত্রিক! বেশ তো! তোমরা সবাই অমৃতাকে ঘেন্না করো? তবে জেনে রাখো অমৃতাও তোমাদের এই ছদ্মবেশী, মিথ্যে মুখোশধারী সমাজকে ঘেন্না করে।

– 'বুঝতে পেরেছি। আমি রাখি এখন।' বলে সে ফোনটা কেটে দিল 1 পা বাড়ালো সাদা বৃষ্টির ঘেরাটোপে। পকেটে একটাও পয়সা নেই। কোথায় যাবে? কী করে যাবে? যাবার আগে একটা বার কি সেই মানুষটাকে দেখার সৌভাগ্য হবে? শেষবারের মতো? মোহাম্মদপুর থেকে উত্তরা হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে? কত ঘণ্টা? একরাশ বিভ্রান্তি আর অনিশ্চয়তা বুকে নিয়ে ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটা শুরু করল সে।

৮৭

ব্রেকফাস্টের পর সামি বাবা মায়ের বেডরুমে উঁকি দিল একবার। খোলা জানালা দিয়ে ঝড়ো বাতাস উড়ে আসছে। থেকে থেকে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। বৃষ্টির দিন বলে দিনের বেলায়ও ঘরের ভেতর দুটো টিউবলাইট জ্বলছে। মা চুল আচঁড়াচ্ছেন ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। বাবা গোসল সেরে বেরিয়েছেন মাত্র। সামিকে দেখে তিনি

একটু ম্লান হাসলেন। সামি সেই হাসির কোনো উত্তর না দিয়েই মায়ের দিকে পলক তুলে তাকালো একবার। মায়ের মুখজোড়া উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। বুক মোচড় দিয়ে ওঠে মায়ের করুণ মুখটা দেখলে। সামি এগিয়ে এসে মায়ের মাথায় একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, 'এখন কেমন আছ?'

– 'এখন ভালো আছি আব্বু। তুমি চিন্তা করো না।' ছেলের হাত চেপে ধরে আশ্বস্ত করলেন রোমেলা।

রাশেদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সাধারণত ছেলের সামনে পড়ে গেলে তিনি যত কাজই থাকুক না কেন একটু সময়ের জন্য হলেও ছেলের সাথে কুশল বিনিময় করেন। খোঁজ খবর নেন। আজ তাকে সেসব কিছুই করতে দেখা গেলো না। আজ তিনি বড়ই আনমনা এবং বিষণ্ণ

– 'বাবা! তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে!'

ছেলের গলার স্বর শুনতে পেয়ে যেন তাঁর ঘোর ভাঙল। চমক লাগা চোখ মেলে চাইলেন তিনি। দরজাটা আধখোলা অবস্থায় রেখে চৌকাঠে দাঁড়িয়েই বললেন, 'হ্যাঁ বলো।'

সামি তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলল না। তাকে শীর্ণ দেখাচ্ছে। ফর্সা মুখখানায় দপদপ করছে তেজের গনগনে আঁচ। পিতা পুত্র কয়েকটা মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে রইল একে অপরের দিকে। সামি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে সাহস সঞ্চয় করল যেন। তারপর শক্ত গলায় বলল, 'মা বলছিল যে…' এটুকু বলে থেমে পড়ল সে। বুক কাঁপছে তার। হাতে পায়ে একটা শিরশিরে ভাব। মুখে জড়তা। পিতার সাথে এ ধরনের

অরুচিকর বিষয় নিয়ে আলাপ করতে কোন সন্তানের ভালো লাগে? কিন্তু করতে যে হবেই। ভাগ্যের ফের!

– 'বাবা, ডু ইউ হ্যাভ ফিলিংস ফর সামওয়ান এলস?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল সে। রাশেদের চেহারার পট বদলে গেলো নিমেষে। চোখে ঝিলিক দিল তীব্র বিস্ময়। সেই সাথে নিদারুণ অপমানবোধ এবং রাগ। রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড অবিশ্বাসের গলায় বললেন, 'তুমি বলেছ সামিকে এসব কথা?'

রোমেলা চোখ সরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। স্থিরকণ্ঠে বললেন, 'আজ নয়তো কাল ওকে জানাতে তো হতোই!'

রাশেদ বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চেয়ে রইলেন রোমেলার দিকে। একটা অদম্য ক্রোধ তাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রাস করল। মনের কোণে যতটুকু সম্মান এই রমণীটির জন্য এতকাল অবধি জমা ছিল সেই সম্মানটুকু বুঝি এইমাত্র জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সুতীব্র ক্রোধানলে। সুলেমানের মৃত্যুর কারণ জানতে পারার পরেও এর প্রতি অতটা ঘেন্না হয়নি, যতটা এখন হলো। নিজের একমাত্র সন্তানের চোখে তিনি ছোট হয়ে গেলেন আজ এই মানুষটার জন্য!

– 'বাবা! ইজ ইট ট্রু?'

রাশেদ পুত্রের চোখের দিকে তাকালেন দিশাহারাভাবে। তাঁর মাথা শূন্য। মস্তিষ্ক শূন্য। কেমন অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। তিনি যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন আদিগন্ত এক জলোচ্ছ্বাসের মাঝে। চারদিকে শুধু বড় বড় ঢেউ। কূল নেই, কিনারা নেই। প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের চোখে চোখ রাখতে আজ তাঁর সীমাহীন কুণ্ঠা! অপ্রতিরোধ্য সংকোচ!

একটা ঢোক গিললেন তিনি। মাথা নত করে যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আই উইশ আই কুড সে আদার ওয়াইজ। বাট আই ফিয়ার ইওর মাদার ইজ রাইট!'

সামির চোখের দৃষ্টি চকিতে বিস্ফোরক হয়ে উঠল। মুখ কুঁকড়ে গেলো ব্যথায়। মনে হলো যেন এইমাত্র তার খুব আপন কেউ পৃথিবী ছেড়ে গত হয়েছে। রাশেদ ছেলের ওই অসহায় মুখখানা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে দরজার বাইরে পা বাড়ালেন।

– 'শোনো!' ছেলের কণ্ঠস্বর থমকে দিল তাঁকে। তিনি ঘুরে তাকালেন।

সামি বরফ শীতল কণ্ঠে কেটে কেটে বলল, 'আমার মায়ের সাথে তুমি এমন করতে পারো না!'

রাশেদ স্তিমিতভাবে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। তাঁর চোখে এখন ঝাঁঝ নেই আছে শুধুই খাঁখাঁ শূন্যতা। ছেলের এই উদ্ধত ভাব তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বাবাকে যেন শাসন করছে ছেলে। সামি আহ্লাদী আর একগুঁয়ে ছিল সবসময় এ কথা সত্য। কিন্তু বেয়াদব ছিল না কোনো কালেই। হাতের আঙুল উঁচিয়ে অপ্রকৃতস্থের মতো চিৎকার করে উঠে ছেলে বলল, 'আমার মা কষ্ট পেলে আমি কাউকেই ছেড়ে দেবো না! কথাটা শুনে রাখো। আমার মাকে ঠকানোর চেষ্টা করো না, খবরদার! ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!' কথাগুলো বলা শেষ করে সামি ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলে গটগটিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে অতিক্রম করে। রাশেদ এক ঝলক তাকালেন রোমেলার দিকে রোমেলার দুচোখ তখন পুত্র গরিমায় জ্বলজ্বল করছে।

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে রাশেদ লাইব্রেরী রুমের গোল বারান্দায় এসে বসলেন। বৃষ্টি এখনো থামেনি। বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত তাঁকে আসতে হয়েছে ছাতা মাথায় দিয়ে। উঠোনে জল জমে গেছে। কাদা থকথক করছে চারপাশে। আশেপাশে কোথাও ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছে ক্রমাগত। বারান্দায় এসে বসতেই সুলেমানকে খুব মনে পড়ল। সুলেমান নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত তথ্য গোপন করে গেছে। একজন মানুষের এই অখণ্ড বিশ্বস্ততার কোনো মূল্যই তিনি দিতে পারলেন না। একটা মানুষের জীবন চলে গেলো তার অপকর্মের হিসেব লুকোতে গিয়ে! এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? কেন যে সুলেমান সত্যটা বলে দিল না! বললে হয়তো বেচারা অন্তত জানে বেঁচে যেত। উচিত ছিল সুলেমানকে কয়েকদিনের জন্য অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়া। কে জানত রোমেলা এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে! আহা, এত বছরের পুরোনো লোকটা! অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মরেই গেলো।একটু বাদে গন্ডায় গন্ডায় লোক আসা শুরু হবে। স্টাডিরুমে মিটিং চলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাঁর মনটা অত্যধিক খারাপ। আজ বোধহয় কোনো কাজেই মন বসবে না। মিটিং ক্যান্সেল করা সম্ভব হলে তিনি তাইই করতেন। কিন্তু সেটা কোনোমতেই সম্ভব না।

বারান্দার ছাদ চুঁইয়ে জল গড়াচ্ছে বৃষ্টির। কৃষ্ণচূড়ার ডাল নেচে চলেছে হাওয়ায় হাওয়ায়। সামনের উঠোন বৃষ্টিতে সাদা! দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে বাড়ির মূল ফটক। ফটকের পাশে একটা লম্বা টুল রাখা। ওই টুলটাতেই সুলেমান বসে থাকত। রোজ! আজকের এই মেঘলা সকালটায় কাঠের চেয়ারে বসে থেকে কাহিল চোখে বৃষ্টি ডোবা সেই টুলের দিকেই চেয়ে ছিলেন রাশেদ। মানসপটে একমাত্র ছেলের বাল্যকালের নানা স্মৃতি ভেসে উঠছে। তিনি বাবা হয়েছিলেন অতি অল্প বয়সে। প্রথম যৌবনেই একজন সার্থক পিতা হবার যুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন আঁটঘাট বেঁধে। তাঁর জীবনটা ছেলেকে কেন্দ্র করেই ঘুরছিল। ছেলে কী করে মানুষের মতো মানুষ হবে, কী করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, এসব চিন্তা করেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর! এমন নিবিড় উৎসর্জনের পরেও এই জীবন সায়াহ্নে এসে দৈব দুর্বিপাকে পড়ে তিনি পুত্রের চোখে তুচ্ছ হয়ে গেলেন, হেয় হয়ে গেলেন। বরবাদ হয়ে গেলো এত বছরের সাধনা, একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতা। মাতাপিতা শৈশবে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সন্তানকে

আগলে রাখেন। লালন পালন করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতার দায়ভার অনেকখানিই সন্তানের ওপর বর্তায়। সামি এখন বড় হয়েছে। মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই হয়তো সে বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর তো বাবা হিসেবে খুশি হওয়ার কথা। ছেলে বোধপ্রাপ্ত হয়েছে। দায়িত্বশীল হয়েছে। নীতিবাগীশ হয়েছে! এর চেয়ে স্বস্তির খবর আর কী হতে পারে? কিন্তু তিনি কেন শতভাগ খুশি হতে পারছেন না? কেন এক অনির্বচনীয় ক্লেশে সারাটা হৃদয় এমন কলুষিত হয়ে আছে? কেন জ্বলছে ধিকিধিকি অঙ্গার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে?

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ভেজা মাটির ঘ্রাণে সয়লাব চারপাশ। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জমে থাকা বৃষ্টির জল। চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন তিনি। নিদ্রাবিহীন রাত্রিযাপনের পর শরীর ক্লান্ত। মন বিষাদগ্রস্ত। সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল দৃশ্যটা। বৃষ্টির জলে ভিজে চুবুচুবু হয়ে অমৃতা এসে দাঁড়িয়েছে গেটের সামনে। আঁটোসাঁটো হয়ে গায়ে লেগে আছে লাল টি শার্ট। চুল লেপটে গেছে কপালে। তার চোখে মুখে একটা দিশাহারা ভাব। সিকিউরিটির সাথে অধৈর্য ভাবে কী সব কথা বলল মেয়েটা। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল লাইব্রেরির দিকে।

ছাইরঙা মেঘের লহর ভেদ করে মিহি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে তখন আকাশময়। মেঘের পাড়ে জমেছে রুপালি রঙের আস্তর। উতলা বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার কয়েকটা পাঁপড়ি উড়ছিল এলোমেলো। সেই বৃষ্টিভেজা রুপো রঙের চকচকে সকালটার ভেতর দিয়ে অমৃতাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখলেন রাশেদ। দেখামাত্র এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া ছুঁয়ে দিল তাঁকে। পাটিগণিতের কোনো মস্ত কঠিন অংক বুঝি নিমেষে সহজ হয়ে গেলো। মনে হলো এই মুহূর্তে মেয়েটির এখানে আসাটা খুব জরুরি ছিল। মেয়েটি এলো বলেই তিনি আজ এই বৃষ্টিভেজা দিনটায় সম্যক রূপে উপলব্ধি করলেন যে, পৃথিবীতে শুধু এই একটি মানুষই আছে যার সাথে তাঁর মনের টান সম্পূর্ণ

নিঃস্বার্থ এবং নির্ভেজাল। এই মেয়েটা তাঁর কেউ না, কিচ্ছু না, তবুও মনে হলো যেন এই মেয়েটিই তাঁর সব কিছু!

অমৃতার মুখে দুশ্চিন্তা, অধীরতা এবং ত্রাসের চিহ্ন। খুব হাঁপাচ্ছে। ক্লান্তি মাখা চোখ নিয়ে সে বারান্দার চেয়ারে বসা মানুষটাকে দেখল। মানুষটার গায়ে অফ হোয়াইট রঙের কলার ওয়ালা টি শার্ট, কালো ট্রাউজার। অবিন্যস্ত চুল। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই সমস্তটাই অমৃতার জন্য ভালো লাগার এক টোটাল প্যাকেজ। কিন্তু আজ ভালোলাগার চেয়ে বিষাদ বেশি। এই প্রিয় মুখটা সে আজকের পর থেকে আর দেখতে পাবে না। না দেখেই বাঁচতে হবে তাকে। মরে মরে, ধুঁকে ধুঁকে!

অমৃতা হনহন করে হেঁটে এসে মানুষটার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসলো উঠোনে। দাঁড়ালো বারান্দার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে। কাদা থকথকে মাটির ওপর কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন লাল গালিচা।

– ‘আমি চলে যাচ্ছি!’ হাঁপধরা গলায় বলল অমৃতা।

রাশেদ নিষ্পলক চেয়ে ছিলেন ওর দিকে। তাঁর মুখ থেকে এখন রাত জাগার ক্লান্তি মুছে গেছে। সরে গেছে কপালের ভাঁজ। চোখজোড়া আচ্ছন্নতায় ডোবা। ঠোঁটে কেমন অলৌকিক হাসির রেশ।

– ‘বাবা মা জেনে গেছে আপনার ব্যাপারে। আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। হৃদি ফোন করেছিল। সে বলল সামির কানে নাকি কী সব কথা গেছে। সে খুব আপসেট।’ এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে অমৃতা কান্নার ঢোক গিলল। তার পুতুল চোখের কার্ণিশে ফোঁটায় ফোঁটায় জল জমেছে তখন।

– ‘আপনি কিছু বলছেন না কেন? আমি চলে যাচ্ছি। একটা ট্রেনে উঠে পড়ব তারপর চলে যাব অনেক দূরে। আর ফিরে আসব না। আমার কেউ নেই। বন্ধুরা ছিল এখন আর নেই। বাবা মা ছিল এখন নেই। আর আপনি··· আপনি তো কখনওই আমার ছিলেন না। তবুও···’ অমৃতা থামল। রাশেদ কিছু বললেন না। নিমিষহারা চোখে শুধু চেয়েই রইলেন।

– ‘তবুও আপনাকে শেষবারের মতো দেখতে আসলাম। আপনি আমার না তা আমি জানি। কিন্তু জেনে রাখবেন যে আমি শুধুই আপনার। আপনার ছিলাম। আপনারই থাকব।’

এ কথা শুনে রাশেদ হঠাৎ তাঁর ধারওয়ালা সুন্দর হাসিটা হাসলেন। বুকের পাঁজরে এতক্ষণ ধরে আটকে থাকা ভারি পাথরটা নেমে গেছে। সমস্ত দুনিয়া এখন ভারহীন, হালকা আর ফুরফুরে! ভেজা চুল, ভেজা জামা, আর চোখভর্তি অভিমানের মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এত সুন্দর কিছু তিনি জীবনে এর আগে কোনোদিন দেখেননি। পৃথিবীর অন্য কোনো মুখ এমন চুম্বকের মতো টানেনি তাঁকে এর আগে কখনো!

– ‘আপনি কি কিছুই বলবেন না? কিছু বলা···’

রাশেদ আচমকা এগিয়ে এসে অমৃতার পুতুল মুখখানা দুহাতে চেপে ধরলেন। তারপর মোহাবিষ্টের মতো ওর পাতলা, গোলাপি রঙের ভেজা অধরে এঁকে দিলেন এক প্রগাঢ় চুম্বন। অমৃতার মুখের কথা আটকে গেলো, ছুটে গেলো! ধাক্কা দিয়ে কেউ একজন হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসলো যেন গলার কাছে। শাঁখ বেজে উঠল শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকায়। বহু দিনের অপেক্ষার পর এক পশলা বৃষ্টি নামল হৃদয় উঠোনজুড়ে। সেই বৃষ্টিতে নিভে গেলো বিরহের অনল, অতৃপ্তি এবং তৃষ্ণা!

কৃষ্ণচূড়ার ডালের ফাঁক গেলে সদ্য মেঘ ভাঙা রোদ্দুরের রুপালি ঝিকিমিকি ছুঁয়ে দিচ্ছিল ওদের। ছুঁয়ে দিচ্ছিল জল ভরা এলোমেলো বাতাস। প্রলম্বিত চুম্বন লগ্নের পর অমৃতা অর্ধনিমীলিত চোখ তুলে তাকালো মানুষটার দিকে। হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি। সে বুঝতে পারছে না কী থেকে কী হয়ে গেলো। বুক কাঁপছিল দুরদুর করে। চোখভর্তি চাপা উচ্ছ্বাস আর মনের মাঝে ঝনক ঝনক খুশির ঝংকার! অমৃতা অস্বস্তিতে গাঁট হয়ে রইলেও রাশেদকে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখাল না। তিনি হাত বাড়িয়ে অমৃতাকে কাছে টেনে নিলেন। অমৃতা খুব আস্তে করে আদুরে বেড়ালের মতো মাথাটা রাখল তাঁর প্রশস্ত বুকে। পরম নির্ভরতায়। এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল বুঝি জীবনে এই প্রথম খুঁজে পেল সে।

– ‘তোমার ভয় কীসের পুতুল? আমি আছি না? কোথাও যাবে না তুমি। আমার কাছেই থাকবে।’ রাশেদ বললেন পরিষ্কার গলায়। অমৃতার চোখের তারায় চিকচিক করে উঠল কয়েকবিন্দু অশ্রুজল। এই মুহূর্তে মরে গেলেও তার আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

– ‘তুমি গাজীপুরের রিসোর্টে চলে যাও। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।’

অমৃতা একটু ইতস্ততভাবে বলল, ‘গাড়ি নিয়ে যাব? কেউ যদি দেখে ফেলে?’

– ‘দেখলেই কী? তোমার ভয় নেই কোনো। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। অমৃতার ঠোঁটের হাসি স্ফীত হলো কথাটা শুনতে পেয়ে। মৃদুভাবে সে বলল, ‘আপনি কখন আসবেন?

– ‘সন্ধে হবে। একা থাকতে তোমার সমস্যা হবে না তো?’

– 'না। সমস্যা হবে না। আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য।'

অমৃতা যখন গাড়িতে উঠে বসল তখন তার ঠোঁটের সাথে, বুকের সাথে, শরীরের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে মিশে আছে প্রথম চুম্বনের স্বাদ। একটু আগে এই গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিল সে মৃতপ্রায় বিমর্ষ মন নিয়ে আর এখন বেরিয়ে আসলো পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি হাতে নিয়ে। চারপাশে এখন হোলির রং লেগেছে!

৮৮

বিকেলে একবার বাবার বাড়ি যাবার কথা ছিল হৃদির। সামিকেও যেতে বলেছেন মা। হৃদি ভেবেছিল দুপুরে খাবার পরপরই বেরিয়ে পড়বে। বিকেলের চায়ের পালাটা বাইরে কোথাও সেরে নেবে। রাস্তার ধারের ফুচকা অথবা ভেলপুরির সাথে। রুদ্র আর আকাশ থাকলে আড্ডাটাও জমে যেত। কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হলো না। বেলা বারোটার দিকে সামি সেই যে বিছানায় ঢলে পড়ল আর একটিবারের জন্যেও তাকে শোয়া থেকে ওঠানো গেলো না। জ্বর জ্বর ভাব। হৃদি থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপল। একশ দুইয়ের মতো হবে টেম্পারেচার। দুপুরের খাবার পৌঁছে দেওয়া হলো তার ঘরে। খেলোও না কিছু ঠিকমতো। মুখে নাকি জন্মের অরুচি! লাঞ্চের পর একটা নাপা এক্সট্রা খেয়ে আবার ধুপ করে শুয়ে পড়ল। নিরস গলায় হৃদিকে বলল, 'আমি কোথাও যাব না। তুই যা।'

একা একা যেতে কি আর ভালো লাগে? তাছাড়া সামিকে এই অসুখের মুখে ফেলে রেখে সে যাবে কী করে? অগত্যা প্ল্যানটা ক্যানসেল করতেই হলো। মাকে ফোন করে দাওয়াতটা নাকচ করে দিল। তারপর সামির মাথার কাছে এসে চুপ করে বসে রইল। সামির বন্ধ চোখের পাতা কাঁপছে তিরতির করে। কপালের চামড়া আছে কুঁচকে। মনে হচ্ছে কোনো গভীর দুশ্চিন্তা তাকে অনবরত দংশন করে চলেছে।

– ‘কী ভাবিস?’

প্রশ্নটা শুনে সামি চোখের ঢাকনা আলতো করে মেলে ধরে ঈষৎ বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘কথা বলিস নাতো! ভালো লাগতেছে না কিছু।’

অন্য সময় হলে এমন তাচ্ছিল্য মাখা কথায় হৃদি রেগে যেত নির্ঘাত। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম। সামির মনের অবস্থাটা সে খুব ভালো মতোই আঁচ করতে পারছে। সর্বক্ষণ বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফূর্তিতে মেতে থাকা, বাবা মায়ের আদর আহ্লাদে হেসে খেলে সময় কাটিয়ে দেওয়া ছেলেটা যেন হঠাৎ করে এক রাত্তিরের মধ্যে পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে গেছে। চোখ মুখ থেকে ফূর্তি ভাব মুছে গিয়ে তার বদলে ভর করেছে এক গহন বিষণ্ণতা। সে কারো সাথে কথা বলছে না, নড়ছে না, চলছেও না। চুপচাপ শুয়ে থেকে চিন্তিত মুখ নিয়ে কীসের যেন ধ্যান করছে শুধু দিনরাত। হৃদি ওর কপালে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, ‘আচ্ছা কথা বলব না। বসতে দিবি একটু? নাকি তাও চলবে না?’

– ‘বসে থাক চুপ করে।’

হৃদি তাই করল। নিশ্চুপ বসে থেকে সামির কোঁকড়া চুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগল আনমনে। সামির চোখ বন্ধ। হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা। কপাল থেকে চিন্তার রেখাগুলো সরার নাম নেই। হৃদির কষ্ট হচ্ছিল। একটু বেশিই কষ্ট হচ্ছিল। আর ওই কষ্টটাই কলিজার মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধতে বিধতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে এই ছেলেটাকে সে কতখানি ভালোবাসে। খানিক বাদে সামি উঠে বসে পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা কাঁথাটা গায়ের ওপর টেনে নিল। হৃদি ব্যস্ত গলায় বলল, ‘ঠান্ডা লাগছে?’

– ‘হুম।’ কাঁথা গায়ে জড়াতে জড়াতে অস্ফুটে উত্তর দিল সামি। হৃদি আরেকবার ওর কপালে হাত রাখল। জ্বরটা বেড়েছে।

বসা থেকে উঠে পড়ল সে। ঘরের এসির পাওয়ারটা কমিয়ে একদম শূন্যে নিয়ে আসলো। তারপর বেরোলো শাশুড়ির খোঁজে। উনাকে এবার খবরটা না দিলেই নয়। গিয়ে দেখল শ্বশুর শাশুড়ির বেডরুম ফাঁকা। কাজের লোকের কাছ থেকে জানতে পারল শাশুড়ি গেছেন বোনের বাসায় এবং শ্বশুর মশাই নিচে স্টাডিরুমে মিটিং করছেন। সময় নষ্ট না করে সে শাশুড়ির নম্বরে ডায়াল করল। তিনি ধরলেন না। বিচলিত হৃদি কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে বেশ কিছুক্ষণ দোতলার করিডোরে পায়চারি করল অস্থির চিত্তে। তারপর আবার ফিরে আসলো নিজের ঘরে। এসে দেখল সামির একটু চোখ লেগে এসেছে। নিশ্বাস ভারি। ঘুমিয়ে গেছে বোধহয়। হৃদি পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। আকাশের মেঘ তখন কেটে গেছে। চৈত্রের আলো ঝলমলে বিকেল বাইরে। রোদে খুব একটা তেজ নেই। বাড়ির সামনের স্কুল মাঠটা ফাঁকা। আজ ছুটির দিন। স্কুল বন্ধ। গলির মধ্যে একটা আইসক্রিমের গাড়ি ঘুরছে টুংটাং শব্দ তুলে। কয়েকটা টোকাই ছেলেমেয়ে আইসক্রিম খাবার লোভে গাড়ির পেছন পেছন দৌড়ে বেড়াচ্ছে প্রাণপনে। আইসক্রিমওয়ালা ওদের খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। শান্ত বাতাসে ঝিরিঝিরি দুলছে আম আর কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা। ইশ! এমন বিকেলে বন্ধুদের সাথে টিএসসিতে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতে পারলে কী দারুণ হতো! নিজেকে আজ ভীষণ একলা বলে মনে হচ্ছে তার। বিভা নেই। আকাশ রুদ্রও নেই ঢাকায়। আর অমৃতা… অমৃতাটা তো থেকেও নেই। এই মুহূর্তে অমৃতার জন্যে মন কেমন করছে তার। কেন যে এরকম একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেলো মেয়েটার জীবনে!

হঠাৎ একটা হলদে ছোট্ট পাখি উড়ে এসে বসল বারান্দার গ্রিলে। বিকেলের আলো লেগে আছে ওর গায়ে। ডানা ঝাপটাচ্ছে ঝটপট শব্দ তুলে। ডাকছে টুইটুই করে। পুতুপুতু দুটা চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে হৃদিকে। কোনো ভয় নেই তার,

নেই কোনো সংকোচ! কী সুন্দর! কী সুন্দর! আর কী মিহি ওর গলার স্বর! এই যান্ত্রিক শহরে হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এলো এই ছোট্ট সুন্দর পাখিটা? নাম কী ওর? জানে না তো হৃদি।

হলুদিয়া পাখি সোনারই বরণ পাখিটি ছাড়িল কে?

গুনগুন করল হৃদি। তার মনে হলো পাখিটি যেন অতীতকালের সুন্দর কিছু মুহূর্তের পুরনো চেনা ঘ্রাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওর ডানা ছটফটানির শব্দে হৃদির বুকের মধ্যে শঙ্খ ধ্বনির মতো বেজে উঠছে বন্ধুদের সাথে কাটানো কিছু সুখময় মুহূর্তের স্মৃতি। চায়ের আড্ডা, হাসির ফোয়ারা··· ফাজলামো, বাঁদরামো, দুষ্টুমি। আহা! বাতাস ভরে গেলো অসংখ্য টুকরো টুকরো পুরনো ছবি ঠাসা ফুলেল পাপড়িতে। সেই হলুদ বিকেলের বুকে বসে থাকা হলুদ পাখির দিকে চেয়ে থেকে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো হৃদিরও আচমকা মনে হলো যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের ভালো ছিল যা ফেলে এসেছে তা। এই মুহূর্তে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন এসে যদি তাকে প্রশ্ন করে, কী চাই? সে নির্দ্বিধায় বলে দেবে, 'ফেলে আসা দিনগুলি!'

৮৯

রোদের তাপে উত্তপ্ত হয়েছিল চিলেকোঠার ঘরটা। টালির ফাঁক গেলে সূর্যের আলো এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর। বিছানায় চুপটি করে বসে বসে জানালায় চোখ রেখে আকাশ পাতাল ভাবছিল অমৃতা। বাবার কথা। মায়ের কথা। ছেলেবেলার কথা। বন্ধুদের কথা··· কত কথা আর কত রকম দুশ্চিন্তা! কিন্তু বলতে নেই এই সমস্ত দুশ্চিন্তা আর হতাশা ছাপিয়ে খানিক বাদে বাদেই এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে তার সমগ্র অন্তর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনের আঙিনায় বারেবারে ঝাপটা বাতাসের মতো ফিরে আসছিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচের এক টুকরো ছবিটা। ফিরে আসছিল সেই মুখ সেই স্পর্শ!

ভেজা জামাকাপড় খুলে চেয়ারের ওপর মেলে দিয়েছে। ফ্যানের নিচে। তার গায়ে এখন শুধু একটা তোয়ালে জড়ানো। গোসলটা সেরে নেয়া দরকার। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে করছে না। ভয় হচ্ছে বুঝি স্নানের জলের সাথে ধুয়ে মুছে যাবে সেই মানুষটার ছোঁয়া আর ভালোবাসা। একটু পরেই আসবে সে। অনেক অপেক্ষার পরে··· অনেক বাধা পেরিয়ে··· অনেক জ্বালা, অনেক অপমান··· গ্লানি আর কলঙ্কের পাহাড় ডিঙিয়ে অবশেষে আসবে তার মনের মানুষ তার কাছে। ভাবতে গিয়ে কুলকুল করে ভালোলাগায় ভরে যাচ্ছিল বুকটা। নাহ, বিধাতা অমৃতার সাথে অতটাও অবিচার করেননি! বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ল সে। তিনকোণা টালির ছাদের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল। নিজের মনে হেসে উঠল কয়েকবার। আজকের দিনটা তার মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে। মনে থাকবে নিজের বাবা মা আর বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া কষ্টটা। সেই সাথে মনে থাকবে প্রিয় মানুষটার কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসাটা। বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে। সে লন্ডন যাবে। ব্যারিস্টারি পড়বে। দেশে ফিরে এসে নামকরা উকিল হবে। অমৃতার অবশ্য ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছে কোনো কালেই ছিল না। ব্যারিস্টারির খরচ জোটানোও তো চাট্টিখানি কথা নয়। বাবাকে বলেছিল মাস্টার্স করবে। পৃথিবীর নামকরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাবা তাতেও সায় দিয়েছিলেন। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা একটু ভারি হয়ে উঠছিল। হঠাৎ সেলফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে।

– ‘হ্যালো!’ ফোন কানে নিয়ে একটু আলগাভাবে বলল অমৃতা।

– ‘তুই কোথায়?’ মায়ের ক্যাটক্যাটে প্রশ্নটা কানে বিঁধল সূচের মতো।

- ‘আছি। বেঁচে আছি।’

– ‘ফোন ধরছিলি না কেন? কতবার ফোন দিলাম!’

– ‘খেয়াল করিনি।’

– ‘এখন কোথায় তুই?’

অমৃতা চুপ করে রইল।

– ‘কথা বলছিস না কেন?’

– ‘নিরাপদ স্থানেই আছি। তোমার চিন্তার কারণ নেই।’

– ‘নিপা! তুই বাড়ি ফিরে আয়। এখুনি!’

– ‘আমি বাড়ি ফিরলে তোমার পতিদেব যে আমাকে পুনরায় ঝাঁটা পেটা

করে ঘরছাড়া করবেন না তার নিশ্চয়তা কী?’

– ‘নিজের বাবার সম্পর্কে তোর এ কেমনতর কথাবার্তা, হ্যাঁ? বলি মাথাটা কি একেবারে গেছে?

– ‘ভুল কিছু তো বলিনি!’

– 'পাগলামো করিস না। তোরা বাবা মেয়ে দুজনেই পাগল। আমি পড়েছি সব পাগলের পাল্লায়। আমার দিকটা তো কেউ দেখে না। সবাই যার যার চিন্তায় মত্ত।'

– 'মা! আমার একটা উপকার করো প্লিজ! বাবাকে বলো ভুলেও যেন রাশেদকে ফোন না করে। আমি চাই না লোকটাকে কেউ অপমান করুক।'

– 'তোর বাবার যা ইচ্ছা তিনি তাই করবেন। আমার এখানে কিছু করার নাই। আর তুই বয়সে বড় একটা লোককে নাম ধরে ডাকছিস কেন? এত বেহায়া কেন তুই?'

– 'বাবাও তো তোমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়। তুমি তো বাবাকে নাম ধরে ডাকো।'

– 'ঘেন্না হচ্ছে তোর সাথে আমার কথা বলতে। ছিঃ এমন মেয়ে পেটে ধরেছিলাম আমি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ'

শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মা ফোন রেখে দিলেন। অমৃতা জানে মা এখন কাঁদবেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবেন। কথাটা হয়তো খুবই সত্য যে অমৃতার মতো বাজে একটা মেয়ের জন্ম দিয়ে মা অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছেন। সেই অন্যায়ের শাস্তিই পাচ্ছেন তিনি এখন। অমৃতাও কি চেয়েছিল এতটা বাজে হতে? এতটা ঘৃণিত হতে? চায়নি… এ পৃথিবীতে মানুষের চাওয়াগুলো যে আসলে অন্য কারো চাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষ এই সত্যটা বুঝেও না বোঝার ভান করে। সে ভুলে যায় জীবন নামের নাট্যমঞ্চে সে নিছক একজন অভিনেতা মাত্র। নির্দিষ্ট চরিত্রে আমৃত্যু অভিনয় করে যাওয়া ছাড়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার

ভূমিকা নেই। ভাবতে ভাবতে অমৃতার একটু ঘুম ঘুম পেয়ে গেলো। ঘুমের মধ্যে কী সব স্বপ্ন দেখতে লাগল সে। ভাবছিল এক জিনিস আর স্বপ্নে এসে ধরা দিল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। স্বপ্নে আসলো ভর দুপুরের কোর্ট রুম। কালো কোট পরিহিত ঘর্মাক্ত চেহারার গিজগিজ করা একগাদা উকিল। লোহার খাঁচার ওপারে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা রুক্ষ চেহারার অভিযুক্ত অপরাধী। তার নিজের কী যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। বোধহয় সাক্ষী সময় মতো আসেনি। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তার মুহূর্ত। সময়মতো এক্সাম হলে পৌঁছুতে না পারলে যেরকম একটা অসহায় বোধ হয় অনেকটা সেরকম লাগছে এখন। কপালে জমে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সিনিয়র খিটখিট করে ভীষণ আপত্তিকর কিছু কথা শুনিয়ে দিচ্ছে তাকে। হঠাৎ দৃশ্যপট পাল্টে গেলো। কোর্টরুমের ঘর্মাক্ত ভাপ ওঠা, বুকচাপা ভিড় সরে গেলো চোখের সামনে থেকে। তার বদলে ভেসে উঠল থানচি রোডের সেই শাল আর মহুয়ার জঙ্গল। কানে এসে লাগল দূরের বনের কোকিলের ডাক। কাছে খুব কাছে··· প্রিয়দর্শন মানুষটা। উত্তেজনায় চোখ খুলে গেলো তার। বুক ধড়ফড় করছে। চট করে ঘড়িটা দেখে নিল। ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। তিনি বলেছেন আসতে আসতে সন্ধে হবে। এতক্ষণ কী করবে অমৃতা বসে বসে? ল্যাপটপ সাথে থাকলে কিছু কাজ সেরে নেয়া যেত। কিন্তু সত্য বলতে এই মুহূর্তে তার কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চুপ বসে থেকে ওই রোদ তাতানো কমলা বিকেল দেখেই স্বস্তি পাচ্ছে সে। হঠাৎ সামির কথা মনে পড়ল। সামিকে সত্যটা বলতেই হবে। আজ নয় কাল। সবচেয়ে ভালো হবে অমৃতা যদি নিজ থেকেই সত্যটা বলে দেয়। সে চট করে সেলফোনটা হাতে তুলে নিল। ফোনের নোটপ্যাড খুলে লেখা শুরু করল সামির উদ্দেশ্যে। লিখল খানিকটা। আবার কাটল। আবার লিখল এমনি করে কেটে গেলো একটি ঘণ্টা। লেখা শেষ হলে সে চিঠিটা সেভ করে রাখল ফোনে। একদিন ঠিকঠিক মেইল করে দেবে সামিকে। এখন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা!

৯০

সামির জ্বরটা নামছিল না। ঘুমের মধ্যে বারবার আর্তনাদ করে উঠছিল। যেন কোনো দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়া করে যাচ্ছে বিরতিহীনভাবে। নিরুপায় হয়ে হৃদি নিচতলায় নেমে এলো। স্টাডিরুমের দরজার বাইরে বিশ পঁচিশ জোড়া স্যান্ডেল রাখা। ভেতরে জোর আলোচনা চলছে। চাকরবাকররা চা নাশতার ট্রে নিয়ে আসা যাওয়া করছে অনবরত। দরজাটা আধখোলা অবস্থায় ছিল। হৃদি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে খালি চায়ের কাপের ট্রে নিয়ে একটি কাজের মেয়ে বেরিয়ে আসলো। হৃদি উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'বাবাকে একটু ডাকো তো। জরুরি কথা আছে।' আদেশ শুনে কাজের মেয়েটির মুখ বেলুনের মতো চুপসে গেলো। শুকনো গলায় বলল, 'স্যার তো ভাষণ দিতাছে। আমার ডর করে ভাবি উনার সাথে কথা কইতে। আপনে কন।'

মেয়েটির অবাধ্যতা দেখে রাগ ধরে গেলো। কিন্তু রাগটা হজম করল হৃদি। মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেলো ভেতরে। ঘরভর্তি নানা বয়সি মানুষ। বেশিরভাগই পুরুষ। হাতে গোণা দু তিনজন মহিলা আছেন। শ্বশুর মশাই ঘরের মাঝামাঝি অবস্থানে বসে কথা বলছেন দরাজ গলায়। হৃদির আকস্মিক উপস্থিতি তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল। তিনি একটু থমকে গেলেন, 'কিছু বলবে বৌমা?'

ঘরের প্রতিটি মানুষের জোড়াচোখ তখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে হৃদির মুখের ওপরেই নিবদ্ধ। এ বাড়ির নতুন বৌকে অনেকেই দেখেননি। কদিন বাদে বৌভাতের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। বৌভাতে অফিশিয়াল এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকজনদের দাওয়াত দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন হক। সেসব আনুষ্ঠানিকতার আগেই নতুন বৌ দর্শন হয়ে গেলো উপস্থিত লোকজনের। তাকানো মাত্রই তারা বুঝে গেলো যে এই মায়াবী সুন্দর মেয়েটিই হক সাহেবের একমাত্র পুত্রবধূ।

– 'বাবা একটু শুনবেন?' হৃদির কাতর কণ্ঠে অনুরোধের সুর বেজে উঠল।

হক সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসলেন ঘর থেকে পুত্রবধূর সাথে। দরজার বাইরে এসে হৃদি উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'সামির সেই দুপুর থেকে খুব জ্বর বাবা। ওখুধ খাইয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু জ্বরটা ছাড়ছেই না। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমার শাশুড়ি বাসায় নেই। ফোন দিয়েছি বেশ কয়েকবার। ধরছেন না। আপনি কি একবার আসবেন?'

হক সাহেবের মুখে চিন্তার একটা ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল।

– 'হঠাৎ জ্বর আসলো কেন?' কথাটা বলতে বলতে তিনি করিডোর ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন সামনে। হৃদি তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা। গতকাল রাতে ঘুম হয়নি ওর। আপনি তো জানেন আপনার ছেলে কিছু নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা করলেই জ্বর চলে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার।'

হক সাহেব এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আর কিছু বললেন না। এক নিচ্ছিদ্র দুর্ভাবনা এবং উৎকণ্ঠায় তাঁর চিত্ত অস্থির হয়ে উঠল। ছেলেটাকে তিনি সত্যই খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর একটিমাত্র সন্তান। একটিমাত্র বুকের ধন। এই ছেলে কষ্ট পেলে যে গোটা দুনিয়া অন্ধকার! সামির চোখ বোজা ছিল। ঘরের ভেতর দুটি মানুষের ঝটিকা প্রবেশ সে টের পেল না প্রথমে। টের পেল তখন, যখন বাবা এসে তার কপালে একটা হাত রাখলেন। দুর্বল চোখ মেলে তাকাল সে। দুর্বল গলায় ডাকল একবার, 'বাবা!'

হক সাহেব ছেলের মাথার কাছে বসলেন। নরম স্বরে বললেন, 'আব্বু তোমার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?'

হৃদি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামি বাবার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে হৃদির দিকে এক ঝলক তাকালো। কারো কিছু বলতে হলো না। হৃদি কী করে যেন বুঝে গেলো এই মুহূর্তে তার এখান থেকে একটু সময়ের জন্য হলেও সরে যাওয়া উচিত। ওদের বাবা ছেলের একটু প্রাইভেসি দরকার। একটু আলাদা সময় দরকার। এই মুহূর্তে তার দখলদারি একেবারেই মানায় না। কোনো কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

– 'মা কোথায়?' চোখ দুটো কপালের ওপর তুলে বাবার দিকে দৃষ্টি তাক করে বলল সামি।

– 'বাইরে গেছেন তোমার মা। বাসায় নেই।' ছেলের মাথায় হাত রেখে তিনি উত্তর দিলেন।

সামি একটু সময় চুপ করে রইল। শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে নিল জিব দিয়ে। তারপর ক্লান্তভাবে বলল, 'তুমি আমার মাকে ভালোবাসো না বাবা?'

হক সাহেবের বুক মোচড় দিয়ে উঠল এই প্রশ্নে। তীব্র কনকনে এক ব্যথা শৈত্যপ্রবাহের মতো উড়ে এসে হিমায়িত এবং জারিত করে তুলল অন্তর দেশ। তিনি ছেলের একটা হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, 'এসব নিয়ে এখন চিন্তা করো না তুমি। আমি এবং তোমার মা সবসময় তোমার পাশে আছি। কেমন?'

সামি একদম বাচ্চা ছেলের মতো আবদারের গলায় বলল, 'তুমি কখনো আমার মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো বাবা?'

– ‘না যাব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।’

এই সান্ত্বনা বাক্যটি সামির অস্থির করুণ মুখখানা অনেকখানি স্বাভাবিক করে তুলল। দুচোখের তারায় জ্বলতে থাকা পেরেশানির অগ্নিময় শিখা একটু নিভন্ত মনে হলো।

– ‘তুমি রেস্ট নাও। জ্বর না কমলে ডাক্তার ডাকতে হবে।’

– ‘ডাক্তার লাগবে না বাবা। ঠিক হয়ে যাবে।’

– ‘কাল অফিস যেতে হবে না। তুমি এক কাজ করো বন্ধুদের সাথে ঢাকার বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসো। দেশের বাইরেও যেতে পারো। কোথায় যাবে বলো। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

সামি একটু সময় চুপ থেকে বলল, ‘দেখি।’

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হক সাহেব সস্নেহে বললেন, ‘তুমি এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।’

সামির ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ছাদে উঠে আসলেন তিনি। ডায়াল করলেন অমৃতার নম্বরে।

– ‘হ্যালো।’

– ‘অমৃতা! শোনো কয়েকটা জরুরি কথা বলে নেই। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। মিটিং এর মাঝখানে আছি।’

– ‘জি বলুন।’

– ‘সামি খুব অসুস্থ। ডিপ্রেশনে ভুগছে আমার ছেলেটা। আমি ওর এই অবস্থা সহ্য করতে পারছি না। তোমার আমার ব্যাপারটা সামিকে কোনোভাবেই জানানো যাবে না। বুঝতে পারছ তুমি?’

অমৃতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কঠিন গলায় বলল,

– ‘আপনি তাহলে আমার কাছে আসছেন না। তাই না রাশেদ?’

রাশেদ তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। একটা নিগূঢ় দিশাহারা ভাব যেন তাঁকে শব্দশূন্য করে তুলেছে। আজ সব আছে। সম্মান, সুখ্যাতি, যশ, অর্থ, সম্পদ সব! নেই শুধু নিজের স্বাধীনতা। হাজার হাজার আপামর জনসাধারণের সহায় হওয়া মানুষটা আজ নিজ জীবনের একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে কী নিদারুণ অসহায়! বুকে পাথর চাপা দিয়ে তিনি কোনো রকমে বললেন, ‘তুমি ফিরে এসো। তোমার বন্ধুকে দেখে যাও। গাড়ি তো আছেই তোমার সাথে।’

– ‘গাড়ি লাগবে না। আমি বের হয়ে যাচ্ছি এখুনি। যেখানে ইচ্ছা যাব। আপনার চিন্তা করতে হবে না।’

– ‘অমৃতা! তর্ক করো না। কথা শোনো।’

– ‘কেন শুনব? আপনি কি আপনার কথা রেখেছেন? কথা দিয়েছিলেন আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আর এখন ফোন দিয়ে বলছেন… ’

– ‘অমৃতা প্লিজ। আমার সময় নেই। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। সে তোমাকে উত্তরা নিয়ে আসবে।’

– ‘আমি উত্তরা আসব না।’ গোঁ ধরা গলায় বলে অমৃতা।

– ‘তোমার মতামত কেউ জানতে চায়নি।’ কথাটা বলে তিনি ফোন রেখে দিলেন। ড্রাইভারের নম্বরে ডায়াল করে আদেশ দিলেন যে কোনো উপায়ে যেন মেয়েটিকে ধরে বেঁধে এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

নিরুপায় অমৃতা রাগে গজগজ করতে করতে গাড়িতে উঠে বসল। তার শিরা উপশিরায় তখন জ্বলছে তেজের শিখা। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টে আর অপমানের তীব্র দহনে অন্তর পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। পাগল পাগল লাগছে। মনে হচ্ছে এর চাইতে বুঝি মৃত্যুও ঢের সুখের হতো। বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না আর এই ছাইপাশ জীবনটাতে।

সন্ধ্যার জ্যাম ঠেলে উত্তরা এসে পৌঁছুতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগে গেলো। হক সাহেবের মিটিং তখন শেষ হয়েছে। তিনি ছেলের ঘরে এসে বসেছেন। হৃদি সামির মাথায় জলপট্টি দিচ্ছিল। সামিকে আগের চাইতে সতেজ দেখাচ্ছে এখন। যদিও

শরীরের তাপমাত্রা কমেনি। তবে চেহারার বিষণ্ণ ভাবটা অনেকটা কমে এসেছে। বোঝা যাচ্ছে বাবার উপস্থিতি তার ভেতরে প্রাণের সঞ্চার করেছে। রোমেলা রাস্তার জ্যামে আটকে আছেন। ছেলের অসুস্থতার খবর তিনি পেয়েছেন। তবে ছেলের বাবা বাড়িতে আছেন বলে অনেকটাই নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ধীরেসুস্থে বোনের বাসা থেকে বেরিয়েছেন তিনি। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

অমৃতা দরজার নব ঘুরিয়ে সশব্দে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। তার ছোট ছোট বয়কাট চুল অবিন্যস্ত হয়ে আছে। চোখে কীসের যেন চাপা ক্ষোভ। ফর্সা গালে রাগের লালচে আভা। হৃদি ওকে দেখে থমকে গেলো। চোখের তারায় ফুটে উঠল বিহর্ষ বিস্ময়। রাশেদ ছেলের বিছানার পাশে ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন। হাতে ধরা আজকের খবরের কাগজ। অমৃতা ঘরে ঢোকামাত্রই রাশেদের দিকে একটা কট্টর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। রাশেদ সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলেন।

– ‘কীরে দোস্ত? কী অবস্থা?’ কেউ কোনো কথা বলল না। কথা বলল শুধু জ্বরে কাতর অসুস্থ সামি। ক্লান্ত স্বরে।

অমৃতা এগিয়ে গেলো, ‘তোর কী হইছে? ভং ধরছস ক্যান?’

সামি হাসার চেষ্টা করল। জ্বরের মধ্যেও তার ম্লান হাসিটা সুন্দর দেখালো। সেই সময় অমৃতার জীবনে প্রথমবারের মতো মনে হলো সামির হাসির সাথে তার বাবার হাসির বিস্তর মিল আছে। শুধু গায়ের রংটা ছাড়া সামি আসলে ওর বাবারই কার্বন কপি

অমৃতা সামির পায়ের কাছে এসে বসল। কাঁথার দিয়ে মোড়া ওর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা খপ করে ধরে হিসহিসে গলায় বলল, ‘কথা বলিস না ক্যান? হইছে কী তোর?’

সামি একবার আড়চোখে বাবার দিকে তাকালো। অমৃতাটার কোনো আদবকায়দার বালাই নাই। বাবা পাশে বসে আছেন অথচ সে একটা সালাম পর্যন্ত দিল না। যেন বাবাকে দেখতেই পায়নি।

রাশেদের মুখে স্বভাবসুলভ অটল গাম্ভীর্য খেলছিল। ছেলের বৌয়ের সামনে তিনি বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। কেন যেন মনে হচ্ছে ছেলের বৌ তাঁর এবং অমৃতার ব্যাপারে কিছু হলেও জানে। ব্যাপারটা তাঁর জন্য খুবই লজ্জাজনক।

– ‘তেমন কিছু না। শরীরটা একটু খারাপ।’ উত্তর দিল সামি।

– ‘দুই দিন পর পর কী হয় তোর শালা!’

হৃদি চুপচাপ সামির মাথায় জলপট্টি লাগিয়ে দিচ্ছিল। তার মুখখানা থমথম করছে রাগে। কার ওপর এত রাগ কে জানে! মনে হয় অমৃতার ওপরেই। অথচ একটু আগেই অমৃতার জন্য তার মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু মেয়েটার এই বেহায়ার মতো আকস্মিক আগমন মনের ভেতর পূর্বের রাগ ফিরিয়ে এনেছে। বারবার ঘুরেফিরে এ বাড়িতে আসা কেন ভাই? আত্মসম্মান বোধ বলতে কি কিছু নেই নাকি? এই মেয়ে সত্যি পাগল হয়ে গেছে। বরবাদ হয়ে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে!

ভাবতে ভাবতে হৃদি জলের বাটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুখে বলল, ‘আমি পানিটা পাল্টে আনি। বাবা আপনি চা কফি কিছু খাবেন?’

রাশেদ নিউজ পেপার থেকে চোখ না তুলেই বললেন, ‘চা হলে মন্দ হয় না।’

হৃদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই অমৃতা জায়গা বদল করল। সামির পায়ের কাছ থেকে উঠে এসে মাথার কাছে বসল খুব সন্তর্পণে। সামির মুখটা বড়ই রুগ্ন দেখাচ্ছে। কেমন মায়া লাগল দেখে। অমৃতা ওর কপালে একটা হাত রেখে বলল, ‘তোর মন খারাপ নাকি?’

সামি অস্পষ্টভাবে বলল, ‘না এখন ঠিক আছি।’

অমৃতা ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিষ্পলক। এই ছেলেটা জন্মেছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে। জন্মের পর থেকে সে দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন দেখেনি কখনো। যখন যা চেয়েছে, পেয়েছে। জীবন তার কাছে ফুলশয্যা বৈ অন্য কিছু নয়। শুধু বিভার সাথে বিচ্ছেদটাই তার জীবনের একমাত্র কালো অধ্যায়। সেই কালো অধ্যায়টিও এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, ঘুচে গেছে হৃদির আগমনে। হৃদি ওর জীবনে বিভার অভাব পূরণ করে দিয়েছে। বাবা মা আর স্ত্রীকে নিয়ে সামির ছিমছাম সুখের সংসারটি এখন পরিপূর্ণ। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে সে চকিতে একবার তাকালো খানিক দূরে বসে থাকা মানুষটার দিকে। হঠাৎ করেই বুকের ভেতর হুহু করে একটা বোবা কান্নার ঝড় উঠল। এই দুটি মানুষই তার জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ! কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে, এদের দুজনকে কোনোভাবেই একসাথে সে চাইতে পারবে না। বেছে নিতে হবে যেকোনো একজনকে। যাকেই বেছে নিক না কেন আগুনে তাকে ঝাঁপ দিতেই হবে। চোখের সম্মুখে সে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাচ্ছে। আর একটু হলেই সেই

আগুন ছুঁয়ে ফেলবে তাকে। এবার আর বেঁচে যাবার পথ নেই। জ্বলতে তাকে হবেই। হয় একূলে নয় ওকূলে!

রোমেলা ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন ঝড়ের বেগে।' আমার বাচ্চাটার কী হয়েছে?' 'বলে তিনি সামির কাছে উড়ে আসলেন মুহূর্তের মাঝে। অমৃতা চট করে সরে গেলো জায়গাটা থেকে। সামি বাবা মা দুজনকে একসাথে পেয়ে তৃপ্ত হলো, প্রীত হলো এবং সবশেষে নিশ্চিন্ত হলো। ঘর থেকে বেরোবার আগে অমৃতা একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ওদের তিনজনকে একত্রে। ভালো দেখাচ্ছে। সুন্দর, ছোট্ট ছিমছাম পরিবার। হৃদি এসে পাশে দাঁড়ালেই ষোলো আনা পূর্ণ হবে। চোখের সামনে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অশ্রুবিন্দুর ভেতর দিয়ে সে হৃদিকে ঘরে ঢুকতে দেখল। তারপর আর একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সোজা নেমে এলো নিচে বিড়বিড় করে জপ করার মতো বলতে লাগল, ভালো থাকো তোমরা। ভালো থাকো। ভালো থাকো। ভালো থাকো! সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তার দুটি চোখের মণি নিশ্চল হয়ে সম্মুখে চেয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে এখন শুধুই শূন্যতা। একটা জলের ধারা ডান চোখের নিচ দিয়ে বয়ে এসে গাল ছুঁয়ে ফেলেছে। মুখজোড়ায় বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের ভাঙচুরের প্রতিফলন। তার ভেতরে সকাল বেলার অসহায় ভাবটা আবারও ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে বুঝি কেউ পাশে নেই কিচ্ছু নেই, ফাঁকা, সব ফাঁকা!

ড্রইংরুমের সোফায় এসে বসল সে। সিলিঙে ঝুলে থাকা ঝাড়বাতির হলুদ আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। ঘরের ভেতর এয়ার কন্ডিশন চলছে। কেমন একটু শীত শীত ভাব। মাথাটা ঘুরাচ্ছে। শরীর দুর্বল। ব্রেকফাস্টের পর সারাদিন আর কিছু খাওয়া হয়নি। এ মুহূর্তে তার তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু উঠে গিয়ে পানি ঢেলে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মাথার ওপর দিয়ে টুকরো টুকরো মেঘের মতো নানান চিন্তা ভেসে যাচ্ছে। কোনো চিন্তাই স্থির হয়ে থাকছে না বেশিক্ষণ। আসছে, ভাবাচ্ছে··· আবার উবে যাচ্ছে। তবে সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ছাপিয়ে এক সহজ অথচ মারাত্মক উপলব্ধি দীর্ঘশ্বাস হয়ে তার সমস্ত অন্তরে ক্রমে ক্রমে একটা তোলপাড় সৃষ্টি করছিল। সেই

উপলব্ধি অনেকটা এরকম যে, এই জন্মে বুঝি তার আর সত্যিকারের সুখে থাকা হবে না। এই জন্মের সুখটা সামি আর হৃদির জন্যেই বরাদ্দ রইল! পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই তা সে জানে। তবে মৃত্যুর পরের জীবনটায় এই হিসাব নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেবে বিশ্ববিধাতা!

কতক্ষণ কাটল কে জানে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা কেউ একজন খুলল। লম্বা মানুষটা দরজার ফাঁক গলে উঁকি দিয়ে খুব নিচু গলায় বললেন, 'তোমার ফোনের কী হয়েছে?'

অমৃতা পকেট হাতড়ে ফোন বের করে দেখল, 'চার্জ চলে গেছে।'

রাশেদ ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা ভালো মতো দেখে শুনে লক করলেন। ঝাড়বাতির হলদে আলোর জোয়ারের ভেতর দিয়ে অমৃতা ঘোলা চোখ মেলে দুর্বলভাবে তাকালো তাঁর দিকে। মানুষটার দু চোখে এখন স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসের ঝিলিকটা নেই। আছে গভীর বিষণ্ণতা আর চাপা হাহাকার।

– 'অমৃতা! আশা করি ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ। সামি যদি কিছু জানতে…'

– 'আমি জানি। আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

রাশেদ অমৃতার পাশে এসে বসলেন। ওর শুকনো মুখটা তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বললেন, 'তুমি সারাদিন কিছু খাওনি?'

– ‘আমার কথা বাদ দিন। আপনার কী হয়েছে? এরকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ করেনি তো?’

মনে মনে একটু চমকে উঠলেন রাশেদ। তাঁর কেমন লাগছে। তিনি কেমন আছেন এই খবরটা যেন বহু শতাব্দী পর কেউ এমন ব্যাকুলভাবে মন থেকে জানতে চাইল। যে প্রশ্নটা কাছের মানুষদের করার কথা ছিল সেই প্রশ্নটা করে বসল এই দূরের মেয়েটা। মানুষের জীবনে আসলে কে কাছের আর কে দূরের, তা এক জটিল, দুজ্ঞেয় এবং অমীমাংসিত ধাঁধাঁ!

– ‘আমি ঠিক আছি।’

– ‘মিথ্যা কথা বলছেন।’

– ‘কী করে বুঝলে?’

– ‘আমি বুঝি আপনাকে।’

তিনি অমৃতার ফর্সা সুন্দর নরম হাতখানা তার সবল হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন। স্থিরতার সাথে বললেন, ‘আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। সামির আম্মা সত্য উদ্ঘাটনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। সামিকে ব্যাপারটা কোনোমতেই জানানো যাবে না।’

– ‘হুম।’ ছোট করে বলে অমৃতা।

– ‘তুমি বাসায় ফিরে যাও। বাবা মাকে বুঝিয়ে বলো যে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। আর… কয়েকটা দিন আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করো না। কেমন?’

– ‘একটা ফোনও করা যাবে না? আজব! মেরে ফেলতে চান নাকি আমাকে?’

দরজার ওপাশ থেকে কারো পদশব্দ ভেসে আসলো হঠাৎ। রাশেদ একটু সচকিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন বসা থেকে। ব্যস্ত গলায় বললেন,

– ‘আমি এখন আসছি। তোমাকে ড্রাইভার নামিয়ে দিয়ে আসবে তোমার বাসায়। ’

অমৃতা উঠে দাঁড়ালো। জল টলমল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মানুষটার দিকে। কম্পনযুক্ত গলায় বলল, ‘এখানেই শেষ?’

রাশেদ অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। মেয়েটির চোখে চোখে তাকানোর মতো মানসিক শক্তি এ মুহূর্তে তাঁর নেই।

– ‘আমিও চাই সামি ভালো থাকুক। আপনার সিদ্ধান্তকে আমি রেসপেক্ট করি।’ দম বন্ধ করে কথাগুলো বলল অমৃতা

রাশেদ কিছু বললেন না। শক্ত চোয়াল নিয়ে স্থির চোখে চেয়ে রইলেন দেয়ালে লেগে থাকা ভার্টিক্যাল গার্ডেনের লতানো পাতার দিকে। কয়েক সেকেন্ড অমৃতাও চুপ করে রইল। দরজার বাইরের পায়ের আওয়াজটা আবার পাওয়া গেলো। রোমেলা এ সময়

নিচে নামার কথা না। খুব সম্ভবত চাকরবাকর কেউ হবে। রাশেদ ড্রাইভারের নম্বরে ডায়াল করে গাড়ি বের করতে বললেন। তারপর গম্ভীর গলায় অমৃতাকে বললেন, 'যাও, আর দেরি করো না। বাসায় গিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেল। বাবা মাকে গিয়ে বলো, সব সমস্যা মিটে গেছে।'

– 'একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

– 'কী প্রশ্ন?' মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

– 'আমাকে মিস করবেন?'

রাশেদ একটা বড় শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'না করব না।'

অভিমানের একটা কনকনে ব্যথা চিলিক দিয়ে উঠল অমৃতার বুকের ভেতর। পাতলা গোলাপি ঠোঁটদুটো ফুলে গেলো বাচ্চা মেয়ের মতো। ঈষৎ বাঁকা গলায় সে বলল, 'বেশ!' আর কোনো কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। বুকটায় বড্ড দাপাদাপি! কেউ পাঁজর খুলে নিলেও বোধহয় এর চেয়ে কম কষ্ট হতো।

– 'অমৃতা শোন।'

দাঁড়ালো সে। কিন্তু ঘুরে তাকাল না। দরজা বরাবর মুখ রেখেই বলল, 'বলুন।'

– 'তোমাকে মিস করব না কারণ তুমি আমার সাথেই থাকবে সব সময়। যে মানুষ সাথে থাকে। পাশে থাকে। তাকে কি আর আলাদাভাবে মিস করা যায়?'

অমৃতা ফিরে তাকালো রাশেদের দিকে। কী যেন একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো আবার। একটা শ্বাসরুদ্ধকর আবেগ তার বাকশক্তি কেঁড়ে নিল হঠাৎ। হাত বাড়িয়ে দরজার নবটা ঘুরালো সে। তারপর বেরিয়ে এলো হনহন করে। সিঁড়ির গোড়ায় হৃদিকে পাওয়া গেলো। কিচেনে গিয়েছিল সে সামির জন্য স্যুপ তৈরি করতে। অমৃতার রক্তলাল চোখজোড়া দেখে একটু থমকালো হৃদি। বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তুই ঠিক আছিস?'

– 'আমি যাচ্ছি। তোদের আর বিরক্ত করব না। তোর শ্বশুরের দিকে খেয়াল রাখিস। খালি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকিস না। উনার শরীর বিশেষ ভালো নেই।'

হৃদিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে প্রস্থান করল জায়গাটা থেকে। মূল ফটকের সামনে গাড়িটা রাখা ছিল। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে বসল। এতক্ষণের অবরুদ্ধ কান্নাটা বাধ ভাঙল এবার। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। গাড়ির ব্যাক মিররে চোখ রেখে অল্পবয়সি ড্রাইভারটা সেই কান্নার সম্যক রূপখানি আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করল। কৌতূহলে তার চোখের মণি আরেকটু হলেই যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। অমৃতা গাড়ির জানালার গ্লাস নামিয়ে দিল। ভীষণ দমবন্ধ ভাব হচ্ছে তার। গাড়ি চলতে শুরু করতেই শেষ চৈত্রের গুমোট রাতটা হাওয়ায় হাওয়ায় ভরে উঠল। খোলা জানালার বাইরে মাথা বের করে আনল সে। দুরন্ত বাতাস খেলতে লাগল ওর চুল নিয়ে। শুষে নিতে লাগল চোখের জল।

কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে

শ্যামের পিরিত রাখ গোপনে

গাড়িতে গানটা বেজে যাচ্ছিল। কোন একটা রেডিও স্টেশন ধরা আছে এখন।

ইশারায় কইবি কথা গোঠে-মাঠে

দেখিস যেন কেউ না জানে

কেউ না বোঝে কেউ না শোনে

শ্যামকে যখন পড়বে মনে

চাইবি কালো মেঘের পানে

কিছুদিন মনে মনে…

অমৃতা একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। কিছুদিন? নাকি চিরদিন?

৯১

হৃদি তখনও সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমৃতার মাত্র বলে যাওয়া কথাটার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করছিল। 'তোদের আর বিরক্ত করব না' এই কথা দ্বারা আদতে কী বোঝানো হলো? হঠাৎ চোখের সামনে কাঁধে ব্যাকপ্যাক নিয়ে প্রায় নির্জীব অবস্থায় হেলতে দুলতে রুদ্রকে বাড়িতে ঢুকতে দেখল সে। ট্রেন যাত্রার ধকলে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ধূলোর আস্তর পড়ে কালচে হয়ে আছে মুখ। রুক্ষ চুলগুলো আউলবাউল হয়ে ছড়িয়ে আছে ঘাড়ময়।

হৃদিকে দেখামাত্র সে তার মলিন মুখখানা ভরে একটা ঝলমলে হাসি হেসে বলল,

– 'আরে মামা! তুমি কি আমার জন্য ওয়েইট করতেছিলা?'

– 'ইশ তোরে এরকম নোংরা দেখাচ্ছে কেন? নর্দমার পানিতে ডুব দিয়া আসছিস নাকি?' নাক মুখ কুঁচকে গেলো হৃদির। তবে মুখে যাই বলুক না কেন বস্তুত রুদ্রর আমুদে আর রসিক গলার স্বর শুনতে পাওয়ামাত্র তার বুকের চাপটা যেন অনেকাংশে কমে গেলো। রুদ্র দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটু ঝুঁকে নিয়ে পায়ের জুতো খুলে নিল। তারপর সহাস্যে বলল, 'হ দোস্ত, নর্দমায় ডুব দিয়া আসছি। এখন আয় তোরে একটা হাগ দেই। কতদিন পর দেখা!

হৃদি আঁতকে উঠল, 'অসম্ভব এই নোংরা শরীর নিয়ে তুই আমার কাছে আসবি না!'

হৃদির কথা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই রুদ্র তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসলো ওর দিকে।

'আল্লাহ বাঁচাও!' বলে একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠে হৃদি পড়িমরি করে দিল ছুট। ধুপধাপ শব্দ করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল দুজনে। হৃদি সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'রুদ্রর বাচ্চা! ভালো হবে না বলতেছি। থাম তুই!' রুদ্র প্রত্যুত্তরে হো হো করে ডাকাতের মতো হাসছে। হৃদিকে তাড়া করতে পেরে যেন সে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দটি লাভ করছে এই মুহূর্তে। এতক্ষণের সুনসান নীরব বাড়িটা হঠাৎ করেই দুটি সমবয়সী যুবক-যুবতীর হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। সুতির শাড়ি গায়ে জড়িয়ে হৃদি সুবিধামতো দৌড়োতে পারছে না। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি শাড়িতে হোঁচট খাবে সে। তাছাড়া রুদ্রর সাথে পেরে ওঠা কি অত সহজ? দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে ঠিকই খপ করে ধরে ফেলল সে হৃদির বাম হাতের কবজি। হৃদি নাক মুখ বাঁকাচ্যাকা করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'দোস্ত প্লিজ। গোসল করে আয়। এই নোংরা জামা কাপড় নিয়ে আমাকে হাগ করিস না। মাফ চাই, দোয়াও চাই। আমার জামাই অসুস্থ। এদিকে

অমৃতার বাচ্চিও সিনেমা দেখায় বিদায় হইছে একটু আগে। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। বুঝার চেষ্টা কর।'

রুদ্রর মুখ থেকে ডাকাতিয়া হাসিটা তবুও সরল না। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'তোর জামাইয়ের আবার কী হইছে?'

– 'জ্বর।'

– 'শালা মাদী পোলা একটা। দুইদিন পর পর জ্বর হয়।'

– 'অই, আমার জামাইরে নিয়া উল্টাপাল্টা কথা বলবি না খবরদার।'

– 'অমৃতার কী হইছে?'

হৃদি আশপাশটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে গলা এক স্তর নিচে নামিয়ে বলল, 'জানি না! খুব ডায়লগ দিচ্ছিল তোদের আর বিরক্ত করব না। তোর শ্বশুরকে দেখিস। ব্লা ব্লা ব্লা!'

– 'তোর শ্বশুরের আবার কী হইছে?'

– 'জানি না কিসু। তবে অমৃতা মনে হয় কান্নাকাটি করছে। চোখটোখ লাল।'

– ‘অমৃতা আবার কাঁদে নাকি? ওরে আমি জীবনে কখনো কাঁদতে দেখি নাই।’

– ‘আগে কান্নাকাটি করত না। এখন করে। কেমন জানি হয়ে গেছে। আগের মতো আর নাই।’

– ‘হুম··· সামি কোথায়?

– ‘শুয়ে আছে।’

– ‘চল।’ শব্দটা উচ্চারণ করে নিয়ে রুদ্র সামির শোবার ঘরে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

সামি বাতি নিভিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। রুদ্র ঘরে ঢুকেই প্রথমে বাতি জ্বালাল। কোনো কথা না বলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো সামির বিছানার দিকে। তারপর সড়াৎ করে একটানে তুলে ফেলল ওর গায়ে জড়ানো কাঁথা। হৃদি পেছন থেকে একটা চাপা ধমক দিয়ে উঠল, ‘আরে! ডিস্টার্ব করতেছিস কেন?’

ঘুম ছুটে গেলো সামির। জ্বরে কাবু হওয়া ছোট ছোট চোখ মেলে কোনো রকমে দেখল সে রুদ্রকে। ব্যথাতুর কণ্ঠে বলল, ‘দোস্ত প্লিজ বিরক্ত করিস না। ভালো লাগতেছে না।’

– ‘তোর ভাললাগতেছেনার গুষ্টি কিলাই। কী হয় দুই দিন পর পর হ্যাঁ? তুমি কি ন্যাদা বাচ্চা? দুদু খাও এখনো?’

সামি এবার রেগে গেলো খুব। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, 'শাট দ্যা ফাক আপ! দূর হ তুই। জ্বর আসছে আমার।'

– 'তোর বালের জ্বর আমি বাইর করতেছি দাঁড়া। আমি কিন্তু নর্দমায় ডুব দিয়া আসছি। এখন ময়লা শরীর নিয়ে তোরে হাগ করব। জানের মায়া থাকলে পালা শালা।'

রুদ্রকে আগাগোড়া একবার দেখে নিয়ে সামি রীতিমতন পিলে চমকে উঠল।

– 'আসলেই? তোর কী হইছে? এমন নোংরা দেখাচ্ছে কেন?'

– 'কী হইছে দেখবি?' বলে রুদ্র সামির বিছানার ওপর এক লাফে চড়ে বসল ওকে জড়িয়ে ধরতে। তড়াক করে উঠে বসল সামি। মুহূর্তের মাঝে তিন চার হাত দূরে ছিটকে সরে গেলো সে। বিপন্ন গলায় বলল, এরকম ময়লা শরীর নিয়ে আমাকে ধরবি না।'

'খবরদার!'

– 'ময়লা নিয়ে ধরলে তোর জ্বর পালায় যাবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। এটাই বেস্টেস্ট ট্রিটমেন্ট।'

– 'লাত্থি খাবি শালা।'

হৃদি ওদের কাণ্ড দেখে খিলখিল করে হাসছিল। সামির জ্বর টর সব লেজ তুলে পালিয়েছে এখন। রুদ্র বলল, 'জ্বর আসলে কী করতে হয় জানিস? ঠান্ডা পানি দিয়ে ঝপাঝপ গোসল করে ফেলতে হয়। যা এখুনি বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার নে। ঠান্ডা পানি দিয়ে।'

– 'আরে না। জ্বর বেড়ে যাবে।' হৃদি ফোড়ন কাটল।

– 'মোটেও বাড়বে না। আমি ফ্রেশ হয়ে আসতেছি। আইসা যেন দেখি তোর জামাইয়ের জ্বর হাওয়া হয়ে গেছে। নইলে তোরেই আজকে হাওয়া করে দিব।'

খুব ভালো মতো দুই বন্ধুকে শাসিয়ে নিয়ে রুদ্র নিজের ঘরে গেলো। সামি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করল না বটে তবে তার ভেতরে একটা প্রফুল্ল ভাব প্রত্যক্ষ করল হৃদি। সে কয়েকবার হাত পা ছুঁড়ে আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে বলল, 'ক্ষুধা লাগছে। কী খাওয়া যায়?'

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হৃদি বলল 'আমি চিকেন স্যুপ বানাইছি। খাবি?' শুনে সামি হাসে, 'ওয়াও। জ্বর মুখে বৌয়ের হাতে বানানো গরম গরম চিকেন স্যুপ। অসাম!'

হৃদি স্যুপ আনার জন্য নিজেই নামল নিচে। কিচেনে ফোন করে দিলে অবশ্য কাজের লোকরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সার্ভ করে দিয়ে যেত। কিন্তু এ মুহূর্তে কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে হলো না। এসব টুকটাক কাজ তো নিজেই করা যায়। তার পরনে জলপাই সবুজ রঙের সুতির শাড়ি। হাতভর্তি স্বর্ণের চুরি। নাকে হীরের ফুল। পিঠময় ছড়িয়ে আছে সুন্দর ঝরঝরে খোলা চুল। তাকে দেখতে বেশ বৌ বৌ লাগছে। ডাইনিং

এ শাশুড়ির সাথে দেখা হয়ে গেলো। সাথে একজন অতিথি উপস্থিত আছেন। রোমেলার কলেজ জীবনের বন্ধু। এর আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছে হৃদি এই মহিলাকে।

– 'আমার বাচ্চাটা কেমন আছে এখন?' রোমেলার প্রশ্ন।

– 'এখন একটু বেটার।' বলল হৃদি।

শুনে রোমেলা নিশ্চিন্ত হলেন। খুব দ্রুত গল্পে মশগুল হয়ে পড়লেন আবার। হৃদি কিচেনে গিয়ে স্যুপ বেড়ে নিল বাটিতে। কী মনে করে দুটো বাটি রেডি করল। তারপর ট্রের ওপর স্যুপের বাটি চামচ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসলো। ডাইনিং পার হবার সময় একবার শাশুড়িকে বলল, 'আপনাদের স্যুপ দেবো? আমি বানিয়েছি।'

অতিথি কিছু বলার আগেই রোমেলা হাত নেড়ে আপত্তি জানালেন, না না! আমরা ঠিক আছি।'

হৃদি আর কথা বাড়ালো না। বেরিয়ে এসে স্টাডিরুমে একবার উঁকি দিল। শ্বশুরমশাই এ সময় স্টাডিরুমেই থাকেন। আজকে আছেন কিনা কে জানে। ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজার হাতলটা হালকাভাবে ধরতেই ক্যাক করে একটা বিচ্ছিরি শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি গলার স্বর শুনতে পাওয়া গেলো, 'কে?'

– 'বাবা আমি!'

– ‘এসো।’

ট্রে হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল হৃদি। নিষ্প্রভ আলোর ল্যাম্পশেড জ্বলছে একটা। টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে ভ্রুকুটি গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছেন শ্বশুরমশাই। ঘরময় এলোমেলোভাবে অনেকগুলো কাঠের চেয়ার রাখা। টেবিলের ওপর কয়েকটা খালি চায়ের কাপও পড়ে আছে এখনো। মিটিং শেষ হবার পর কাজের লোকরা ঘরটা আর পরিষ্কার করেনি। এটা কোনো কথা হলো? এতগুলো বাধা চাকর বাড়িতে। কারো বুঝি একদণ্ড সময় হলো না এই ঘরে একবার আসার? হৃদির অপরিপক্ক নবীন সংসারি মনটা বাড়ির কাজের লোকদের এহেন দায়িত্বজ্ঞান হীনতা দেখে ভারি ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। এখুনি রান্নাঘরে গিয়ে কয়টা কড়া কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

– ‘কী খবর?’ প্রশ্ন করলেন তিনি।

হৃদি হাতে ধরে রাখা ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, ‘আমি সামির জন্য চিকেন স্যুপ বানিয়েছি বাবা। আপনি একটু চেখে দেখবেন?’

হক সাহেব পুত্রবধূর উপরোধে সুন্দর হাসলেন।

– ‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সামি এখন কেমন আছে?’

হৃদি স্যুপের বাটিটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ। এখন আগের চেয়ে একটু বেটার ফিল করছে।’

হক সাহেব বাটিভর্তি স্যুপ এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, ‘লুকস গুড! মনে হচ্ছে খেতেও ভালো হবে।’

হৃদি সলজ্জ হাসল। শ্বশুরকে শ্রদ্ধাভরে দেখল একবার। গায়ে ছাই রঙের একটা কলারওয়ালা টি শার্ট, কালো ট্রাউজার। তার বাবা বাড়িতে লুঙ্গি পরেন সব সময়। কিন্তু শ্বশুর মশাইকে সে লুঙ্গিটুঙ্গি পরতে দেখেনি কখনো। লোকটার মধ্যে এই বয়সেও সবসময় একটা ফিটফাট ভাব কাজ করে। অবশ্য বয়স তো একেবারেই বোঝা যায় না। অবস্থা এমন যে সামির বড়ভাই হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যাবে। আর কথা বলেন কী সুন্দর করে! শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে। অমৃতাটা এইজন্যেই তো··· ধ্যাৎ! হৃদির মাথাটা গেছে একেবারে। এখন কি এসব ভাববার সময়?

– ‘তোমার বাবা মা কেমন আছেন?’

– ‘উনারা ভালো আছেন। আপনার শরীর ঠিক আছে তো? একটু কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।’

আন্তরিক প্রশ্নটা শুনে হক সাহেবের মন ভরে গেলো। তিনি প্রসন্ন গলায় বললেন, ‘আমি ভালো আছি মা। আমার ছেলেটাকে নিয়ে শুধু একটু চিন্তা হচ্ছিল।’

– ‘ওকে নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। বলল ক্ষিদে পেয়েছে। এর মানে জ্বর কমে এসেছে।’

– ‘তুমি তাহলে আর দেরি করো না। স্যুপ ঠান্ডা হয়ে যাবে।’

হৃদি ট্রে হাতে তুলে নিল আবার। হেসে বলল, ‘আসছি বাবা। আপনার কিছু লাগলে বলবেন।’

– ‘নিশ্চয়ই।’ তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন হক সাহেব।

করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে হৃদি ভাবছিল যে, তার শাশুড়ি মানুষটা যেন কেমনতর! দেখতে ফকফকা সুন্দরী হলে কী হবে, ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি মনে হয় কিছুই নেই। এরকম একজন গুণবান এবং রূপবান স্বামী পেয়েও কদর করতে জানল না। বরকে একটু সময় দেবে তা না। সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়ে মত্ত। আজ সন্ধ্যায়ও বাড়ি ফিরেছে শপার্স ওয়ার্ল্ড থেকে একগাদা কেনাকাটা করে। এহেন দুর্দিনে এত শপিং করার মন মানসিকতা আসে কোত্থেকে? হৃদি এই অল্প কদিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বোঝে যে স্বামীর মনে শান্তি না থাকলে কোনো স্ত্রীর পক্ষেও যথাযথ শান্তিতে থাকা সম্ভব না। নিজের বাবা মায়ের ভেতরেও এমনই নির্ভরযোগ্য নিটোল সম্পর্ক দেখে এসেছে সে ছোটবেলা থেকে। কিন্তু তার শাশুড়ির মনটা যে কোথায় থাকে তা এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মহিলার সংসারে মন নেই এক ফোঁটা। সারাক্ষণ একটা পাইপাই খাইখাই ভাব। বিলাসিতা, বাহুল্য আর বড়লোকিকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে তার পৃথিবী। এ কারণেই তো বাইরের লোকে সুযোগ পেল। অমৃতাটা কয়েকদিন আঁকুপাঁকু করে ঠিকই সোজা পথে চলে আসত। এই লোভী, স্বার্থপর এবং কিম্ভূত মহিলার কারণেই ব্যাপারটা এখন মাচ মোর কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। অমৃতা শূন্যস্থান পূরণ করে দিয়েছে। স্থানটি শূন্য না হলে ঘটনা অন্যরকম হতো।

ঘরে এসে দেখা গেলো রুদ্রও উপস্থিত আছে। এর মাঝেই গোসল সেরে নিয়েছে সে। পরনে হাফ প্যান্ট আর টি শার্ট। চুল ভেজা। ঢেউ খেলানো ভেজা চুলে বিন্দু

বিন্দু জল টলমল করছে এখনো। চেয়ারে বসে গিটার নিয়ে টুংটাং করছে। ওর জন্যেও এক বাটি স্যুপ নিয়ে আসা উচিত ছিল। ইশ বেচারার নিশ্চয়ই জার্নি করে এসে খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

সামি বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে। হৃদি সাইডটেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে স্যুপের বাটিটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। সামি বাটি হাতে নিয়ে বলল, 'রুদ্রকে দিলি না?'

রুদ্র গিটারে টুংটাং করছিল, 'কী এইটা?'

– 'স্যুপ।'

– 'স্যুপটুপ খাবো না মামা। ভাত দে। ভাত খাব।'

হৃদি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়ালে লাগানো টেলিফোন সেটটার কাছে এগিয়ে গেলো। রান্নাঘরের ফোনে ডায়াল করে একজন কর্মচারীকে বলে দিল ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে আসার জন্য ওপরে। ঘড়িতে এখন সবে সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়ির লোকেদের ডিনার করতে করতে দশটা বেজে যায়। রুদ্র বেচারা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ফোন রেখে দিয়ে হৃদি শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসে রুদ্রর ভেজা ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে থাকা চুলগুলো খুব ভালো মতো মুছে দিল যত্নের সাথে। সেই সাথে বকাঝকাও করতে লাগল খুব, 'লম্বা চুল রাখতে তোকে কে বলছে? পারিস নাতো ম্যানেজ করতে। দুইদিন পর তোর মাথায় উকুন হবে বলে দিলাম।'

রুদ্রকে তখন গানে পেয়েছে। হৃদির মাথা মোছার দমকে অবশ্য তার গিটারের ওপর চলতে থাকা আঙুল গেছে থেমে। চোখ বন্ধ করে গুনগুনিয়ে একটা সুর ভাজছিল সে। হঠাৎ বলে উঠল, ‘এই সবাইরে ফোন লাগা তো। কতদিন একসাথে সবগুলাকে দেখি না। ফোন লাগা।’

সামি কোনো প্রত্যুত্তর করল না। চামচে গরম স্যুপ তুলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগল মনোযোগের সাথে।

হৃদি ভেজা তোয়ালেটা বারান্দার গ্রিলের ওপর মেলে আসলো। তারপর ফোন হাতে নিয়ে গ্রুপ কল করল সব বন্ধুদের। বিভা প্রায় সাথে সাথেই জয়েন করল। ফোনের পর্দায় ওর লাল সিঁদুরভর্তি কপালটাই ভেসে উঠল সবার প্রথমে। আকাশ অনলাইনে চলে এলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। চিৎকার করে বলল, ‘আমার এখানে নেটওয়ার্ক নাই একেবারেই। লাইন কেটে যাবে যে কোনো মুহূর্তে।

বিভা ওপাশ থেকে হড়বড় করে তখন বলে যাচ্ছে, ‘এই জানিস, আমি নাচ শেখানোর দুইটা স্টুডেন্ট পাইছি। ওরা প্রতিদিন বিকালে আমার কাছে নাচ শিখতে আসে।’

– ‘তাই নাকি? কত টাকা দিবে?’ তড়িৎ গতিতে প্রশ্ন করে রুদ্র।

– ‘টাকা দিবে না তো। আরে গ্রামের গরিব মানুষ। এদের কাছ থেকে আবার টাকা নিব?’

সেই সময় অমৃতাকে পাওয়া গেলো লাইনে। তার স্ক্রিনটা অন্ধকারে ঢাকা। নাক মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে সামি বলল, 'কীরে অমৃতা, তুই কিছু না বলে চলে গেলি কেন?'

কয়েক সেকেন্ড পর অমৃতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেলো, 'এমনি দোস্ত। মাথাটা ব্যথা করতেছিল। তাই চইলা আসছি। তোরে আর ডিস্টার্ব করি নাই।'

রুদ্র ভ্রু কুঁচকে বলল, 'অমৃতা, তোর কি মন খারাপ?'

– 'নারে… ঠিক আছি।' অমৃতার কণ্ঠস্বর ম্লান।

রুদ্র গিটারের তারে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'আরে মন খারাপ করিস না। চিল কর দোস্ত। চিল কর। দুনিয়া কয়দিনের? এত প্যারা নেয়ার কোনো মানে হয় না। হাসো খেলো খাও দাও ঘুমাও ব্যস এটাই লাইফ।' কথাটা বলা শেষ করে সে শিস দিয়ে উঠে একটা গানের সুর ধরল। বিভা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, 'ইশ অনেকদিন পর রুদ্রর গান শুনতেছি।' এটুকু বলে সে ঘাড় ঘুরিয়ে উঁচু গলায় অভিজিৎকে ডাকল, 'অভি! এদিকে এসো। রুদ্রর গান শুনে যাও।'

"Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy"

অভিজিৎ বাথরুমের বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল। তার গালভর্তি সাদা রঙের শেভিং ফোম। বিভার পীড়াপীড়িতে সেই অবস্থায়ই তাকে কাঁধে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতে হলো। বিভাবরী ড্রেসিং টেবিলের আয়নার গায়ে ভর দিয়ে সেলফোনটা দাঁড় করিয়ে দিল তারপর বরের হাত ধরে রুদ্রর গানের তালে তালে আরম্ভ করল নাচ। সেই নাচ দেখে হৃদিও উঠে পড়ল। সামির স্যুপ তখন শেষের পথে। হৃদি সামির হাত ধরে টেনে তুলল ওকে বসা থেকে। তারপর হেলেদুলে নাচতে লাগল। সামির মুখে দিনভর স্কচটেপের মতো লেপটে থাকা বিষণ্ণতাটা কেটে গেছে এখন। রুগ্ন ভাবটা যায়নি বটে তবে মুখের রুচি ফিরে এসেছে। পেটভর্তি এখন চনমনে খিদে।

এদিকে রুদ্র মাথা নেড়ে নেড়ে গেয়ে যাচ্ছিল-

"In every life, we have some trouble

But when you worry you make it double

Don't worry, be happy

Don't worry, be happy now

don't worry"

আকাশ তখন অফলাইনে চলে গেছে। অমৃতার পর্দা অন্ধকার। মূর্তিমান স্থির সে। হ্যাপি হতে কার না ইচ্ছে করে! কিন্তু নিয়তি তাকে এমন এক মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন হ্যাপিনেসের সাথে তার হয়ে গেছে জন্ম জন্মান্তরের বৈরিতা। এই বৈরিতাটুকু কবে যে আবার পুরোদস্তুর স্বস্তিতে পরিণত হবে তা এক খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন সে অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে তাদের অ্যাপার্টমেন্টের বারো তলার ছাদে। মাথার ওপরে গুমোট আকাশ। একটা ভাঙা ম্লান

চাঁদ। কোথাও এক রত্তি হাওয়া নেই। ভ্যাপসা গরম ঘর্মাক্ত করে তুলছে মুখের ত্বক। বাসায় ফিরে যাবার ইচ্ছে, উদ্যম বা সাহস এর কোনোটিই এ মুহূর্তে নেই তার। সেলফোনের চার্জ চলে গিয়েছিল পুরোপুরি। বাসার সামনের একটা স্টেশনারি দোকানে সৌভাগ্যবশত চার্জার পাওয়া গেলো। খাদ্য পাবার পর আবার চাঙা হয়ে উঠল যন্ত্রটা। বাবা এখন পর্যন্ত একটা ফোনও করেননি। মা দফায় দফায় ফোন করেছেন। কান্নাকাটি করে বাড়ি ফিরে যাবার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু যে বাবা তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়িছাড়া করল সেই বাবার টিকিটাও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অমৃতার সাথে যেন সত্যই তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বিতাড়িত হবার পর যেচে পড়ে বাড়ি ফিরে যেতে তার আত্মসম্মানে বাধছে। তাই অ্যাপার্টমেন্টের ছাদই এখন শেষ আশ্রয়স্থল।

– ‘এই অমৃতা তুই কোথায়?’ গান শেষ করে হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করল রুদ্র।

- ‘বাসায়।’ অস্ফুটস্বরে বলে অমৃতা। বলে শেষ করেই আবার বলে ওঠে, ‘শোন তোরা থাক। গানটান কর। আমি রাখি। মাথাটা ব্যথা করতেছে।’ এরপর কারো কোনো উত্তরের আশা না করে ফোন কেটে দিল সে। সেকেন্ড না গড়াতেই ফোনটা আবার আসলো। ক্যামেরা অফ রেখেই স্পিকার অন করল সে।

– ‘অমৃতা! কীরে তুই ঠিক আছিস তো?’ কথা বলছে সামি।

– ‘আমি ঠিক আছি।’

– ‘কেমন যেন টেন্সড মনে হচ্ছে তোকে। কোনো সমস্যা হয় নায় তো দোস্ত?’

– ‘কোনো সমস্যা হয় নাই। মাথাব্যথা একটু। তুই নিশ্চিন্ত থাক।’

– ‘আচ্ছা রেস্ট নে তাহলে।’

–হ্যাঁ। তোর জ্বর কমছে?’

– ‘কমছে।’

– ‘ভালো থাক দোস্ত।’

– ‘হুম। তুইও ঠিক থাক।

- ‘আচ্ছা।’

– ‘রাখি তাহলে।’

– ‘হ্যাঁ। রাখ।’

ফোন কেটে দিয়ে ছাদের সিমেন্টের উষ্ণ মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল অমৃতা। সারা শরীরে একটা ঝিমুনি ভাব। পেট অনেকক্ষণ খালি থাকার দরুণ খিদে মরে ভূত হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছে খুব। কিন্তু ঘুমাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অথচ গভীর

ঘুমের নেই রাজ্যে পদার্পণ করতে পারলেই এখন সবচেয়ে ভালো হতো। একটা নিশ্চিন্ত ঘুম, আর সব কিছু নেই হয়ে যাওয়া মাথা থেকে। কী চমৎকার!

আজকাল সামির সাথে কথা বলতে গেলে বুকে চাপ অনুভূত হয়। ভয়ংকর অপরাধবোধ চোরাবালির মতো ক্রমশ টেনে নিয়ে যেতে থাকে অতল এক অন্ধকার গহ্বরে। নিজেকে হিপোক্রেট মনে হয়। দুই নম্বর মনে হয়। বেইমান মনে হয়। কদিন ধরে ভাবছিল সামিকে সব খুলে বলবে। ওকে লেখা চিঠিটা এখনো সেভ করা আছে ফোনের নোটপ্যাডে। চাইলে এখনই পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আত্মা কাঁপে। ভয় ভয় লাগে। অশুভ আশংকায় হৃৎপিণ্ড দুলে ওঠে। ভয় নামক অনুভূতিটার সাথে অনেক বছর কোনো যোগসাজশ ছিল না তার। সে ছিল নির্ভীক, সাহসী এবং অকপট। মনের কথা লুকোতে জানত না। জানত না নিজের ইচ্ছেশক্তিতে লাগাম দিতে। এতটা স্বাধীনচেতা ছিল বলেই হয়তো প্রকৃতি এখন শোধ নিচ্ছে। আচ্ছা প্রকৃতি কি শোধ নেয়? নেয় হয়তো! এ পৃথিবীতে কাউকেই পুরোপুরিভাবে হারানো বা জেতানো হয় না। সবাই কিছু জায়গায় জেতে, আবার কিছু জায়গায় হারে। এভাবেই ভারসাম্য টিকে থাকে। যেভাবে প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় ঠিক সেভাবেই প্রতিটি মানুষকেও হার জিতের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। অমৃতা ঠিক কোন অপরাধের শাস্তি পাচ্ছে এই মুহূর্তে? জানে না তো সে! কোনটা অপরাধ আর কোনটা অপরাধ নয় তা বলে দেবে কে? হৃদয়ঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালে ঠিক কত দিনের সাজা হবে তার? যত কঠিন সাজাই হোক না কেন সেই সাজা মাথা পেতে নিতে কোনো আপত্তি নেই। এ জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছে সে। ছিমছাম সচ্ছল পরিবার। পছন্দনীয় বন্ধু। পছন্দের পেশা! পেল না শুধু পছন্দের মানুষ! একেবারেই পায়নি কি? পেয়েছে তো! লোকে বলে ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়!

এইযে মানুষটার মনের সাথে তার মন এক অদৃশ্য শেকলে বাধা পড়ে গেছে, এটা কি একধরনের পাওয়া নয়? এখন যতদূরেই তারা একে অপরকে ফেলে যাক না কেন, এই অদৃশ্য শেকল ঠিকই ঝনঝন শব্দে জানান দিবে নিজের অস্তিত্ব। সে এখন

জানে যে তার মনের মানুষটাও আদতে তাকেই ভালোবাসে। তাকেই চায়। কী আশ্চর্য! কথাটা মনে হতেই ওই চৈত্র রাতের গুমোট অন্ধকার আকাশের নিচে শুয়ে থেকে, অমৃতার মনটা হঠাৎ কিশোরী বালিকার মতো চপল আনন্দে মেতে উঠল। একটা জটিল সমীকরণ যেন সমাধান হয়ে গেলো নিমেষে। সামি পেয়েছে বাবা। রোমেলা পেয়েছে স্বামী আর অমৃতা পেয়েছে মানুষটার মন! মনটাই আসল। শরীর সঙ্গর চাইতে মনের সঙ্গ ঢের উত্তম। আত্মাই শ্বাশত! দেহের মৃত্যু সম্ভব কিন্তু আত্মার মৃত্যু সম্ভব না। ঠিক তাই ঠিক তাই! অমৃতা যা পেয়েছে তা শুধু এই পার্থিব জীবনের জন্য তো নয়! তা অনন্তকালের! আহা শান্তি! অমেয় শান্তি! শান্তিতে তার দুচোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। পবিত্র অনুভূতিতে সুবাসিত হয়ে উঠছে চারপাশ। নরম হয়ে আসছে এতক্ষণের বিক্ষিপ্ত মনটা মখমলের মতো। এ মুহূর্তে পুরো পৃথিবীকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। এই ছাব্বিশ বছরের জীবনে সময়ে অসময়ে যে বা যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, খারাপ কথা বলেছে, অপমান করেছে··· সব্বাইকে!

সেলফোন বেজে উঠল। এবার বাবার নম্বর থেকে ফোন আসছে। অমৃতার মাথা এখন ঠান্ডা, ভারহীন। ভাবনারা মসৃণ

সে ফোন ধরে খুব শান্ত গলায় বলল– ‘বাবা!’

– ‘কোথায় তুই?’ বাবার কণ্ঠস্বর গমগমে।

– ‘ছাদে।’

– ‘ছাদে মানে?’

– ‘আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে।’

বাবা চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ভারি গলায় বললেন, ‘বাসায় ফিরে আয়।
’

অমৃতারও মনটা যেন বাড়ি বাড়ি করছিল। নিজের ওই এক টুকরো ছোট্ট শোবার ঘরটা টানছিল খুব। টানছিল বিছানা। টানছিল মায়ের মুখখানা। তাছাড়া বাড়ি ফিরে যেতে আর বাধা কোথায়? অমৃতার তো এখন আর কোনো কষ্ট নেই, ক্লেশ নেই। নেই কারো প্রতি কোনো অভিযোগ হেরে গিয়েও দারুণভাবে জিতে গেছে সে। তার কিচ্ছু নেই তবুও যেন সব আছে। সব!

৯২

দুপুর বারোটায় আকাশ সায়দাবাদ বাস স্টেশনে এসে পৌঁছল। ওখান থেকে বাসা অবধি যেতে আরো ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগে গেলো। দরজা খুলল তারা। ওর পরনে বাইরে যাবার জামা। চুলে বেণী। কানে দুল। আকাশকে দেখে ঝলমলে হাসল সে, ‘ওহ্, এসে গেছেন। যাক বাঁচা গেলো। খালা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।’

তারার ঝলমলে হাসিটা আকাশ ওর আকাশময় হাসি হেসে ফিরিয়ে দিল। বলল, ‘তোমরা কেমন আছ?’

– ‘আছি এই তো।’

ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পায়ের জুতো খুলতে খুলতে আকাশ বলল, ‘উনি কেমন আছেন?’

– ‘কার কথা বলছেন?’

– ‘তোমার খালা।’

– ‘ও, আছেন মোটামুটি।’

– ‘পেট ব্যথা কমেছে?’

– ‘পেইন কিলার খেলে একটু কমে। আবার কিছুক্ষণ পর বেড়ে যায়।’

– ‘তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?’

– ‘জি একটু বেরোচ্ছি। টিউশনি আছে।’ বলে তারা পা বাড়াল। দরজাটা আটকে দেবার আগে গলা বাড়িয়ে একবার আকাশকে বলল, ‘আসছি ভাইয়া।’

– ‘হ্যাঁ ঠিক আছে। সাবধানে যেও।’

গোসল সেরে ডাইনিং স্পেসে এসে দেখা গেলো টেবিলের ওপর খাবার বাড়া আছে। ঝুমকির দেখা পাওয়া গেলো না। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। ঝুমকিকে সে নিজে খুব একটা পাত্তা দেয় না এ কথা সত্য। তবে সেই অবহেলাটুকু খুব একটা গায়ে মাখবার মতো ধারালো ব্যক্তিত্ব ঝুমকির কখনোই ছিল না। আকাশের কাছ থেকে সে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে একটানা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অপমানিত হয়েছে। তবুও তার আত্মসম্মানে এতটুকু লাগেনি। আকাশের সেবাযত্ন করাটাকে সে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছে যেন। টেবিলে খেতে বসলে ওর পাশে দাঁড়িয়ে এটা সেটা তুলে দেওয়া, বিকেলের চা-টা নিজের হাতে বানিয়ে দেওয়া, ঘুমোনোর আগে এক গ্লাস দুধ নিয়ম করে ওর ঘরে রেখে আসা, এই দায়িত্বগুলো সে বহুদিন ধরে নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। আজ তো আকাশ দু তিন দিন পরে বাড়ি ফিরল। তবুও ঝুমকি একটাবারের জন্য উঠে এলো না যে? খচখচে মন নিয়ে খাবার শেষ করল সে। বাড়িতে পিতৃদেব নেই। থাকলেই কী আর না থাকলেই কী? লোকটার থাকা না থাকায় আজকাল কিছু এসে যায় না আকাশের।

খাওয়া শেষ করে ভেতরের ঘরে একবার উঁকি দিল সে। শুয়ে আছে ঝুমকি বিছানায়। গায়ের ওপর ক্যাটক্যাটে গোলাপি রঙের একটা চাদর। ঘরটার দরজা জানলা আটকানো। ভ্যাপসা গরম। সিলিঙে ঝোলা ফ্যানটা থেকেও যেন খটখট শব্দ করে উত্তপ্ত বাতাস বেরোচ্ছে। দরজায় খুট করে শব্দ হতেই ঝুমকি চোখ মেলে তাকালো। তার মুখখানা ফ্যাকাশে। চোখ সাদাটে আর রক্তশূন্য। আকাশকে দেখে অনেক কষ্টে ঠোঁট নেড়ে বলল, 'ভাত খেয়েছ বাবা?'

জানে না আকাশ। কেন যে ঝুমকির এই রুগ্ন দশা দেখে তার বুকটা অমন মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ! জ্বলন্ত উনুনের আগুনে ছ্যাঁক খাবার মতো করে মনে পড়ে গেলো অনেক বছর আগের এমনই এক গ্রীষ্মের দুপুর বোলার কথা। স্কুল থেকে ফিরে এসে নিজের মাকে ঠিক এরকমই রুগ্ন, বিধ্বস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিল বিছানার ওপর। তার ছোট্ট মনটা মায়ের অমন পীড়িত ক্লিষ্ট চেহারা দেখে একদম দুমড়েমুচড়ে

গিয়েছিল। সেদিনের পর থেকে মা অসুখে ভুগেছিলেন প্রায় সাড়ে তিন বছর। আজকে এই মুহূর্তে যেন দেজা ভ্যু ঘটে গেলো। মনে হলো এই ঘটনাটি সে হুবহু এর আগেও

একবার প্রত্যক্ষ করেছে।

– 'আপনার ব্যথা কমেনি?'

এ প্রশ্নের উত্তরে শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে ঝুমকি যা বলল তার একটি অক্ষরও আকাশের কানে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করল না। সে অধৈর্য গলায় বলল, 'উঠুন আপনি। ব্যাস অনেক হয়েছে। চলুন ডাক্তারের কাছে।

আদেশ শুনেও নড়ল না ঝুমকি। দুর্বলভাবে চোখ বুজল একবার। আকাশ ধুপধাপ পা ফেলে সামনে এগিয়ে এসে ওর গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরালো। হাতের কব্জি ধরে টেনে তুলল শোয়া থেকে। ঝুমকির কাঁধের ওপর দু হাত রেখে বলল, 'খুব বেশি খারাপ লাগছে? যেতে পারবেন? নাকি ডাক্তার বাসায় ডাকব?'

ঝুমকি দুদিকে মাথা নেড়ে অস্ফুটস্বরে বলল, 'না বাসায় ডাকতে হবে না।'

– 'তাহলে চলুন। জাস্ট স্যান্ডেলটা পরে নিন।

কথাটা বলে সে নিজের ঘরে ছুট দিল। পকেটে ওয়ালেট আর মোবাইল পুরে নিয়েই তড়িঘড়ি করে ফেরত আসলো আবার ঝুমকির কাছে। গায়ের কাপড় আর পাল্টাল না। ঘরোয়া টি শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরেই বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। ঝুমকি

ততক্ষণে এলোমেলো চুলগুলি মুড়িয়ে একটা হাতখোঁপা করেছে আর বাসার স্যালোয়ার কামিজের ওপর বোরখা পরে নিয়েছে কোনোরকমে। পেটে এখনো টনটনে ব্যথা। হাঁটতে বড়ই কষ্ট। গতকাল থেকে একটু ভয় এসে গেছে তার ভেতর। মরেটরে যাবে নাকি আল্লাহ জানে। মরতে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই তার। এ জীবনে তার আছে কে? কার জন্য বেঁচে থাকবে? মরে গেলে বরং তার স্বামী বেশ খুশিই হবে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। আরো বেশি খুশি হবে আকাশ। এ সংসারে পদার্পণের প্রথম দিন থেকেই ছেলেটা তাকে মনে প্রাণে ঘেন্না করে। সেই তীব্রতর ঘেন্নাটা ঝুমকির গায়ে প্রতি নিয়ত কাঁটার মতো বিধত। খুব ভালোমতোই টের পেতো সে যে ছেলেটা তাকে সহ্য করতে পারছে না। তবুও মায়া লাগত। এইটুকু বয়সের মা মরা ছেলে। বাবাটা মেরুদণ্ডহীন, কাপুরুষ। ওরকম একজন পিতা থাকা আর না থাকা একই কথা। ছেলেটা বাবা মায়ের স্নেহ, মায়া মমতা থেকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত। এসব ভেবেই আঠার মতো ওর পেছনে লেগে থাকত সে। আশা ছিল একদিন বুঝি ছেলের মন ঘুরবে। ভালোবাসা না হোক অন্তত মায়া জন্মাবে। কিন্তু না, পোড়া কপাল! ছেলেটা তাকে মানুষ বলেই কখনো গণ্য করল না। তবে এ কদিন যাবৎ ঝুমকির একটু কেমন অন্যরকম লাগছে ওকে। বারবার ঘুরে ফিরে তার শরীরের অবস্থা জানতে চাইছে। ঢাকার বাইরে যাবার আগে কোন এক বন্ধুকে বলে গিয়েছিল খবর নিতে। সেই বন্ধু আবার রোজ একবার করে ফোন দিয়ে খোঁজ নিয়েছে তার। এ ছাড়াও বারংবার ডাক্তারখানায় যাবার জন্য চাপ দিচ্ছে ছেলে। মুখ শুকনো করে আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। ঝুমকির মনে হচ্ছে আজ তার নিজের পেটের একটা সন্তান থাকলেও বুঝি এই অসুস্থতার সময়ে ঠিক এমনিভাবেই মুখ কালো করে মায়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। এই ছেলের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক নেই। তবে এ কথা অকাট্য সত্য যে সংসারে শুধু এই ছেলেটির প্রতিই তার রয়েছে অগাধ মায়া। এর পিতা মানুষটা জানোয়ারের চেয়েও অধম। ছেলেটা না থাকলে ওই লোক এতদিনে তাকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করত না।

বাড়ির কাছের একটা হাসপাতালেই গেলো ওরা। আকাশের এক কলিগের বাবার চেম্বার এখানে। তিনি মেডিসিনের ডাক্তার। ঝুমকির রোগটা আসলে কী তা তো

এখনো অজানা। আপাতত ইনার কাছে গিয়েই সমস্যাটা শনাক্ত করা যাক। তারপর নাহয় বিশেষজ্ঞ দেখানো যাবে। ডাক্তারের চেম্বারে বেশ লম্বা লাইন। অপেক্ষা করতে হলো প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আকাশ ঝুমকিকে বসিয়ে রেখে এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করল। ফোনে বন্ধুদের সাথে কথা বলল। যে কলিগের বাবার কাছে আসা সেই কলিগকেও একটা ফোন করল। ওদিকে ঝুমকি মানুষ জনের ভিড়ে মিশে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল একাবোকা হয়ে। নেকাবের ওপর শুধু রক্তশূন্য চোখদুটি দেখা যাচ্ছিল তার। বাদ বাকি সব সাদা কাপড়ে ঢাকা।

একটা সময় ডাক পড়ল। ঝুমকিকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকল আকাশ। ডাক্তার সাহেবের মাথাভর্তি একরাশ পাকা চুল। মোটা সাদা গোঁফ। হাস্যোজ্জ্বল মুখ। আকাশকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন,

– ‘তুমি কি আমার ছেলে মানে সাব্বিরের কলিগ?

আকাশ ঝুমকির জন্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলল, ‘জি আংকেল। আমি সাব্বিরের কলিগ।’

– ‘বেশ বেশ! আমাকে সাব্বির একটু আগেই ফোন করেছিল। বলল তুমি আসবে।
’

ঝুমকি চেয়ারে বসল। আকাশও বসল ওর পাশে অপর একটি চেয়ারে। ডাক্তার সাহেব ঝুমকিকে ইঙ্গিত করে আকাশকে প্রশ্ন করলেন, ‘উনি কে? তোমার মা?’

অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু আকাশ কেন যেন থমকে গেলো প্রশ্নটা শুনে। ক্ষণিকের জন্য তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল। বুকে এসে লাগল কীসের যেন একটা বড়সড় ধাক্কা! ভারি বিব্রত দেখাল তাকে সেই মুহূর্তে। ঝুমকিও প্রশ্নটা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যদিও তার নেকাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুখের কোনো ভাবভঙ্গি টের পাওয়া যাচ্ছে না।

কয়েকটা শব্দহীন নির্বাক এবং অস্বস্তিকর মুহূর্তের পর আকাশ মুখ নিচে নামালো। খুব করে বলতে চাইল, 'জি না, মোটেও উনি আমার মা নন। উনি আমার বাবার দ্বিতীয় বৌ। আমার মা মরে গেছে অনেক আগে।' বলতে চাইলেও এসব কিছুই বলতে পারল না সে। গলা দিয়ে শুধু অনাহূত ভাবে বেরিয়ে আসলো একটি শব্দ, 'জি।'

উত্তরটা দেওয়ার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড সে কিছু ভাবতে পারল না। মাথাটা ফাঁকা। কানের কাছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। কী বলার ছিল আর কী বলে ফেলল। সে কি পাগল হয়ে গেছে? বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো থম ধরা চোখে ডাক্তার সাহেবের দিকে চেয়ে রইল সে। যদি পাশ ফিরে একবার তাকাতো তবে দেখতে পেত যে ঝুমকির চোখভর্তি তখন জল!

৯৩

চৈত্র পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল আসতেই একেবারে কাঠফাটা গরম পড়তে শুরু করল। রোদের তেজে সারাবেলা তেতে থাকে সারা শহর। সন্ধেটাও গুমোট। ভারি অস্বাস্থ্যকর আর দম আটকানো এক পরিবেশ। বিভার বাবা মা প্রায় এক মাস মেয়ের বাসায় অবস্থান করে অবশেষে ফিরে এসেছেন ঢাকায়। বিভা বাবা মায়ের হাতে বন্ধুদের জন্য ছোটখাটো কিছু উপহার পাঠিয়েছে। সাথে আম আর তেঁতুলের আচার। নিজের হাতে বানানো। এই আচারের রেসিপি তার শাশুড়ি মায়ের। অতি সুস্বাদু খেতে। বন্ধুরা

সকলেই ব্যস্ত। তবুও এক বিকেলে রুদ্র অফিসের পর বিভার বাসায় গিয়ে উপহার গুলো নিয়ে আসলো। একই বাড়িতে থাকার সুবাদে হৃদি সামির উপহার সঙ্গে সঙ্গেই হস্তান্তর করা গেলো। অমৃতা আর আকাশেরটা রইল জমা। ঝুমকির গলব্লাডারে পাথর জমেছিল। অপারেশন বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। আকাশকে তাই বেশ কিছুদিন নানা ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হলো। বন্ধুরা অবশ্য ঝুমকির অপারেশনের দিনটায় সকাল সন্ধ্যা আকাশকে সঙ্গ দিতে দ্বিধা বোধ করল না।

অমৃতার পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো। কাজ ছাড়া যেন এই মেয়ের জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুক্র, শনিবারেও চেম্বারে যায়। বন্ধুরা ছুটির দিনের বিকেলগুলোতে ওকে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যায়। ওর দেখা মেলে না। চেম্বার কোর্ট এনজিও আর ইয়োগা সেন্টারেই তার জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। দেখা না হলেও ফোনে বন্ধুদের রোজই আড্ডা হয়। সেই আড্ডাতেও অমৃতার উপস্থিতি বড় ম্লান। হাসি ঠাট্টায় কদাচিৎ অংশ নেয় সে। হৃদি আর বিভার সংসার জীবনের গল্পগুলি আজকাল তার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাবনার উদ্রেক করে। তার কখনোই আর দশটা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো ঘরকন্না করার শখ ছিল না। খুব ছোটবেলায়ই কখনো বিয়ে না করার ব্রত নিয়েছিল সে। জীবনটাকে সে দেখে অন্য চোখে। বিয়ে করে জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় একটি বিশেষ মানুষ এবং সংসারের পেছনে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না তার। কিন্তু আজকাল কী হয়েছে কে জানে! হৃদি আর বিভা যখন ওদের সাংসারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা এবং মিষ্টি মধুর ঘটনাবলী রসিয়ে রসিয়ে বন্ধুদের শোনায় তখন সব কিছু বোঝার পরেও, জানার পরেও তার শিক্ষিত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন পরিণত মনটার মধ্যে অজান্তেই অবুঝ অস্পষ্ট আর বোবা এক অনুভূতির জন্ম হয়। এই অনুভূতির নাম জানে না সে। কেমন যেন ঝাঁঝালো আর টনটনে। ব্যথা নয় আবার ব্যথারই মতো। কষ্ট নয় আবার কষ্টেরই মতো! বলতে নেই অমৃতারও তখন খুব ইচ্ছে করে… ভীষণ রকমের ইচ্ছে করে যে তার পছন্দের মানুষটির সাথে সেও ঠিক এরকম একটা জীবন কাটায়। ওইযে… কী যেন জীবন? হৃদি সামি বলছিল সেদিন

… ইচ্ছে জীবন! ওরা নাকি ওদের ইচ্ছে জীবন পেয়েছে। হ্যাঁ অমৃতারও একটা ইচ্ছে জীবনই পেতে ইচ্ছে করে!

কাজ ছাড়া বসে থাকলেই মাথায় হাবিজাবি চিন্তা আসে। বুকের ভেতর ভাঙচুর হয়। কান্নার মতো কিছু একটা সুড়সুড়ি দেয় গলায়। কাঁদে না সে। মাঝে মাঝে শুধু চোখ ভর্তি জল নিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। এর মধ্যে দেশের বাইরের কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লাই করেছে মাস্টার্সের জন্য। মন বলছে কোথাও না কোথাও এডমিশন হয়ে যাবে। হয়ে গেলেই বাঁচোয়া। দেশ ছেড়ে কিছুদিনের জন্য পালাতে পারলেই ভালো হয়। তবে কষ্ট হয় বন্ধুগুলার জন্যেই। এ কদিন দেখা সাক্ষাৎ কম হচ্ছে ঠিক, তবু তো তার সমস্তটা জুড়ে ওই বন্ধুরাই আছে। এখন সে জানে যে মনে চাইলেই ছুটে গিয়ে ওদের দেখতে পারবে। এই নিশ্চয়তা নিয়েই দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ ছেড়ে দূরে চলে গেলে মনে চাইলেই তো আর যখন তখন দেখতে পাবে না, ছুটে যেতে পারবে না। ব্যাপারটা চিন্তা করলে দমবন্ধ হয়ে আসে কষ্টে।

গ্রীষ্মের অনেকগুলো উত্তপ্ত দিন কাটবার পর একদিন হঠাৎ ছুটির দুপুরে ডাইনির ঢেউ খেলানো কালো চুলের গোছার মতো ভয়ংকর মেঘ ঘনিয়ে আসলো আকাশে। ধূলো উড়িয়ে ছুটল হাওয়া। সোঁদা মাটির ঘ্রাণে সয়লাব হলো চারপাশ। সাপের লিকলিকে জিহ্বার মতো বিদ্যুতের নীল আলো ছড়িয়ে পড়ল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। হৃদি কিচেনে একটা পিৎজা বেক করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে সামি দৌড়ে আসলো। হইহই করে বলল, ‘কী করতেছিস ছাই! বৃষ্টি আসতেছে। চল ভিজব।’ বলামাত্র আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেটা বাড়ির একগাদা চাকরবাকরের সামনে বৌকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিল। লাল টুকটুকে লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে গেলো হৃদির মুখ। সামি পাগলাটা কাজের লোকদের বিদ্রুপপূর্ণ হাসি আর ঠাট্টামাখা চাউনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে বৌকে কোলে করে নিয়ে চলে গেলো বাগানে। তারপর যেন পৃথিবীজোড়া ভালোবাসার বৃষ্টি নামল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। খানিক বাদে রুদ্রও যোগ দিল

ওদের সাথে। তিনজন যুবক-যুবতীর বৃষ্টিভেজা হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশ।

এভাবেই নদীর স্রোতে ভেসে আসা খুশবু ওয়ালা ফুলের মতো সুন্দর একেকটি দিন কাটছিল ওদের। হৃদির ইদানিং খুব রান্নার শখ হয়েছে। প্রায়ই নতুন নতুন অসাধারণ সব ডিশ বানিয়ে সে বাড়ির লোকদের চমকে দিচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে তিন বন্ধুতে মিলে খুব আড্ডা হয়। মুভি দেখা হয়। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে খেলা হয় নানা রকম ভিডিও গেমস। ঝুমকির অপারেশনের ঝামেলা শেষ হওয়ার পর থেকে আকাশও ওদের সাথে এসে যোগ দেয়। বিকেল থেকে রাত অবধি আড্ডাটাড্ডা দিয়ে একেবারে ডিনার করে তবেই বাড়ি ফেরে।

এদিকে অমৃতার মতোই আরেকজন মানুষও কাজের মধ্যেই ডুবে আছেন সকাল দুপুর রাত্রি। আপাত চোখে সেই মানুষটার ভেতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। তিনি তো আগাগোড়াই ব্যস্ত মানুষ। তাঁর জীবনটা ছক বাঁধা নিয়মে গড়া। সারাদিন কত শত লোকের সাথে উঠা বসা। সবার সাথেই নিয়ম রক্ষার্থে এবং কাজের খাতিরে স্বাভাবিক আচরণ করে যেতে হয়। কারো সাথে হেসে, কারো সাথে গাম্ভীর্য বজায় রেখে, কারো সাথে আবার স্নেহের সাথে আলাপ চালিয়ে যেতে হয়। কত কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হয় সংসদের অধিবেশনে, সভা সমিতির মঞ্চে, সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে! এত সব প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং সাংসারিক চিন্তা চেতনার রাজ্যে নিজের কথা আর আলাদা করে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে শুধু একলা থাকার সময়গুলোতে দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তার ঝড় ওঠা অথৈ সাগরে একটা মুখ দ্বীপের মতো জেগে ওঠে চোখের সামনে। দিশাহারা নাবিকের মতো দিশা ফিরে পান তিনি। সেই দ্বীপটাই যেন একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেইখানেই রয়েছে দুদণ্ড শান্তি। তবে সেই শান্তিটাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অমোঘ বাস্তবতার চাপে পিষ্ট হয়ে যায় অতি দ্রুত।

বাড়ি ফিরে আজকাল ছেলেকে সময় দেন তিনি। যত কাজই থাকুক না কেন ডিনারটা করার চেষ্টা করেন পরিবারের সাথে। পুত্রের সামনে স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করেন। যদিও দুজনের শয্যা এখন আলাদা। রাশেদ মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমান। রোমেলা নিজ থেকে খুব একটা কথা বলেন না। সামনে যখন উপস্থিত থাকেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন শুধু। এত বছরের পুরোনো স্বামীকে যেন নতুন করে চিনে নিতে চান। এর মধ্যেই একবার কিশোরগঞ্জ ঘুরে আসতে হলো রাশেদকে। বাড়ির সামনের কাঁচা রাস্তা পাকা করা হয়েছে তাঁর নিজ উদ্যোগে। কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার রাস্তা উদ্বোধনের পালা। উদ্বোধন করবেন তিনি নিজেই। সেই সুবাদে গ্রামের বাড়িতে দুদিন থাকতে হলো। ফিরে আসার দিন আকাশে ভরা পূর্ণিমা। গাড়ি উঠোন পেরোতেই দেখা গেলো চারপাশে অলৌকিক নীল আলোর ছড়াছড়ি। সর্ষে ক্ষেতের ওপর স্বপ্নের মতো জেগে আছে পেলব জোছনা। হঠাৎ কানে এসে লাগল ভারি সুন্দর একটা সুর। গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন সর্ষে ক্ষেতের আইলের ওপর একলা বসে কে যেন হেড়ে গলায় গান গাইছে। হাতে ধরা একতারা। আবছা চাঁদের আলোয় মুখখানা চিনতে পারা গেলো না। তিনি খুব একটা রসিক মানুষ নন। গানটান মন দিয়ে শোনেন না বহুদিন। কিন্তু এই গানটা কেন যেন একদম বুকে গিয়ে বিধল।

"সে মানুষ চেয়ে চেয়ে ফিরিতেছি পাগল হয়ে
মরমে জ্বলছে আগুন আর নেভে না।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ,
বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।"

মাথার ওপরে হীরকখচিত আকাশ। চারপাশে ফকফকে জোছনা। ঝিরঝিরে বাতাস বিলি কেটে যাচ্ছে সর্ষে ফুলের মাঠে। গানের সুর যেন তাঁর নিজের সুর হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল জলে স্থলে আর অন্তরীক্ষে!

"তারে ধরি ধরি মনে করি

ধরতে গেলেম আর পেলাম না

ধরি ধরি মনে করি

ধরতে গেলেম আর পেলাম না

দেখেছি,

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা

আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ,

বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।"

৯৪

রোমেলা দুদিনের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসলেন। তার মেজো মামার কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মামা প্রায় ছয়মাস যাবৎ সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। বোনেরা মিলে ঠিক করলেন দুদিনের জন্য হলেও মামার কাছ থেকে ঘুরে আসবেন। উপরি হিসেবে কিছু শপিং হবে। ঘুরে বেড়ানোও হবে। যাবার আগে তিনি ছেলেকে পইপই করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেছেন যে বাবার ওপর যেন নজর রাখে। ছেলেটা তার একদম সাদাসিধে আর সরল। মায়ের কথা শুনে উল্টো রেগে গেলো। চোখ বড় করে গরম গলায় বলল, 'মা তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু। বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। বাবা বলেছে এসব নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক আছে।'

– 'তোমার বাবা বলল আর তুমি বোকার মতো বিশ্বাস করে ফেললে?'

সামি মায়ের দিকে ব্যথাতুর চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বিভ্রান্ত গলায় বলে, 'তুমি কি বলতে চাইছ বাবা আমাকে মিথ্যে বলেছে?'

– 'তোমার চোখে সাধু সাজতে চাইছে লোকটা। তুমি চেনো না তোমার বাবাকে। আমাকে ঠকিয়ে আমারই ছেলের কাছে সাধু সাজা হচ্ছে। এত বড় বেইমান লোকটা!

মায়ের কথা শুনে সামির চোখ নীড় নষ্ট হওয়া পাখির মতো অসহায় হয়ে ওঠে। পাণ্ডুর হয়ে যায় মুখের রং।

রোমেলা ছেলের হাতে হাত রেখে বলেন, 'তোমাকে আমি এসব কখনোই বলতে চাইনি আব্বু। নিরুপায় হয়ে বলছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কাকে বলব আমি বলো? তোমার খালাদের সাথে কি এসব কথা বলা যাবে? কোন মুখে বলব? তুমি কষ্ট পেও না। শক্ত হও। আমি তোমাকে আমার পাশে চাই। ওই লোক আমাকে ছেড়ে চলে যাক কোনো সমস্যা নেই। আমার ছেলে আমার পাশে থাকলেই হবে।'

– 'বাবা বলেছে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না কখনো।'

– 'ওই যে বললাম তোমার কাছে সাধু সাজতে চাইছে।'

সামি আর্ত চোখে মায়ের দিকে তাকালো। তাকিয়েই রইল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর অদ্ভুত অন্যরকম গলায় হঠাৎ বলে উঠল, 'মা তুমি বাবাকে ভালোবাসো তো তাই না?'

রোমেলা চমকে উঠলেন। থমকে গেলেন। ফর্সা চামড়ার মুখে অতর্কিতে একটা গাঢ় ছায়াপাত ঘটল।

– ‘এটা কোনো কথা হলো?’ মুখ ঝামটা মেরে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি। তারপর আস্তে করে সরে পড়লেন জায়গাটা থেকে। এই ছেলেকে দিয়ে কিছুই হবে না। ছেলে তার বেশি ইমোশনাল। এত আবেগ দিয়ে জীবন চলে না। অবশ্য এর মাঝেই তিনি দুজন লোক লাগিয়ে দিয়েছেন গোপন তথ্য খুঁড়ে বের করে আনার কাজে। সুলেমানের পরিবর্তে যে নতুন ছেলেটা এসেছে তার বয়স কম। নাম আনিস। টাকার লোভ দেখিয়েই তাকে হাত করা গেছে। আপাতত তার কাজ হলো লাইব্রেরি রুম এবং স্টাডিরুমের প্রতিটা ড্রয়ারের চাবি যোগাড় করা। ছেলেটা বেশ চটপটে। মনে হচ্ছে একে দিয়ে কাজ হবে। এদিকে হক সাহেব সুলেমানের মৃত্যুর পরদিন থেকে আজ অবধি রোমেলার সাথে স্বাভাবিকভাবে একটি বাক্যও বিনিময় করেননি। ভাবটা এমন যেন সুলেমানের মৃত্যুর দায়টা সম্পূর্ণ রোমেলার ওপরেই বর্তায়। আশ্চর্য! সত্তর বছর বয়সের একটা লোক হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে এতে রোমেলার দোষ কোথায়? হ্যাঁ এটা ঠিক যে তাঁর আদেশেই গুণ্ডারা ধরে বেঁধে সুলেমানকে তুলে নিয়ে গেছে। একটু নাহয় টর্চার করেছে। কিন্তু খুন তো করেনি ওরা। এটা নিছক একটা এক্সিডেন্ট ছাড়া কিছুই না। এত সামান্য ঘটনায় এহেন প্রতিক্রিয়া দেখানো পুরোপুরিই অযৌক্তিক ঠেকেছে তাঁর কাছে। সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর হলো সুলেমানের পরিবার ঘটনার সত্যতা উদ্ঘাটন করতে পারেনি। তারা জানে না যে রোমেলার আদেশ অনুসারে তাদের বাবাকে অপহরণ করা হয়েছিল। তো ঝামেলা শেষ! তাই না? এই এক ইস্যু ধরে এতদিন অবধি ঢং দেখানোর তো কোনো মানে হয় না। সেদিন লোকটা হুট করে এসে বলল,

– ‘শোন! সামির সামনে নরমাল থাকার চেষ্টা করো। আমাদের ভেতরকার সমস্যা যেন ও কিছুতেই টের না পায়।’

– ‘এটার মানে কী?’ রোমেলার চোখদুটো কপালে উঠে গেলো।

– ‘মানে সামিকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে তার বাবা মায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো না।’

রোমেলা চোখা হাসি হেসে বললেন, ‘বাহ, আমাকে তো ধোঁকা দিয়েই ফেলেছ। এখন ছেলেকেও ধোঁকা দিতে চাও?’

– ‘ধোঁকা হবে কেন? ওর জন্য হলেও আমাদের সংসারটা টিকিয়ে রাখতে হবে। ছেলে এখন প্রাপ্তবয়স্ক। বাড়িতে নতুন বৌ এসেছে। আমাদের উচিত ওদের জীবনের এই সুন্দর সময়টা প্রাণ খুলে উপভোগ করতে দেওয়া। নিজেদের সমস্যা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা একেবারেই উচিত হবে না।’

– ‘তা কী করতে হবে এখন?’

– ‘কিছু করতে হবে না। যেমন ছিলে। তেমন থাকো।’

– ‘আর তোমার প্রেমিকাটির কী হবে?’ কেটে কেটে প্রশ্ন করলেন রোমেলা।

– ‘আমার কাছে আমার ছেলের জীবনটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

কথাটা বলে হক প্রস্থান করেছিলেন। সেদিনই আনিসকে ডেকে এনে তার হাতে এক হাজার টাকার কড়কড়ে বিশটি নোট ধরিয়ে দিয়ে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগিয়ে দিলেন রোমেলা। সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট ধরলেন তিনি পরদিন বিকেল তিনটায়। আনিসের সাথে ভাইবারে যোগাযোগ রইল। আনিস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারল না। তার বর্ণনার সারমর্ম অনেকটা এরকম যে, লোকটা সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ি ফিরেছেন। চা খেয়েছেন। সন্ধ্যেবেলায় ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে খাঁচা খুলে পাখি উড়িয়েছেন। এরপর গোসল সেরে স্টাডিরুমে গিয়ে বসেছেন। ল্যাপটপ খুলে কী সব কাজ করেছেন। ফোনে কথা বলেছেন কয়েকজনের সাথে এবং বিদেশী এক ভদ্রলোকের সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছেন। এরপর ছেলে এবং ছেলের বৌয়ের সাথে একত্রে ডিনার সেরে ঘুমোতে চলে গেছেন। তবে কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো আনিস এর মাঝেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিল সংলগ্ন ড্রয়ারের ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে ফেলেছে। এই খবর শুনে রোমেলা মনে মনে ছেলেটির প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি পেলেন সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসার পরদিন। বাড়িতে একটি চ্যাংড়া ড্রাইভার রাখা হয়েছে কয়েকমাস ধরে। সেই ড্রাইভারের কাছ থেকে কথায় কথায় আনিস জানতে পেরেছে দুমাস আগে একটি অল্প বয়সি মেয়েকে সে মোহাম্মদপুরের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে গাজীপুরের বাংলোতে পৌঁছে দিয়েছে। তার ভাষ্যমতে ঠিক একই সময়ে হক সাহেবও সেই বাংলোতে উপস্থিত ছিলেন। শুধু এইই নয় ঘটনার পরদিন সেই একই মেয়েকে পুনরায় গাজীপুরের বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণ বশত সেদিনই আবার উত্তরার বাসায় তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আরো বিস্ময়কর খবর হলো বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড বেশ কয়েক মাস আগের এক গভীর রাতে এই একই মেয়েকে লাইব্রেরি রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। সেটা ছিল সামির বিয়ের রাত। ড্রাইভারের বর্ণনা মোতাবেক মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, লম্বা, ফর্সা এবং ছেলেদের মতো বয়কাট চুল। কর্মচারীরা সকলেই মেয়েটিকে চেনে। এ বাড়িতে মেয়েটির অগাধ যাতায়াত।

কথা হচ্ছিল মোবাইলে। আনিসের দেয়া বর্ণনা শুনে রোমেলার চোখের সামনে যে মুখটি ঝলক দিয়ে উঠল সেই একরত্তি মেয়ের যে কখনো এত বড় দুঃসাহস হবে তা

তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কখনো। বিস্ময়ে একদম বোবা হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো তাঁর। ফোনটা অতর্কিতে হাত থেকে খসে পড়ে গেলো মেঝেতে। চক্ষু দুটো হয়ে উঠল বিস্ফারিত। মুখ জ্বলে উঠল তীব্র রোষানলে। এতটুকুন একটা মেয়ে ... তাও আবার নিজের ছেলের বন্ধু... কী করে সম্ভব! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন লোকটা বলে ফেলেছিল অসাবধানতাবশত... মেয়েটি অন্যরকম!

কী সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক!

সারা শরীর রাগে আর ঘেন্নায় রিরি করে উঠল। পাগলের মতো ছুটলেন তিনি ছেলের ঘরে। তাঁর শাড়ির আঁচল লুটাতে থাকল মাটিতে। নিশ্বাসের সাথে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল লেলিহান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এখুনি ছেলেকে তার গুণধর বাবার কীর্তিকলাপ নিজ মুখে শোনাবেন তিনি। এইসব মিডল ক্লাস আজেবাজে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলেমেয়েরা যাদেরকে তার ছেলে বন্ধু ভেবে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসে। সেইসব বন্ধুরূপী শয়তানদের আসল চেহারাটা যে কতটা কদর্য তা এবারে সবাইকে জানানোর সময় এসেছে। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গেলেন তিনি। না না! এভাবে নয়। যথার্থ প্রমাণ জোগাড় করে তবেই গুমোর ফাঁস করতে হবে। ছেলে তাঁর মুখের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। ড্রাইভারের মুখ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে এই ব্যাপারটাও কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাবে না সামির কাছে। এখন এগোতে হবে খুব সাবধানে। এই বেয়াদব মেয়েকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। রোমেলার সংসার ধ্বংস করার চড়া মূল্য দিতে হবে এই মেয়েকে। দিতেই হবে!

৯৫

হৃদিতার জন্মদিন উপলক্ষে সব বন্ধুরা একত্রিত হলো জুলাই মাসের পনেরো তারিখ সন্ধেবেলা। সামিদের উত্তরা বাড়িতে। বাগানে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাছের গায়ে গায়ে আর মাথার ওপরে তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

বাল্ব স্ট্রিং লাইট। সন্ধে বেলার মন কেমন করা ধূসর আকাশের নিচে আলোগুলো তারার মতো জ্বলছে। বাগানের এক পাশে স্টেজের ওপর চাদর পেতে বসেছে কাওয়ালি গানের দল। আরেক পাশে লম্বা কাঠের টেবিলের ওপরে রাখা হয়েছে হৃদির পছন্দের বিশাল বড় এক রেড ভেলভেট কেক। সাথে আরো কিছু স্ন্যাক্স এবং পানীয়। একটু পরেই ক্যাটারিং এর লোকরা খাবার নিয়ে আসবে। মেনু হলো কাচ্চি বিরিয়ানি, মিক্সড ভেজিটেবল, চিকেন রোস্ট, চিংড়ির মালাইকারি, পাবদা মাছ ভুনা এবং সর্ষে ইলিশ। সেই সাথে জালি কাবাব আর বোরহানী। আজকের সমস্ত আয়োজন সামি নিজ উদ্যোগে করেছে। বাবা মাকে কিছুই জানায়নি আগে থেকে। এমনকি হৃদিকেও না। হৃদির জন্য এটা বিশাল বড় সারপ্রাইজ ছিল।

হৃদি আজ সেজেছে খুব। বেগুনির ওপর সাদা কারুকাজ করা কাতান শাড়ি, গলায় কানে বেগুনি পাথরখচিত স্বর্ণের গয়না আর কানের পাশে বেগুনি অর্কিড ফুল। সব মিলিয়ে দারুণ জমকালো দেখাচ্ছিল ওকে। পতি গর্বে চকচক করছে দুচোখের তারা। ঠোঁটে লেগে আছে চওড়া হাসি। সুখি সুখি একটা ভাব লেপটে আছে সারা মুখে।

অফিসের কয়েকজন কলিগ আর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করেছিল সামি। সাথে বন্ধুরা তো থাকছেই। হৃদির খালাতো চাচাতো ভাইবোন মিলিয়ে প্রায় আট দশজনের একটি দল এর মাঝেই চলে এসেছে। বাবা মা আসবেন একটু দেরিতে। হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে। ঘাসের ওপর পেতে রাখা সারি সারি চেয়ার দখল করে অতিথিরা বসে পড়েছে এর মাঝেই। বন্ধুরাও বসেছে এককোণে গোল হয়ে। অমৃতা অবশ্য তখনো আসেনি। চেম্বার থেকে সরাসরি এখানে চলে আসার কথা। ফোনে বলে দিয়েছে পৌঁছুতে একটু দেরি হবে।

হৃদি কোথাও স্থির হতে পারছে না। এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে ক্রমাগত। সামি বন্ধুদের পাশে বসে ছিল। আকাশের সাথে তারা আর মনীষা এসেছে। বন্ধুরা অনেক

দিন ধরে মনীষার গান শুনতে চাইছিল তাই রুদ্র আকাশকে খুব করে বলে দিয়েছিল যে মনীষাকে যেন অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়। মনীষা তারাকে ফেলে আসতে চাইল না। তারাও আর খুব একটা আপত্তি করার জোর পেল না। এসে অবশ্য ভালোই হয়েছে। তারার কিন্তু বেশ লাগছে! আসবার পর থেকেই এক আপামর মুগ্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে সে। জীবনে এই প্রথম এত বড়লোকের বাড়িতে বেড়াতে আসা হলো তার। এটা সাধারণ কোন বাড়ি নয়। এ যেন রাজপ্রাসাদ। শহরের বুকে একটুকরো স্বপ্নপুরী বলে মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। ঘুম ভাঙলেই যেন ভস করে হাওয়া হয়ে যাবে এই স্বপ্নরাজ্য। রাজ্যের মানুষগুলোও রূপকথার মতোই সুন্দর। এর আগে একদিন আকাশের বন্ধুদের সাথে তার দেখা হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎ বলে একটা আড়ষ্টতা কাজ করছিল। লজ্জায় কারো দিকে ঠিকমতো চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। আজকে দেখল পূর্ণ চোখে। আর দেখে একদম মনের মধ্যে ঝিম ধরে গেলো ভালো লাগায়। এ বাড়ির ছেলেটি যা সুন্দর! যেন সাক্ষাৎ রাজপুত্র। কী ফর্সা আর কী লম্বা! রাজবধূটিও দেখতে অসাধারণ। এরা যেন কোন অলীক জগতের বাসিন্দা। তারার নিজের ধুলোবালি মাখা মলিন পৃথিবীর সাথে এই জগতের বিন্দুমাত্র মিল নেই। সবুজ ঘাস, নানা জাতের চোখ ধাঁধাঁনো ফুল আর আবছা হলুদ আলোর মনোরম পরিবেশে ডুবে থেকে নিজেকে বড়ই বেমানান আর বিদঘুটে মনে হচ্ছিল তারার। হীনমন্যতাটা বোধহয় ওর চোখেমুখেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সে পরেছে একটা নিতান্তই সাধারণ স্বল্পদামি ব্লকের কাজ করা সালওয়ার কামিজ 1 আসবার আগে মনীষা তাকে একটু সাজিয়ে দিয়েছিল। চোখে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। কোঁকড়া চুলগুলোকে ব্লো ডাই করে সোজা বানিয়ে দিয়েছিল। আসবার পর থেকেই জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সে মনীষার পাশে। কিন্তু একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে। ওর ঠিক সামনেই মুখোমুখি অবস্থানে লম্বা চুল, দাড়িওয়ালা, বিড়ালচোখা ছেলেটা বসে আছে। মুখে একটা অনর্থক হিজিবিজি হাসি নিয়ে। একটু বাদে বাদে চোখ তুলে এদিকে তাকাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না ছেলেটা ঠিক কাকে দেখছে? তাকে? নাকি মনীষাকে? প্রথম প্রথম সে শতভাগ নিশ্চিত ছিল যে ছেলেটা মনীষাকেই দেখছে। মনীষা এত সুন্দর যে মাঝেমাঝে তার নিজেরই মনে হয় সারাদিন ওই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু খটকাটা লাগল এই কয়েক মিনিট আগে। হঠাৎ তারার মনে

হলো মুখে হিজিবিজি হাসি নিয়ে ছেলেটা তার ব্লো ব্লাই করা চুলের দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল সে। নাকের ডগায় ঝুঁকে পড়া চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে দিল উপরের দিকে অপ্রস্তুত ভাবে। মনীষার দিকে তাকালো একবার। আকাশের সাথে কী নিয়ে যেন কথা বলছে মনীষা। সামি নিজের সেলফোন নিয়ে ব্যস্ত। আর এদিকে ওই লম্বাচুলো ফ্রাইড টমটম কেন যে অমন নিমিষহারা চোখে ওকে দেখতে লেগেছে কে জানে! কী করবে, কী বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। আকাশের বন্ধুদের মধ্যে এই একজনকেই তার অপছন্দ। এমন সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের বন্ধুদলের মাঝে এই চালচুলোহীন ছেলেটিকে তার একেবারেই মানানসই বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ এর মাঝে একটা ফিচেল ভাব আঠার মতো লেগে থাকে। তারার বিব্রত হয়ে পড়াটা রুদ্রর চোখ এড়ালো না। আর এড়ালো না বলেই তারার ওই অস্থির, রোগা মুখখানার ওপর বিড়াল চোখদুটো আরো বেশি করে সিঁটিয়ে গেলো। রুদ্র মজার মানুষ। মজা করার সুযোগ হাত ছাড়া করবে কেন? হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই নিজের চোখের মণি দুটোকে ম্যাজিকের মতো ট্যারা বানিয়ে ফেলল সে। ঠোঁট করে ফেলল বাঁকা। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করতে লাগল যেন চোখ উল্টে এখুনি বেহুঁশ হয়ে যাবে। পিলে চমকে উঠল তারা। শিরশির করে একটা ভয়ের ঢেউ খেলে গেলো মেরুদণ্ড দিয়ে। কী হলো ছেলেটার? মরে টরে যাচ্ছে নাকি? ভয়ে জমে গিয়ে পাশে বসা মনীষার পিঠে হাত দিয়ে একটা ঠ্যালা দিল সে। চিৎকার করে ডেকে উঠল 'মনীষা আপু! মনীষা আপু!' মনীষা তাকালো তারার দিকে।

উদ্বেগ নিয়ে বলল-'কী হয়েছে তারা?'

তারা রুদ্রর দিকে আঙুল উঁচিয়ে কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই রুদ্র হো হো করে ডাকাতিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল। তারার চশমা পরা চোখের চাউনিতে একটা বোকাটে ভাব ঝুপ করে নেমে আসলো চকিতে। স্তম্ভিতভাবে চেয়ে রইল সে হাস্যরত অদ্ভুত ছেলেটার দিকে। ধীরে ধীরে তার চোখের বোকাটে ভাবটা লুপ্ত হয়ে

গেলো। তার বদলে ধক করে জ্বলে উঠল এক অগ্নিবৎ তেজ। তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে কোনো মানুষ এত অসভ্য হতে পারে!

আকাশ রুদ্রকে একটা ধমক দিয়ে উঠল, 'তোর প্রব্লেম কী? পাগলের মতো হাসতেছিস ক্যান?'

মনীষা তারার মুখটা ভালোমতো একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে? ঠিক আছ তো?'

তারা হিংস্র চোখে রুদ্রর দিকে চেয়ে থেকেই উত্তর দিল, 'ঠিক আছি।'

রুদ্রকে দেখে মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে সে মরেই যাবে আজকে। তারার ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটার মুখ বরাবর পায়ের স্যান্ডেল জোড়া ছুঁড়ে মারে। হয়তো আরেকটু হলে সে তাইই করত। কিন্তু রুদ্রকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল অমৃতা। অমৃতার উপস্থিতি রুদ্রর আজগুবি হাসিটা থামিয়ে দিল মুহূর্তের মাঝে। সন্ধ্যা তখন গুটিয়ে গেছে। স্ট্রিং বাল্বের নরম হলদে আলোর আস্তর মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল অমৃতা। তার গায়ে কালো টি শার্ট। টিশার্টের বুকের ওপর সাদা রং দিয়ে লেখা 'দ্যা নর্থ রিমেম্বার্স' । শুকিয়ে গেছে খুব। তবে শুকিয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। অনেকদিন পরে দেখল বলেই রুদ্রর চোখে হয়তো ওই সৌন্দর্যটা প্রকট হয়ে ধরা দিল। আকাশ মনীষার সাথে গল্পে মশগুল ছিল। অমৃতা যখন কাঁধে ব্যাকপ্যাক, কানে হেডফোন আর পকেটে দুহাত পুরে উদাস মুখে বাগানের মাঝ বরাবর এসে দাঁড়ালো আকাশ তখন কী যেন একটা বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গেলো। থমকে গেলো। গুলিয়ে ফেলল কথা।

– ‘কী হলো?’ মনীষা প্রশ্ন করল আকাশের দুরবস্থা দেখে।

- ‘কিছু না। আমি আসছি। গিভ মি আ সেকেন্ড প্লিজ।’

আকাশ বসা থেকে উঠে অমৃতার দিকে এগিয়ে গেলো। ততক্ষণে সামি পৌঁছে গেছে অমৃতার কাছে। কোনো কথা না বলে ওকে ঝুপ করে জড়িয়ে ধরেছে। বাবা মা বহুদিন বাদে সন্তানের সংস্পর্শে আসলে যেমন আদরে সোহাগে সন্তানকে বুকে টেনে নেয় অনেকদিন পর বন্ধুকে কাছে পেয়ে সামির আচরণ এখন ঠিক সেরকম।

– ‘কীরে দোস্ত? তুই তো আমাদের ভুইলাই গেছিস। কতদিন পর দেখলাম!’ বলছিল সামি আবেগরুদ্ধ গলায়। হৃদি ছুটে আসলো। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অমৃতার ওপর। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘অনেক মিস করতেছিলাম তোরে। আজকে না আসলে খবর ছিল।’

আকাশ রুদ্রও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো কথা বলছে না ওরা। শুধু চেয়ে আছে অমৃতার দিকে। কথা বললেই যেন এই সুন্দর মুহূর্তটি নষ্ট হয়ে যাবে। ছন্দ পতন হবে। কিছু কথা আছে যেগুলো আসলে বলার চাইতে না বলাই ঢের ভালো। বন্ধুদের ভালোবাসায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল অমৃতার। ধীরে ধীরে সে আকাশ আর রুদ্রর দিকে এগিয়ে গেলো। হাত তুলে হাইফাইভ করল দুই বন্ধুর সাথে। তারপর হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘তোরা এমনে চায়ে আছস ক্যান? মনে হচ্ছে যেন আমি কবর থেকে উঠে আসছি।’

উত্তরে আকাশ নিরাসক্ত গলায় বলল, ‘তুই এরকম হয়ে গেছিস ক্যান?

– 'কী রকম?'

– 'কেমন জানি। শুকায়ে কাঠি হয়ে গেছিস। আরো বেশি পোলা পোলা লাগতেছে এখন।

এইসব হাবিজাবি কথা সচরাচর তেমন একটা পাত্তা দেয় না অমৃতা। কিন্তু কেন যেন আজকের মন্তব্যটা পছন্দ হলো না তার। মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ফালতু কথা বলিস না।'

– 'ফালতু কথা না। সত্যি! কী হইছে তোর? হিজড়াদের নিয়া কাজ করতে গিয়া নিজেও কি হিজড়া হয়ে গেলি নাকি?'

কাওয়ালি দলটা তখন হারমোনিয়াম আর তবলা বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। হৃদি তাড়া দিয়ে বন্ধুদের বলে উঠলো, 'এই তোরা চা কফি কিছু খাবি নাকি?' রুদ্র ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ গানের দলটার দিকে চেয়ে থেকে সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল, 'এইগুলা গান? নাকি গানের মাথা? কাউয়ার মতো কা কা করতেছে। থামতে বল!'

সামি একটু বিব্রতভাবে বলল, 'আহঃ আস্তে কথা বল। শুনবে তো!'

– 'শুনলেই কী? আমি কি কাউরে ডরাই নাকি? এই কাউয়ার কা কা থামা তুই এখুনি। নাইলে কইলাম মামা খুব খারাপ কিসু হবে।'

– ‘আরে কেমনে থামাবো আমি?’

– ‘কিসু একটা কর। সারা শহর খুঁইজা তুই এই কাউয়ার দলরেই ভাড়া করলি? মানে সমস্যা কী?’

– ‘আমি ভাড়া করি নাই। আমার এক কলিগ ভাড়া করছে।’

‘আকাশ! তোমার ফোন এসেছে!’ মনীষার ডাকে ফিরে তাকালো আকাশ। সেলফোনটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছিল। দৌড়ে ছুটে গেলো ফোন ধরতে। ওর পেছন পেছন বাকি বন্ধুরাও এগিয়ে গেলো। অমৃতা ব্যাকপ্যাকটি টেবিলের ওপর রাখল। মনীষা আর তারার সাথে হেসে কুশল বিনিময় করল। তারপর বসল একটা চেয়ারে। আকাশ ফোন কানে নিয়ে একটু দূরে সরে যাবার পর রুদ্র হঠাৎ ঘোষণা দেওয়ার ঢঙে বলল, ‘শোন তোরা! গতকাল রাতে, আম্মা আমারে ফোনে বলছে যে আমেরিকা যাওয়ার আগেই আমারে বিয়া দিয়ে দিবে।’

শুনে বন্ধুরা হই হই করে উঠল। হৃদি রস টই-টই গলায় বলল, ‘তোর মতো উজবুককে বিয়ে করবে কে?’

– ‘তাতো জানি না। তবে আম্মার লজিক হচ্ছে বিয়ে করে না গেলে আমি নাকি না খেয়ে মরব। এখানে তো তোরা আছিস আমাকে খাওয়ানোর জন্য। আমেরিকায় তো কেউ নাই।’

– ‘হুম, তা অবশ্য ঠিক।’ সায় দিল হৃদি।

আকাশ ফিরে এসেছে তখন। বসেছে অমৃতার পাশের চেয়ারে। মনীষা মিটমিটে হাসি হেসে বলল, 'ভালো সিদ্ধান্ত। আমি তাহলে তোমার জন্য মেয়ে দেখা শুরু করি। আমাদের অফিসে কয়েকজন ফ্রেশারস জয়েন করেছে এই মাসে। প্রত্যেকেই সুন্দরী। গুড ক্যালিবার।'

মনীষার কথাটা শুনে সামি একটু ঠাট্টার গলায় বলে উঠল, 'অত দূরে যাবার কী দরকার? আশেপাশে কেউ নেই?'

বন্ধুদের মধ্যে শুধু রুদ্র আর আকাশ ছাড়া অন্য কেউ সামির মাত্র বলা কথাটার গোপন ইঙ্গিত ধরতে পারল না। রুদ্র সামির চোখে চোখ রাখল একবার। কী যেন কথা হলো দুই বন্ধুর চোখে চোখে। তারপর রুদ্র যতটা সম্ভব নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আশেপাশে আর কে আছে? এই অমৃতা! তুই আমাকে বিয়ে করবি?'

বন্ধুদের মুখে একটা চমক খেলে গেলো। মনীষা আর তারাও হতবাক। হৃদির মুখটা একটু হা হয়ে গেছে। অমৃতা মিনারেল ওয়াটারের বোতল উঁচু করে পানি ঢালছিল গলায়। রুদ্রর কথা শুনে একটা ধাক্কা খেল সে। মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসলো একটু জল। বোতল নামিয়ে, হাতের উল্টো পাশ দিয়ে ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়া পানিটুকু মুছতে মুছতে সে বিস্মিত চোখে তাকালো রুদ্রর দিকে। তারপর হিহি করে হেসে উঠল শব্দ করে। মিনিট না গড়াতেই হাসির রোল পড়ে গেলো সবার মধ্যে। হাসল রুদ্রও। হাসতে হাসতেই বলল, 'চিন্তা কইরা দ্যাখ মামা। আমেরিকা যাইতেছি। পাঁচ বছর থাকবি আমেরিকায়। পাশাপাশি তোর পড়াশোনাটাও হয়ে গেলো। খারাপ হবে না কিন্তু!'

সবাই হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেও হৃদিকে কিন্তু একটু সিরিয়াস দেখালো। সে বরাবরই একটু সহজ সরল। মনের ভাব খুব একটা লুকাতে পারে না। টেবিলে

একটা চাপড় মেরে সে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আইডিয়া কিন্তু খারাপ না। অমৃতাও তো দেশের বাইরে যাইতে চাইতেছে। আমার মনে হয় কি তোরা দুইজন বিয়ে কইরা ফ্যাল। রুদ্ররও একটা সঙ্গী হইল। অমৃতারও বিদেশ যাওয়া হইল। ফাটাফাটি!'

হৃদির কথাগুলো অমৃতার মুখের হাসি উড়িয়ে দিতে খুব একটা সময় নিল না। এই প্রস্তাবের পেছনের সুপ্ত লুকায়িত স্বার্থটা খালি চোখেই ধরা পড়ে গেলো অমৃতার কাছে। সে বুঝল হৃদি ঠাট্টা করছে না। সে সত্যই চাইছে অমৃতা কাউকে বিয়ে করে থিতু হোক এবং তার নিজের সংসার থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাক। এখানে রুদ্র মুখ্য নয়। মুখ্য হলো অমৃতার থিতু হওয়া এবং হৃদির সংসার জীবনের ঝুঁকি অপসারণ করা।

– 'আমেরিকা একটা বাল। আমি যাব কানাডা নইলে লন্ডন।' বলল অমৃতা ত্যাড়া গলায়।

– 'কী বলতেছিস ভাইবা চিন্তা বল। পিএইচডি মামা! পাত্রের কিন্তু দাম আছে!' বলল রুদ্র তারিয়ে তারিয়ে।

– 'দাম দিয়া মুড়ি খা।'

সামি এবার রুদ্রকে অভয় দিয়ে বলল, 'সমস্যা নাই বন্ধু। একজন রিজেক্ট করছে তো কী হইছে? আশেপাশে মানুষের অভাব আছে নাকি?' বলে সে একটা চোখ টিপল। রুদ্র বুঝল তার ইঙ্গিত। কিন্তু হাজার হোক মনীষা ওদের চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়। হুট্ করে উল্টাপাল্টা ফাজলামো করে বসলে যদি মাইন্ড করে ফেলে? রুদ্র তাই মনীষার উদ্দেশ্যে বলা কথাটা তারার দিকে চেয়ে ছুঁড়ে দিল, 'আর কেউ কি আছে?

যে এই বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আটলান্টিকের ওপারে পাড়ি দেবে? কে সেই ভাগ্যবতী নারী?'

তারা এসব ঠাট্টা মশকরায় একেবারেই অভ্যস্ত নয়। রুদ্রর ফাজিল কথা শুনে তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেলো। এমনিতেই এই ছেলেটার প্রতি অনেক ক্ষণ যাবৎ এক দুর্দান্ত রাগে তার অন্তর দেশ জ্বলে যাচ্ছে। এবার রাগের জ্বালায় তার কান্না পাবার উপক্রম হলো। আকাশ বোধহয় তারার অবস্থাটা একটু টের পেয়েই বলল, 'ওই রুদ্রর বাচ্চা। বিয়া করবি তো আমারে বল। দুইদিনের মধ্যেই বৌ খুঁইজা দিতেছি তোরে।
'

রুদ্র ভীষণ করুণ গলায় বলল, 'হ, কিসু একটা কর মামা। আর ভাল্লাগে না।'

– 'কিসুই হবে না তোদের। এত বয়স পর্যন্ত একটা প্রেম করতে পারস নাই। এখন আর হবে না। বিয়া করলে বাপ মায়ের পছন্দেই করতে হবে। আংকেল আন্টিরেই বল মেয়ে দেখতে।' বলল অমৃতা খটোমটো স্বরে।

– 'লুক হু ইজ টকিং। অমৃতা নিজে প্রেম করতে পারে নাই এখনো একটা! আর আসছে ওদের কথা শুনাইতে।' বলল সামি, সহাস্যে। শুনে বন্ধুরা একটু চুপসে গেলো। সামির কথার প্রত্যুত্তরে কাউকে কিছু বলতে দেখা গেলো না। রুদ্র হঠাৎ করেই আর্তনাদ করে উঠল, 'এই কাউয়ার দল যদি এখন কা কা বন্ধ না করছে তো আমি এদের মাথায় পানি ঢাইলা দিমু।'

অমৃতা খিকখিক করে হেসে উঠে বলল, 'যা পানি ঢাইলা আয়। ডেয়ার দিলাম তোরে। দেখি পারিস কিনা।'

রুদ্র উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। বুক চিতিয়ে বলল, ‘দেখতে চাস?’

হৃদি চেয়ারে বসে থেকেই রুদ্রর হাত চেপে ধরে ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। অবশ্য হাতের নাগাল পেল না সে, টেনে ধরল ওর মোবাইল প্যান্টের ফুলে ফেঁপে থাকা পকেট। কাকুতিমিনতি করে বলল, ‘প্লিজ, দুষ্টামি করিস না। বসে থাক।’

রুদ্র নিজের পরনের প্যান্টের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বলল, ‘কী আজব, মামা তুই আমার প্যান্ট ধইরা টানতেছিস ক্যান? মান ইজ্জত সব ডুবাবি নাকি?’ হোহো করে হেসে ফেলল বন্ধুরা। কথাটা বলে শেষ করে নিজের অজান্তেই একবার তারার দিকে তাকিয়েছিল রুদ্র। তারার মুখের মেঘ তখন অনেকখানি কেটে গেছে। ঠোঁট টিপে হাসি চাপানোর চেষ্টা করছে সে। সেই হাসির দৃশ্য দেখতে পেয়ে রুদ্রর হৃদির ওপরে চড়াও হওয়া রাগটা আরেকটু জমে গেলো। হিসহিসে গলায় বলল, ‘দাঁড়া, এই কাউয়ার দলরে একটা শিক্ষা আমার দিতেই হবে!

কাওয়ালির দল তখন বাদ্য বাজনা বাজিয়ে, নেচে নেচে গাইছে–

“Duma dum mast kalandar

Ali da pehla number

Duma dum mast kalandar

Sakhi shabaaz kalandar”

হৃদির কয়েকজন কাজিন খুব উপভোগ করছে গান। স্টেজের সামনে জড়ো হয়ে উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে তারা দলবদ্ধভাবে। তাদের বেশির ভাগের চোখ বন্ধ। কপালের

ভাঁজে ভাঁজে গভীর ব্যগ্রতা। রুদ্র স্টেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পাশে আকাশও আছে। নৃত্যরত ছেলেমেয়েগুলোর দিকে চোখা দৃষ্টি রেখে রুদ্র বলল, 'দ্যাখ না, কী নাচটা নাচতেছে। মনে হইতেছে নাচতে নাচতে আজকে শহীদ হয়ে যাবে এরা!'

হাসল আকাশ রুদ্রর মন্তব্য শুনে। গায়ক স্টেজের ওপর আসন গেঁড়ে বসে চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হয়ে গান গাইছে আর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। তার গায়ের রং দুধে আলতা। ঠোঁটের ওপর কালো মোটা গোঁফ। মাথায় একটি লম্বাটে টুপি। রুদ্র কয়েক পা হেঁটে গায়কের সামনে এসে দাঁড়ালো। আশপাশটা চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল একবার। তারপর মুখে দু হাত চেপে চিৎকার করে ডেকে উঠল তারস্বরে 'কা কা কা কা!'

গায়কের চোখ খুলে গেলো। সেই চোখে মোটা দাগের বিস্ময়রেখা। ততক্ষণে বাজনা থেমে গেছে। নাচতে থাকা ছেলেমেয়েগুলো রুদ্রর কাণ্ড দেখে থামিয়ে ফেলেছে নাচ। উপস্থিত দর্শক হতভম্ব। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই রুদ্রর দিকে। রুদ্র প্রায় মিনিট দেড়েক সময় টানা কা কা করে গেলো। সবচেয়ে আজব ঘটনাটা ঘটল ওর কাকের ডাক থামানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। একটি বছর পনেরোর বালক, যে কিনা এতক্ষণ নেচে নেচে ঘাম ঝরিয়ে ফেলেছে। সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ঠিক রুদ্রর গলা নকল করে ডাকতে শুরু করল, 'কা কা কা কা!' যেন এটা খুব মজার একটা কাজ। বাকি ছেলেমেয়েদেরও যোগ দিতে খুব একটা সময় লাগল না। কয়েক সেকেন্ড না গড়াতেই কাকের ডাক বেশ জোরালো হয়ে উঠল। গায়কের মুখ রাগে থমথম করছে তখন। রুদ্র পালিয়েছে জায়গাটা ছেড়ে। পালিয়েছে আকাশও। হৃদি হাহাকার করে ছুটে এসে ভাই বোনদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করালো। তারপর গায়কের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'আমরা খুবই দুঃখিত। ওরা ছোট মানুষ তো দুষ্টুমি করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না প্লিজ।'

৯৬

রোমেলা বাগানের কোণে একলা দাঁড়িয়ে চারপাশটা অবলোকন করছিলেন। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ছেলের এই অহেতুক আদিখ্যেতা তাঁর মোটেও ভালো লাগছে না। এসব কপর্দকশূন্য লো স্ট্যান্ডার্ড মানুষজনদের আপ্যায়ন করার জন্য এত আয়োজন! এরা কি এসব সম্মান পাবার যোগ্য? ছেলেটাকে নিয়ে আর পেরে উঠছেন না তিনি। দিনকে দিন বড়সড় গাধায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ছেলের বউটারও আজকাল দেমাগ হয়েছে খুব। প্রথম দিকের নরমসরম ভাবটা এখন আর নেই তার মধ্যে। শ্বশুরের আশকারা পেয়ে দিন দিন মাথায় উঠছে এই মেয়ে।

সেই বাজে মেয়েটাকেও ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন রোমেলা। ছেলের কাছে এখনো এই ডাকিনীর আসল রূপ প্রকাশ পায়নি। কখন প্রকাশ পাবে সেই অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন তিনি মনে মনে। গত পরশুদিন স্টাডিরুম তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলেছেন কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই হাতে পড়েনি। গতরাতে হক সাহেব ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁর ব্যক্তিগত সেলফোনটা নিয়েও নাড়াচাড়া করে দেখেছেন রোমেলা। লাভ কিছুই হয়নি। ফোনে তালা দেওয়া। ল্যাপটপেরও একই অবস্থা। পাসকোড জানা নেই বলে কাজ উদ্ধার করা গেলো না। লাইব্রেরি রুমটা দেখা হয়নি এখনো। চাবি জোগাড় করা হয়ে গেছে। ইচ্ছে আছে আগামীকাল সকালে নিরিবিলিতে একবার ওই রুমটায় ঢু মারবেন। ওই বেহায়া মেয়েটিকে দেখামাত্র মন বিষিয়ে উঠেছে কবে যে একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ তিনি হাতে পাবেন আর নিজের ছেলের চোখের সামনে মেলে ধরবেন! ইশ! আর তর সইছে না। মনে চাইছে মেয়েটাকে এখুনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমন মেয়ের কি কখনও ভালো হবে? কোনোদিনও ভালো হবে না! এর ধ্বংস অনিবার্য। এমনই সব খাপছাড়া ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি অনতি দূরে বসে থাকা ছোট চুলের, ছিপছিপে দেহের, গোঁয়ার মেয়েটির দিকে বিষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। হিংস্র, বিদ্বেষপূর্ণ এক তিতকুটে অনুভূতিতে ক্রমশ ভরে যাচ্ছিল বুক। একেই বলে চোরের মার বড় গলা। তলে তলে অন্যায় কাজ করে আবার খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলা হয় সুযোগ পেলেই। একটিবার শুধু সামি জানতে পারুক

আসল ঘটনা। জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবে একদম। কী বিশ্রী ব্যাপার! ড্রাইভার থেকে শুরু করে বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড পর্যন্ত সকলে জানে! মেয়েটার নাহয় কোনো চালচুলো নেই, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই কিন্তু ওই লোকটা? ওই লোকটা কী করে চরম নির্লজ্জের মতো এই ঘৃণিত কাজটা করতে পারল? নিজের ছেলেটার কথা পর্যন্ত একবার ভাবল না। আসলে ভুলটা হয়ে গিয়েছিল সেই প্রথম জীবনে। রোমেলার উচিত ছিল, ভোগবিলাস আর অর্থবিত্ত নয়, বরং ভালোবাসাকেই জীবনের পাথেয় হিসেবে বেছে নেয়া। বিয়ের তিন চার মাস পরে আনিস একবার এসেছিল তাঁর কাছে। দেখা করেছিল লুকিয়ে, একটা শপিংমলের ফুডকোর্টে। সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে ফিরে আসার প্রস্তাব রেখেছিল। রোমেলাও চেয়েছিলেন ভীষণভাবে। কিন্তু তখন সামির বাবার ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হচ্ছে হুহু করে। বাড়ছে তাদের জীবনযাত্রার মান। বাপের বাড়ির আত্মীয় স্বজন আগের চাইতে বেশি দাম দেওয়া শুরু করেছে। কারো কারো চোখে ঝিলিক দিচ্ছে ঈর্ষা। আড়ালে আবডালে লোকে তাঁর ভাগ্যের প্রশংসা করছে। এমন সুযোগ্য স্বামী কজনের ভাগ্যে জোটে? ওদিকে আনিস তখন সরকারি স্কুলের শিক্ষক। বেতন পরিমিত। অসুস্থ বাবা মায়ের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। থাকে বাসাবোর একটা তিন রুমের পুরোনো আমলের বাসায়। তিন রুমের বাসায় সদস্য সংখ্যা ছয়জন। সেই টানাটানির সংসারে মরার উপর খারার ঘা হয়ে রোমেলার গিয়ে হাজির হওয়াটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। তাছাড়া স্বামী সংসার ফেলে আনিসের বাড়িতে গিয়ে ওঠা মানে নিজের বাবা মায়ের সাথেও চিরদিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা। সাত পাঁচ ভেবে সব শেষে তাই বৈষয়িক ভাবনারই জয় হলো। প্রাচুর্যের কাছেই নিজেকে সমর্পন করলেন তিনি। ভালোবাসা হেরে গেলো। আনিস এই সিদ্ধান্তে কষ্ট পেয়েছিল খুব। তাঁর জীবনে কি তবে আনিসের অভিশাপই লেগে গেলো শেষমেশ? আনিসকে কখনোই ভোলার মতো করে ভুলতে পারেননি এ কথা ঠিক। কিন্তু সত্য বলতে কি, টাকার একটা অন্য রকমের নেশা আছে। সেই নেশায় একবার আকণ্ঠ ডুবে গেলে বাস্তবিক জ্ঞান থাকে না কিছু কিছু মানুষের। নাহ, বেয়াদব মেয়েটাকে সহ্য হচ্ছে না আর। রাগ, ঈর্ষা এবং বিতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে ভেতরটা। খুব দ্রুত প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। তারপর নিজের ছেলের হাতেই তুলে দেবেন তিনি এই অন্যায়ের বিচার ভার।

৯৭

গেটের বাইরে বেরিয়েই রুদ্র হো হো শব্দে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার পেট ফেটে যাবার অবস্থা। আকাশ একটু বাঁকা গলায় বলল,

– ‘শালা তুই একটা জিনিস! কী কামটা করলি? হৃদি রেগে যাবে।’

– ‘রাগুক। ওরে কে বলছে এই কাউয়ার দলরে টাকা দিয়ে ভাড়া কইরা আনতে?’

– ‘অতটা খারাপও গাইতেছিল না।’

– ‘খারাপ তো বটেই। আর আমি মনীষারে নিয়া আসছি গান গাওয়ানোর জন্য। কাউয়া বাহিনীর কা কা চলতে থাকলে ও গান গাবে কখন?

– ‘সময় তো আছে। এত তাড়াহুড়ার কিছু নাই।’

– ‘ও কি সারারাত থাকবে নাকি?’

আকাশ একটু সময় চুপ থেকে কিছুটা গম্ভীরভাবে বলল, ‘তুই তারার সাথে এইসব কী করিস? হুদাই?’

– ‘কী করলাম আবার!’

– ‘আরে ও অত ঠাট্টা মশকরা বোঝে না। শান্ত প্রকৃতির মেয়ে।’

রুদ্র ত্যাড়া চোখে তাকালো আকাশের দিকে, ‘মানে কী? তুই বলতে চাইতেছিস ওর সেন্স অব হিউমার ভালো না?’

– ‘সেইটা না। ছোট মেয়ে একটা। বয়স কম। তোর কী দরকার ওর সাথে এইসব ফাইজলামি করার?’

– ‘ছোট মেয়ে মানে? কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস ওয়ান?

রুদ্রর কথা শুনে আকাশ চোখ গরম করে তাকাল ওর দিকে। গেট পেরিয়ে মনীষাকে হেঁটে আসতে দেখা গেলো, গলির মাথায় জ্বলতে থাকা নিয়ন বাতির আলোয়। দুই বন্ধুকে পেয়েই সে স্ফীত হাসি হেসে বলল, ‘আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে। ’

– ‘কী আইডিয়া?’ আকাশের প্রশ্ন।

– ‘আমাদের রুদ্রর সাথে তারার বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?’

দুই বন্ধু স্তব্ধীভূত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ মনীষার দিকে। কয়েকটা সেকেন্ড কাটার পর রুদ্র ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। আকাশ কিন্তু হাসল না। উপরন্তু একটু কেমন গম্ভীর দেখাতে লাগল তাকে। সে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে একটু নিস্তেজভাবে বলল, ‘চলুন ভেতরে যাই।’

৯৮

বন্ধুদের সাথে হেসে কথা বলছিল অমৃতা। কিন্তু এইসব কথা বলাবলিতে আর হাসাহাসিতে আগের মতো প্রাণ নেই যেন। বন্ধুদের সান্নিধ্য তার ভালো লাগছিল এ কথা ঠিক। কিন্তু এই ভালোলাগাটাও যেন বড় নির্জীব এবং প্রাণহীন। অবাধ্য মনটা তাই চেতনে অবচেতনে একটুখানি প্রাণের খোঁজে হৃদয়েশ্বর প্রাণনাথের জন্যই ব্যাকুল হয়ে ছিল সর্বক্ষণ। না, চাইছিল না সে ভাবতে এসব, একেবারেই না! কিন্তু ভাবনার ওপর একটানা জোর খাটাতে খাটাতে তার স্নায়ু তখন উত্যক্ত এবং ক্লান্ত।

হৃদি অমৃতার পাশেই বসে ছিল। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে হঠাৎ বলল, 'রুদ্রটার কাণ্ড দেখেছিস? এরকম পাগল হলে কি হয়? জীবন চলবে কী করে?'

অমৃতা ঘাড় ঘুরিয়ে হৃদির দিকে তাকালো। খুব স্টাইলিশ দেখাচ্ছে আজকে ওকে··· চুল বাঁধার ধরনটাও··· নিশ্চয়ই পার্লারে গিয়েছিল। পরিপাটি মেকআপ মায়াবী মুখের আদল অনেকটাই ধারালো করে তুলেছে। একটু অন্যরকম সুন্দর দেখাচ্ছে। এই হৃদি যেন অনেক বেশি লৌকিক, সাংসারিক এবং বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন। অমৃতা একটু আলগা হাসি হেসে বলল, 'আমরা সব সময়ই এরকম পাগল। এভাবেই জীবন কেটে যাচ্ছে। এভাবেই কাটবে।'

হৃদির চোখ আটকে গিয়েছিল তখন অমৃতার গলায় ঝোলা হোয়াইট গোল্ডের লকেটের ওপর।

– 'এটা কে দিল? কিনেছিস নাকি?'

একটু অপ্রস্তুতভাবে নিজের গলায় লটকে থাকা চেইনের ওপর একটা আঙুল ছোঁয়ালো অমৃতা। আশপাশটা একবার ভালোমতো দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলো যে সামি ধারে কাছে কোথাও নেই। এরপর খুব ক্ষীণ গলায় বলল, 'উনি দিয়েছেন। আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছেন।' কথাটা বলার সময় অমৃতার ঠোঁটে একটা স্পর্ধিত হাসি ঝিকোচ্ছিল। এরকম কেন হয় সে জানে না। লোকটার কথা বলতে তার ভালো লাগে। বিভাকে ভিডিও কলে দেখিয়েছিল জিনিসটা। কিন্তু অন্য কাউকেই এ ব্যাপারে কিছু বলার মতো সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আজকে বলতে পেরে ভালো লাগছিল। এদিকে ওর বলা কথাটা শোনামাত্র হৃদির চোখজোড়া ধক করে জ্বলে উঠেছিল একরাশ বিস্ময়ে। তারপর ক্রমেই কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে আসছিল সন্ধ্যার নিভে আসা আলোর মতো। ওর মুখের ওই পট বদলানো দেখে অমৃতার ঠোঁট উপচানো হাসি উধাও হলো মুহূর্তের মাঝে।

– 'বাহ্! এতদূর!' কেমন যেন বিদ্রুপপূর্ণ শোনায় হৃদির গলা।

– 'মানে কী?'

– 'আমেরিকা থেকে গিফট নিয়ে আসলো? তোর জন্য দেখি অনেক দরদ!'

অমৃতা বিহর্ষ বিস্ময়ে তাকায় এত দিনের পুরোনো বান্ধবীর দিকে।

– 'এভাবে বলতেছিস কেন?'

– 'কীভাবে বললাম আবার? ভালোই তো, বড়লোক বয়ফ্রেন্ড পাইছিস। দামি দামি গিফট পাবি।'

হতভম্ব অমৃতা কোনোরকমে বলতে পারল, ‘আমি কি লোকটার টাকা দেখে ভালোবাসছি? আমার কাছে এসব বড়লোকির কোন মূল্য নাই! কী যা-তা কথা বলতেছিস তুই?’

– ‘সত্যি কথাই তো বলতেছি। এত অবাক হওয়ার কিছু নাই। এসব কথা তোমাকে শুনতেই হবে। মানুষের সংসারে দখল দিতে আসছ। একটু কথা শুনবা না তা তো হয় না!’

খারাপ লাগল। এত খারাপ লাগল যে অমৃতা একদম চুপ করে গেলো। নিশ্চল হয়ে গেলো। একটা ভীষণ রকমের গভীর শ্বাস পড়ল গোপনে। তর্ক করতে পারত। শুনিয়ে দিতে পারত দু চারটা কথা। কিন্তু কী লাভ? হৃদি একেবারে ভুল কথা তো বলেনি! পাপ করলে সেই পাপের শাস্তি স্বরূপ কিছু আজেবাজে কথা তো শুনতেই হবে। লজিক আছে ওর কথায়। হায় পাপ!... পাপ পুণ্যের কথা আমি, কারে বা শুধাই! সেই থেকে অনেকক্ষণ অবধি অন্তরটা কেমন পাপযুক্ত গ্লানিতে ভরে রইল। কিন্তু খানিক বাদে হালকা আকাশি পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘকায় মানুষটিকে যখন ভিড়ের মাঝে এক ঝলক দেখতে পেল, তখন পাপবোধের ভারি নভশ্চর ভেদ করে হৃদয়াকাশে নিমেষে এক পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হলো। এবং একটি অকাট্য সত্য সে সজ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারল যে, এই অনুভূতি কোনভাবেই পাপ হতে পারে না। এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম … চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম!

আজকেও একটা ছোটখাটো ভিড় আছে তাঁকে ঘিরে। অফিসের লোকজনরা দেখামাত্র ছুটে এসেছে হুড়মুড় করে। তিনি সবার সাথে ভদ্রতার সাথে কথা বলছেন। সৌজন্যতামূলক হাসি হাসছেন। হঠাৎ দৃষ্টি কাড়ল মেয়েটা। কালো টি শার্ট, ছোট ছোট চুল, পুতুল পুতুল মুখ। তারপর… চার চোখেতে মিলন যখন হলো, তখন বুকের

মধ্যে অনায়াসে নেমে এলো পাহাড়ি ঝরনা, নেমে এলো শীতল বাতাস! অনেক কষ্টেও দৃষ্টি আর অন্য কোনদিকেই সরল না।

হৃদির আব্বা আম্মা চলে এসেছেন ততক্ষণে। কেক কাটার জন্য সবাইকে ডাকা হলো। লম্বা টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়ালো সামি, হৃদি এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ। বিভাকে ভিডিও কল করতে ভুলল না বন্ধুরা। কেক কাটা হলো। হাততালির রোল পড়ল। কেক কাটার পালা শেষ হবার পর রোমেলা তার বোনদের সঙ্গে নিয়ে একটি আলাদা টেবিলে বসলেন। হৃদি বসেছে বাবা মা এবং ছোট ভাইকে নিয়ে। রাশেদের একটি প্রেস কনফারেন্স আছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজ তিনি ছেলের শ্বশুর শাশুড়িকে সময় দিতে পারবেন না। হৃদি চোখা চোখে বারবার দেখছিল শাশুড়িকে। এই মহিলার সমস্যা কী বুঝতে পারছে না সে। তার বাবা মা বিয়ের পর প্রথমবার এসেছে এ বাড়িতে। শাশুড়ির কি উচিত না অতিথিদের সাথে এক টেবিলে বসা এবং আদর আপ্যায়ন করা? ন্যূনতম সৌজন্য বোধ কি নেই ইনার ভেতরে?

আজকে সামিকে কথা শোনাতে ছাড়ল না হৃদি। সামি বন্ধুদের টেবিলে বসে কী নিয়ে যেন হাহা হোহো করছিল। হৃদি ওর পাঞ্জাবির হাতা ধরে টেনে হিঁচড়ে একটু আড়ালে নিয়ে আসলো। তারপর চাপা গলায় বলল, 'তোর মায়ের সমস্যা কী? আমার আব্বা আম্মা আজকে প্রথম আসছে এই বাসায়। উনার কি উচিত না আমার আব্বা আম্মাকে সময় দেওয়া? আপ্যায়ন করা?'

সামিকে একটু বিভ্রান্ত দেখালো। মাথার কোঁকড়া চুলে হাতের আঙুল চালালো সে কয়েকবার চিন্তিত ভাবে। বলল, 'আচ্ছা দেখতেছি কী করা যায়।'

হৃদি জায়গাটা থেকে নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সামির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। মায়ের টেবিলের পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো সামিকে।

তারপর ঝুঁকে নিয়ে মায়ের কানে কানে কী যেন বলল। রোমেলার কপালে ফুটে ওঠা তিনটি পরিষ্কার ভাঁজযুক্ত রেখা হৃদি এই দশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল। হাত নেড়ে কী যেন বললেন তিনি ছেলেকে। সামিও বলল কিছু একটা। তর্কের ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলল মা ছেলেতে। কয়েক মিনিট পর রোমেলা সীমাহীন বিতৃষ্ণা নিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্তিমিশ্রিত মুখে হেঁটে এসে বসলেন হৃদির মায়ের পাশের চেয়ারে।

ওয়েটার মুখের সামনে খাবার ভর্তি ডিশ রেখে যাচ্ছে বিরতিহীন ভাবে। রুদ্র শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে বেশ আয়োজন করে খাওয়া শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। টেবিলে এসে গেছে ধোঁয়া ওঠা কাচ্চি বিরিয়ানি, চিকেন রোস্ট, চিংড়ির মালাইকারি, পাবদা মাছ ভুনা, সর্ষে ইলিশ আর সালাদ। রুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে খাবার তুলে নিচ্ছে প্লেটে। তার মুখখানি এখন অনাবিল সুখে মাখামাখি হয়ে আছে। ভোজনের মতো আনন্দদায়ক ব্যাপার যেন এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হয় না। আহা কী আনন্দ! তারা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। ছেলেটার এই খাদক খাদক ভাব দেখে তার গা ঘিনঘিন করছে। নিজের খাওয়ার রুচি চলে যাচ্ছে। এত বড় রাক্ষস সে জীবনে এই প্রথম দেখল। ভুখা ভিখারীর মতো হাপুস হুপুস করে খেয়ে যাচ্ছে!

অমৃতা একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না। লোকটা কি চলে যাচ্ছে? মাত্রই তো এলো!... আসা মাত্রই আবার চলে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ ওই তো চললেন! কান্না পাচ্ছে অমৃতার। ওই মানুষটার মধ্যেই যেন তার প্রাণভোমরাখানি লুকায়িত আছে। মনে হচ্ছে মানুষটা এখান থেকে প্রস্থান করলে এবার সে মরেই যাবে। সেই সময় হঠাৎ অদৃশ্য শেকলে টান পড়ল। মানুষটা থমকে দাঁড়ালেন। আশপাশটা দেখলেন একবার সতর্ক চোখে। বাম দিকে পাঁচ কদম দূরের একটা টেবিলে অমৃতা বসে আছে। তিনি এক ঝলক তাকালেন ওর দিকে। অমৃতা ওই দৃষ্টির অর্থ কী বুঝল কে জানে। চট করে উঠে গেলো চেয়ার ছেড়ে। ওকে উঠে পড়তে দেখে রাশেদও আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত

পায়ে বাগানের চৌহদ্দি পেরোলেন। পাজেরো মিৎসুবিশি গাড়িটা মূল গেটের কাছাকাছি রাখা। বাগানের পর সোজা বিশ গজের মতো চিকন একটা রাস্তা চলে গেছে গেট অবধি। রাস্তাটা একেবারে খালি নয়। কয়েকজন অতিথি নিরুদ্দেশ ভাবে হাঁটাহাঁটি করছে এ মাথা থেকে ও মাথা। এদের মধ্যে দুজন রাশেদকে দেখে বিনীতভাবে সালাম দিয়ে উঠল। তিনি মাথা নেড়ে সালামের উত্তর দিলেন। গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন চুপ করে। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল সম্মুখে। খুলে দিয়েই চলে গেলো না, তাঁর উঠে বসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। গেটের মাথায় একটা নিষ্প্রভ হলুদ আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখতে পেলেন অমৃতা সরু রাস্তার এক কোণে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মাথা অবনত। পায়ের জুতো দিয়ে একটা ইটের টুকরো নাড়াচাড়া করছে অস্থির ভঙ্গিতে। অতিথিদের দলটা হেঁটে হেঁটে এদিকেই আসছে। ড্রাইভারটাও অপেক্ষা করে আছে দরজা খুলে রেখে। ড্রাইভারকে কিছু না বলেই কয়েক পা এগিয়ে আসলেন তিনি। আধো অন্ধকারে অমৃতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। সামির সেদিনকের মরণ দশা দেখার পর মনে মনে ঠিক করেছিলেন মেয়েটার সাথে আর কোনোভাবেই কোনো রকম যোগাযোগ রাখবেন না। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল একটাবার জানতে, যে মেয়েটা কোথায় আছে, কেমন আছে। শুধু ছেলের মুখের দিকে চেয়েই তিনি এই অদম্য ইচ্ছেকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে হাজার চেষ্টার পরেও প্রতিরোধের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। টানছে চুম্বক। এই আকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাইতেও বুঝি বেশি শক্তিশালী।

– ‘কিছু বলবে?’

অমৃতা চোখ তুলে তাকালো। কী বলবে সে? মাথার ভেতরে তো এই মুহূর্তে কিচ্ছু কাজ করছে না। মস্তিষ্ক ফাঁকা!

– ‘আপনার পাঞ্জাবির রংটা…’

– ‘কী হয়েছে পাঞ্জাবির রং?’ গম্ভীর মানুষটার গম্ভীর প্রশ্ন!

– ‘সুন্দর!’ জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে আলতোভাবে উচ্চারণ করল অমৃতা। —‘তাই?’

– ‘হুম। আপনিও খুব সুন্দর!’

– ‘আচ্ছা?’ এবার তিনি হাসলেন।

কিছুক্ষণ নীরব। তিনজনের দলটা খুব লক্ষ্য করছে ওদেরকে। এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করছিল, এখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। এরা অফিসেরই কর্মচারী। প্রত্যেকের নাম আলাদাভাবে মনে না থাকলেও মুখ চেনা। একটা ফিসফিসানি ভেসে আসছে হাওয়ায়। কী কথা বলছে ওরা কে জানে!

– ‘আমার পুতুলটা কেমন আছে?’ আবছা গলায় প্রশ্ন করলেন রাশেদ।

– ‘ভালো থাকার চেষ্টা করছে।’

– ‘ভেরি গুড। পুতুলটা ভালো থাকবে। ওর ওপর আমার বিশ্বাস আছে।’ অমৃতা চুপ করে রইল।

– ‘এখন আসি?’

– ‘আরেকটু?’ বাচ্চাদের মতো আবদার করে অমৃতা।

– ‘উঁহু! রিস্ক হয়ে যাচ্ছে।’

– ‘আচ্ছা।’

লোকটা আর কথা বাড়ায় না। ঘুরে দাঁড়ায়। মাথা হেঁট করে ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। একটা গভীর শ্বাস পড়ে। যে জীবনে প্রিয় মানুষকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয়, সে জীবন আর যাইই হোক না কেন সুখের অন্তত নয়!

মনীষা গান গাইল সেই সন্ধ্যায়। হারমোনিয়াম বাজিয়ে। লোকজনের ভিড়ে গুঞ্জন পড়ে গেলো। সবাই জানতে চায় এই পরমা সুন্দরী মেয়েটি কে? মেয়েটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর গানের গলা। রূপের সাথে গুণের এমন চমৎকার সমন্বয় সচরাচর চোখে পড়ে না তো!

রাতে বন্ধুরা কেউ বাড়ি ফিরল না। থেকে যেতে হলো তারা আর মনীষাকেও। অতিথিরা চলে যাবার পর ওরা সবাই ছাদে উঠে এলো। গভীর রাত অবধি চলল গানের আসর। হাসি, ঠাট্টা আর আনন্দের জোয়ারে অনেক দিন পর রমরম করে উঠল বাড়িটা। কারো ঘুম হলো না ঠিক মতো। রুদ্র সকাল আটটার সময় বেরিয়ে পড়ল অফিসের উদ্দেশ্যে। সামিকে আলসেমিতে পেয়ে বসল। ঠিক করল একটু দেরি করেই অফিস যাবে আজ। নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার এটাই সুবিধা। জবাবদিহিতা নেই। আকাশ, মনীষা আর তারা সকাল নয়টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যবশত অমৃতার আজ কোর্টে যাবার প্রয়োজন নেই। বিকেলের দিকে একবার চেম্বার থেকে ঘুরে আসলেই হবে।

এদিকে হক সাহেব অফিসে চলে যাবার পর রোমেলা লাইব্রেরি রুমের দরজাটা চাবি দিয়ে খুললেন। একটাবার পুরো ঘরটা তল্লাশি করে দেখতে চান। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই অবশ্য পাওয়া যাবে না বলে মনে হচ্ছে। এসব দিক দিয়ে স্বামীকে বিলক্ষণ চেনেন তিনি। অতি ধুরন্ধর। কাঁচা হাতের কাজ ওই লোক করে না। অবশ্য মোবাইল ঘাঁটলে ঠিকই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এর মাঝে একজন আইটি অফিসারের সাথে রোমেলা কথা বলেছেন। মোবাইলের পাসকোড উদ্ধার করার ব্যাপারে। অফিসার

মোটা অংকের টাকা চেয়েছে, সেই সাথে কাজ হবার নিশ্চয়তাও দিয়েছে। কিন্তু মোবাইলটা তিনি চুরি করবেন কী করে? এই ঘরের চাবি চুরি করতেই তো দিন রাত এক করে ফেলতে হয়েছে। মোবাইল চুরি তো এক অসম্ভব ব্যাপার। ভাবতে ভাবতে কাঠের টেবিলের ড্রয়ারটা পাগলের মতো তন্নতন্ন করে ঘাঁটছিলেন রোমেলা। হঠাৎ একটা ছোট্ট কাগজে তাঁর চোখ দুটো সুপার গ্লুর মতো আটকে গেলো। ধক করে উঠল বুক। কাঁপা হাতে চিরকুটটা হাতে নিলেন তিনি।

৯৯

সকাল দশটায় গোসলটোসল সেরে গেস্টরুম থেকে বেরোলো অমৃতা। করিডোর পেরিয়ে ডাইনিং এ আসতেই দেখল ফাঁকা ঘরে রোমেলা বসে আছেন থমথমে মুখ নিয়ে। অমৃতা ঘরে ঢুকতেই তিনি ক্রূর চোখে তাকালেন। ওই দৃষ্টিটা দেখামাত্র গা রিরি করে উঠল রাগ আর বিরক্তিতে 1 এক ঝলক তাকিয়েই অমৃতা ঘুরে দাঁড়াল। সকাল সকাল এই বিরক্তিকর মহিলার মুখ দেখতে হলো। মনে হচ্ছে দিনটা খুব বেশি ভালো কাটবে না। সামি, হৃদি মনে হয় এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। বাকি বন্ধুরা সব এর মাঝেই বেরিয়ে গেছে। তার নিজেরও এখন বেরিয়ে পড়া উচিত।

– ‘এই মেয়ে!’ কর্কশ গলার সম্বোধনটা শুনে থমকে দাঁড়ালো অমৃতা।

– ‘বলুন।’

রোমেলা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে একটি গোলাপি রঙের নাইটি। মাথার চুল আলুথালু হয়ে ছড়িয়ে আছে পিঠময়। ফর্সা মুখের ত্বকে তেজের আভা ঝিলিক দিচ্ছে। চোখজোড়া জিঘাংসার হিংস্র ছোবল। এই বিভীষণ রূপ হঠাৎ অমৃতার অন্তরাত্মা নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। ভয় এবং অনিশ্চয়তার প্রাবল্যে বুকের ভেতরটা

হিমালয় শৃঙ্গের মতো জমাট হয়ে এলো মুহূর্তের মাঝে। মহিলা এভাবে কথা বলছে কেন? সে কি কিছু টের পেয়েছে?

– ‘নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি?’ সর্পিনীর মতো ফণা তুলতে তুলতে রোমেলা গটগটিয়ে হেঁটে এগিয়ে এলেন অমৃতার দিকে। অমৃতা তখন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্বাস গেছে থেমে। চোখে আতংকের সুস্পষ্ট ছাপ। রোমেলা ওর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর কোনো কথা না বলে হঠাৎ মুখ থেকে একদলা থুতু ছুঁড়ে মারলেন ‘থু’ শব্দ করে। তরলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল অমৃতার গালে। দুঃসহ যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে গেলো তার। অপমানে বুজে ফেলল চোখ। অপ্রতিরোধ্য কম্পনে থরথর করে কেঁপে উঠল সারা শরীর। গলা দিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। নিশ্চল, নির্বাক স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে রইল শুধু। কিছু মুহূর্ত পরে পকেট থেকে রুমাল বের করে থুতুটা মুছে নিল মুখ থেকে, নিঃশব্দে!

রোমেলা ওর চোখের সামনে একটা ছোট্ট কাগজ মেলে ধরলেন। গলা ফাটানো চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘এসবের মানে কী?’ অমৃতা নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ মেলে তাকালো। মহিলার হাতে তার লেখা চিরকুট। যেখানে একদিন সে বুকের সব আবেগ ঢেলে দিয়ে লিখেছিল, রাশেদ আপনাকে ভালোবাসি নিশ্বাসের মতো… এখানে তার নিজের নামও লেখা আছে! সর্বনাশটা তাহলে হয়েই গেছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে! অমৃতার মনে হচ্ছিল এই মাত্র বুঝি অনেক উঁচু বিল্ডিং থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে তাকে। সে প্রবল বেগে পতিত হচ্ছে ভূগর্ভে। আরেকটু পরেই মুখ থুবড়ে পড়বে শক্ত মাটিতে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে হাত পা, থেঁতলে যাবে মুখমণ্ডল।

– ‘আমি কিছুই বলব না তোমাকে। যা করার আমার ছেলেই করবে।’ দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন রোমেলা।

ক্ষুরধার বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে যেন চমকে উঠল অমৃতা। বুকের মধ্যে খচ করে বিঁধে গেলো ছুরি। শুরু হলো রক্তক্ষরণ। 'প্লিজ! সামিকে কিছু বলবেন না!' শত সহস্র বছরের হিমায়িত মৃত্যুর কোল থেকে জেগে উঠে যেন শব্দগুলো উচ্চারণ করল অমৃতা। বহু কষ্টে! রোমেলার মুখে স্বৈরিণী হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। চেহারা মাখামাখি হয়ে গেলো পৈশাচিক আনন্দে।

– 'সামির সামনে তার বন্ধুদের আসল রূপটা এবার প্রকাশ হয়েই পড়বে। পাপীর বিচার এই দুনিয়াতেই করবেন আল্লাহতায়ালা। আমার সংসার ভাঙার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। জীবনে কখনো সুখী হবে না তুমি!'

কথাটা বলে নিয়ে হাতের মুঠোয় শক্ত করে কাগজটা চেপে ধরে রোমেলা পা বাড়ালেন। অমৃতা এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল, অসহায় গলায় বলল, 'প্লিজ, আপনি সামিকে কিছু বলবেন না। ও কষ্ট পাবে।

রোমেলা এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিলেন, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'সরো! খবরদার আমাকে ছোঁবে না তুমি!'

অমৃতা এবার আকুলভাবে বলল, 'আপনি সামিকে ব্যাপারটা জানাবেন না দয়া করে। যা শাস্তি দেবার আমাকে দিন। দোষ আমার। আমি আপনার ফ্যামিলি থেকে অনেক দূরে চলে যাব। আল্লাহর কসম আর কোনোদিন মুখ দেখাব না আপনাদের!' রোমেলার সর্বাঙ্গ রাগে আর ঘেন্নায় জ্বালা করে উঠল। এইসব মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়েরা পারে শুধু নাটক করতে। নাটক করেই পুরুষমানুষের মগজ খায় এরা। ছিঃ!

তিনি ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'এসব নাটক করে কোনো লাভ নেই। সামিকে আমার ঘটনা জানাতেই হবে!

কথাটা বলে শেষ করে তিনি দ্রুত পায়ে জায়গাটা থেকে সরে পড়লেন। বিধ্বস্ত এবং অশ্বীভূত অমৃতা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র কোনো নিকটজনের কাল হয়েছে। কতক্ষণ কাটল কে জানে। একটা সময় অমৃতা প্যান্টের পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে নিল। তার হাত পা টলছে মৃগী রোগীর মতো। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মেসেঞ্জার খুলে বন্ধুদের চ্যাট গ্রুপে ডায়াল করল সে। আকাশ আর বিভা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন রিসিভ করল। খুব দ্রুত কথাগুলো বলে ফেলল অমৃতা।

– 'শোন, সামির মা আমার আর রাশেদের ব্যাপারটা জেনে গেছে। আর সে বলছে যে সামিকে সব কিছু খুলে বলবে আজকেই। এখন··· কী করব?'

অমৃতার গলা অস্বাভাবিক রকমের কাঁপছিল। ফোনের অপর দুই প্রান্তের দুজন বন্ধু এক ধাক্কায় ঠিকঠাক কিছুই বুঝে উঠতে পারল না তার কথা। তবে ওই ভাঙা ভাঙা কয়েকটা কথা শুনেই বেশ ঘাবড়ে গেছে ওরা। বিভা আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বলে উঠল, 'কী হইছে? হ্যাঁ? আমি বুঝি নাই।' আকাশও একই ধরনের অভিব্যক্তিই প্রকাশ করল।

– 'অমৃতা, তোর কথা অস্পষ্ট। আরেকবার বল।'

– 'বাল, কানে কালা নাকি তোরা? কথা বুঝিস না কেন? সামির মা···' অমৃতা হাঁপাচ্ছে। দম আটকে আসছে তার কথা বলতে গিয়ে।

– 'হ্যাঁ, কী হইছে সামির মায়ের? তুই একটু শান্ত হ। ডোন্ট প্যানিক দোস্ত।' আকাশ বলল।

– 'শি নোজ এভরিথিং!'

– 'ও… ফাক! কী বলতেছিস তুই এসব?' বিভার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো আর্তনাদের মতো। আকাশ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বলল না। ভারি শ্বাস প্রশ্বাস পড়তে লাগল শুধু।

– 'কীভাবে?' বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশ জানতে চাইল। ঠান্ডা… খুব ঠান্ডাভাবে।

– 'আমার লেখা একটা চিরকুট পাইছে সে। কোত্থেকে পাইছে জানি না।'

রুদ্র অনলাইনে আসলো সেই মুহূর্তে। জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'কী হইছে?' আকাশ বলল ওকে ঘটনাটা অতি সংক্ষেপে।

– 'জানতাম এরকম হবে। এইজন্যেই তোরে সাবধান হইতে বলছিলাম অমৃতা। বারবার বলছিলাম!' বিলাপ করার সুরে বলল রুদ্র কথাগুলো। প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আফসোস নিয়ে।

– ‘আচ্ছা থাম, এখন এসব বলার সময় না। যা হবার হয়ে গেছে। এখন ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।’ বিভা বলল।

– ‘হ্যাঁ সেটাই। অমৃতা লিসেন! তুই তোর রাশেদরে ফোন দিয়ে বিষয়টা জানা তাড়াতাড়ি। দেরি করিস না।’ মতামত দিল আকাশ।

অমৃতা কাঠের চেয়ারের হাতলের ওপর তখন পাঁচ আঙুলের ছাপ বসিয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন হাতটা সরিয়ে ফেললেই সে কাটা গাছের মতো ঝপ করে মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে।

– ‘কথা বলছিস না কেন? সাহস রাখ মনে।’ আকাশ বলল।

অমৃতা এবারেও কিছু বলল না।

– ‘দোস্ত শোন, অমৃতা! আমার কথা শোন।’ বিভা ডাকল ওকে। বাড়ির পোষা বেড়ালকে যেমন আদর করে ডাকে লোকে।

– ‘বল।’ একটা শব্দ বেরোলো অমৃতার গলা দিয়ে। অনেকক্ষণ পর।

– ‘তুই যদি সত্যিই লোকটাকে ভালোবেসে থাকিস, তাহলে ভয় পাস না। ভালোবাসলে ভয় পেতে নেই।’ বলল বিভা অনেকখানি দৃঢ়তার সাথে।

আকাশ যোগ করল, 'হ্যাঁ সেটাই। ভয়ের কিছু নাই। আমরা তোর সাথে আছি। ওই মহিলা তোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর দোস্ত সামিকে নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। ওরে আমরা দেখতেছি। তুই জাস্ট সামির বাবাকে বিষয়টা জানায় রাখ। বাকিটা আল্লাহ ভরসা।'

বন্ধুদের কথা অমৃতার ক্ষুব্ধ, অশান্ত মনটার ওপর সান্ত্বনার মৃদু পরশ বুলিয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় বেঁধে যাওয়া জটগুলো খুলতে শুরু করল একটা একটা করে। বন্ধুরা তার পাশে আছে। এখন আর কোন ভয় নেই!

রুদ্র মুখ খুলল এবার, 'হ্যাঁ, আমরা তোর সাথে আছি।'

হৃদির উপস্থিতি টের পাওয়া গেলো সেই মুহূর্তে। সে ফোন ধরেই বলে উঠল, 'কীরে কী হইছে?' এটুকু বলেই আবার বলল, 'আচ্ছা শোন, আমার শাশুড়ি আসছে। দরজা নাড়তেছে। পরে কথা বলব।'

হৃদি চলে যাবার পর বিভা খুব ঠান্ডা ভাবে বলল, 'অমৃতা, তুই উনাকে ফোন দিয়ে ব্যাপারটা জানায় দে। আর সময় নষ্ট করিস না।'

– 'আচ্ছা, আমি রাখতেছি তাহলে।' বলল অমৃতা।

– 'ওকে, আমি আর রুদ্র, সামির ব্যাপারটা দেখতেছি। তুই টেনশন নিস না।' বলল আকাশ।

রাশেদকে ফোনে পাওয়া গেলো না। প্রায় দশবারোবার টানা ফোন করার পর অধৈর্য অমৃতা ভূতগ্রস্তের মতো বেরিয়ে আসলো বাড়ি থেকে। একটা রিকশা নিয়ে সোজা রওয়ানা দিল হক এন্টারপ্রাইজের উদ্দেশ্যে। উত্তেজনায় নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে যাচ্ছিল সে। আতঙ্কে জমে আছে ভেতরটা। আল্লাহ যেন শত্রুকেও কখনও এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন না করেন। হঠাৎ মাথায় আসলো ব্যাপারটা। অন্য কারো মুখ থেকে শোনার আগে তার উচিত নিজেই সব কিছু খুলে বলা সামিকে। ফোন বের করে চট করে নোটপ্যাডে সেভ করে রাখা চিঠিটা ইমেইল করল সে সামির ঠিকানায়।

১০০

কান থেকে ফোন নামিয়ে রেখে হৃদি দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলল। শাশুড়ির থমথমে গম্ভীর মুখখানা দেখে একটু ভয় খেলো নিজের অজান্তেই। উদ্বেগ নিয়ে বলল, ‘কী হয়েছে?’

– ‘আমার বাচ্চাটা কোথায়?’

মায়ের গলার আওয়াজ পেয়ে সামি দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে তখন। হাতমুখ ধুয়ে মাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে সে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ছাই রঙের একটা পাতলা গেঞ্জি। এই অসময়ে মায়ের উপস্থিতি কিঞ্চিৎ চমকে দিল তাকে, ‘কিছু বলবে মা?’

রোমেলা ছেলের ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন। ঘরটা বেশ অন্ধকার হয়ে আছে। দরজা, জানালা বন্ধ বলে সূর্যের আলো ঢোকেনি এখনও ভেতরে। রোমেলা ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ঠান্ডা গলায় আদেশ দিলেন, ‘বাতি জ্বালাও।’

সামি বাধ্য ছেলের মতো বাতি জ্বালালো। টিউবলাইটের সাদা আলোয় মায়ের মুখটা একবার ভালোমতো দেখে নিল সে। চোখ পড়ল মায়ের হাতে ধরে থাকা টুকরো কাগজটার দিকে। কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল, ‘কী ওটা?’

হৃদি একটা চেয়ার এগিয়ে দিল শাশুড়ির দিকে, ‘বসুন। বসে কথা বলুন।’ বলল সে সসম্মানে।

রোমেলা বসলেন চেয়ারটায়। পায়ের ওপর পা তুলে। ছেলের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘জরুরি কথা বলতে এসেছি।’ সামির কপালে একটা ভাঁজ পড়ে গেছে এর মধ্যেই। চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে মায়ের মুখোমুখি বসল, মোড়া পেতে। বলল, ‘হ্যাঁ বলো। কী জরুরি কথা?’

হৃদি বিছানার ওপর দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা কাঁথাটা ভাঁজ করছিল যত্ন সহকারে। তার মন উৎকর্ণ। সাত সকালে শাশুড়ির কী এমন জরুরি দরকার পড়ে গেলো তা জানবার জন্য কৌতূহলে ভেতরটা একদম আইটাই করছে।

রোমেলা দুএকবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর খুব ধীরস্থিরভাবে বললেন, ‘তোমার বাবার ব্যাপারে জানতে পেরেছি। মেয়েটিকে তুমি চেনো।’

সামি প্রথমটায় যেন কিছুই বুঝল না। বিস্মিতভাবে বলল, ‘মানে?’

রোমেলা নড়েচড়ে বসলেন। টেনে টেনে বললেন, ‘তোমার বাবার যে একজনের সাথে সম্পর্ক আছে বলেছিলাম, ভুলে গেছ?’

সামির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্য ভারি বিচলিত দেখাল তাকে। মায়ের দিকে শূন্য চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, ‘তোমার কথা বুঝতে পারছি না।’

রোমেলা ছেলের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হলেন। মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক চ’ কারান্ত শব্দ করে উঠে বললেন– ‘অবশেষে তোমার বাবার প্রেমিকা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছি! এখন বুঝেছ?’

একটা দশ মণ ওজনের ভারি পাথর বুঝি দূরের ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে ঠিক সামির বুক বরাবর আটকে গেলো। ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো মায়ের দিকে চেয়ে থাকল সে। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না।

– ‘নাম জানলে অবাক হবে। যাদেরকে তুমি এতকাল বন্ধু ভেবে এসেছ। আপন মনে করেছ। তারাই তলে তলে তোমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।’ কথাটা বলে তিনি হৃদির দিকে একবার প্রখর চোখে তাকালেন। সেই দৃষ্টি দেখে বুক কেঁপে উঠল হৃদির। হাত পা অসাড় হয়ে এলো এক উৎকলিত উত্তেজনায়।

সামি একটু কড়াভাবে বলল, ‘যা বলবা সরাসরি বলো। এত প্যাঁচ করতেছ কেন?’

রোমেলা এ কথা শুনে তীক্ষ্ণ হাসলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘ওই যে তোমার একটা বেয়াদব ফ্রেন্ড আছে না? সারাক্ষণ বড়দের মুখে মুখে কথা বলে, ছেলেদের মতো পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, নিজেকে মহাপণ্ডিত মনে করে! সেই বেয়াদব মেয়েটাই তোমার বাবার মাথাটা খেয়েছে।’

সামির চোখজোড়া চকিতে স্ফীত হয়ে উঠল এক প্রবল বিস্ময়ে, মুখ হয়ে গেলো হা। কয়েকটা সেকেন্ড থ মেরে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেলো সেই মুহূর্তে। তারপর হঠাৎ করেই উৎকট শব্দে ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার মাথাটা একেবারে গেছে মা। আমার বাবার সাথে আমার বন্ধু? সিরিয়াসলি? এটা কখনো সম্ভব? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

রোমেলা এবার উঠে এসে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন। একটু ঝুঁকে হাতে ধরা চিরকুটটা ছেলের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমি জানতাম তুমি আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবে না। এ কারণেই প্রমাণ সাথে করে নিয়ে এসেছি। নাও, এটা পড়।'

সামি আশ্চর্য চোখে তাকালো কাগজটার দিকে। তুলে নিল হাতে। চোখের সামনে মেলে ধরে পড়া শুরু করল। কালো কালি দিয়ে লেখা গোটা গোটা অক্ষরগুলো পড়তে গিয়ে তার হৃৎপিণ্ড থমকে গেলো। ভ্রু দুটো সূচালো হয়ে উঠল ত্রিভুজের মতো। প্রগাঢ় হলো কপালের ভাঁজ। এই হাতের লেখাটা তার অনেক চেনা!

হৃদি কাজ ফেলে রেখে সামির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। বিস্ফারিত চোখে পড়ছে চিরকুটের লেখাগুলো।

– 'এটার মানে কী?' বিভ্রান্তি, বিস্ময় এবং উত্তেজনায় একাকার হয়ে প্রশ্ন করল সামি।

– 'এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?'

সামি রুদ্ধশ্বাসে আরেকবার তাকালো হাতে ধরা চিরকুটটার দিকে। গুচ্ছের বিহ্বলতা নিয়ে বলল, 'কোথাও নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে। এটা সম্ভব না।'

হৃদির চোখ ফেটে জলের ফোয়ারা নেমেছে। ভয়ে আর আতংকে মনে হচ্ছে বুঝি এখুনি ফিট হয়ে যাবে।

রোমেলা কাটা কাটা গলায় বললেন, 'অসম্ভব ব্যাপারটাই সম্ভব করে দেখিয়েছে তোমার বান্ধবী। বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে ড্রাইভার পর্যন্ত সকলে জানে। সুলেমানও জানত। জানো না শুধু তুমি। চিন্তা করে দেখো কীভাবে বোকা বানিয়েছে তোমাকে তোমার প্রাণ প্রিয় বন্ধুরা!'

দিশাহারা সামি হাতে ধরা কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বিতীয়বার পড়ল। তার মনে হচ্ছিল সে একটা ভয়ংকর বাজে দুঃস্বপ্ন দেখছে। এখুনি ঘুম ভেঙে যাবে এবং ঘুম থেকে উঠে পড়লেই দেখবে সব ঠিক।

'রাশেদ! আপনাকে ভালোবাসি নিঃশ্বাসের মতো। নিশ্বাস নিতে যেদিন ভুলে যাব সেদিন আশা করি আপনাকেও ভুলতে পারব। আমি কাউকে ভয় পাই না। আপনার স্ত্রী যদি কিছু জানতে পারে তাহলে বলবেন সব দোষ অমৃতা নামের বাজে মেয়েটার। এরপর যে শাস্তিই আপনারা আমাকে দেবেন। আমি মাথা পেতে নেব।'

সামির চারপাশটা ক্রমেই কেমন ঘোলা হয়ে আসছিল। কান হয়ে আসছিল বধির। বুকের ভেতর ঘটছিল একের পর এক বিস্ফোরণ! কাগজটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়ালো সে। বুনো ষাঁড়ের মতো দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। হৃদি

দৌড়ে ছুটে আসলো, পেছন থেকে ওর একটা হাত ধরে ফেলে আতভাবে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

সামি ঘুরে তাকালো। চমকে উঠল হৃদি ওর ওই আগুন দৃষ্টি দেখে।

– 'তুই কি কাহিনি কিছু জানিস?'

হৃদির চোখ ভেসে যাচ্ছে নোনাজলে। থরথরিয়ে কাঁপছে ঠোঁট। কথা আটকে যাচ্ছে গলায়। সামি তার বহু বছরের পুরানো বন্ধু এবং পাঁচ মাসের নবীনা স্ত্রীর চোখের দিকে কিছু সময় নির্বাক চেয়ে রইল। তারপর আর উত্তরের আশা না করে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গটগটিয়ে এগিয়ে গেলো সামনে। কান্নারত অস্থির হৃদি বুঝতে পারল, সামি খুব ভালোমতোই বুঝে গেছে, যে হৃদি এমন কিছু জানে, যা সামি জানে না।

বেডরুমের দরজায় রোমেলা এসে দাঁড়ালেন। হৃদি তাঁকে দেখামাত্র মুখ ঝামটা মেরে বলে উঠল, 'আপনি এটা কী করলেন?'

মেয়েটির স্পর্ধা রোমেলাকে বিস্মিত করল, 'আমি কী করেছি, কেন করেছি এসব এখন তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে?'

হৃদি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কেন এরকম করলেন আপনি? কেন বলতে গেলেন সামিকে? এখন কী হবে? হায় আল্লাহ! এখন কী হবে?'

– 'শোনো মেয়ে, ঢং করোনা। বলব না তো কি তোমাদের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করব নিজের ছেলের সাথে? সত্য লুকাব?'

– 'একটা সত্য না জেনেই না হয় ওর জীবনটা কেটে যেত!'

– 'বাহ্! ওই লোকটা যা খুশি তা করে যাবে আর আমি কোনো প্রতিবাদ করব না? কেন এই অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করব আমি?'

– 'একটু ধৈর্য ধরতেন। বাবা নিশ্চয়ই ফিরে আসতেন একটা সময়ে।

– 'চুপ করো! এখন তোমার মতো লো স্ট্যান্ডার্ড একটা মেয়ের কাছ থেকে আমার এসব উপদেশ বাণী শুনতে হবে? তুমি তো সবকিছু জানা সত্ত্বেও মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলে।'

– 'আমি চুপ করে ছিলাম শুধু সামির জন্য। আমি ওকে কষ্ট দিতে চাইনি!'

– 'মিথ্যে কথা বোলো না! তুমি চুপ করে ছিলে তোমার বান্ধবীকে বাঁচানোর জন্য। সামি জেনে গেলে তো তোমাকে আর তোমার বান্ধবীকে লাথি মেরে বের করে দেবে ওর জীবন থেকে। এই ভয়েই চুপ করে ছিলে।'

হৃদি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ রোমেলার দিকে। তারপর অস্ফুটে বলল, 'সামি কোনোদিনই আমাকে ওর জীবন থেকে বের করে দেবে না।'

রোমেলা হুংকার ছাড়লেন, 'আলবৎ দেবে! যখন জানতে পারবে তুমি সব জেনেশুনেও চুপ করে বসে ছিলে তখন ঘাড়টা ধাক্কা দিয়ে এই বাড়ি থেকে বিদায় করবে তোমাকে!' হৃদি আর কিছু বলতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলো শোবার ঘরে।

১০১

রিসিপশনিস্ট আটকে দিল অমৃতাকে।

– 'এক্সকিউজমি ম্যাডাম, আপনি কার কাছে এসেছেন?'

শংকিত এবং অস্থির অমৃতা থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রিসিপশনে বসে থাকা ভারি প্রসাধন মাখা মেয়েটির দিকে। চিনতে পারল। মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের অভদ্র আচরণের কথা। এ মুহূর্তে অমৃতার বেশি কথা বলার সময় নেই। সে খুব ছোট করে বলল, 'আপনাদের স্যার আছেন অফিসে?'

– 'কোন স্যার?' মেয়েটিও চিনেছে অমৃতাকে। তার চোখে মুখে সেদিনের উদ্ধত ভাবটা ফিরে এসেছে। গলার স্বর রুক্ষ।

– 'রাশেদুল হক।'

– 'ও। স্যার তো কনফারেন্স রুমে আছেন। এখন দেখা করা যাবে না।' অমৃতা অস্থিরভাবে বলল, 'প্লিজ উনাকে একটা ফোন করে বলুন যে অমৃতা এসেছে। খুব জরুরি দরকার।'

মেয়েটা এমনভাবে হাসল, যেন এমন হাস্যকর কথা জীবনে সে কখনো শোনেনি।

– 'স্যরি ম্যাডাম। স্যারকে তো এখন ডিস্টার্ব করা যাবে না। আপনাকে ওয়েইট করতে হবে।'

অসহনীয় রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল অমৃতার। দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'আপনি ফোন করুন। আমার এ মুহূর্তেই উনার সাথে মিট করা দরকার।'

মেয়েটা দুদিকে সজোরে মাথা নাড়ল, 'এখন ফোন করা যাবে না। ইউ হ্যাভ টু ওয়েইট। আপনার তো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টও ছিল না। স্যার তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করেন না। অবশ্য আত্মীয়স্বজন হলে অন্য কথা। আপনি কি স্যারের আত্মীয়?'

অমৃতা মেয়েটির দিকে একটা অত্যধিক ধারালো দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো। খুব দ্রুত অতিক্রম করল রিসিপশনের জায়গাটা। পেছন থেকে মেয়েটা সমানে চিৎকার করে যেতে লাগল, 'আরে আজব, আপনি পারমিশন ছাড়া ভেতরে যেতে পারেন না। অফিসের একটা রুল আছে তো!'

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দুজন সিকিউরিটি গার্ড ছুটে আসলো অমৃতার পেছন পেছন। অমৃতা তখন লিফটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সিকিউরিটি গার্ড দুজন ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে এসে ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। গার্ডদের পেছনে রিসিপশনের মেয়েটাও এসে দাঁড়িয়েছে। মোচওয়ালা যা চেহারার একজন গার্ড বলে উঠল, 'আপনি এখন ওপরে যেতে পারবেন না। অপেক্ষা করেন।'

রিসিপশনিস্ট বলল, 'কী কাজে এসেছেন সেটা বলেন। আমি দেখছি কী করা যায়।
'

প্রেতাত্মার মতো ফোঁসফোঁস নিশ্বাস পড়ছিল অমৃতার। রাগ, অপমান, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এই সমস্ত অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে পিষে ফেলছে একেবারে ভেতরটা। কী করবে সে এখন? সামি কি এতক্ষণে জেনে গেছে ঘটনা? তার পাঠানো ইমেইলটা কি পেয়েছে? কী করছে ও? কী ভাবছে? সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে একটা কান্নার দলা। উপোসি শরীর বড়ই দুর্বল। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে। কী বলবে সে এদেরকে? কী করে বোঝাবে যে লোকটার সাথে একটাবার দেখা করা এ মুহূর্তে তার জন্য কতটা জরুরি!

হঠাৎ পাগলের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'পথ ছাড়ুন! সরে দাঁড়ান সামনে থেকে! আমার এখুনি ওপরে যেতে হবে। রাইট নাও!'

চিৎকার শুনে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো রিসিপশনিস্ট। সিকিউরিটি গার্ড দুজনকেও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত দেখাল।

– 'সরে দাঁড়ান। আপনাদের স্যার জানতে পারলে কিন্তু আপনাদের একজনেরও চাকরি থাকবে না!'

একটু বিভ্রান্তি খেলে গেলো মানুষ তিনজনের মুখে। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল তারা। অমৃতা এই সুযোগে লিফটের বাটন প্রেস করে দিল। তার ভেতরে এখন স্বভাবসুলভ একরোখা এবং জেদি ভাবটা ফেরত এসেছে। মুখে থমথমে কঠোরতা। চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে তেজ। গার্ড দুজন হতভম্বভাবে তাকিয়ে আছে তার

দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লিফ্‌ট সমতলে এসে দাঁড়ালো। অমৃতা কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ঢুকে গেলো বাক্সটায়। কনফারেন্স রুম কোথায় সে জানে না। লিফটম্যানকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হলো। লিফ্‌ট থেকে নেমে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এলো কনফারেন্স রুমে। তারপর একমুহূর্তও দেরি না করে কনফারেন্স রুমের দরজাটা সটান খুলে ফেলল। বিশাল বড় ঘরটার মাঝামাঝি অবস্থানে একটি লম্বা টেবিল দখল করে দশবারোজন মানুষ বসে আছে। অন্ধকারে জ্বলছে দেয়ালজোড়া প্রজেক্টর। অমৃতা দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরসুদ্ধ লোক তার দিকে ঘুরে তাকালো। পিনপতন নীরবতা। অন্ধকারে কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অমৃতার মাথা শূন্য। কানে যেন তালা পড়ে গেছে। একটা চিঁচিঁ শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে এই মুহূর্তে। দুশ্চিন্তায় বমি বমি ভাব হচ্ছে।

হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠ কানে এসে লাগল, ‘তুমি এখানে?’

অনেকক্ষণ ধরে উত্তেজনার বশে আটকে রাখা নিশ্বাসটা এবার এক বিন্দু স্বস্তি হয়ে বেরিয়ে আসলো শ্বাসনালি দিয়ে। মানুষটা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। পরনে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, গলায় ঝোলানো কালো টাই। চোখ জোড়া বিস্ময়। কপালে ভাঁজ! দরজার বাইরে হেঁটে আসলেন তিনি

– ‘উই নিড টু টক!’ এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল অমৃতা।

– ‘সব ঠিক আছে তো?’

– ‘একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।’

কিছু সময় তীক্ষ্ণ চোখে অমৃতার মুখপানে চেয়ে থেকে কী যেন একটা পড়ার চেষ্টা করলেন রাশেদ। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, ‘একটু দাঁড়াও। আসছি।’

অমৃতা দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাশেদ ফিরে আসলেন।

– ‘এসো আমার সাথে।’ কথাটা বলে অমৃতাকে পেছনে ফেলেই তিনি হাঁটা শুরু করলেন। অমৃতা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে পা বাড়াল। লম্বা করিডোর পেরিয়ে, লিফট চেপে, ওপরতলায় রাশেদের নিজস্ব কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছুতে প্রায় মিনিট পাঁচেক সময় লেগে গেলো। ভেতরে ঢুকে তিনি দরজা আটকে দিলেন। এই ঘরে সচরাচর কেউ অনুমতি ব্যতীত ঢোকে না বলে দরজা লক করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

– ‘কী ব্যাপার? কী হয়েছে?’ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

অমৃতা মুখ তুলে তাকালো। কাচের জানালায় পর্দা টানানো নেই বলে, দিনের আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর। এয়ারকন্ডিশনের হিম শীতল বাতাসে চারপাশ ভারি হয়ে আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেও অমৃতার কপাল ঘামছে অনবরত। সে অস্থিরভাবে বলল, ‘এক গ্লাস পানি হবে?’

– ‘নিশ্চয়ই।’ বলে রাশেদ ঘরের মাঝ বরাবর অবস্থিত ডিম শেপের কাঠের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের এক কোণে পানির জগ আর গ্লাস রাখা। জগ থেকে পানি ঢেলে নিলেন ঝকঝকে কাচের গ্লাসে। এই পুরো সময়টায় অমৃতাকে আড়চোখে দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ কী হলো মেয়েটার? খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। খারাপ কিছু হয়নি তো?

অমৃতা তখন সোফার ওপর বসে পড়েছে। রাশেদ পানির গ্লাসটা ওর হাতে তুলে দিলেন। ঢকঢক করে গ্লাসের সম্পূর্ণ পানিটা গিলে ফেলল অমৃতা। মনে হচ্ছিল যেন এক সমুদ্র পানি পান করলেও এই মুহূর্তে তার তৃষ্ণা মিটবে না। বুকজোড়া মরু প্রান্তরের খাঁ খাঁ শূন্যতা! রাশেদ ওর সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেয়ে ছিলেন পলকহীন গম্ভীর চোখে। পানি খাওয়া শেষ হলে অমৃতার হাত থেকে তিনি গ্লাসটা তুলে নিলেন। নামিয়ে রাখলেন গোলাকার স্বচ্ছ কাচের সেন্টার টেবিলের ওপর, নীল রঙের চীনা মাটির ফুলদানিটার পাশে। কাঁধের ব্যাগটা সোফায় রেখে অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। বড় একটা শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,

– 'আপনার ওয়াইফ আমাদের ব্যাপারটা জেনে গেছেন।'

রাশেদের মুখ থেকে রক্ত সরে গেলো। থমকে গেলো হৃৎপিণ্ড।

--'কীভাবে?' কণ্ঠনালি দিয়ে ঠেলেঠুলে শব্দটা বের করলেন তিনি, অনেক কষ্টে!

অমৃতা কাঁপতে কাঁপতে বলল –'আই হ্যাভ নো আইডিয়া। উনার কাছে আমার লেখা চিরকুট আছে। আমি জানি না কোথায় পেয়েছেন। উনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, উনি যেন সামিকে না বলেন ব্যাপারটা। লাভ হয়নি।'

বিস্ময়, শঙ্কা এবং দুশ্চিন্তায় কয়েকটা সেকেন্ড স্তব্ধীভূত হয়ে রইলেন রাশেদ। পেশাগত জীবনে অনেক সংকটাপন্ন মুহূর্ত তিনি পার করে এসেছেন। দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি সংকটই নির্বিঘ্নে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে তাঁর সাংসারিক জীবন ছিল ছিমছাম, নিস্তরঙ্গ এবং ঝুঁকিমুক্ত। সাংসারিক জীবনে এমন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হলেন এই প্রথম। এমন বিপদ

মোকাবেলা করার নিয়মকানুন তাঁর জানা নেই। আজ তাই নিতান্তই আনাড়ি, দুর্বল এবং বুদ্ধিহীন খেলোয়াড়ের মতো ভেতরে ভেতরে একদম সিঁটিয়ে গেলেন। কুঁকড়ে গেলেন! দুঃসহ আতঙ্কে জমে বরফ হয়ে গেলেন। একমাত্র আদরের পুত্রের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো বিন্দু পরিমাণ সাহসও বুঝি তাঁর মাঝে আর অবশিষ্ট রইলো না। অস্থির চিত্তে ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করলেন তিনি। হেঁটে গিয়ে জানালার কাচ তুলে দিলেন। কম্পিত হাতে সিগারেট ধরালেন একটা।

অমৃতা শ্বাস রোধ করে চেয়েছিল মানুষটার দিকে। তার বুকের কলিজা এক নিদারুণ কষ্টে খণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। আজকে তার জীবনের সবচাইতে প্রিয় মানুষটার এহেন দুরবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। সব দোষ তার। শুধু তার দোষেই আজ মানুষটা তার ছেলের কাছে ছোট হয়ে গেলো। ঠুনকো হয়ে গেলো। নিজের প্রতি একটা সুতীব্র ঘেন্নায় অন্তর বিষিয়ে যাচ্ছে তার। এত বড় অন্যায়ের পর, নিজেকে আর কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না সে। কোনোদিন না!

– 'রাশেদ!' হঠাৎ আকুলভাবে ডেকে উঠে কয়েক পা এগিয়ে এলো অমৃতা। রাশেদ ফিরে তাকালেন। অমৃতা দুই হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভূমিকম্পিত বক্ষ নিয়ে বলল, 'রাশেদ লিসেন, আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ স্যরি! আমার জন্য আপনাকে আপনার ছেলের কাছে ছোট হতে হচ্ছে। আপনার তো কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার। ' বলতে বলতে অমৃতার গলা কেঁপে যাচ্ছিল। ঝাপসা হয়ে আসছিল দৃষ্টি। একটু থেমে সে আবার বলল, 'কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সামিকে বুঝিয়ে বলব যে ব্যাপারটা পুরোই একতরফা ছিল। ওই চিরকুটে আমি আমার মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলাম। নিজের দোষও স্বীকার করে নিয়েছিলাম। ঠিক এই কথাটিই আমি সামিকে ভালোমতো বুঝিয়ে বলব। ও খুব সহজেই এটা বিশ্বাস করবে যে আমার প্রতি আপনার কোনো দুর্বলতা নেই।'

রাশেদ কিছু বললেন না। শুধু নিশ্চল দুটি চোখের মণি অমৃতার দিকে তাক করে রাখলেন। সকাল বেলার নরম আলোতে ডুবে আছে মেয়েটার মুখ। হলদে রোদে চিকচিক করছে ওর চুল, গলা আর কণ্ঠাস্থির ছোট্ট সুন্দর গাঢ় রঙের তিলটা। চোখে টলমল করছে কয়েকবিন্দু জল। পাতলা সুন্দর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা… ভীষণ আচমকা একটা ভারি আশ্চর্য অনুভূতি তাঁর সমস্ত চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। মনে হলো এই মুখটা সামনে থাকলে যত বড় তুফানই আসুক না কেন, হাসিমুখে সেই তুফান মোকাবেলা করতে পারবেন তিনি।

– 'কিছু বলছেন না যে?' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল অমৃতা।

রাশেদ আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। জানালার কাচ দিলেন তুলে। তারপর দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন অমৃতার মুখোমুখি। কুয়াশাময় আবছা কান্নার জাল ভেদ করে অমৃতা দেখল মানুষটা তার চোখের ওপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রেখেছেন। ওই গভীর দুটি চোখে আজ এক দুর্জ্ঞেয় এবং অব্যক্ত কষ্ট। বুক মোচড় দিয়ে ওঠে অমৃতার। এতক্ষণের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর শঙ্কা আবছা হয়ে আসে এক বাঁধছেড়া সম্মোহনে। বশীভূতের মতো সামনে এগিয়ে যায় সে। তারপর জুতো পরা পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে মানুষটাকে। গভীর আলিঙ্গনে… শ্বাসে শ্বাস মিশিয়ে বলে, 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সামিকে আমি বুঝিয়ে বলব যে এই সম্পর্ক একতরফা। ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রাশেদ অমৃতার নরম শরীরটা শক্ত করে চেপে ধরলেন নিজের বুকের সাথে। ওর বয়কাট ছাটের চুলগুলোতে নাক ডুবিয়ে কেমন অন্যরকম গলায় বললেন, 'অমৃতা! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার জীবনে আসার জন্য এবং আমাকে খুব সুন্দর কিছু

অনুভূতি উপহার দেবার জন্য। তুমি না এলে আমি কখনোই জানতাম না যে টাকাপয়সা, ক্ষমতা এবং প্রাচুর্যের বিনিময়ে গোটা দুনিয়া কিনে ফেলা সম্ভব হলেও ভালোবাসা কখনোই কেনা সম্ভব না!'

এরপরের কয়েকটা ক্ষণ দুজন মানুষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। কেউ কোনো কথা বলছিল না। শুধু চোখ বন্ধ করে শুনছিল একে অপরের হৃদস্পন্দন। গ্রীষ্ম সকালের চনমনে রোদে ভেসে যাচ্ছিল প্রশস্ত, পরিপাটি, আধুনিক সাজে সজ্জিত অফিস কক্ষটি। ভেসে যাচ্ছিল দুটি মানুষের মন স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা আর ভালোবাসায়। কোথাও যেন আর কোনো ভয় নেই, উৎকণ্ঠা নেই, নেই কোনো দুশ্চিন্তা! শুধুই শান্তি! অমেয় শান্তি!

একটা ধুপধাপ পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল কাছে। ওরা ঠিকমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাঠের দরজাটা হাট করে খুলে ফেলল কেউ একজন। ঘরের ভেতর যেন হঠাৎ প্রকট শব্দে বজ্রপাত হলো। চমকে উঠে ছিটকে গেলো দুজন দুদিকে। ঝাপসা চোখে সামিকে দেখল অমৃতা খোলা দরজার সামনে।

– 'হোয়াট দ্যা ফাক ইজ গোয়িং অন?' সামির গমগমে কণ্ঠস্বর মাঘ মাসের শৈত্যপূর্ণ হাওয়ার মতো ভেসে এসে জমিয়ে দিয়ে গেলো অমৃতার হাত পা। বুকের মধ্যে দুপদুপ করে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল ক্রমাগত। বাকশূন্য, বুদ্ধিশূন্য হয়ে সে শুধু নিষ্পলক চেয়ে রইল সামির দিকে। কিছু বলতে পারল না। রাশেদ ছেলের দিকে তাকালেন একবার। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। ওই চোখের দিকে সরাসরি তাকাবার মতো সাহস তার নেই আজ।

সামি বিস্ফোরক চোখে সামনে দাঁড়ানো মানুষদুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখদুটো রক্তলাল। চুল অবিন্যস্ত। নাকের পাটা ফুলে ঢোল। হিংস্র, ক্ষুধার্থ, শিকারি ব্যাঘ্রের ন্যায় উত্তপ্ত এবং ক্রুদ্ধ তার নিশ্বাস।

রাশেদ ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অপরাধবোধ এবং গ্লানিতে তার চোখ জ্বালা করছে। বুকে চিলিক দিয়ে উঠছে এক অনির্বচনীয় ব্যথা।

সামি গটগটিয়ে হেঁটে এসে অমৃতার মুখোমুখি দাঁড়ালো। হাতে ধরা কাগজটা ওর চোখের সামনে মেলে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ‘এটার মানে কী?’

অমৃতার সর্বাঙ্গ তখন এপিলেপটিক রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছিল। চোখের কার্নিশ উপচে গড়িয়ে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা রুপালি জল। সামি নিষ্কম্প, নিথর এবং বিস্ময়াভিভূত চোখে চেয়ে ছিল ওর দিকে। জীবনে এই প্রথম সে অমৃতাকে কাঁদতে দেখল। এই মেয়েটি যেন তার বহুদিনের পুরোনো চিরচেনা বন্ধুটি নয়। এ যেন সম্পূর্ণ অচেনা কেউ!

অমৃতা ঠোঁট চেপে কান্না রোধ করার চেষ্টা করল। ভাঙা গলায় অনেক কষ্টে বলতে পারল, ‘দোস্ত··· স্যরি!’

– ‘কী বললি?’ অবিশ্বাসের গলায় বলে উঠল সামি। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চোখের চাউনি এখন অনেকটা অপ্রকৃতস্থের মতো। অবিরত হাঁপাচ্ছে সে। অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে বুক।

অমৃতা এবার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘তুই যা শুনেছিস তা সঠিক। কিন্তু এটা ওয়ান সাইডেড।’ এটুকু বলে সে একটা লম্বা দম নিল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল ‘আমি পছন্দ করি উনাকে। কিন্তু উনি আমাকে পছন্দ করেন না। দোষ আমার। উনার কোনো দোষ নাই।’

একটা হিংস্র বুনো আক্রোশে সামির ফর্সা মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল দু চোখ ভেসে গেলো জবজবে ঘেন্নায়।

বরফ শীতল গলায় সে কেটে কেটে বলল, ‘পছন্দ করিস? আমার বাবাকে?’

কথাটা বলে নিজের বাবার দিকে একবার বুদ্ধিভ্রংশ চোখে তাকালো সে। তারপর গগনবিদারি চিৎকারে ফেটে পড়ে বলে উঠল, ‘আমার বাবাকে?’

চিৎকারটা একদম শাণিত তীরের মতো সরাসরি কলিজায় গিয়ে বিঁধলো অমৃতার। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গা।

– ‘ইউ নো হোয়াট? ইউ আর আ ফাকিং হোর!’ গলা দিয়ে বিষ উগরে দিতে দিতে উচ্চারণ করল সামি কথাগুলো।

– ‘সামি! মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ!’ রাশেদের মুখ থেকে নির্দ্বিধায় ছুটে এলো গর্জনটা।

সামি বাবার কথা গ্রাহ্য করল না। অমৃতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ক্ষুরধার কণ্ঠে বলল, ‘বেশ্যা তুই একটা!’

রাশেদ এগিয়ে এসে ছেলের বাহু চেপে ধরলেন। প্রচণ্ড কড়া গলায় বললেন, 'এসব কী হচ্ছে?

সামি ভীষণ জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে বাবার হাতটা সরিয়ে দিল, 'সরো! তোমার সাথে কথা বলতে আমার ঘেন্না হচ্ছে!'

এবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল অমৃতা, 'সামি! ইউ ক্যান্ট টক টু ইওর ফাদার লাইক দ্যাট!' সামি পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগল –'চুপ থাক! আমার বাবার সাথে আমি কীভাবে কথা বলব তা তোর কাছ থেকে শিখতে হবে? দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমার বাবাকে কেন মনে ধরল তোর? আমার বাবার অনেক টাকা। এইজন্যে? শালি স্লাট কোথাকার!' রাশেদের গলা এবার সপ্তমে চড়ল, 'খবরদার! আর একটাও বাজে কথা বলবে না!'

– 'চুপ করো তুমি! আমার মায়ের কথা একটাবারও ভাবলে না? আমার কথা ভাবলে না? হাও কুড ইউ ডু দিস টু মি বাবা? হাও কুড ইউ?'

অমৃতা দু পা এগিয়ে এলো, 'পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? উনি তো তোদের কথাই ভেবেছেন সবসময়। তোর কানে কি যায় না যে আমি বারবার বলতেছি এটা ওয়ান সাইডেড?' কথাটা বলামাত্র হঠাৎ মনে পড়ল অমৃতার। সামিকে পাঠানো ইমেইলে বলা হয়নি যে ব্যাপারটা একতরফা। দুই জায়গায় দু রকম কথা দেখে সামির মনে কি সন্দেহের উদ্রেক হবার সম্ভাবনা আছে? উফ! ভাবতে পারছে না আর সে। সব কিছু এলোমেলো লাগছে!

রাশেদ ক্ষিপ্তবৎ পুত্রের দিকে অবাক চোখে চেয়ে ছিলেন। তাঁর ভেতর থেকে ভয় এবং সংকোচ উভয়ই কেটে গেছে পুরোপুরিভাবে। এখন শুধু বুকজোড়া এক দগদগে ঘা বিরামহীনভাবে জ্বালাপোড়া করছে। একমাত্র প্রিয় পুত্রের হৃদয় ভাঙার অপরাধে তাঁর ভেতরটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে নিদারুণ কষ্টে। কিন্তু পুত্রকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আংশিক সত্য তো জেনেই গেছে, তাহলে পুরোটা জানাতে আর দ্বিধা কোথায়?

– 'ও ভুল বলছে। ব্যাপারটা একতরফা নয়। আমিও…' এটুকু বলে বড় একটা শ্বাস টেনে নিলেন রাশেদ। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমিও ওকে পছন্দ করি। আমি জানি কথাটা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। কিন্তু এটাই সত্য। আই অ্যাম স্যরি মাই সান! আই অ্যাম রিয়েলি রিয়েলি স্যরি!'

অমৃতা জড়ীভূত বক্ষ নিয়ে তাকালো রাশেদের দিকে। তার ভেতরে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এ মুহূর্তে। লোকটার এই অকপট স্বীকারোক্তি ক্ষণিকের জন্য যেমন একটা ভালোলাগা হয়ে ছুঁয়ে দিয়ে গেছে আলতোভাবে, তেমনি আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে গেছে তীব্র এক গা ছমছমে ভয়ে। ভয়টা সামিকে নিয়েই। দুচোখ ভর্তি গুচ্ছের আতঙ্ক নিয়ে সে সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর চোখে চোখ রাখল। মনে হলো যেন এক শক্তিশালী মাতঙ্গ পায়ের তলায় পিষ্ট করে দিচ্ছে সামির হৃৎপিণ্ডখানি। রক্তলাল চোখজোড়া টলমল করছে কাচের মতো স্বচ্ছ জলে। মুখখানা কুঁকড়ে গেছে অসহনীয় যন্ত্রণায়। কয়েকটা মুহূর্ত সে বাবা এবং বন্ধুর দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা অশ্রুজল। তারপর আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালো। খুব দুর্বল পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল দরজার দিকে। তার মাথাটা তখন কোনো রকমে ঝুলে আছে কাঁধের সাথে। মনে হচ্ছে আরেকটু হলেই কাটা মুণ্ডুর মতো খসে পড়বে শরীর থেকে। অমৃতার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল প্রাণের অধিক প্রিয়বন্ধুর এই মর্মান্তিক দশা দেখে।

– ‘সামি, দোস্ত! একটু শুনে যা।’ কম্পনযুক্ত গলায় কথাগুলো বলতে বলতে সামির একটা হাত পেছন থেকে খপ করে ধরে ফেলল অমৃতা। সেই হাতের ছোঁয়া লাগা মাত্র দুর্দান্ত এক বিধ্বংসী রাগে সরোষে কেঁপে উঠল সামির সমগ্র সত্তা। অসুরের শক্তি ভর করল যেন তার ওপর। ডান হাতটা শূন্যে তুলে নিমেষে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা চীনা মাটির খালি ফুলদানিটা হাতে তুলে নিল সে। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অমৃতার মাথায় একটা প্রবল আঘাত করল। মাটির জিনিসটা সশব্দে আছড়ে পড়ল অমৃতার কপাল বরাবর। ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো নিমেষে। একটা আর্তচিৎকার ছিটকে বেরিয়ে আসলো অমৃতার মুখ থেকে। ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। আতঙ্কিত, স্তম্ভিত, আহত অবস্থায় ক্ষতস্থানে একটা হাত রেখে বন্ধুর দিকে বিস্ময়বিদ্ধ চোখে চাইল সে একবার। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না। ক্রমেই চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। আঙ্গুলের ফাঁক গলে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। অসহ্য ব্যথায় লুপ্ত হচ্ছে চেতনা!

রাশেদ রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসলেন। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কোলে তুলে নিলেন অমৃতাকে। ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সামি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা দেখল। নড়ল না, কিছু বললও না। অমৃতার মাথা চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়েছে মেঝেতে। সেই কাঁচা লাল রক্ত দেখে তার হাতে পায়ে কাঁপুনি ধরে গেছে। সে রক্ত সহ্য করতে পারে না। তার হিমোফোবিয়া আছে।

চোখের সামনে প্রিয় মানুষটার মুখ দেখতে পেল অমৃতা এক ঝলক, চোখ বন্ধ করার আগে। তারপর··· চারপাশে শুধুই শব্দ, শব্দ আর শব্দ! সেইসব শব্দের আলাদা কোনো অর্থ নেই, বর্ণ নেই, গন্ধ নেই! সমস্ত ইন্দ্রিয়জুড়ে তখন শুধুই রক্তের গন্ধ। যন্ত্রণার গন্ধ। শব্দেরাও ঝাপসা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার প্রকোপে। লাল রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে মুখে ঢুকে যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক গেলে। জিবে নোনতা স্বাদ! সবগুলো বাতি নিভে যাচ্ছে একে একে। ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে এক মিশমিশে অন্ধকার। কে যেন কপালের ওপর শত সহস্র পিন ফুটিয়ে যাচ্ছে অনবরত! কেউ ওকে বারণ করো!

কষ্ট হচ্ছে! বড়ই কষ্ট! সে কি মরে যাচ্ছে? যাক, মরেই যাক। প্রিয় মানুষটার বুকে মাথা রেখে অন্তত মরতে পারছে। এমন ভাগ্য কজনের হয়? তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যপটে হঠাৎ কয়েকটা মুখ তারার মতো জ্বলে ওঠে। বাবা, মা, ছোট বোন আর বন্ধুদের মুখ। জ্বলে উঠেই আবার মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। উত্তরমেরু থেকে কনকনে এক হিমবাহ ধেয়ে এসে শরীরের শেষ উত্তাপটুকুও কেড়ে নিয়ে যায়। হাত পা জাড় হয়ে আসে বরফের ন্যায়। এটাই মনে হয় মৃত্যু! কে মারল অমৃতাকে? তার বন্ধু? বন্ধুদের তো সে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। ভালোবেসেছিল আরো একজনকে। দুটি ভালোবাসায় কাটাকাটি হয়ে গেলো। সুখ হলো না আর এ জীবনে! থাক, সবার জীবনে কি সুখ হয় বল? হয় না! তোমরা কেউ অমৃতার মতো ভুল করো না যেন! তোমাদের কারো ভাগ্য যেন অমৃতার মতো না হয়। মরে যাবার আগে তোমাদেরকে এতটুকুই শুধু বলে যেতে চায় অমৃতা

কাচের মতো ঝনঝন শব্দে কিছু একটা ভেঙে যাচ্ছে। অর্থহীন শব্দগুলো ফিরে এসেছে আবার। বর্ণহীন, অর্থহীন, বিদঘুটে শব্দগুলোর ভেতর দিয়ে কে যেন আবছাভাবে বলে উঠল, তোমার বৃষ্টিমহলটা ভেঙে যাচ্ছে! অমৃতা ভারি চোখের পাতা মেলে সামনে তাকানোর চেষ্টা করল। দেখল না কিছুই। চোখের সামনে শুধুই অন্ধকারের বন্যা। কিন্তু দূরের বজ্রপাতের মতো ভাঙচুরের শব্দটা কানে এসে লাগল ঠিকঠাক। ঝনঝন … ঝনঝন… ঝনঝন! আহা বৃষ্টিমহলটা বুঝি ভেঙেই গেলো! অমৃতার আজ একটাই দুঃখ! তোমরা শুনছ? শুধু একটা দুঃখ নিয়েই মরতে হলো অমৃতাকে। তার স্বপ্নের বৃষ্টিমহলটা ভেঙে গেছে!

বন্ধুরা সিএনজি তে করে অফিস বিল্ডিং এর সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল। রাশেদ অমৃতাকে নিয়ে পাজেরো গাড়িতে উঠে বসেছেন। অমৃতার মাথাটা চেপে ধরে আছেন নিজের বুকের সাথে। সাদা শার্ট লাল রক্তে ভিজে জবজব করছে। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে জল। হৃদি, রুদ্র আর আকাশ হাহাকার করে ছুটে গেলো সেদিকে। কিন্তু তার আগেই গাড়ি চলতে শুরু

করে দিল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। তিন বন্ধু পাগলের মতো ছুটোছুটি করে একটা সিএনজি যোগাড় করল। তারপর চলল পাজেরো গাড়িটার পিছু পিছু।

১০২

সামির মস্তিষ্ক বেশ কিছুক্ষণের জন্য চেতন অবচেতনের মধ্যবর্তী একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিল। হাতে পায়ে তীব্র কাঁপুনি নিয়ে সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছিল সে। দাঁতে দাঁত লেগে খিঁচুনি ওঠার উপক্রম হচ্ছিল। চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে রইল অনেকটা সময় সোফার ওপর। মাথা পুরোপুরি ফাঁকা। তার যেন আর কিছুই ভাববার নেই, কোথাও যাবার নেই। যেন সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরে নিঃস্ব অবস্থায় একলা বসে আছে সে বোধশূন্য, বাকশূন্য এবং বুদ্ধিশূন্য হয়ে। হঠাৎ হঠাৎ শুধু মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল শীতল একেকটা স্রোত। বুকে চিলিক দিচ্ছিল চিনচিনে ব্যথা

প্যান্টের পকেটে মোবাইল ভাইব্রেট হচ্ছে। অনেক কষ্টে যন্ত্রটা বের করে চোখের সামনে ধরল সে। মা ফোন করছে। কেটে দিল ফোন। হঠাৎ চোখ পড়ল। একটা ইমেইল এসেছে, অমৃতার ঠিকানা থেকে। কাঁপা আঙুলে ইমেইলটা খুলে দেখল সে।

সামি,

দোস্ত জানি না কথাটা তোকে কী করে বলব। বলতে গিয়ে ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে বিশ্বাস কর! কিন্তু বলতে যে আমাকে হবেই। তুই খুব মন দিয়ে শোন। কিছু দিন আগে আমার এই ছাব্বিশ বছরের ছিমছাম, সুন্দর ছোট্ট জীবনটায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। জীবনে কোনোদিন কোনো পুরুষের প্রতি দুর্বল না হওয়া এই আমি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম একজনকে দেখলে আমার বুক কাঁপে। একলা হলেই

তার কথা মনে পড়ে। তাকে এক নজর দেখবার জন্য, তার গলার স্বর একটাবার শুনতে পাবার জন্য মনটা সারাক্ষণ খাঁচা বন্দি পাখির মতো ছটফট ছটফট করে। সারাক্ষণ তার কথা ভাবতে ইচ্ছা করে, বলতে ইচ্ছা করে, মন খারাপের সময়গুলোতে তার পায়ের কাছে চুপটি করে বসে থাকতে ইচ্ছা করে। কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেলোমরে দোস্ত! বিশ্বাস কর! নিজেকে কন্ট্রোল করার মতো কোনো শক্তিই আর আমার রইল না। ক্রমেই বুঝতে পারলাম এই অনুভূতি কোনো সাধারণ অনুভূতি নয়, মোহো নয়, ইনফ্যাচুয়েশন নয়। সেই মানুষটাও কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সে আমার ভালোবাসা, আমার প্রথম প্রেম!

সামি, লক্ষ্মী বন্ধু আমার! বলতে বড়ই কষ্ট! তবুও বুকে পাথর চাপা দিয়ে আজ বলছি তোকে। আমার জীবনের এই বিশেষ মানুষটি অন্য কেউ নয়, স্বয়ং তোর বাবা। জেনে বুঝে, সজ্ঞানে কিছুই করিনি দোস্ত। হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর! ব্যাপারটা হয়ে গেছে! কী করে যে হলো তা আমি নিজেও জানি না! কিছুতেই নিজেকে ফেরাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। আমি দুঃখিত! ভীষণ ভীষণ ভীষণ দুঃখিত! তুই হয়তো জানিস যে একটা সময় তোর বাবাকে আমি চরমভাবে ঘেন্না করতাম। কিন্তু যখন তাকে কাছ থেকে দেখলাম, মিশলাম, চিনলাম, তখন বুঝলাম যে এমন মানুষ আজকের পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া অতিশয় বিরল ব্যাপার। সত্যিই বিরল। তোর বাবা একজন অসাধারণ মানুষ দোস্ত! আজকে এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই!

তোর মা আমাকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবেন না আমি জানি। তুই কি পারবি? দ্যাখ আমি একটা ব্যাপার অনেক ভেবে দেখেছি। আমরা সবসময় আমাদের বাবা মায়ের পারস্পরিক সম্পর্কটাকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড হিসেবে ধরে নেই। এটা ভুল। আমার বাবা মা হয়েছে বলেই সারাটা জীবনভর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের একজন আরেকজনের সাথে লটকে থাকতে হবে এমনটা ভাবা কোনো সন্তানের জন্যেই যৌক্তিক নয়। আমরা সন্তানেরা একটু বড় হবার পর বাবা মায়ের কাছে নিজের স্বাধীনতার দাবি করি। নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তাদের দখলদারিত্ব মেনে নিতে

কষ্ট হয় আমাদের। অথচ বাবা মায়েরও যে কখনো কখনো মানুষ হিসেবে একটুখানি মানসিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হতে পারে সে বিষয়ে কি কখনো স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে দেখেছি? একদিন তুই তোর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে চেয়ে নিয়েছিলি। আজকে যদি তোর বাবা কিংবা মা তোর কাছে নিজের জন্যে ঠিক এধরনের কিছুই চায়, তাহলে তুই কী করবি? কী করা উচিত? আমি জানি না দোস্ত, সত্য জানি না। তোর বিবেকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। শুধু এটুকু বলে দিই পরিষ্কারভাবে যে তোর বাবা মায়ের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্বের কারণ আমি নই। অনেক আগে থেকেই তাদের দুজনের মাঝে একটি শূন্যস্থান ছিল। যা আমি মাত্র কয়েকদিনেই বুঝে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুই বুঝিসনি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরেও! এ ঘটনার পেছনে অবশ্য আমার একটা আলাদা ব্যাখ্যা আছে। আমার বিশ্বাস, মানুষটা সবসময়ই আমার ছিল। আমি আমার বুকের গভীরে জানতে পেরেছি যে, আমার ছিল বলেই এতকাল ধরে কোনো দ্বিতীয় মানুষ তার মনের ঘরে বসত গড়তে পারেনি। আমাকে তার জীবনে আসতেই হতো। আবার একই সাথে তোকেও আমার বন্ধু হতেই হতো। তোরা দুজনেই আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে থাকবি এমনটাই আসলে হবার ছিল। এটাই নিয়তি!

তোর নিশ্চয়ই রাগ হচ্ছে। আমি জানি ভীষণ রাগ হচ্ছে। খুন করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমাকে দোস্ত? চাইলে করতে পারিস। আমি জানি আমি দোষ করেছি। তোর কাছে এবং তোর মায়ের কাছে আমি চিরকালের জন্য অপরাধী হয়ে রইলাম। তোরা যে শাস্তিই দিবি আমি মাথা পেতে নেব। সবার ভাগ্য তো তুই, হৃদি, বিভা··· তোদের মতো ভালো হয় না! সবার জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের আগমনও ঘটে না! এ জীবনে আমার হয়তো আর ভালো থাকা হবে না। তবুও তুই যদি একটাবার আমাকে ক্ষমা করতে পারিস তাহলে একটুখানি স্বস্তি অন্তত মিলবে। এই স্বস্তিটুকু আমাকে দিস প্লিজ! আমার বর্তমান জীবনে স্বস্তির বড়ই অভাব!

পুনশ্চ : তোকে একদিন প্রমিজ করে বলেছিলাম, আই উইল নেভার লেট ইউ ডাউন। আমি দুঃখিত। কথাটা রাখতে পারলাম না। মাফ করে দিস। আর জেনে রাখিস আমি এবং তোর বাবা, আমরা দুজনেই তোকে অনেক বেশি ভালোবাসি! তুই যা চাইবি তাইই হবে দোস্ত! আল্লাহর কসম!

ইতি,

অমৃতা

৩য় খণ্ডের সমাপ্তি